Written strictly in accordance with the approved Syllabus, dated 25. 7. 57
the Board of Secondary Education, West Bengal, for Classes IX—XI
of Higher-Secondary & Multipurpose Schools.

ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান

Elements of Economics and Civics]

[আলোচনা, সংক্ষিপ্তসার ও প্রশ্নোত্তর-সম্বলিত]

(উচ্চ মাধ্যমিক সংস্করণ)

(নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য)

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী, এম. এ.

অধ্যক্ষ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলিকাতা,

'An Introduction to Politics', 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' (ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ)
১ম ও ২য় খণ্ড, 'অর্থতত্ত্ব', 'প্রাগ্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর
ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান', 'বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান
ও ধনবিজ্ঞান' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

ষষ্ঠ সংস্করণ

(পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত)

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

SYLLABUS FOR ELEMENTS OF ECONOMICS & CIVICS

The objects that have been kept in view in preparing the syllabus are .

(a) to help the students understand and take an intelligent interest in the every day problems of our economic life.

(b) to prepare them as future citizens to appreciate and to take an intelligent part in the affairs of the country, and

(c) to provide those amongst them who intend to take up the 3-Year Degree Course in Economics with the necessary theoretical background.

(a) Economics

For Class IX

1. National Income and its distribution, per capita income —standard of living.
2. Broad factors determining national income,—factors of production.
3. Population—Population and food supply—population and national income—labour supply—unemployment.
4. Natural resources—land and its productivity.
5. Capital— factors governing the accumulation of capital.
6. Technical skill—its importance —factors governing its formation.
7. Economic structure—main structural features of an underdeveloped economy—requirements for economic development.

For Class X

8. Forms of bussiness organisation—single owner firm—partnership—Joint Stock Companies.

   Co-operation – principles—different types of co-operative societies and their main features.

   Small and Large scale industries.

9. Role of the Government, economic functions of the Govt.—Govt and development planning—Indian 5-Year plans.

10. Government finances—taxation, expenditure and borrowing—financing of development.

11. Money—functions of money – monetary standards—creation of money– Banks—Commercial Banks —Central Bank —Functions of Banks—Bank money.

12. The General price level—measurement of changes in the general price level—simple index numbers—Inflation.

For Class XI

13. International Trade, Territorial division of labour—Balance of Trade & Balance of Payments, Protection & Free Trade

14. Markets—forms of markets Competition and Monopoly.

15. Price determination under different market conditions—factors governing demand Price changes and income variations, elasticity of demand—factors governing supply and supply price—increasing and diminishing returns.

16. Different types of factor incomes—wages, interest, rent and profits—collective bargaining and trade unions.

N. B. The Subject is to be treated with special reference to Indian conditions.

(b) Civics

For Class IX

1. The evolution of human society. The family. The patriarchal and matriarchal families. The Indian Joint Family.
2. The State : its origin and characteristics.
3. The Government. Forms of Government. Democracy and Dictatorship. Merits and defects of Democracy. Unitary and Federal Government. Parliamentary and Presidential Government.
4. Organs of Government. Separation of Powers. Departments of Govt.
5. Functions of Government.
6. The individual and Society. Socialism.
7. The Nation. Right of Self-determination. United Nations.

For Class X

8. The Citizen ; how citizenship is acquired and lost ; qualities of a good citizen ; hindrances to good citizenship.
9. The Citizen's Rights. The Right to vote : its importance and implications.
10. The Citizen's Duties—to the family, to the community, to the State.
11. Rights and Duties.
12. Law and Liberty.
13. Public Services.
14. Public Opinion. Organs of Public opinion.
15. Political Parties.

For Class XI

16. A brief outline of the Constitution of India with special reference to—

    The Preamble.

Fundamental Rights; Directive Principles. The Indian Citizen. Franchise.

The Federation of India.

The Distribution of Powers.

The President—how is he elected? Powers of the President.

The Union Parliament. Control of the Executive by the Legislature.

The States. The Governor. The State Legislature.

Relation between the Centre and the States.

Heads of Revenues and Expenditures for Union and State Govts.

The Judiciary. The Supreme Court.

The Indian Political Parties.

17. Local Government.

18. Civic Problems. Village improvement.
    Community Development Projects. Towns and Cities.
    Food. Housing. Sanitation. Health.

19. Defence of India. The Army, the Navy, and the Air Force. Voluntary Defence Organisations. The National Cadet Corps.

—

নিবেদন

দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আসন্ন পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীগণের ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞানের জন্য যে পাঠ্যসূচী সঙ্কলন করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতেই এই পুস্তক রচিত হইল। পাঠ্যসূচী সঙ্কলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে পর্ষৎ তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, ছাত্র-ছাত্রীগণ যাহাতে দৈনন্দিন জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্র-ছাত্রীগণ তাহাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনে দেশের কাযে যাহাতে সক্রিয়ভাবে অংশ-গ্রহণ করিবার যোগ্য হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, তাহারা যাহাতে ধনবিজ্ঞানে তিন বৎসরের উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নির্ধারিত উচ্চ আদর্শের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই এই পুস্তক প্রণয়ন করা হইল। পুস্তকের বিষয়বস্তু পাঠ্যসূচী অনুসারেই আলোচনা করা হইয়াছে। আশা করি, বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ পুস্তক নির্বাচনকালে পর্ষৎ কর্তৃক নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর আমার লেখা অন্যান্য পুস্তকগুলির মত এই পুস্তকের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়টির সংক্ষিপ্তসার ও প্রশ্নাবলী দেওয়া হইল। ইহাতে একদিকে যেরূপ ছাত্র-ছাত্রীগণের অর্থ-পুস্তকের প্রয়োজন হইবে না অপরদিকে সেইরূপ তাহাদিগকে পরীক্ষা-প্রস্তুতিতে সাহায্য করিবে। অবশ্য এই সংক্ষিপ্তসার ও প্রশ্নাবলী দিবার ফলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুস্তকের ভাষা যথাসম্ভব সরল ও সহজে বোধগম্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তৃতীয় উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হইল। বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র-ছাত্রীগণ যাহাতে পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সমগ্রভাবে ধারণা করিতে পারেন, সেজন্য পুস্তকের প্রথমে পাঠ্যসূচী দেওয়া হইল এবং পুস্তকখানি আংশিকভাবে প্রকাশ না করিয়া একসঙ্গে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইল। আশা করি, ছাত্র-ছাত্রীগণ পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন।

প্রকাশকের অনুপ্রেরণাতেই পুস্তকখানি লেখা সম্ভব হইল। নতুবা দু'মাসের মধ্যে পুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্ভব হইত না। এই প্রসঙ্গে প্রকাশকের কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারিবৃন্দের বিশেষ করিয়া সুদক্ষ প্রুফ-রিডারগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। বাণী প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ যেরূপ তড়িৎগতিতে মুদ্রণকার্য সমাপ্ত করিয়াছেন তাহা বিস্ময়ের বিষয়।

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে পুস্তকখানির স্থানে স্থানে যথাযথ পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করা হইল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ ও ১৯৬৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নসমূহের উত্তর দেওয়া হইল। ছাত্র-ছাত্রীগণ পুস্তকপাঠে উপকৃত হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব। প্রকাশক ও প্রেসদ্বয়কে ধন্যবাদ।

আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা-২৬
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

(দশম শ্রেণীর জন্য)

অষ্টম অধ্যায় (ক)

অষ্টম অধ্যায় (খ)

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

(একাদশ শ্রেণীর জন্য)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

(দশম শ্রেণীর জন্য)

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

(একাদশ শ্রেণীর জন্য)

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড

অবতারণা

(Introduction)

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু—Definition and Scope of Economics

অনেক সময় অর্থকে অনর্থের মূল বলা হয়। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অর্থ বা ধন ধর্মসাধনের একটি উপায় এবং এই ধর্ম হইতেই স্থায়ী সুখ লাভ হয়—"ধনাদ্ধর্মস্ততঃ সুখম্"। অর্থের অপব্যবহার অনর্থের কারণ হইলেও বর্তমানে অর্থ মানুষের সুখসমৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়।

অর্থতত্ত্বের সংজ্ঞা সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। পাশ্চাত্ত্য ধনবিজ্ঞানিগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক মার্শালের মতে ধনবিজ্ঞানে আলোচিত হয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী—মানুষ কিভাবে অর্থ উপার্জন করে ও কিভাবে সেই উপার্জিত অর্থ তাহার বিবিধ অভাব মোচনের জন্য ব্যয় করে। মানুষমাত্রই অভাবের দাস। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অভাবের সংখ্যা, বৈচিত্র্য ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু অভাবমোচনের সকল উপাদান সহজে বা বিনা আয়াসে পাওয়া সম্ভব নয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাতাস সহজপ্রাপ্য হইলেও খাদ্য, বস্ত্র ও বাসগৃহ অনায়াসলভ্য নহে। এই জাতীয় অভাব মোচনের জন্য মানুষকে একক বা সম্মিলিতভাবে পরিশ্রম করিতে হয় এবং একমাত্র পরিশ্রমলব্ধ ফলের দ্বারাই তাহার অভাব মোচন হইতে পারে। আদিম মানুষের অভাব ছিল স্বল্প—তাই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষভাবে তাহার অভাব মোচন করিত। সভ্যতাবৃদ্ধির ফলে মানুষ শুধু নিজ চেষ্টা দ্বারা আর তাহার সমুদয় অভাব মোচন করিতে পারে না। তাই তাহারা সংঘবদ্ধভাবে তাহাদের অপরিসীম ও বৈচিত্র্যময় অভাব মোচনের উপাদান উৎপাদন করিয়া অর্থের বিনিময়ে স্বেচ্ছামত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া অভাব দূর করে। সুতরাং বর্তমানযুগে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হইল অর্থ উপার্জন করা—কেননা, অর্থ ব্যতীত কেহই তাহার বৈচিত্র্যময় অভাব মোচনের উপাদান আহরণ করিতে পারে না। কোন মানুষই তাহার নিজের পরিশ্রম দ্বারা তাহার অসংখ্য অভাব মোচনের উপাদান উৎপাদন করিতে পারে না। এইজন্যই একজনের পরিশ্রমলব্ধ ফল অন্যের পরিশ্রমলব্ধ ফলের সহিত বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। নতুবা অভাবের

সম্পূর্ণ মোচন বা তৃপ্তি হইতে পারে না। আর এই বিভিন্ন দ্রব্যের বিনিময়ের বাহন হইল অর্থ। কৃষক তাহার পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদিত ধান্য-বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা তন্তুবায়-নির্মিত বস্ত্র সংগ্রহ করে এবং এইরূপে অর্থের সাহায্যে পারস্পরিক বিনিময় দ্বারা প্রত্যেকের অভাব পূরণ হয়। এইজন্য অর্থতত্ত্ব বা ধনবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল অর্থ বা ধন। ধনবিজ্ঞানে মানুষের শুধুমাত্র সেই কর্মপ্রচেষ্টাগুলি আলোচিত হয়, যে প্রচেষ্টাগুলি একমাত্র অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়। নৈতিক বা সামাজিক হিতবোধ দ্বারা পরিচালিত প্রচেষ্টাগুলির উপযোগিতা অস্বীকার না করিলেও সেগুলিকে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। এইজন্য অনেক লেখক অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়-সংক্রান্ত কাজকর্মগুলিকে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অর্থ ধনবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইলেও অর্থের আলোচনা ধনবিজ্ঞানের একমাত্র বা মুখ্য লক্ষ্য নহে।

একটু প্রণিধানপূর্বক আলোচনা করিলে দেখা যায় বিনিময় করিবার জন্যই মানুষের অর্থের প্রয়োজন হয় আর এই বিনিময়ের সাহায্যে লোকে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য (scarce goods) সংগ্রহ করে। চাহিদার তুলনায় এই অভাবমোচনের দ্রব্যগুলি এত স্বল্প যে, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি লইয়া গঠিত কোন জাতি তাহার ইচ্ছামত সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে—প্রত্যেক জাতিকে—এরূপভাবে এই অভাবমোচনের দ্রব্যগুলির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে হয় যাহাতে ব্যক্তির—জাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধিক হয়। অভাবমোচনের সামগ্রী ব্যবহারের এই নিয়ন্ত্রণের অর্থ হইল নির্বাচন করা বা বাছাই করা। একই ব্যক্তির একই সময়ে কাপড় ও ছাতার প্রয়োজন হইলে তাহাকে বিবেচনা করিতে হয় যে, কোনটি অধিক প্রয়োজনীয়। ব্যক্তির পক্ষে কাপড় ও ছাতার মধ্যে যেরূপ নির্বাচন করিতে হয়, জাতির পক্ষেও সেইরূপ বিচার করিতে হয় যে, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করা হইবে, না বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ধনবিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অর্থের ভূমিকা লইয়া আলোচনা করে না। মানুষের অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের মূলে রহিয়াছে **বিনিময় (Exchange), অপ্রাচুর্য (Scarcity)** ও **নির্বাচন (Choice)**।

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান। ইহা মানুষের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে, কিন্তু এই আচরণ কোন সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষের আচরণ

নহে—ইহা সমাজ দ্বারা প্রভাবিত ও সমাজের অঙ্গীভূত মানুষের আচরণ। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের এই আচরণের একটা সীমা নির্ধারিত হইয়াছে। এই আচরণ শুধু স্বল্প উপাদান দ্বারা মানুষ কি প্রকারে তাহার অপরিসীম অভাব মোচন করে—ইহাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, স্বল্প উপাদান দ্বারা অসংখ্য অভাবমোচনের জন্য ব্যক্তির পক্ষে সামগ্রীর বৈকল্পিক ব্যবহার অর্থাৎ সামগ্রী বাছাই করিবার প্রয়োজন হয়। এইজন্য চাউলের অপ্রাচুর্য হইলে গমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই বাছাই বা পছন্দ উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ-ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করিতে হয়, নতুবা স্বল্প উপকরণ দ্বারা অফুরন্ত অভাব মিটিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, ধনবিজ্ঞানে ব্যক্তিগত পছন্দের কোন স্থান নাই। কারণ, মানুষ সামাজিক জীব। সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয়। এইজন্যই সমাজে শ্রমবিভাগ সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেইজন্য বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং মানুষের অভাবমোচনের সর্ববিধ প্রচেষ্টাব ফল এই বিনিময়-কার্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ধনবিজ্ঞানে বিনিময়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ধনবিজ্ঞান কি ধনেরই বিজ্ঞান—Is Economics the Science of Wealth?

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, অর্থের উপার্জন ও অর্থের ব্যয় ধনবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু হইলেও অর্থই ধনবিজ্ঞানের আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অর্থ বিনিময়ের বাহন মাত্র—ইহা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অভাব মোচন করিতে পারে না। অর্থ উপকরণমাত্র, ভোগ্যবস্তু নহে। অর্থের বিনিময়ে মানুষ তাহার অভাবমোচনেব দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সেই দ্রব্য দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে। এইরূপে অভাব দূরীভূত হইলে মানুষ উন্নততর জীবন-যাপন করিতে পারে। সুতরাং ধনবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানব-জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে কেহ যদি এ কথা মনে করেন যে, অর্থ বা ধন বৃদ্ধি পাইলেই মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলে মারাত্মক ভুল হইবে। অর্থ বা সম্পদ মানুষের কল্যাণ-সাধনে সাহায্য করে মাত্র, কিন্তু অর্থ ও কল্যাণ সমার্থক নহে। অর্থ বৃদ্ধি পাইলেই যে কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই—আবার যাহার দ্বারা কল্যাণ বৃদ্ধি পায় তাহা অর্থ দ্বারা আহরণ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। অনেকের মাদক দ্রব্যের চাহিদা আছে এবং প্রচুর অর্থের অধিকারী অর্থের বিনিময়ে মাদক দ্রব্য

ক্রয় করিয়া তাহার অভাব মোচন করিতে পারে, কিন্তু মাদক দ্রব্যের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ ঘটে। অপর পক্ষে প্রচুর মুক্ত বায়ু, জল ও সূর্যালোক প্রভৃতি প্রকৃতির দান মানব-কল্যাণের অপরিহার্য উপাদান হইলেও ইহারা অনায়াসলভ্য বলিয়া ইহাদের কোন অর্থমূল্য নাই। পূর্ণাঙ্গ জীবন-যাপনের জন্য পিতা-মাতার স্নেহ, বন্ধুর প্রীতি, উন্নততর সামাজিক পরিবেশ একান্ত অপরিহার্য, কিন্তু এইগুলিও অর্থ দ্বারা বিনিময়যোগ্য নহে। অর্থশালী হইলেই যে মানুষের মানসিক অবস্থা উন্নততর হইয়া কল্যাণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, ইহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। শান্তিময়, সরল ও উচ্চস্তরের জীবন-যাপন অর্থের উপর নির্ভরশীল নহে।

আসল কথা হইল যে, দারিদ্র্য মানবজীবনের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র্য দূর করিয়া মানুষকে উন্নত করিবার একমাত্র উপায় হইল প্রচুর অভাবমোচনের সামগ্রীর উৎপাদন। সম্পদের অপব্যবহার নানাবিধ কুফল সৃষ্টি করে—ইহা সত্য। কিন্তু উৎপাদিত সম্পদের যদি যথাযথ সদ্ব্যবহার হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়। সম্পদের অভাবে মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক্ষুধার্ত ও নিরাশ্রয় ব্যক্তির আহার, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া শুধু নীতি-বাক্য দান করিয়া তাহার কল্যাণ-সাধন করা সম্ভব নয়। সুতরাং সম্পদ ব্যতীত প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। এ সম্পর্কে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের কল্যাণ শুধু সম্পদ-উৎপাদন পরিমাণের উপর নির্ভর করে না—উৎপাদিত সম্পদ যদি অল্পসংখ্যক লোকের আয়ত্তে থাকে তাহা হইলে সমাজের অধিকাংশ লোকের অভাব মোচন হইতে পারে না। এইজন্য বর্তমানে সম্পদ-উৎপাদন অপেক্ষা সম্পদ্-বণ্টন ব্যবস্থার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলি ক্রমশঃই কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছে। জনকল্যাণ সাধন করাই হইল আধুনিক রাষ্ট্রগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান রাষ্ট্রীয় সরকারগুলি একদিকে যেরূপ নানাভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে, অপরদিকে সেইরূপ ক্রমবর্ধমানহারে কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি ধার্য করিয়া আয়ের পার্থক্য দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাধারণের হিতার্থে রাষ্ট্র রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি নির্মাণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে চিকিৎসালয়-স্থাপন এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শিক্ষাবিস্তার করিতেছে। এই সমস্ত কল্যাণের কাষ সম্পদ তথা অর্থ ব্যতীত সম্ভব নহে। সুতরাং অর্থ ও কল্যাণ একেবারে সম্পর্কহীন নহে।

ধনবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান—Is Economics a Science ?

ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে কিনা এ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই 'বিজ্ঞান' কাহাকে বলে তাহা জানা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারিলেই ধনবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান কিনা তাহা নির্ণয় করা সহজ হইবে। 'বিজ্ঞান' শব্দটির সাধারণ অর্থ হইল বিশেষরূপ বিদ্যা বা জ্ঞান। এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা বা গবেষণা দ্বারা আহরণ করা হয় এবং সেইজন্য এই শাস্ত্রকে বিশেষ বিষয়সমূহ-সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ জ্ঞান বলা হয়। এই সুসংবদ্ধ বা শৃঙ্খলিত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বা নিয়ম সংকলন করা যায় ও সেই সংকলিত সূত্র প্রয়োগ করিয়া বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতিকে বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত করা হয়, কেননা, তাহাদের বিষয়বস্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া শৃঙ্খলিত জ্ঞান আহরণ করা যায় এবং এইরূপে নির্ণীত জ্ঞান হইতে কতকগুলি কার্যোপযোগী সাধারণ সূত্রও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উপরি-উক্ত পদ্ধতি প্রযোজ্য। ধনবিজ্ঞানীও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মত তাঁহার বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ-সম্পর্কে শৃঙ্খলিত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ দেশ-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন হইলেও মানুষ বুদ্ধিজীবী বলিয়া সাধারণতঃ যুক্তি মানিয়া চলে। এইজন্য মানুষের অর্থনৈতিক আচরণে মূলতঃ কতকগুলি সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যকে ভিত্তি করিয়া ধনবিজ্ঞানী তাঁহার পরীক্ষা-কার্য করিতে পারেন। সুতরাং ধনবিজ্ঞানীর পক্ষে তাঁহার বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং এই শ্রেণী-বিভক্ত ও পরীক্ষিত জ্ঞান হইতে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিয়া বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে উহা প্রয়োগ করাও সম্ভবপর। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় ধনবিজ্ঞানেরও কতকগুলি সাধারণ সূত্র আছে। সুতরাং ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত না-করিবার কোন সংগত কারণ নাই।

এস্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পদবাচ্য হইলেও ইহা রসায়ন বা পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি প্রাকৃত বিজ্ঞানগোষ্ঠীর সমপর্যায়ভুক্ত নহে। তাহার কারণ হইল যে, ধনবিজ্ঞানে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ক্ষেত্র স্বল্প-পরিসর। যে বিষয়বস্তু লইয়া ধনবিজ্ঞানী আলোচনা করেন, তাহা বহুল পরিমাণে বাহ্যিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। আর এই বাহ্যিক পরিবেশ

এত দ্রুত পরিবর্তনশীল যে, ইহা পর্যবেক্ষণ করিয়া যে-কোন সিদ্ধান্ত করা হউক না কেন তাহা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত রাসায়নিক দ্রব্যগুলির নির্দিষ্ট অবস্থায় নির্দিষ্ট কারণে এই প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানী যদি মানুষের উপর দ্রব্যমূল্যের প্রতিক্রিয়া-সম্পর্কে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল হইতে পারে না। তাহার কারণ মানব-চরিত্র রাসায়নিক দ্রব্যের মত অপরিবর্তনীয় বা সর্বত্র সমান নহে। ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান। কোন সমাজবিজ্ঞানই প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলির মত সম্পূর্ণ নহে। এইজন্য ধনবিজ্ঞানকে আবহবিদ্যার ন্যায় অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

অর্থনৈতিক সূত্র ও ইহার প্রকৃতি—Nature of Economic Laws

সকল বিজ্ঞানেরই কতকগুলি সাধারণ সূত্র থাকে। ধনবিজ্ঞানেরও কতকগুলি সূত্র আছে। এই সূত্রগুলি ধনবিজ্ঞানী তাঁহার বিষয়বস্তুর পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষাকার্য দ্বারা আহরণ করেন। তবে অর্থনৈতিক সূত্রগুলির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই সূত্রগুলি অনুমানসিদ্ধ বা শর্তাধীন (hypothetical)। অর্থনৈতিক সূত্রগুলি কার্যকারণের ফলাফল প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণতঃ চাহিদা হ্রাস পায় ও মূল্যহ্রাসের ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ধনবিজ্ঞানী তাঁহার বিষয়বস্তুর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা মূল্যের সহিত চাহিদার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট অবস্থায় সত্য অর্থাৎ ইহা শর্তাধীন। যদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ যদি লোকের রুচি বা অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে, অথবা আয় বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাহা হইলে মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন নাও হইতে পারে। সুতরাং অর্থনৈতিক এই সূত্রটি অনুমানসিদ্ধ মাত্র—সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। অর্থনৈতিক সূত্রগুলি অনুমানসিদ্ধ বা শর্তাধীন—একথা অনস্বীকার্য। একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বুঝা যায় যে, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলির সূত্রসমূহও অর্থনৈতিক সূত্রগুলির ন্যায় অনুমানসিদ্ধ বা শর্তাধীন। রাসায়নিক দুই-অণু উদজান ও এক-অণু অম্লজানের সংমিশ্রণে জল উৎপাদন করিতে পারেন। কিন্তু এই দুইটি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণ একটি অপরিবর্তিত অবস্থায় হওয়া চাই অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপ বর্তমান থাকিলেই দুই-অণু উদজান ও এক-অণু অম্লজান জলে পরিণত হয়। তাপ ও চাপের

পরিবর্তন ঘটিলে রাসায়নিকের সিদ্ধান্তও ধনবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তের ন্যায় নির্ভুল হয় না। সুতরাং এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ধনবিজ্ঞানের সূত্র ও রসায়নের সূত্র সমপর্যায়ভুক্ত বলিতে হয় এবং ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা চলে।

ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলির সহিত প্রাকৃত বিজ্ঞানের সূত্রগুলির প্রধান পার্থক্য হইল যে, ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলি প্রাকৃত বিজ্ঞানের সূত্রগুলির ন্যায় সঠিক (exact) নহে। নির্দিষ্ট অবস্থায় দুই-অণু উদজান ও এক-অণু অম্লজান জলে পরিণত হইবেই, কিন্তু ধনবিজ্ঞানীর সব সিদ্ধান্ত এরূপ অভ্রান্ত নহে বা হইতে পারে না। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির এই অনিশ্চয়তার প্রথম কারণ হইল যে, ধনবিজ্ঞানী অর্থের দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের পরিমাপ করিয়া থাকেন। কিন্তু অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতীতও অন্য নানা উদ্দেশ্য দ্বারা মানুষ কার্যে প্রণোদিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বলা যাইতে পারে যে, মানব-চরিত্র রাসায়নিক দ্রব্যের মত অপরিবর্তনীয় বা সর্বত্র সমান নহে। অবস্থা পরিবর্তনের সহিত মানব-চরিত্রেও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি গণিতশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলির মত ধ্রুবসত্য হইতে পারে না।

ধনবিজ্ঞান ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান—Economics and Other Social Sciences

ধনবিজ্ঞানে ধন বা সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের কার্যকলাপ আলোচিত হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তাই এই সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা-গুলির আলোচনা করাই ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কিন্তু সমাজের বাহিরে নির্জন স্থানে বসবাসকারী লোকেরও অভাব মিটাইবার জন্য খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হয়। জনমানবহীন দ্বীপে নির্বাসিত রবিন্‌সন্ ক্রুসোরও খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়-স্থল সংগ্রহ করিবার জন্য পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সমাজের সহিত সম্পর্ক-রহিত কোন মানুষের কার্যকলাপই ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয় না। যে সমস্ত মানুষ শৃঙ্খলার সহিত পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইয়া সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে, ধনবিজ্ঞানে শুধু সেই সমস্ত মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার আলোচনা করা হয়। এইজন্য ধনবিজ্ঞানকে একটি সমাজবিজ্ঞান বলা হয়।

ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান হিসাবে অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়।

ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান—Economics and Sociology

ধনবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের কার্যকলাপের একটা বিশেষ দিক অর্থাৎ অর্থ-নৈতিক কার্যকলাপ লইয়া আলোচনা করে, আর সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

হইল মানুষের সমগ্র সামাজিক জীবনের আলোচনা করা। মানুষ কি করিয়া প্রকৃতিদত্ত স্বল্প উপাদানে তাহার অসংখ্য অভাব পূরণ করে, ইহাই ধনবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে মানবজীবনের সব দিকই আলোচিত হয়। পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সমাজের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ও মানবজাতির আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি জীবনযাত্রা-প্রণালী সর্ববিষয়ে আলোচনা হয় সমাজবিজ্ঞানে। এইজন্য ধনবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা বা অংশ বলা যাইতে পারে।

ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান—Economics and Politics

ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র পৃথক্ হইলেও উভয় শাস্ত্রই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এক—সমাজের হিতসাধন করা। বেকার সমস্যা দূর করা, দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করা ও কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া দেশে যথেষ্ট ধনাগমের ব্যবস্থা করা এবং ধন দ্বারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা ধনবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। ধন-বিজ্ঞানের সম্পর্ক-রহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোন সুফল দিতে পারে না। দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা, এমন কি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অনেকাংশে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আবার, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, ইহার ধনোৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন-ব্যবস্থা বর্তমান যুগে রাষ্ট্রদ্বারা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান রাষ্ট্র ব্যতীত কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠান করিতে পারে না। বর্তমান যুগে বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্র বহু জনহিতকর কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে।

ধনবিজ্ঞান ও ইতিহাস—Economics and History

ইতিহাসে মানবজীবনের সর্ববিধ কার্যের আলোচনা হয়। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের কার্যাবলীর বিবরণও ইতিহাসে পাওয়া যায়। সুতরাং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর লক্ষ্য রাখিয়া ধনবিজ্ঞানের আলোচনা না করিলে সে আলোচনা কখনও সার্থক হয় না। আবার অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বিবরণ ব্যতীত কোন দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস গঠিত হইতে পারে না। অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমান অর্থনৈতিক জীবন সময়োপযোগী করিয়া গঠন করিতে পারিলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সার্থক হয়।

ধনবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র—Economics and Ethics

সামাজিক আদর্শ অনুযায়ী কোন্ কাজ করা উচিত, আর কোন্ কাজ করা উচিত নয়, নীতিশাস্ত্রে ইহার আলোচনা হয়। নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারেই

মানুষের কাজের একটা আদর্শমান স্থির করা হয়; ধনবিজ্ঞানে মানুষের চলিত অর্থনৈতিক আচরণ আলোচিত হয় বটে, কিন্তু কিরূপে চলিত আচরণগুলিকে একটি আদর্শমানে উন্নীত করিয়া মানুষের অর্থনৈতিক জীবন তথা সমগ্র জীবনকে মঙ্গলময় করা যায়, ইহাই হইল ধনবিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। আর অর্থনৈতিক জীবনের এই আদর্শমান স্থির হয় নীতিশাস্ত্রেব নির্দেশ দ্বারা। সুতরাং ধনবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিভাগ—Divisions of Economics

বর্তমানে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এত বিস্তৃত ও জটিল হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রকে কতিপয় সুসংবদ্ধ বিভাগে ভাগ না করিয়া ইহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নহে। এইজন্য ধনবিজ্ঞানিগণ এই শাস্ত্রকে পাঁচটি অংশে ভাগ করিয়াছেন, যথা,

১। ভোগব্যবহার—Consumption

অভাব মোচন কবাই হইল মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং ভোগব্যবহার দ্বারা মানুষ স্বল্প উপাদান সাহায্যে কিভাবে তাহাব অসংখ্য অভাব পরিতৃপ্ত করে, এই অংশে তাহাই আলোচিত হয়। অভাবের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশেষ কবিযা এই অংশে আলোচিত হয়।

২। উৎপাদন—Production

মানুষেব অভাব অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময় হইলেও অভাব মিটাইবার উপাদান স্বল্প, এই কারণে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের উপব নানা যন্ত্রপাতিব সাহায্যে তাহাব বুদ্ধি ও কায়িক শ্রম প্রয়োগ করিয়া অভাবপূরণের জন্য নানাবিধ সামগ্রী উৎপাদন করে। সুতবাং উৎপাদন ব্যতীত ভোগব্যবহার সম্ভব নহে। মানুষ যত বেশী পরিমাণ ও উৎকৃষ্ট ধবণের দ্রব্য উৎপাদন কবিতে সক্ষম হইবে ততই তাহাব অভাবেব তৃপ্তি হইবে। সুতরাং একটা দেশেব লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বা দাবিদ্র্য বহুপবিমাণে সেই দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

৩। বিনিময়—Exchange

কোন মানুষই তাহাব অসংখ্য অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী নিজে উৎপাদন কবিতে পারে না। চাষী ধান বা পাট উৎপাদন করে, কিন্তু লবণ, তৈল, বস্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যের জন্য তাহাকে অন্যের উপর নির্ভর কবিতে হয়। সুতরাং একজনের উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত অপরের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় না হইলে কাহারও সব অভাব মিটিতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে দ্রব্য-বিনিময় তাহার অভাব পূরণের জন্য যেরূপ অপরিহার্য, বিভিন্ন দেশের মধ্যেও

সেইরূপ আন্তর্জাতিক বিনিময় (বাণিজ্য) অপরিহার্য। পাটের বিনিময়ে ভারতকে অনেক সময় বিদেশ হইতে গম বা ঔষধপত্র সংগ্রহ করিতে হয়। এই অংশের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার-ব্যবস্থা, বিনিময়ের মাধ্যম অর্থাৎ অর্থ ও অর্থের সাহায্যে দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণ ও পরিশেষে ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যে সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে ও বিদেশে বিনিময়-কার্যে সাহায্য করে।

৪। বণ্টন—Distribution

আধুনিককালে অভাবমোচনের সকল প্রকার সামগ্রীই বহু লোকের যুক্ত-প্রচেষ্টায় উৎপাদিত হয়। কেহই একাকী সম্পূর্ণ একটি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে না। এইজন্য ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা এই চারিটি উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান একত্রে কাজ করে। ব্যবস্থাপক নিজে তাঁহার সংগঠন-শক্তি প্রয়োগ করিয়া অপর তিনটি উপাদানের সাহায্যে ধন উৎপাদন করেন। সুতরাং উৎপাদিত ধন হইল জমি, মূলধন, শ্রম ও ব্যবস্থাপনার সমবেত প্রচেষ্টার ফল। সমবেত প্রচেষ্টার ফলে যে ধন উৎপাদিত হয়, তাহা এই চারিটি উপাদানের প্রাপ্য এবং চারিটি উপাদানের মধ্যেই ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাই হইল ধনবিজ্ঞানের একটি প্রধান বিভাগ। যে নীতি অনুসারে উৎপাদিত ধন বা ইহার অর্থমূল্য এই চারিটি উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হয়, তাহার উপর দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

৫। সরকারী আয়-ব্যয়—Public Finance

এই বিভাগে রাষ্ট্র কিভাবে অর্থ আহরণ করিয়া বিভিন্ন কার্যের জন্য ব্যয় সঙ্কুলান করে, তাহাই আলোচিত হয়। সরকারী আয়ের বিভিন্ন উৎস, বিশেষ করিয়া কর-ব্যবস্থা, সরকারী ঋণ ও সরকারী ব্যয়-সম্পর্কে এই বিভাগে আলোচনা করা হয়।

ধনবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা—Utility of the Study of Economics

ধনবিজ্ঞানে মানুষের অর্থ উপার্জন ও অর্থব্যয়-সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা হয় বলিয়া অনেকে এই শাস্ত্রকে অসার ও অকেজো শাস্ত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে—ধনবিজ্ঞান আলোচনা করিবার সার্থকতা আছে। মানুষ শুধু তাহার ক্ষুধা মিটাইবার জন্য বাঁচিয়া থাকে না। ক্ষুধা নিবৃত্তি করা ব্যতীতও তাহার আরও মহত্তর উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। কিন্তু আসল কথা হইল যে, ক্ষুধা নিবৃত্তি না হইলে মানুষের উন্নততর জীবন-যাপন আদৌ সম্ভব হয় না। সুতরাং যে শাস্ত্রে ক্ষুধা মিটাইবার যথাযথ উপায়গুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়, সে শাস্ত্রকে অসার বা অকেজো বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল ধন বা সম্পদ। এই ধনই হইল মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির প্রধান উপকরণ। ধনের যথাযথ উৎপাদন ও সদ্ব্যবহার দ্বারা কি প্রকারে সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা যায়, ধনবিজ্ঞানে তাহারই আলোচনা করা হয়। সুতরাং এই শাস্ত্রকে মানব-কল্যাণের প্রধান সহায়ক শাস্ত্র বলিলেও দোষ হয় না।

এতদ্ব্যতীত ধনবিজ্ঞানের বিবিধ তথ্য ও জটিল সমস্যাগুলির আলোচনা করিলে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। শাসনকর্তৃপক্ষ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রভৃতির পক্ষে ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা একান্ত আবশ্যক। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির উত্তমরূপে সমাধান করিতে পারিলে শাসনকর্তৃপক্ষ জনপ্রিয় হইতে পারেন। ব্যবসায়ীর পক্ষেও শিল্প-সংগঠন এবং উৎপাদন ও বিক্রয়-ব্যবস্থার মূল নীতিগুলির সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি ফলপ্রসূ বিজ্ঞান হইলেও এই বিজ্ঞানগুলি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান যখন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে প্রয়োগ করা হয়, একমাত্র তখনই এই বিজ্ঞানগুলির আলোচনা সার্থক হয়। সুতরাং উন্নততর জীবন-যাপনের পক্ষে ধনবিজ্ঞানের আলোচনা একান্ত অপরিহার্য।

ধনবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণা —Some Fundamental Concepts

ধনবিজ্ঞানে ধনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের কার্যাবলীর আলোচনা করা হয়। কিন্তু 'ধন' কাহাকে বলে তাহা জানিতে হইলে তৎপূর্বে 'দ্রব্য' কাহাকে বলে তাহা জানা প্রয়োজন।

দ্রব্য—Goods

যে সমস্ত সামগ্রী মানুষের অভাব দূর করিতে পারে সাধারণতঃ সেই সমস্ত সামগ্রীকে ধনবিজ্ঞানে 'দ্রব্য' বলা হয়, যেমন—বাড়ী, গাড়ী, জল, আলো, বাতাস ইত্যাদি। এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, দ্রব্য বলিতে শুধু বাড়ী, গাড়ী প্রভৃতি বাস্তব সামগ্রী বুঝায় না, চিকিৎসকের চিকিৎসা-নৈপুণ্য, গায়কের কণ্ঠমাধুর্য প্রভৃতি অবাস্তব সামগ্রীগুলিকেও বুঝায়। এক কথায় বলিতে গেলে যে সমস্ত জিনিসের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে—তাহা বাস্তবই হউক বা অবাস্তবই হউক তাহাদিগকে দ্রব্য বলা হয়।

দ্রব্যগুলিকে আবার অনায়াসলভ্য দ্রব্য (Free goods) ও অর্থনৈতিক দ্রব্য (Economic goods) বলা হয়। চাহিদার তুলনায় যে সমস্ত দ্রব্যের সরবরাহ অধিক যেমন, আলো, বাতাস প্রভৃতি তাহাদিগকে অনায়াসলভ্য দ্রব্য

বা মূল্যহীন দ্রব্য বলা হয়। যে সমস্ত দ্রব্য চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাড়ী, গাড়ী সেই সমস্ত দ্রব্যকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বা মূল্যবান দ্রব্য বলা হয়; কারণ এই সমস্ত দ্রব্য পাইতে হইলে মানুষের একটি মূল্য দিতে হয়।

ধন বা সম্পদ—Wealth

ধনবিজ্ঞানে ধন বা সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে ধন কাহাকে বলে তাহার আলোচনা হওয়া উচিত।

সাধারণভাবে 'ধন' বলিতে আমরা টাকা-পয়সা বুঝি এবং এই অর্থে যাহার প্রচুর টাকা-পয়সা আছে তাহাকে ধনী বলে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে 'ধন' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না—ইহা একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধন-বিজ্ঞানে 'ধন' বলিতে সেই সমস্ত দ্রব্যকে বুঝায়, যাহা মানুষের অভাব মিটাইতে পারে এবং যে সমস্ত দ্রব্যের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় এত কম যে, ইহার দ্বারা সকলের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং সাধারণ অর্থে ধন বলিতে প্রাচুর্য বুঝায়, আর ধনবিজ্ঞানের অর্থে প্রাচুর্যের অভাব হইলে অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর সামগ্রীগুলিকে ধন বলা হয়।

ধনবিজ্ঞানের অর্থে 'ধনের' নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা চাই।

১। উপযোগ বা অভাব মিটাইবার ক্ষমতা—Utility

ধনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার উপযোগ অর্থাৎ অভাব মিটাইবার ক্ষমতা থাকা চাই। যে দ্রব্য অভাব মিটাইতে পারে না, তাহার কোন চাহিদাও হইতে পারে না। আর যাহার চাহিদা নাই তাহাকে ধন বলা হয় না। নিরক্ষর ব্যক্তির নিকট কোন পুস্তক ধন নহে, কারণ সে উহা পড়িতে পারে না, সুতরাং উহা তাহার অভাব মিটাইতে পারে না।

২। সরবরাহের স্বল্পতা—Scarcity

কিন্তু শুধুমাত্র উপযোগ-সম্পন্ন সামগ্রীগুলিকে ধন বলা যায় না। বাতাস, জল, সূর্যের আলোক প্রভৃতি জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় হইলেও ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন নহে, কারণ ইহারা অনায়াসলভ্য—চাহিদার তুলনায় এগুলির সরবরাহ প্রচুর। সুতরাং ধনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল দুষ্প্রাপ্যতা। যে সমস্ত দ্রব্য পাইতে হইলে পরিশ্রম-প্রয়োগের প্রয়োজন হয় এবং বিনিময়ের মাধ্যমে একটা মূল্য প্রদান করিতে হয়, সেই সমস্ত দ্রব্যকে ধনবিজ্ঞানে ধন বলা হয়। এইজন্য বৃষ্টির জল বা নদীর জল ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন নহে, কিন্তু শহরাঞ্চলে মিউনিসিপালিটি যে জল সরবরাহ করে তাহাকে ধন বলা হয়—কারণ এই জল অপ্রচুর ও অনায়াসলভ্য নহে।

৩। হস্তান্তর যোগ্যতা—Transferability

যে সমস্ত দ্রব্যের মালিকানা-স্বত্ব এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা সম্ভব, শুধুমাত্র সেই সমস্ত দ্রব্যকেই ধন বলা হয়। যে দ্রব্য হস্তান্তরযোগ্য নহে, তাহা ধন নহে। বাড়ী প্রভৃতির মালিকানা-স্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য, সুতরাং এগুলিকে ধন বলা যায়। কিন্তু শাসকের শাসনক্ষমতা, কারিগরের দক্ষতা, গায়কের গুণ এগুলির মালিকানা-স্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য নয় বলিয়া ধন হইতে পারে না।

৪। বাহ্যবস্তু—External goods

ধনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল যে, ধন বলিতে শুধু বাহ্যবস্তুগুলিকে বুঝায়—কারণ একমাত্র বাহ্যবস্তুগুলিই হস্তান্তরযোগ্য। শিক্ষকের অধ্যাপনা-নৈপুণ্য ও সুগায়কের কণ্ঠমাধুর্য তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি। ইহা দান বা বিক্রয় করা যায় না। সূত্রধরের কর্মদক্ষতা তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি, সুতরাং ইহা হস্তান্তরের অযোগ্য এবং সেইজন্য ধন নহে। কিন্তু সূত্রধর-নির্মিত চেয়ার বা টেবিল বাহ্যবস্তু—ইহা তাহার কর্মদক্ষতার সাহায্যে নির্মিত হইলেও বাহ্যবস্তু বলিয়া হস্তান্তরযোগ্য—সুতরাং ইহা ধন বলিয়া গণ্য হয়।

ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন বলিতে বাস্তব এবং অবাস্তব উভয়বিধ দ্রব্য বুঝায়। খাদ্য, পানীয়, পরিধেয় প্রভৃতি বাস্তব দ্রব্যগুলি যেরূপ মানুষের অভাব মোচন করে, শিক্ষকের বক্তৃতা, গায়কের গান, চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রভৃতি কার্যগুলির খাদ্য, পরিধেয় বা আসবাবপত্রের মত কোন বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহারা মানুষের অভাব মোচন করে এবং সেইজন্য বাস্তব বাহ্যবস্তুগুলির ন্যায় বিনিময়যোগ্য। সুতরাং অবাস্তব অথচ উপযোগসম্পন্ন কাজগুলিকেও ধনবিজ্ঞানে ধন বলা হয়।

ব্যক্তিগত ধন, সমষ্টিগত ধন ও জাতীয় ধন—Personal, Collective and National Wealth

ব্যক্তিগত ধন বলিতে ব্যক্তিবিশেষের ভোগাধিকারে যে সমুদয় দ্রব্য থাকে তাহা বুঝায়। নগদ অর্থ, জমি, গৃহ, আসবাবপত্র, পুস্তক বা অন্য দ্রব্যের উপর রক্ষিত স্বত্ব ব্যক্তিগত ধন বলিয়া ধরা হয়। ব্যবসায়ের সুনাম (Good will of a bussiness) প্রভৃতি অবাস্তব দ্রব্যও ব্যক্তিগত ধনের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত ধন গণনাকালে অবশ্য ব্যক্তিগত ঋণ বাদ দিতে হইবে।

সমষ্টিগত ধন বলিতে সেই সমস্ত দ্রব্যকে বুঝায়, যাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিই এই ধন ভোগব্যবহার করিতে পারে।

রাস্তাঘাট, পার্ক, যাদুঘর প্রভৃতি হইল সমষ্টিগত ধনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইগুলির মালিক হইল সমাজ, কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে। ব্যক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে এইগুলি অনেকটা প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যের মত, কারণ ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাইতে এইগুলির ভোগব্যবহারের জন্য ব্যক্তির কোন মূল্য দিতে হয় না। কিন্তু এই দ্রব্যগুলি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমাজের একটা খরচ আছে এবং সেইজন্য প্রয়োজনের তুলনায় এইগুলি স্বল্প। সুতরাং সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই দ্রব্যগুলি ধনপর্যায়ভুক্ত।

সমস্ত ব্যক্তির ধনসমষ্টি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ধন লইয়া জাতীয় ধন গঠিত হয়। এই ধনসমষ্টি হইতে বিদেশী ঋণ বাদ দিতে হইবে এবং একই ধন যাহাতে একবারের বেশী গণনা না-করা হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। ব্যক্তিগত ধন জাতীয় ধনের অংশ হইলেও জাতীয় ধন ব্যক্তিগত ধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। নদী, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতি কোনমতেই ব্যক্তিগত ধন নহে অথচ গঙ্গা নদীকে ভারতের একটি প্রধান জাতীয় ধন বলা হয়।

উপযোগ—Utility

ধনবিজ্ঞানে 'উপযোগ' শব্দটির অর্থ হইল অভাব মিটাইবার ক্ষমতা। যে দ্রব্যের দ্বারা আমাদের অভাব পরিতৃপ্ত হয় তাহারই উপযোগ আছে। সুতরাং উপযোগ বলিতে কোন দ্রব্য বুঝায় না—দ্রব্যের গুণ বা ক্ষমতা বুঝায়। পানীয় জল আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে অর্থাৎ জলের গুণ বা ক্ষমতা হইল তৃষ্ণা নিবারণ করা। সুতরাং জলের এই তৃষ্ণা নিবারণের গুণ বা ক্ষমতাকে উপযোগ বলা হয় এবং এই উপযোগের জন্যই জল আমাদের জীবনে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয়। এস্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ধনবিজ্ঞানে উপযোগ শব্দটির সহিত কোন ভাল-মন্দের প্রশ্ন জড়িত নাই। যে দ্রব্য অভাব পূরণ করিতে পারে, তাহার উপযোগ আছে—তা সে দ্রব্যটি প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় হউক, আর উপকারী বা ক্ষতিকর হউক না কেন। এই অর্থে দুগ্ধ ও মদ্য উভয়েরই উপযোগ আছে। তবে সকল দ্রব্যই সব সময়ে সকলের নিকট সমান উপযোগ-সম্পন্ন নাও হইতে পারে।

বিভিন্ন প্রকারের উপযোগ—Different Kinds of Utility

উপযোগ নানাপ্রকারের হইতে পারে, যথা,

১। স্বাভাবিক উপযোগ—Natural Utility

প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। অরণ্যজাত বৃক্ষ, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যগুলিকে রূপান্তরিত বা স্থানচ্যুত না

করিয়া উপযোগ পাওয়া যায় না, কিন্তু আলো, জল, বাতাস প্রভৃতি দ্রব্যগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের উপযোগ দেয়। সুতরাং এই দ্রব্যগুলির উপযোগকে স্বাভাবিক উপযোগ বলা হয়।

২। **আকারগত উপযোগ—Form or Shape Utility**

প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যের আকার পরিবর্তন করিয়া দ্রব্যটির নূতন উপযোগ সৃষ্টি বা উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। ছুতার মিস্ত্রী অরণ্যজাত বৃক্ষকে নানা-আসবাবপত্রে রূপান্তরিত করিয়া কাঠের উপযোগ বৃদ্ধি করে। এইরূপে আকার পরিবর্তন করিয়া যে নূতন উপযোগ সৃষ্টি হয়, তাহাকে আকারগত উপযোগ বলা হয়।

৩। **স্থানগত উপযোগ—Place Utility**

অনেক সময় প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যকে স্থানান্তরিত করিয়া অর্থাৎ সহজপ্রাপ্য স্থান হইতে দুষ্প্রাপ্য স্থানে লইয়া উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিয়া শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রেরণ দ্বারা কয়লার উপযোগ বৃদ্ধি করা হয়। ভারত ও পাকিস্তান হইতে বিদেশে পাট রপ্তানীর দ্বারা পাটের উপযোগ বৃদ্ধি পায়।

৪। **কালগত উপযোগ—Time Utility**

বিভিন্ন সময়ে দ্রব্যের উপযোগ হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। আমের সময়ে আম সহজপ্রাপ্য বলিয়া আমের উপযোগ কম, কিন্তু অকালে আমের উপযোগ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অকালে আমের যোগান দিয়া ইহার উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। নানাবিধ ফল, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি সংরক্ষণ করিয়া অনেক ব্যবসায়ী অসময়ে এই দ্রব্যগুলির যোগান দ্বারা ইহাদের উপযোগ বৃদ্ধি করে। এইরূপ উপযোগ-বৃদ্ধিকে কালগত উপযোগ বলা হয়।

৫। **সেবাগত উপযোগ—Service Utility**

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ কাজের দ্বারা অভাব পরিতৃপ্ত হয়। এই কাজগুলি কোনপ্রকার নূতন রূপ ধারণ না করিয়াও প্রত্যক্ষভাবে লোকের অভাব মিটায়। গৃহভৃত্যের কাজ, আইনজীবীর কাজ প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত এবং প্রত্যক্ষ কাজের দ্বারা পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় বলিয়া এইগুলিকে সেবাগত উপযোগ বলা হয়।

উৎপাদন—Production

ধনবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষ কিভাবে ধন-উৎপাদন দ্বারা তাহার অসংখ্য অভাব মোচন করিয়া উন্নততর জীবন যাপন করিতে পারে। সুতরাং 'উৎপাদন' শব্দটির অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে প্রথমেই আলোচনা হওয়া উচিত। সাধারণ অর্থে উৎপাদন শব্দটি নূতন কোন দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত করা বুঝায়। সাধারণতঃ বলা হয় যে, তাঁতি কাপড় প্রস্তুত করিতেছে, স্বর্ণকার অলংকার প্রস্তুত করিতেছে, চর্মকার জুতা প্রস্তুত করিতেছে। সাধারণ অর্থে ইহারা সকলেই নূতন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যাপৃত রহিয়াছে বুঝায়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে উৎপাদন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন শব্দটিব অর্থনৈতিক তাৎপর্য হইল, যে, এই শব্দটির দ্বারা কোন দ্রব্য-উৎপাদন বুঝায় না—ইহাব দ্বাবা বুঝায় দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি করা। মানুষ কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে পাবে না—কারণ দ্রব্যগুলি প্রকৃতি-দত্ত। মানুষ প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যের উপর তাহাব পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যগুলির উপযোগ (Utility) বৃদ্ধি করে মাত্র—নূতন কোন দ্রব্য প্রস্তুত করে না। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে উৎপাদনের অর্থ হইল নূতন উপযোগ বা অধিকতব উপযোগ (creation of new or additional utility) সৃষ্টি করা।

এই নূতন বা অধিকতর উপযোগ প্রধানতঃ তিন প্রকারে সৃষ্টি করা যায়। প্রথমতঃ, প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যের আকার পরিবর্তন করিয়া উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। ছুতার মিস্ত্রী একটি গাছকে চেয়ার-টেবিলে রূপান্তরিত করিয়া উপযোগ বৃদ্ধি করে—এই জাতীয় উৎপাদনকে **আকারগত উপযোগ** (Form utility) বৃদ্ধি বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্থানপরিবর্তন করিয়াও দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। যেমন,, খনিজীবী (Miner) খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিয়া মানুষের ব্যবহারযোগ্য করিতেছে—বণিক সহজপ্রাপ্য স্থান হইতে কোন দ্রব্যকে দুষ্প্রাপ্য স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি করিতেছে। ইহাকে **স্থানগত উপযোগ** (Place utility) বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন করা বলা হয়। তৃতীয়তঃ, **কালগত উপযোগ** (Time utility) বৃদ্ধি করিয়াও উৎপাদন করা হয়। যাহারা কোন দ্রব্যের প্রাচুর্যের সময় সেই দ্রব্য আহরণ করিয়া ভবিষ্যতে দুষ্প্রাপ্যতার সময় যোগান দেয়, তাহারাও উৎপাদক বলিয়া পরিগণিত হয়। এই অর্থে যাহারা মৎস্য, মাংস

ফল ইত্যাদি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে, তাহারাও অর্থনৈতিক অর্থে উৎপাদক বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই অর্থে জীবনবীমা কোম্পানীগুলিও উৎপাদন-কার্যে ব্যাপৃত বলা চলে। দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে কার্য করিয়াও উপযোগ বৃদ্ধি করা যায় —যেমন গৃহভৃত্য প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিয়া তাহার প্রভুর সাহায্য করে। ইহাকে **সেবাগত উপযোগ** (service utility) বলা হয়।

ভোগ—Consumption

ধনবিজ্ঞানে ভোগ বা সন্তুষ্টি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন বলিতে যেরূপ নূতন উপযোগ সৃষ্টি বুঝায়, নূতন দ্রব্যের উৎপাদন বুঝায় না, ভোগ বলিতেও তদ্রূপ উৎপাদন দ্বারা সৃষ্ট নূতন উপযোগের বিনাশ (destruction of utility) বুঝায়। মানুষ অভাব মোচনের জন্য দ্রব্য ব্যবহার করিয়া তাহার উপযোগ দ্বারা নিজের সন্তুষ্টি বিধান করে। সুতরাং ভোগ শব্দটি ধনবিজ্ঞানে উপযোগের বিনাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয় ধনবিজ্ঞান—Indian Economics

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের কার্যকলাপগুলি সম্পূর্ণ সার্থক হয় তখন, যখন এই আলোচনাগুলি জাতীয় জীবনের মান উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। আমরা ভারতবাসী। আমাদের দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়া একটি অনুন্নত দেশ বলিয়া পরিচিত। আমাদের দেশ অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হইলেও বিদেশী শাসনেব নিষ্পেষণে এতদিন পর্যন্ত ইহার অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিব কোন সন্তোষজনক সমাধানেব চেষ্টা হয় নাই। দেশ স্বাধীন হইবার পর ভারতীয় ধনবিজ্ঞান বলিতে আমরা বুঝি ধনবিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যেখানে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি এবং সেগুলির সমাধানেব উপায সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। সুতরাং ভারতীয় ধনবিজ্ঞান একটি ফলিত ধনবিজ্ঞান। এই শাস্ত্রে ভারতের জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করা হয়। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হইল ভারতের দুর্গত অর্থনৈতিক অবস্থার অবসান ঘটাইয়া কিভাবে জনসাধারণের জীবনধারণের মানের উন্নতি করা যায়। এই আলোচনা কালে মনে রাখিতে হইবে যে, ধনবিজ্ঞানের সাধারণ সূত্র ও তত্ত্বগুলি ভারতেব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেই চলিবে না। ভারতের নিজস্ব সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি ও জাতীয়

জীবনের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারতীয় ধনবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইবে।

ভারত অনুন্নত দেশ হইলেও, বর্তমানে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন নানা কারণে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির অনুরূপ হইয়া উঠিতেছে। ছোট ছোট শিল্প ও কুটিরশিল্পের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া বৃহদায়তন শিল্প গঠিত হইতেছে। ব্যক্তিগত মালিকানা-পরিচালনাধীন শিল্পের পাশে রাষ্ট্র-পরিচালিত শিল্প গঠিত হইতেছে। ভূমিব্যবস্থার ও কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। সুতরাং অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায়গুলির সহিত উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করিয়া ভারতীয় ধনবিজ্ঞানে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের আলোচনা করিতে হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

মানুষ কিভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবনে অর্থোপার্জন দ্বারা তাহার অসংখ্য অভাব মোচন করে, ধনবিজ্ঞানে সেই বিষয়ই আলোচিত হয়। মানুষের অভাব অসংখ্য ও নানাবিধ, কিন্তু অভাব পূরণের সামগ্রীর স্বল্পতার জন্য তাহাকে পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণ করিয়া অভাব পূরণ করিতে হয়। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে মানুষের সেই প্রচেষ্টাগুলি আলোচিত হয়, যাহার একটা আর্থিক মূল্য আছে। সমাজের অঙ্গীভূত মানুষ হিসাবেই মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার আলোচনা করা হয়। অর্থ-উপার্জন ও অর্থের ব্যয় ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইলেও ইহা আলোচনা করিবার প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন দ্বারা তাহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা।

ধনবিজ্ঞান কি ধনেরই বিজ্ঞান

ধনবিজ্ঞানে মানুষের অর্থ উপার্জন সম্পর্কিত কাজের আলোচনা হইলেও অর্থ বা ধন আহরণ করা এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অর্থ ব্যতীত মানুষের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় না ইহা সত্য। প্রচুর পরিমাণে যদি ধনোৎপাদন হয় এবং উৎপাদিত ধন যদি ন্যায্যভাবে বণ্টিত হয়, তাহা হইলে লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ধন হইতে স্থায়ী সুখলাভ হয়। এই জন্য বলা হয় যে, ধনবিজ্ঞানে ধন অপেক্ষা মানব-কল্যাণের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অর্থ বা ধন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই সব সময়ে

মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় না। আবার, এমন অনেক বিষয় আছে যাহা মানব-কল্যাণের সহায়ক হইলেও ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন বলিয়া ধরা হয় না।

ধনবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান

অধুনা ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা হয়, তাহার কারণ হইল ধনবিজ্ঞানে বিজ্ঞান-বিষয়ক বৈশিষ্ট্যগুলি অল্পবিস্তর পরিমাণে দেখা যায়। ধনবিজ্ঞানীও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের ন্যায় তাঁহার বিষয়বস্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে শৃঙ্খলিত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের মত সম্পূর্ণ বিজ্ঞান না হইলেও ধনবিজ্ঞান আবহ-বিদ্যার ন্যায় একটি অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান।

অর্থনৈতিক সূত্র

অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় ধনবিজ্ঞানেরও কতকগুলি সূত্র আছে। এই সূত্রগুলি অন্যান্য বিজ্ঞানেব সূত্রের ন্যায় অনুমানসিদ্ধ, তবে ইহারা অন্যান্য বিজ্ঞানের সূত্রের ন্যায় সঠিক নহে। ধনবিজ্ঞান অর্থের দ্বারা মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার পরিমাপ করিবার চেষ্টা করে, সুতরাং এই সিদ্ধান্তগুলি নির্ভুল হইতে পারে না।

ধনবিজ্ঞান ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান

ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানে ধনকে কেন্দ্র করিয়া সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাগুলির আলোচনা করা হয়। সমাজবিজ্ঞান হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির সহিত ধনবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। ইতিহাস হইতেই মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের মান রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়। নীতিশাস্ত্র বর্তমান অর্থনৈতিক কার্যকলাপগুলিকে এক আদর্শ-মানের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে।

ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিভাগ

১। ভোগ-ব্যবহার, ২। উৎপাদন, ৩। বিনিময়, ৪। বণ্টন ও ৫। সরকারী আয়-ব্যয়।

ধনবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা

ধনবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু হইল ধনসম্পর্কে আলোচনা করা। এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল যে, কি প্রকারে মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করিয়া ন্যায়সঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থা দ্বারা ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ-সাধন করা সম্ভব হয়। সুতরাং এই শাস্ত্রকে মানব কল্যাণের সহায়ক শাস্ত্র বলা

যাইতে পারে। রাষ্ট্রনায়ক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক-নেতা প্রভৃতির পক্ষে তাঁহাদের নিয়মিত কার্যপরিচালনার জন্য ধনবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সহিত পরিচয় একান্ত আবশ্যক।

ধন বা সম্পদ

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসাবে ধনের চারিটি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই, যথা,—১। উপযোগ, ২। চাহিদার তুলনায় সরবরাহের স্বল্পতা, ৩। মালিকানাস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা ও ৪। বাহ্যবস্তু হওয়া চাই। ধন বলিতে বাস্তব দ্রব্য ও অবাস্তব দ্রব্য (কাজ) বুঝায়। ধন আবার ব্যক্তিগত ও জাতীয় ধন হইতে পারে।

উপযোগ

উপযোগের অর্থনৈতিক অর্থ হইল অভাব মিটাইবার ক্ষমতা বা গুণ। দ্রব্যটি উপকারী বা ক্ষতিকর হইতে পারে, কিন্তু দ্রব্যটি যদি অভাব পূরণ করিতে পারে তাহা হইলে তাহার উপযোগ আছে বলিতে হইবে। এই অর্থে ধনবিজ্ঞানে দুগ্ধ ও মদ্য উভয়েরই উপযোগ আছে।

উৎপাদন

ধনবিজ্ঞানে উৎপাদনের অর্থ হইল নূতন উপযোগ সৃষ্টি করা বা উপযোগ বৃদ্ধি করা। চার প্রকারে এই উপযোগ বৃদ্ধি দ্বারা উৎপাদন সম্ভব, যথা—১। আকার পরিবর্তন করিয়া, ২। স্থান পরিবর্তন করিয়া, ৩। ব্যবহারের সময় পরিবর্তন করিয়া, বা ৩। প্রত্যক্ষ সেবামূলক কার্যের দ্বারা।

ভোগ

উৎপাদনের দ্বারা যে নূতন উপযোগ সৃষ্টি হয়, ভোগের দ্বারা সেই উপযোগ ধ্বংস পায়। দ্রব্যের উপযোগের সাহায্যে অভাব পরিতৃপ্ত হইলে তাহাকে ভোগ বলা হয়।

ভারতীয় ধনবিজ্ঞান

ভারতীয় ধনবিজ্ঞান একটি ফলিত ধনবিজ্ঞান। এই ধনবিজ্ঞানে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি এবং এই সমস্যাগুলির সমাধানের উপায় সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হইল যে, কি উপায়ে ভারতের অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Define Economics and discuss its scope.

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক ইহার বিষয়বস্তুর আলোচনা কর।

উঃ। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূল উৎস হইল মানুষের অভাববোধ। টাকা-পয়সা প্রচলিত হইবার পূর্বে মানুষ পরিশ্রম করিয়া তাহার অভাব মোচনের সামগ্রীগুলি সংগ্রহ করিত। বর্তমানে মানুষ পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করে ও উপার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার অভাব মিটায়। এই অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সম্পর্কিত কাজকর্মগুলি হইল ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, ধনবিজ্ঞান হইল সেই শাস্ত্র যে শাস্ত্রে মানুষ তাহার অসীম অভাব সীমাবিত উপকরণ দ্বারা কিভাবে মিটায় তাহাব আলোচনা করে।

ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধি সীমাবদ্ধ। এই শাস্ত্র শুধু সামাজিক মানুষের কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে। দ্বিতীয়তঃ, এই শাস্ত্রে শুধু অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সম্পর্কিত কাজগুলিরই আলোচনা হয়। ধনবিজ্ঞান একটি সমাজহিতকারী বিজ্ঞান—অর্থোপার্জন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনই হইল এই শাস্ত্র আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

2 What do you mean by production of wealth in Economics? How far it would be correct to define Economics as "The Science of Wealth?"

ধনবিজ্ঞানে ধনোৎপাদন বলিতে কি বুঝ? ধনবিজ্ঞানকে ধনের বিজ্ঞান বলা কতদূর সমীচীন?

উঃ। ধনবিজ্ঞানে সম্পদ সৃষ্টি বলিলে কোন নূতন দ্রব্য বা সামগ্রীর উৎপাদন বুঝায় না। সম্পদ সৃষ্টির প্রকৃত অর্থ হইল নূতন উপযোগ সৃষ্টি বা দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি করা। ছুতার মিস্ত্রী চেয়ার তৈয়ারী করে—ইহার অর্থ হইল ছুতার মিস্ত্রী প্রকৃতিদত্ত কাঠ চেয়ারে পরিবর্তিত করিয়া কাঠের উপযোগ বৃদ্ধি করে। সম্পদ উৎপাদন বা নূতন উপযোগ সৃষ্টি তিন প্রকারে করা যায়, যথা, (১) আকারগত উপযোগ সৃষ্টি, যেমন কাঠ হইতে চেয়ার, (২) স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি, যেমন খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিয়া খনিজীবী কয়লার উপযোগ বৃদ্ধি করে, (৩) কালগত উপযোগ সৃষ্টি, যেমন যাহারা ফল, মাছ, মাংস প্রভৃতি সংরক্ষণ করিয়া ভবিষ্যতে সেগুলিকে যোগান দিয়া দ্রব্যগুলির উপযোগ বৃদ্ধি করে। আবার গৃহভৃত্য প্রভৃতি শ্রেণীর লোক তাহাদের সেবামূলক কাযের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপযোগ সৃষ্টি করে। এই অর্থে ধনবিজ্ঞানে ছুতার মিস্ত্রী, খনিজীবী, ব্যবসায়ী, গৃহভৃত্য প্রভৃতি সকলকেই সম্পদের উৎপাদক বলা হয়।

সত্য বটে ধনবিজ্ঞানে ধন বা সম্পদের আলোচনা করা হয়। কিন্তু সম্পদ আহরণই ধনবিজ্ঞান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। দেশে যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদ উৎপাদিত না হইলে অভাব দূর হয় না ও অভাব দূর না হইলে মানুষের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। ধন হইল কল্যাণ সাধনের একটি উপায় মাত্র। ধনবিজ্ঞান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা। সম্পদ ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া যায় না, তাই ধনবিজ্ঞানে সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের আলোচনা করা হয়, কারণ যথেষ্ট সম্পদ উৎপাদন ও উৎপাদিত সম্পদের ন্যায্য বণ্টন-ব্যবস্থা দ্বারা মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ধনবিজ্ঞান একটি সমাজ হিতকারী বিজ্ঞান—ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ধন নহে, মানুষের কল্যাণ।

3. Define wealth and discuss its characteristics.

ধনের সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক ইহার বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা কর।

উঃ। ধনবিজ্ঞানে সম্পদ শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত বাহ্যবস্তু মানুষের অভাব মিটাইতে পারে, যেগুলি চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর ও যেগুলি বিক্রয়যোগ্য অর্থাৎ হস্তান্তর-যোগ্য, সেই দ্রব্যগুলিকে ধনবিজ্ঞানে ধন বা সম্পদ বলা হয়। সুতরাং সম্পদের বৈশিষ্ট্য হইল (১) উপযোগ, (২) অপ্রাচুর্য বা দুষ্প্রাপ্যতা, (৩) বাহ্যবস্তু ও (৪) বিনিময় যোগ্যতা। ধনবিজ্ঞানে সম্পদ বলিতে বাস্তব, যেমন, চাউল, কাপড় ও অবাস্তব দ্রব্য, যেমন গায়কের গান, শিক্ষকের বক্তৃতা উভয়কে বুঝায়। সম্পদের উপরি-উক্ত চারিটি বৈশিষ্ট্যের একটি না থাকিলে কোন দ্রব্যকে অর্থনৈতিক অর্থে সম্পদ বলা যায় না। সাধারণ অর্থে স্বাস্থ্যকে সম্পদ বলা হয়, কিন্তু অর্থনৈতিক অর্থে স্বাস্থ্য সম্পদ নহে। কারণ, কোন ব্যক্তি তাহার স্বাস্থ্য অপরকে বিক্রয় (হস্তান্তরিত) করিতে পারে না। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সনদ, দার্জিলিং-এর আবহাওয়া বা সুগায়কের কণ্ঠমাধুর্যের সম্পদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিলেও হস্তান্তরযোগ্য নহে বলিয়া এইগুলি সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় না।

মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ, সমষ্টিগত সম্পদ ও জাতীয় সম্পদ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(নবম শ্রেণীর জন্য)

প্রথম অধ্যায়

জাতীয় আয় (১)

(National Income)

আয়—Income

জাতীয় আয় আলোচনা করিবার পূর্বে 'আয়' কাহাকে বলে তাহা জানা দরকার। শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম বা অকর্মণ্য ব্যতীত আর সকলেই প্রায় কিছু-না-কিছু আয় করে। চাষী, দিন-মজুর, কুটিরশিল্পী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সরকারী বা বে-সরকারী চাকুরীয়া সকলেই নানাবিধ কাজে নিযুক্ত থাকে। কাজের প্রতিদানস্বরূপ প্রত্যেকে সাপ্তাহিক বা মাসিক যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাহাই হইল প্রত্যেকের আয়। অর্থের দ্বারাই আয়ের পরিমাণ স্থির করা হয়। চাষী বা কুটিরশিল্পী যে দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পায় তাহাই হইল তাহার আয়। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহা উপার্জন করে, তাহাই হইল তাহার ব্যক্তিগত আয়। একজন লোক এইরূপে মাসে বা বৎসরে যে পরিমাণ আয় করে, তাহাই হইল তাহার মাসিক বা বাৎসরিক আয়। একই পরিবারের যদি তিনজনে আয় করে, তাহা হইলে এই তিনজনের আয়সমষ্টিকে পারিবারিক আয় (Family income) বলা হয়।

এখন প্রশ্ন হইল যে, এই আয়ের প্রয়োজন বা গুরুত্ব কি? আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি যে, প্রতিবেশীদের মধ্যে অমুকের অবস্থা বেশ ভাল, সে সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, আর অমুকের অবস্থা খুব খারাপ, তার দিন চলা ভার। এই স্বচ্ছলতা ও দৈন্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, যার আয় বেশী তার অবস্থা ভাল, আর যার আয় কম তার অবস্থা খারাপ। ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের অনেক কিছুরই প্রয়োজন হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ ছাড়া ও মানুষের স্বাস্থ্য-রক্ষা, শিক্ষা-দীক্ষা, ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদ, দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় প্রভৃতি নানা বাবদ ব্যয়ের প্রয়োজন। যথেষ্ট পরিমাণে আয় করিতে না পারিলে ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। কাজেই স্বল্পআয়ের লোকের সব অভাব মিটিতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় যে, আয়ের উপরই লোকের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে।

আর্থিক আয় ও প্রকৃত আয়—Money Income and Real Income

ব্যক্তি তাহার কাজের জন্য যে পরিমাণ অর্থ মজুরি পায় তাহাকে আর্থিক আয় বলা হয়। কিন্তু অর্থ ছাড়া সে কাজের জন্য অন্যান্য যে সমস্ত সুখ-সুবিধা পায় বা অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ ক্রয় করিতে পারে তাহার উপর তাহার প্রকৃত আয় নির্ভর করে। সুতরাং দ্রব্যমূল্য ও কাজের অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুখ-সুবিধার উপরই প্রকৃত আয় নির্ভর করে।

ব্যক্তিগত আয়ের উপর ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে, সুতরাং ব্যক্তিগত আয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত আয় নির্ধারণ করিবার কালে ব্যক্তি তাহার কাজের বাবদ যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে শুধু তাহা গণনা করিলে চলিবে না, অন্য নানাভাবে সে যে আয় করে অথবা তাহার কাজের জন্য যে আনুষঙ্গিক সুবিধা পায় তাহার অর্থমূল্যও ধরিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন রেলকর্মী মাসিক ২০০৲ টাকা বেতন পায়, তিন কামরাযুক্ত বাড়ী বিনা-ভাড়ায় পায় ও বৎসরে দুবার বিনা মাশুলে পরিবারসহ রেলভ্রমণ করিতে পারে। এই রেলকর্মীর মাসিক বা বাৎসরিক আয় পরিমাপকালে শুধু মাত্র তাহার বেতন পরিমাণ ধরিলে চলিবে না। বেতনের সহিত চলতি হারে বাড়ীভাড়া যোগ দিলে তাহার আয়ের সঠিক পরিমাণ জানা সম্ভব। বিনা ভাড়ায় বাড়ী না পাইলে তাহাকে হয়ত ৯০৲ টাকা বাড়ীভাড়া বাবদ দিতে হইত। বর্তমানে বাড়ীভাড়া দিতে হয় না বলিয়া তাহার সমগ্র আয় হইল ২০০৲ (বেতন)+৯০৲ (বিনা ভাড়ায় বাড়ী)=২৯০৲ টাকা। অনেক সময় আবার আয় করিতে কিছু ব্যয় হয়। সমগ্র আয় হইতে এই আবশ্যকীয় ব্যয় বাদ দিলে ব্যক্তির নীট আয় পাওয়া যায়। সু-চিকিৎসকের রোগী দেখিবার জন্য মোটর গাড়ীর প্রয়োজন হয়। মোটর গাড়ী রাখিবার জন্য চালকের বেতন, পেট্রোল খরচ ও অন্য আনুষঙ্গিক ব্যয় আছে। চিকিৎসকের মোট মাসিক আয় হইতে এই ব্যয় বাদ দিলে তাঁহার নীট আয় পাওয়া যায়।

ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান ব্যক্তিগত আয়ের উপর নির্ভর করে ইহা সত্য কিন্তু আয়পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই যে জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইবে, ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। মানুষের জীবনযাত্রার মান অভাব মিটাইবার সামগ্রী অর্থাৎ ভোগ-ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিমাণের উপর নির্ভর করে, অর্থ-পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। আর্থিক আয় দ্বিগুণ বাড়িতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য যদি চতুর্গুণ হয় তাহা হইলে আয়-বৃদ্ধি সত্ত্বেও সুখ-স্বচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় না, অধিকন্তু লোকের কষ্ট হয়। বর্তমানে

আমাদের ভারতেও এই অবস্থা ঘটিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে লোকের যে আয় ছিল তাহা অপেক্ষা আয় দুই-তিন গুণ বৃদ্ধি পাইলেও বাড়ীভাড়া, চাউল, তৈল, ঘৃত, কাপড় প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির এরূপ অগ্নিমূল্য হইয়াছে যে, লোকের দুরবস্থা লাঘব হওয়া দূরের কথা, ইহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং অর্থের ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহার উপরই লোকের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে।

জাতীয় আয়—National Income

ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থা যেরূপ তাহার ব্যক্তিগত আয়ের উপর নির্ভর করে, একটি জাতির অর্থনৈতিক অবস্থাও তদ্রূপ জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করে। এখন দেখা যাউক জাতীয় আয় কাহাকে বলে। একটি দেশের লোক বৎসরব্যাপী পরিশ্রম করিয়া কৃষি, খনি, শিল্প, ব্যবসায়, পরিবহন ও যোগাযোগ প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে যে পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে এবং শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, বিচারক, গায়ক প্রভৃতি শ্রেণীর লোক যে পরিমাণ সেবামূলক কার্য সৃষ্টি করে—এই উভয়ের সমষ্টিকে সেই বৎসরের মোট জাতীয় উৎপাদন-পরিমাণ (Gross National Product বা G. N. P.) বলা হয়। অধ্যাপক মার্শালের মতে একটি দেশের শ্রম ও মূলধন প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রযুক্ত হইয়া নানাবিধ সেবামূলক কার্যসমেত বাৎসরিক যে দ্রব্যসমষ্টি উৎপাদন করে তাহাই হইল জাতীয় উৎপাদন-পরিমাণ। ভূমি, মূলধন, শ্রম ও ব্যবস্থাপনা হইল সর্বপ্রকার উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান এবং ইহাদের যুক্তপ্রচেষ্টায় দেশের যাবতীয় সম্পদ উৎপাদিত হয়। এই জাতীয় মোট উৎপাদন-পরিমাণের অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলা হয়।

নীট্ জাতীয় আয়—Net National Income

মোট জাতীয় আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচ অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি-পূরণ, কাঁচামাল প্রভৃতি চলতি মূলধন-সংগ্রহের খরচ বাদ দিলে নীট্ জাতীয় আয় পাওয়া যায়। কৃষক বৎসরে যে পরিমাণ ধান উৎপাদন করে তাহা হইতে পর বৎসরের জন্য তাহাকে বীজধান রাখিতে হয়। সুতরাং সমগ্র উৎপন্ন ধান্য-পরিমাণের মূল্য হইতে যে পরিমাণ বীজধান রাখিতে হয় তাহার মূল্য বাদ দিলে কৃষকের কৃষিকার্য হইতে নীট্ আয় পাওয়া যায়। শিল্প-কারখানার ক্ষেত্রেও এইরূপে যন্ত্রপাতি-মেরামতের খরচা বা পুরাতনের পরিবর্তে নূতন যন্ত্রপাতি কিনিবার খরচ বাৎসরিক মোট আয় হইতে একটা নির্দিষ্ট হারে বাদ দিয়া নীট্ আয় গণনা করা হয়।

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব—Importance of National Income Analysis

আধুনিককালে সকল দেশেই জাতীয় আয়ের আলোচনা হইতেছে এবং দেশের জাতীয় আয় নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। জাতীয় আয় হইতে দেশের লোকের সম্বৎসরের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ফল সম্বন্ধে একটা ধারণা করা হয় এবং বর্তমান জাতীয় আয়-পরিমাণের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে উন্নতির পরিকল্পনা করা হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন উৎস হইতে জাতীয় আয়ের কি পরিমাণ পাওয়া যাইতেছে এবং কোন্ উৎসটির অধিকতর সু-ব্যবহার হইলে জাতীয় আয় আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহা জাতীয় আয় বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায়। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টিত হইতেছে এবং বণ্টন-ব্যবস্থার ত্রুটিও এই বিশ্লেষণ হইতে জানা সম্ভব, জাতীয় আয়ের নিয়মিত হিসাব ব্যতীত পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় না। এইজন্যই আধুনিক রাষ্ট্রে জাতীয় আয় সম্পর্কিত তথ্যগুলি আহরণ করিবার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি—How to measure National Income

১। উৎপাদন সুমারী পদ্ধতি—Census of Production Method

জাতীয় আয় তিনটি পদ্ধতি অনুসারে পরিমাপ করা হয় প্রথম পদ্ধতি অনুসারে দেশের সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণের সমষ্টির মূল্য যোগ দিলে, জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানা যায়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য-জাত দ্রব্যের মূল্য ও অন্য নানাজাতীয় সেবামূলক কাযের মূল্য যোগ দিয়া জাতীয় আয় পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিকে দ্রব্যসমষ্টির পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে দেশের সমগ্র উৎপাদন পরিমাণের অর্থমূল্য নির্ধারণ করিবার কালে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ, মূল্য নির্ধারণ কালে একই দ্রব্যের মূল্য যাহাতে একাধিকবার জাতীয় আয়ে গণনা না-করা হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার। একটি ব্যবহারযোগ্য গৃহের মূল্য নির্ধারিত হইলে, সেই গৃহ-নির্মাণের জন্য যে উপকরণাদি সংগ্রহ করিতে হয়, পৃথকভাবে আর এই সকল উপকরণাদির মূল্য গণনা করিতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় আয় পরিমাপকালে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত আয় যোগ অথবা ঋণ-পরিশোধ বিয়োগ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, স্থায়ী মূলধনের অপচয় পূরণের খরচ বাদ দিতে হইবে।

২। আয় সুমারী পদ্ধতি—Census of Income Method

দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে দেশের বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত কর্মিসমূহের আয়ের

পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। এইজন্য সরকারী, আধা-সরকারী ও বে সরকারী কর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহে যাহারা কাজ করে, তাহাদের সমগ্র আয়ের পরিমাণ সংগ্রহ করিতে হয়। জমির মালিক বা খনির মালিক যে খাজনা বা নূতন আবিষ্কারের লাভ পান, শ্রমিকের মজুরি ও ভাতা, পুঁজিপতির প্রাপ্য সুদ এবং ব্যবস্থাপকের মুনাফা এই সমস্ত যোগ দিলে জাতীয় আয় জানা যায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে জাতীয় আয় পরিমাপকালেও বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হইলেই সেই আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। একটি বাড়ী বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে না, কারণ বিক্রয় দ্বারা শুধু মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তরিত হয়, কোন নূতন ধন উৎপাদিত হয় না। অনায়াসলভ্য আয়, যথা—ভিক্ষুকের আয়, বৃদ্ধবয়সের ভাতা প্রভৃতি যে আয় বিনা উৎপাদনে পাওয়া যায়, তাহাও জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। সঠিকভাবে জাতীয় আয় নির্ধারণ করিতে হইলে দেশের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ও মূল্যস্তরের পরিবর্তনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া পরিমাপকার্য পরিচালিত করা আবশ্যক।

৩। ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতি—Consumption and Savings Method

ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতির সাহায্যে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়। একটি বৎসরে দেশের বিভিন্ন উৎস হইতে যে আয় হয়, সেই আয় আংশিকভাবে ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় এবং আংশিকভাবে সঞ্চয় করা হয়। সুতরাং সমগ্র জাতীয় আয়ের একাংশ ভোগ করা হয় ও অপরাংশ সঞ্চয় করা হয়। সুতরাং একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট বৎসরে ভোগ্যদ্রব্য ও সেবামূলক কার্যে ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় এবং যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইয়া মূলধন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে—এই উভয়ের সমষ্টি হইল জাতীয় ব্যয় (National Outlay).

জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার তিনটি পদ্ধতি উৎপাদন, আয় ও ব্যয়-বিভিন্ন হইলেও তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে একই ফল পাওয়া যায়। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলি অর্থাৎ জমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা যাহা উৎপাদন করে, সেই উৎপাদন পরিমাণ পুনরায় খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসাবে উপাদানগুলির মধ্যে ভাগ হয়। সুতরাং জাতীয় উৎপাদন জাতীয় আয়ের সমান হইবে। জাতীয় আয় আবার লোকে অংশতঃ ভোগের জন্য ব্যয় করে, অংশতঃ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে। সঞ্চয় ও ভোগ মিলিয়া জাতীয় ব্যয় হয়। এ দিক দিয়াও জাতীয় আয় জাতীয় ব্যয়ের সমান।

বণ্টন বা জাতীয় আয় বিভাগ—Distribution

ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা এই চারিটি উৎপাদনের উপাদানের সাহায্যে জাতীয় আয়ের সৃষ্টি হয়। উপাদানগুলির প্রত্যেকটি উৎপাদন-কার্যে সাহায্য করে এবং এইজন্য ইহাদের প্রত্যেকটির চাহিদা হয়। উৎপাদনের উপাদানগুলির বিক্রেতা হইল স্বয়ং সেই উপাদানটি অথবা উপাদানটির মালিক। ভূমি ও মূলধনের মালিক এই দুইটি উপাদানের বিক্রেতা। শ্রমিক নিজেই তাহার শ্রম বিক্রয় করে। এই উপাদানগুলির ক্রেতা হইল ব্যবস্থাপক—যিনি এই তিনটি উপাদান একত্রিত করিয়া ইহাদের সহযোগে উৎপাদন-কার্য পরিচালনা করেন। উৎপাদনের উপাদানগুলির জন্য ব্যবস্থাপকের যে চাহিদা, তাহা নিছক তাহার নিজের জন্য চাহিদা নহে। সমাজের বিভিন্ন অভাব পূরণের জন্য ব্যবস্থাপক উৎপাদনের উপাদানগুলি ক্রয় করে। সুতরাং দেখা যায় সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদেই ব্যবস্থাপনা-সমেত সমস্ত উপাদানের চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবস্থাপকই অন্যান্য উপাদানগুলি সংগ্রহ করেন এবং উৎপাদিত ধন উপাদানগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। জমির মালিক খাজনা পায়, শ্রমিক মজুরি পায়, মূলধনের মালিক সুদ পায় এবং ব্যবস্থাপক স্বয়ং মুনাফা পাইয়া থাকেন।

এখন প্রশ্ন হইল কি নীতিতে উৎপাদিত ধন অর্থাৎ জাতীয় আয় উপাদানগুলির মধ্যে ভাগ করা হয়। খাজনা, মজুরি, সুদ প্রভৃতি হইল জাতীয় আয়ের অংশ। জাতীয় আয় সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে বলিয়া ভূমি, মূলধন ও শ্রমের চাহিদা হয়। উৎপাদনের সাহায্য করিবার জন্য একদিকে যেরূপ এই উৎপাদনগুলির চাহিদা হয়, অপর দিকে তেমনি চাহিদা মিটাইবার জন্য এই উপাদানগুলির সরবরাহ থাকা চাই—নতুবা চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। সুতরাং ভূমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি জাতীয় আয়ের কি অংশ তাহাদের কাযের মূল্য হিসাবে পাইবে, তাহা প্রত্যেকটি উপাদানের চাহিদা ও সরবরাহের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। যদি কোন একটি উপাদানের অধিকতর উপযোগের জন্য ইহার চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও সেই অনুপাতে সরবরাহ অপ্রচুর হয়, তাহা হইলে সেই উপাদানটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইয়া উপাদানটি জাতীয় আয়ের বেশী পরিমাণ পাইবে। শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির ফলে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে মজুরি বৃদ্ধি পায়। আবার, শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মজুরি কমিয়া যায়। শ্রমিক নিযুক্ত করিবার সময় প্রত্যেক ব্যবস্থাপকই বিবেচনা করেন যে, নিযুক্ত শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যমূল্য ও শ্রমিককে দেয় মজুরি সমান কি না। ব্যবস্থাপক তত সময় পর্যন্তই নূতন

শ্রমিক নিযুক্ত করেন, যত সময় পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রমিক মজুরির সমান মূল্যের দ্রব্য উৎপাদন করিতে: পারে। দ্রব্য উৎপাদন করিবার অন্যান্য খরচ বাদ দিয়া দ্রব্যটি হইতে প্রাপ্ত মূল্য যদি মজুরী অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক নূতন শ্রমিক নিযুক্ত করিবে। ইহাতে তাহাব মুনাফা বেশী হইবে। কিন্তু অধিক শ্রমিক নিয়োগের ফলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পায়। ব্যবস্থাপক ঠিক তত সময় পর্যন্ত নূতন শ্রমিক নিযুক্ত করেন, যত সময় পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন প্রত্যেক শ্রমিকেব মজুরির সমান না হয়। বেশী শ্রমিক নিযুক্ত হইবার ফলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাহা মজুরির সমান হয়।

খাজনা, সুদ প্রভৃতিও জাতীয় আয়ের অন্যান্য অংশ। ইহাদের ক্ষেত্রেও ঐ একই নীতিতে খাজনা ও সুদ নির্ধারিত হয়। সঞ্চয় বেশী হইলে মূলধনের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, ফলে সুদ কমিয়া যায়। আবার সঞ্চয় হ্রাস পাইলে মূলধনের সরবরাহ কমিয়া যায়, ফলে সুদ বাড়ে। এইভাবে জাতীয় আয় উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়।

জন প্রতি আয়—Per capita Income

এক বৎসবে একটি দেশে যে পরিমাণ উৎপাদন হয়, তাহাকে জাতীয় ধন বলা হয়। জাতীয় ধন সেই সময়কার অর্থমূল্যে পরিমিত হইলে, তাহাকে জাতীয় আয় বলা হয়। মোট জাতীয় আয় পূর্ণ জনসংখ্যা দ্বাবা ভাগ করিলে জন প্রতি বা মাথা পিছু আয় কত তাহা জানিতে পারা যায়। ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ১১,০১০ কোটি টাকা। এই আয়ের পরিমাণকে সেই বৎসরের জন-সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে দেখা যায় যে, ভারতে জনপ্রতি আয় ছিল ২৮৪৲ টাকা। একবৎসবে ২৮৪৲ টাকা মাথাপিছু আয় হইলে মাসিক আয় দাঁড়ায় ২৩·৬৬ টাকা। ইহা হইতে ভারতের লোকেব আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। জাতীয় আয় যত বেশী হয়, জনপ্রতি আয়ও তত বৃদ্ধি পায়—অবশ্য জাতীয় আয়বৃদ্ধির সহিত যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেই লোকের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে। জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই যে লোকের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া লোকের মাথাপিছু আয় বাড়িতে পারে। আয় বৃদ্ধির সহিত যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলেই লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি দ্রব্যমূল্য বাড়ে তাহা হইলে লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িতে পারে না। জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ যদি অল্পসংখ্যক লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়,

তাহা হইলে অধিকাংশ লোকের মাথাপিছু আয় কম হইবে। সুতরাং কিভাবে এই জাতীয় আয় জনসাধারণের মধ্যে ভাগ হয়, তাহার উপরও জনপ্রতি আয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। বণ্টন-ব্যবস্থা যদি ন্যায্য হয়, তাহা হইলে, লোকের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং দেখা যায় যে, জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে লোকের জীবনযাত্রার মানের বৃদ্ধি জনসংখ্যা, মূল্যস্তর ও বণ্টন-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। জনপ্রতি আয়ের ভিত্তিতে একটি দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার সহিত অপর দেশের আর্থিক অবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে।

জীবনযাত্রার মান—Standard of Living

জীবনযাত্রার মান বলিতে শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা বুঝায় না—কর্মক্ষমতা বজায় রাখিয়া ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তৎসমুদয় বুঝায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন জীবনযাত্রার মান দেখা যায়। আমাদের দেশের একজন রিক্সা-চালকের জীবনযাত্রার যে মান তাহা একজন শিক্ষক, ডাক্তার বা উকিলের জীবনযাত্রার মান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পরিচালনা করিতে হইলে কি কি দ্রব্যের নিতান্ত প্রয়োজন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের বিভিন্ন ধারণা। একজন সুচিকিৎসকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় একখানি মোটরগাড়ী ও একটি টেলিফোন অপরিহার্য, কিন্তু একজন শিক্ষকের জীবনযাত্রায় এ দুটির কোনটিবই অপরিহার্য নহে। রিক্সওয়ালা এ দুইটি দ্রব্যের কথা আদৌ চিন্তা করিতে পারে না। একটি দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য থাকে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের জীবনযাত্রার মানের মধ্যেও সেইরূপ পার্থক্য দেখা যায়। খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের লোকের পৃথক্ ধারণা থাকে এবং এজন্যই বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে এত পার্থক্য দেখা যায়। ইংলণ্ডের একজন সাধারণ শ্রমিকের যে জীবনযাত্রার মান, আমাদের দেশের একজন উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষেও সব সময়ে জীবনযাত্রার সে মান রক্ষা করা সম্ভব নয়। লোকের জীবনযাত্রার মান নানাবিষয়ের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ মানুষ জীবনযাত্রার মান উত্তরাধিকারসূত্রে পিতামাতার নিকট হইতে পাইয়া থাকে। জীবনযাত্রার এই পারিবারিক মান ব্যক্তিগত রুচি, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক পরিবেশ ও অনুকরণ-প্রবণতার দ্বারা অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়। জীবনযাত্রার মান ধীরে ধীরে গঠিত হয় এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।

এইজন্য হঠাৎ মানুষের আয় কমিয়া গেলে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে মানুষের কষ্ট হয়।

একটি দেশের জীবনযাত্রার মান সেই দেশের উৎপাদন-পরিমাণ ও উৎপাদন বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে। দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা যদি উন্নত না হয় তাহা হইলে শুধুমাত্র বিদেশী ঋণ বা বিদেশী সাহায্যের দ্বারা দেশের জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের সকল শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার মান সমান নহে। বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার মানের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। ইংলণ্ড বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একজন দিনমজুরের যে জীবনযাত্রার মান, ভারতের দিনমজুরের জীবনযাত্রার মান তদপেক্ষা অনেক নীচু।

জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। কোন দেশেরই বা কোন সম্প্রদায়েরই জীবনযাত্রার মান স্থায়ী নহে। বিশেষতঃ বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে নানাবিধ নূতন নূতন ভোগোপকরণ আবিষ্কার হওয়ার ফলে লোকের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিতেছে। আমাদের পিতামহেরা একখানি আট হাত ধুতি, একটি চাদর ও একজোড়া চটি জুতাকেই ভদ্র পোষাক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বর্তমানে পিতামহ কর্তৃক ব্যবহৃত পোষাক পৌত্র কর্তৃক আর ভদ্র পোষাক বলিয়া পরিগণিত হয় না। মাটির দোয়াত আর পালকের কলমের পরিবর্তে এখন অতি দরিদ্র ছাত্রও ফাউনটেন পেন না হইলে নিজেকে হীন মনে করে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অযথা ব্যয় বৃদ্ধি করিলেই জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি হয় না, মানুষ শুধুমাত্র যে-কোনভাবে উদরপূর্তি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায় না। সে আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া একটু আরামের সহিত বাঁচিতে চায়। কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্যই মানুষ একটু আরাম চায়। এই হেতু সে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি ছাড়াও আরও কিছু বেশী চায়। শুধু খাদ্য, পরিধেয় ও কোনরকমে মাথা গুঁজিবার ঠাঁই হইলেই সে সন্তুষ্ট হয় না, সে চায় পুষ্টিকর ও রুচিকর খাদ্য, শালীনতা বজায় রাখিবার উপযুক্ত পরিচ্ছদ, উত্তম বাসস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা, চিত্তবিনোদনের জন্য রুচিকর আমোদ-প্রমোদ ও বিশ্রামের জন্য কিছু অবসর। মানুষ জীবনে যদি এই সুযোগ সুবিধা না পায়, তাহা হইলে তাহার শরীর ও মন সুস্থ থাকিতে পারে না। এইজন্য পৃথিবীর সব সভ্যদেশেই সকল মানুষই যাহাতে এই সুযোগ-সুবিধাগুলি পাইতে পারে, সেজন্য চেষ্টা চলিতেছে।

কোন দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রথমতঃ, দেশের কোন উৎপাদনক্ষম উপকরণই অব্যবহৃত থাকিবে না। প্রত্যেকটি উৎপাদনক্ষম উপকরণের এরূপ যথাযথ ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে সমগ্র ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ভোগকারীর অভাব

মিটাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র জাতীয় আয় এরূপভাবে বণ্টিত হইবে; যাহাতে স্বল্প আয় হইলেও সকলের সর্বাধিক সন্তুষ্টি হইবে।

ভারতে জীবনযাত্রার মান—Standard of Living in India

ভারতের অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার মান যে পৃথিবীর অনেক সভ্য দেশের মান অপেক্ষা নীচু ইহা অস্বীকার করা যায় না। ভারতের লোকের এই নিম্নস্তরের জীবনযাত্রার মানের প্রধান কারণ হইল আয়ের স্বল্পতা। যে দেশে লোকের গড়পড়তা মাসিক আয় হইল ২৭৲ টাকা, সে দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান যে নীচু হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। আমাদের জাতীয় সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ শতকরা ৫ জন লোকে ভোগ করে আর এক-তৃতীয়াংশ শতকরা ৩৫ জন লোকে ভোগ করে, অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ শতকরা ৬০ জন লোকের ভাগে পড়ে। সুতরাং আয়ের স্বল্পতা ব্যতীতও অসম ধন বণ্টন-ব্যবস্থা ভারতবাসীর নিম্ন জীবনযাত্রার মানের জন্য কম দায়ী নহে। খাদ্য, পরিধেয় ও বাসস্থানের দিক দিয়া ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতের বেশীর ভাগ লোকের বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের লোকের আয় অতি কম। শতকরা প্রায় ৫৫টি পরিবারের (অন্ততঃ ৫ জন লোক লইয়া গঠিত) মাসিক একশত টাকা ব্যয় করিবারও সামর্থ্য নাই।" পুষ্টিকর খাদ্য দূরের কথা এই সমস্ত লোক জীবন ধারণের জন্য দুইবেলা পূর্ণ আহার্য জুটাইতে পারে না। পরিধেয়ের দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে, ভারতের অর্ধেকের বেশী লোক অর্ধ নগ্ন। আমেরিকায় একজন লোক গড়পড়তা ৫০ গজ সুতীবস্ত্র ব্যবহার করে, জাপানে ৩৫ গজ আর ভারতে সরকারী হিসাবমত মাথাপিছু বস্ত্রের ব্যবহার হইল ১৬ গজ মাত্র, কিন্তু কার্যতঃ সকলে এই ১৬ গজ পায় না। মুষ্টিমেয় ধনী ব্যতীত অধিকাংশ ভারতবাসীর উপযুক্ত বাসস্থান নাই। পথে-ঘাটে, রেলের প্ল্যাটফরমে ও কুঁড়েঘরে জন্তু-জানোয়ারের মত বহু লোক বাস করে। বড় বড় শহরেও এই গৃহ সমস্যা উৎকটরূপে দেখা দিয়াছে। শিক্ষা ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা আরও শোচনীয়। উপযুক্ত বেতনে উপযুক্ত শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা এক উৎকট সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। সরকার নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উপাধি পর্যায়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ সুসংবদ্ধ চেষ্টা হইতেছে না। শহরাঞ্চলে কিছু পরিমাণ চিকিৎসা-ব্যবস্থা থাকিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নগণ্য এবং এই চিকিৎসা-ব্যবস্থা এত ব্যয়বহুল যে, সাধারণ লোকের পক্ষে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করা আদৌ সম্ভব নহে। গ্রামাঞ্চলে সুচিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেও চলে। খেলা-ধুলা, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ, বিশ্রাম ও উচ্চাঙ্গের চিন্তা অধিকাংশ লোকের কল্পনাতীত। আমাদের জাতীয় সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে

জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিয়া লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতের জাতীয় আয়—National Income of India

ভারতের জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক হইলেও এদেশের জাতীয় আয় অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক কম। জাতীয় আয়ের স্বল্পতার জন্য এদেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় নগণ্য এবং অধিকাংশ লোকই দারিদ্র্য-পীড়িত। দারিদ্র্য দূর করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান ভারত সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে জাতীয় আয়বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতে জাতীয় আয় নির্ণয় করিয়া জনপ্রতি আয় নির্ধারণ করিবার চেষ্টা পূর্বতন সরকার করেন নাই। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু নানাকারণে এই ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল নির্ভরযোগ্য নহে। বর্তমানে ভারত সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়া জাতীয় আয় নির্ধারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন—কারণ জাতীয় আয় নিরূপণ না করিয়া কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না। জাতীয় আয় নির্ধারণ করিবার জন্য ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে অর্থদপ্তরে একটি জাতীয় আয়কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন এবং ইহা পরিচালনা করিবার জন্য একটি জাতীয় আয় কমিটি (National Income Committee) নিযুক্ত হইয়াছে। ১৮৭০ সালে দাদাভাই নওরোজী সর্বপ্রথম ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। সেই সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহার বিবরণ দেওয়া হইল। এই বিবরণ হইতে ভারতের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানের একটি মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে।

হিসাবকারকের নাম	আয়-পরিমাপের বৎসর	জনপ্রতি বাৎসরিক আয়
১। দাদাভাই নওরোজী	১৮৭০	২০ টাকা
২। লর্ড কার্জন	১৯০১	৩০
৩। অধ্যাপক ওয়াদিয়া এবং যোশী	১৯১৩-১৪	৭৪

হিসাবকারকের নাম	আয়-পরিমাপের বৎসর	জনপ্রতি বাৎসরিক আয়
৪। মিঃ সিরাশ	১৯২২	১১৬ টাকা
৫। ডাঃ রাও	১৯৩১-৩২	৬৫ ”
৬। বাণিজ্য দপ্তর	১৯৪৭-৪৮	২৭২ ”
৭। জাতীয় আয় কমিটি	১৯৫২	২৬৫ ”
৮। ”	১৯৫৫-৫৬	২৮০ ”

উপরে জাতীয় আয়ের যে হিসাব দেওয়া হইল, একমাত্র জাতীয় আয় সমিতির হিসাব ব্যতীত অন্য হিসাবগুলিকে নিভরযোগ্য বলা চলে না। ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে সরকারেরও অনেক অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, ভারতের জনসাধারণ নিরক্ষর এবং তাহাদের অজ্ঞতার জন্য তাহারা সরকারকে জাতীয় আয় নির্ধারণ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি-সংগ্রহ ব্যাপারে সাহায্য করে না। এতদ্ব্যতীত এ দেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের বেশীর ভাগ উৎপাদকগণ নিজেরাই ব্যবহার করে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য-বিনিময় করে। এই ব্যবস্থার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের মূল্য অর্থে রূপান্তবিত হয় না বলিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব নির্ভুল হয় না।

জাতীয় আয় সমিতির বিবরণ বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের জাতীয় আয় অন্যান্য দেশের আয় অপেক্ষা কত কম এবং ইহার ফলে আমাদের মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতার জন্য আমাদের দেশের লোক কত গরীব এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মান কত নীচু। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবার ফলে জাতীয় আয় পরিমাণ ও মাথাপিছু আয় পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্ন প্রদত্ত বিবরণী হইতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যাইতে পারে।

পরিকল্পনার পূর্বে

জাতীয় আয় পরিমাণ (চলতি মূল্যের হিসাবে)	মাথাপিছু আয় পরিমাণ (চলতি মূল্যের হিসাবে)
১৯৪৮-৪৯—৮,৬৫০ কোটি টাকা	২৪৬·৯ টাকা
১৯৪৯-৫০—৯,০১০ ” ”	২৫৩·৯ ”
১৯৫০-৫১—৯,৫৩০ ” ”	২৬৫·২ ”

পরিকল্পনার পরে

জাতীয় আয় পরিমাণ (চলতি মূল্যের হিসাবে)	মাথাপিছু আয় পরিমাণ (চলতি মূল্যের হিসাবে)
১৯৫১-৫২—৯,৯৭০ কোটি টাকা	২৭৪৲ টাকা
১৯৫২-৫৩—৯,৮২০ ,, ,,	২৬৬.৪ ,,
১৯৫৩-৫৪—১০,৪৯০ ,, ,,	২৮১৲ ,,
১৯৫৪-৫৫—৯,৬১০ ,, ,,	২৫৪.২ ,,
১৯৫৫-৫৬—৯,৯৮০ ,, ,,	২৫৫.০ ,,
১৯৫৬-৫৭—১১,৩১০ ,,	২৮৩·৪ ,,
১৯৫৭-৫৮—১১,৩৯০ ,, ,,	২৭৯·৬ ,,
১৯৫৮-৫৯—১২,৬০০ ,,	৩০৩·০ ,,
১৯৫৯-৬০—১২,৯৭০ ,,	৩০৪.৭ ,,
১৯৬০-৬১—১৪,১৬০ ,, ,,	৩২৭ ,,
১৯৬১-৬২—১৪,৬৩০ ,,	৩০৯ ,,

(প্রাথমিক হিসাব)

উপরে প্রদত্ত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ১৯৫০-৫১ সাল হইতে জাতীয় আয় ৯,৫৩০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৫ সালে ৯,৬১০ কোটি দাঁড়ায়। ১৯৫০-৫১ সাল হইতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ২৬৫·২ টাকা হইতে কমিয়া ১৯৫১-৫৫ সালে ২৫৫ টাকা হইলেও বলা যায় যে, এই সময় মূল্য হ্রাস পায়, সেইজন্য মাথাপিছু আয় কম দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে মাথাপিছু প্রকৃত আয় ২৭৬·৩ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৬৯ টাকায় দাঁড়ায় অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

জাতীয় আয়ের উৎস (Sources of National Income)

একটি দেশের জাতীয় আয় নানা উৎস হইতে উপার্জিত হয়। বিভিন্ন দেশে এই উৎসগুলির গুরুত্ব সমান নহে। পশুপালন, খনি, কৃষি, মৎস্যের চাষ, ফলের উৎপাদন, ছোট বড় কুটিরশিল্প, পরিবহন, যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও নানাবিধ সেবামূলক কার্য হইতে জাতীয় আয় উপার্জন করা হয়। অনুন্নত দেশ-গুলিতে পশুপালন, কৃষিকার্য, কুটিরশিল্প প্রভৃতি হইতে জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ

পাওয়া যায়, আর উন্নত দেশগুলির জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ বড় বড় শিল্প-কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পরিবহন হইতে পাওয়া যায়।

ভারতে জাতীয় আয়ের উৎসগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কৃষি হইতে জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক পাওয়া যায়।

ভারতের জাতীয় আয়ের উৎস—Sources of India's National Income

			১৯৬০-৬১ সাল	১৯৬১-৬২ সাল (প্রাথমিক হিসাব)
১।	কৃষি, বন ও মৎস্য	শতকরা	৪৮·৭	৪৬·৮
২।	খনি, বড় ও ছোট শিল্প		১০·৪	১৯·১
৩।	ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ		১৬·৫	১৬·৯
৪।	নানাবিধ সেবামূলক কায		১৬·৭	১৭·৬
৫।	বিদেশ হইতে উপার্জিত নীট আয়		–০·৩	—০·৪

জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উৎসগুলি হইতে কোটি টাকা হিসাবে আয়—

(National Income by Occupational categories)

In crores of rupees

কৃষিজ	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২ (প্রাথমিক হিসাব)
কৃষি, পশুপালন ও সংশ্লিষ্ট কাজ	৬,৬৯০	৬,৬৬০
বন	১১০	১২০
মৎস্য	১০০	৭০
	৬,৯০০	৬৮৫০
খনিজ ও শিল্পজাত		
খনি	১৬০	১৭০
কারখানা	১,৩২০	১,৪৬০
ক্ষুদ্র শিল্প	১,১২০	১,১৭০
	২,৬০০	২,৮০০

ব্যবসায় ও পরিবহন সংক্রান্ত

পোষ্ট, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন	৬০	৭০
রেলপথ	৩৬০	৩৮০
সুসংবদ্ধ ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায	১৬০	১৮০
অন্যান্য ব্যবসায ও পরিবহন	১,৭৬০	১,৮৪০
	২,৩৪০	২,৪৭০

নানাবিধ সেবামূলক কার্য

বৃত্তিমূলক কাজ	৬০০	৭৯০
সরকারী চাকুরী	৯১০	১,০২০
গৃহকর্ম	১৯০	২১০
সম্পত্তি (আবাসগৃহ)	৫৩০	৫৫০
	২,৩৭০	২,৫৭০
নীট গৃহজাত উৎপাদন	১৭২১০	১৪,৬৯০
বিদেশ হইতে উপার্জিত	—৫০	— ৬০
নীট আয	১৪,১৬	১৭,৬৩০

নীট জাতীয় আয়

জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায যে, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান এবং জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক কৃষি হইতে পাওয়া যায। বৃহৎ শিল্প কারখানা হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র সাতভাগ পাওয়া যায় আর ক্ষুদ্র শিল্প হইতে দশভাগ পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা বুঝা যায আমাদের দেশ শিল্পসম্পদে অতি দরিদ্র। আবার, এই স্বল্প পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৫৩ ভাগ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতে ব্যয হয।

ভারতে জনসাধারণ যে কত দরিদ্র ও তাহাদের জীবনযাত্রার মান যে কত নীচু তাহা উপরি প্রদত্ত বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায। ইংলণ্ডের লোকের মাথাপিছু মাসিক আয হইল ৩৬০ টাকা, আমেরিকানদের আয় হইল ৭৮৪ টাকা, জাপানীদের আয হইল প্রায় ৮২ টাকা—আর ভারতবাসীর বর্তমান মাসিক আয হইল (৩২৭ ÷ ১২) = ২৭ টাকা। এই নগণ্য আয়ও আবার সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয না—কেহ বেশী পায়, কেহ বা এত কম পায় যে, তাহার

গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয় না। একটি হিসাবে ভারতে মাথাপিছু আয়ের তারতম্য দেখান হইয়াছে। এই হিসাব অনুসারে সমগ্র জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ শতকরা পাঁচজন লোক ভোগ করে, অপর এক-তৃতীয়াংশ পঁয়ত্রিশজনের মধ্যে বন্টিত হয় এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ শতকরা ষাটজনে ভোগ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতের দারিদ্র্যের জন্য শুধুমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থা দায়ী নহে, বণ্টন-ব্যবস্থার ত্রুটিও সমভাবে দায়ী।

বর্তমানে যদিও জনসাধারণের মাথাপিছু আর্থিক আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু প্রকৃত আয় সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৩১-৩২ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৬৫ টাকা, কিন্তু বর্তমানে এই আয় চারগুণ বৃদ্ধি পাইলেও লোকের জীবন যাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। কারণ আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেকক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির তুলনায় দ্রব্যমূল্য অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে এক মণ চাউলের দাম ছিল ৯ টাকা, ১৯৬৩ সালে সেই চাউলের মূল্য দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়া ৯০ টাকা হইয়াছে। সুতরাং আয় বৃদ্ধি হইলেও অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় নাই।

সংক্ষিপ্তসার

জাতীয় আয় ও ইহার বণ্টন

একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করিয়া সেই দেশের শ্রম ও মূলধন প্রতি বৎসর গড়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সেবামূলক কার্যসমেত কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যজাত ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করে। একবৎসরের উৎপাদন পরিমাণকে সেই সময়ের আয় বলা হয়। এই আয়ের সেই সময়কার অর্থমূল্যকে জাতীয় আয় বলা হয়। একটি দেশের মোট জাতীয় আয় হইতে মূলধন ও কাঁচামাল প্রভৃতি পুনঃস্থাপনের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

জাতীয় আয় পরিমাপ করা কঠিন কাজ। ইহা পরিমাপ করিতে দুইটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে দেশের সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণের সমষ্টির মূল্য যোগ দিয়া জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যজাত দ্রব্যের মূল্য ও অন্য নানাজাতীয় সেবামূলক কার্যের মূল্য যোগ দিয়া জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে দেশের বিভিন্ন উৎপাদন-কার্যে নিযুক্ত কর্মীসমূহের আয়,—যথা, খাজনা, মজুরি, সুদ, মুনাফা প্রভৃতি আয়

যোগ দিয়া জাতীয় আয় স্থির করা হয়। এইরূপে জাতীয় আয় নির্ধারণকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, যাহাতে একই আয় একাধিকবার গণনা না হয় বা শুধুমাত্র হস্তান্তরিত আয়, যথা, ভিক্ষুকের আয় বা দান গণনা না হয়।

জাতীয় আয় বণ্টন

ভূমি, মূলধন, শ্রম ও ব্যবস্থাপনা এই চারিটি উৎপাদনের উপাদানের সাহায্যে জাতীয় আয়ের সৃষ্টি হয়। উপাদানগুলির প্রত্যেকটি উৎপাদনে সাহায্য করে এবং সেইজন্য প্রত্যেকটির একটি চাহিদা আছে। আর এই চাহিদা মিটাইবার জন্য উপাদানগুলির সরবরাহ থাকা চাই। নতুবা চাহিদা ও সরবরাহের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা জাতীয় আয়ের কি অংশ তাহাদের কার্যের মূল্য হিসাবে পাইবে, তাহা প্রত্যেকটি উপাদানের চাহিদা ও সরবরাহের দ্বারা নির্ধারিত হয়। শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির ফলে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে মজুরি বৃদ্ধি পায়। আবার মূলধনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, সঞ্চয় বেশী হইলে মূলধনের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। ফলে সুদ কম হয়। মূলধনের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইলে সুদ হ্রাস পায়।

জনপ্রতি আয়

দেশের জাতীয় আয় পূর্ণ জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে, জনসাধারণের মাথা-পিছু আয় পাওয়া যায়। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে জনপ্রতি আয়ও বৃদ্ধি পায় অবশ্য যদি জনসংখ্যা সমান থাকে। জনপ্রতি আয় বৃদ্ধি পাইলে লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়। জনপ্রতি আয়ের পরিমাণ শুধুমাত্র জাতীয় আয়-পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, কি নীতিতে জাতীয় আয় জনসাধারণের মধ্যে ভাগ করা হয় তাহার উপরও অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এইজন্য দেশে ন্যায্য বণ্টন-ব্যবস্থা দরকার।

জীবনযাত্রার মান

কর্মক্ষমতা বজায় রাখিয়া ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, জীবনযাত্রার মান বলিতে তৎসমুদয়ের ভোগ বুঝায়। ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মান, অনেক পরিমাণে পারিবারিক জীবনযাত্রার মান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত রুচি, শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক পরিবেশও জীবনযাত্রার নির্দিষ্ট

মানগঠনে প্রভাব বিস্তার করে। জীবনযাত্রার মান একটি দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জীবনযাত্রার মান দেখা যায়।

ভারতের জাতীয় আয়

জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় ভারতের জাতীয় আয় অতি স্বল্প। ব্যক্তিগতভাবে ভারতের জাতীয় আয় নির্ধারণ করিবার চেষ্টা অনেকে করিয়াছেন। বর্তমানে দেশের জাতীয় সরকার এই বিষয়ে অবহিত হইয়া এই কার্যের জন্য জাতীয় আয়-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। ১৮৭০ সালে দাদাভাই নওরোজী প্রথম জাতীয় আয় নিরূপণ করেন। তাঁহার হিসাবমত ভারতে জনপ্রতি বার্ষিক আয় ছিল ২০ টাকা। তারপর ১৯০১ সালে লর্ড কার্জনের সময় যে হিসাব হয়, তাহাতে জনপ্রতি বৎসরিক আয়ের পরিমাণ হয় ৩০ টাকা। ১৯২২ সালে মিঃ সিরাস ও ১৯৩১-৩২ সালে ডাঃ রাও-এর হিসাবমত ভারতের জনপ্রতি বাৎসরিক আয় হয় যথাক্রমে ১১৬ ও ৬৫ টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয়-কমিটির হিসাবে অনুসারে এই আয ২৮০ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতের জনসাধারণ যে কত দরিদ্র ও তাহাদের জীবনযাত্রার মান যে কত নীচু তাহা জাতীয় আয-কমিটির হিসাব হইতে জানা যায়। আমাদের দেশে জনপ্রতি মাসিক আয় হইল মাত্র ২৭ টাকা। ইংলণ্ড, আমেরিকা এমন কি জাপানের অধিবাসীদের আয়েব তুলনায় এই আয় অতি নগণ্য। এই আয়ও আবার সমান ভাগে ভাগ হয় না। অল্পসংখ্যক শিল্পপতি ও ধনিসম্প্রদায় জাতীয় আয়ের একটা বিরাট অংশ ভোগ করেন। বর্তমানে জনপ্রতি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও লোকের জীবনযাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি হয় নাই—কারণ আর্থিক আয়বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে দ্রব্যমূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What is meant by National Income ? How is it measured ? Give a brief account of the principal sources of National Income.

   জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝ ? জাতীয় আয় কি পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয় ? জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান উৎসগুলি বর্ণনা কর।

উঃ—একটি দেশে পশুপালন, কৃষি, খনি, শিল্প, ব্যবসায়, পরিবহন প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে যে

পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী এবং শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, বিচারক, গায়ক প্রভৃতি শ্রেণীর লোক যে পরিমাণ সেবামূলক কার্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ এক বৎসরে উৎপাদন করে—এই উভয়ের সমষ্টিকে, সেই বৎসরের মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাণ (Gross National Product বা G. N. P) বলা হয়। ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনার যুক্ত প্রচেষ্টায় একটি দেশের যাবতীয় সম্পদ উৎপাদিত হয় আর এই জাতীয় মোট উৎপাদন পরিমাণের অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় আয় (Gross National Income) বলা হয়। মোট জাতীয় আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচ অর্থাৎ স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ, কাঁচামাল প্রভৃতি চলতি মূলধন সংগ্রহের খরচ বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় (Net National Income) পাওয়া যায়।

জাতীয় আয় প্রধানতঃ দুইটি পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা হয়: (১) দ্রব্যসমষ্টি পদ্ধতি—এই পদ্ধতি অনুসারে দেশের সমগ্র উৎপাদন পরিমাণের সমষ্টির মূল্য অর্থাৎ কৃষি শিল্প, ব্যবসায়জাত দ্রব্যগুলির ও নানাজাতীয় সেবামূলক কার্যগুলির মূল্য যোগ দিয়া জাতীয় আয় স্থির করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে, দেশের বিভিন্ন কাযে নিযুক্ত কর্মিসমূহের আয়ের পরিমাণ অর্থাৎ খাজনা, মজুরি, সুদ, ও মুনাফা এই সমস্ত যোগ দিলে জাতীয় আয় জানা যায়। এই উভয় পদ্ধতির সাহায্যে জাতীয় আয় নির্ধারণকালে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

পশুপালন, খনি, কৃষি, মৎস্যের চাষ, ফলের উৎপাদন, ছোট-বড় কুটিরশিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও নানাবিধ সেবামূলক কায হইতে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশে এই উৎসগুলির গুরুত্ব সমান নহে।

2. What is meant by National Income? Give a brief account of the principal sources of India's National Income.

জাতীয় আয় কাহাকে বলে? ভারতের জাতীয় আয়ের উৎসগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উঃ—প্রথম প্রশ্নের প্রথম পংক্তি দ্রষ্টব্য।

ভারতে জাতীয় আয়ের উৎস হইল কৃষি, খনি, শিল্প (বড়, ছোট ও কুটির) ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন ও নানাবিধ সেবামূলক কায। ভারতে জাতীয় আয়ের উৎসগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কৃষি হইতে জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক পাওয়া যায়। শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি উৎসগুলি হইতে জাতীয় আয়ের পরিমাণ অন্যান্য উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা অনেক কম।

3. Write notes on (1) Per Capita Income, (2) Standard of living.

(ক) মাথাপিছু আয় ও (খ) জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উঃ—(১) মাথাপিছু আয় বা গড়পড়তা জাতীয় আয় বলিলে একটি নির্দিষ্ট বৎসরে একটি দেশের জনপ্রতি গড় আয় কত তাহা বুঝায়। এক বৎসরের জাতীয় আয় পরিমাণকে সেই বৎসরের লোকসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে সেই বৎসরের মাথাপিছু আয় জানিতে পারা যায়। ১৯৫১-৫২ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৯,৯৭০ কোটি টাকা। এই আয় পরিমাণকে সেই বৎসরের জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে দেখা যায় যে সেই সময়ে ভারতে চলতি মূল্যের হিসাবে মাথাপিছু

আয় ছিল ২৭৪ টাকা। মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হইতে একটি দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

(২) দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত দ্রব্যগুলিকে ভোগ করা লোকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে সামগ্রিকভাবে সেই দ্রব্যগুলিকে জীবনযাত্রার মান বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। সকলের জীবন-যাত্রার মান সমান নহে। ধনী ও দরিদ্রের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। শহরে ও পল্লীগ্রামে জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। জীবনযাত্রার মান মাথাপিছু আয়, পারিবারিক আয় তথা জাতীয় আয় পরিমাণের উপর নির্ভর করে। জীবনযাত্রার মান স্থায়ী নহে—দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এই মান পরিবর্তিত হয়।

4. How do you measure the national income of a country? If the national income of a country increases, does the standard of living of the people also improve?

জাতীয় আয় কিভাবে পরিমাপ করা হয়? জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেই কি জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়? H. S. (Hu) 1963

উঃ—প্রথম ভাগের উত্তরের জন্য প্রথম প্রশ্নের উত্তরের দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য।

জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে সাধারণতঃ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় এবং আয়বৃদ্ধির ফলে লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়, ইহা আশা করা যায়। কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেই যে লোকের অবস্থা স্বচ্ছল হয় তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

বর্ধিত জাতীয় আয় যদি সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ না হয় অর্থাৎ কেহ বেশী পায় এবং কেহ এত কম পায় যে তাহার গ্রাসাচ্ছদনের সংস্থান হয় না—তাহা হইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও সকলের অবস্থার উন্নতি হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও জনসংখ্যা যদি জাতীয় আয়বৃদ্ধির তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে মাথাপিছু আয় কম হয়, ফলে লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে না। ভারতে এই অবস্থাটি দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ, আয়বৃদ্ধির সহিত যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলেই লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আয়বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে-যদি দ্রব্যমূল্য বাড়ে তাহা হইলে লোকের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না।

ভারতে বর্তমানে যদি জাতীয় আয়বৃদ্ধির ফলে জনপ্রতি আর্থিক আয় পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত আয় সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৩১-৩২ সালে জনপ্রতি আয় ছিল ৬৫৲ টাকা কিন্তু বর্তমানে এই আয় প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইলেও লোকের জীবনযাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। কারণ আয়বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির তুলনায় দ্রব্যমূল্য অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় আয় (২)

(National Income—II)

জাতীয় আয়-নির্ধারক উপাদান সমূহ—Broad factors determining National Income.

একটি দেশের জাতীয় আয় হইল দেশের সমস্ত উৎস হইতে উৎপাদনের ফল এবং বিভিন্ন উৎপাদনের উপাদানের আয়ের উৎস। জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও উৎকর্ষ যতই বৃদ্ধি পাইবে বণ্টন-ব্যবস্থা ন্যায্য হইলে, জনসাধারণের মাথাপিছু আয় ততই বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের প্রথম ও প্রধান উপায় হইল জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা। এইজন্য জাতীয় আয়-পরিমাণ, ইহার উৎকর্ষ ও ইহার বৈচিত্র্য, কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। জাতীয় আয়ের পরিমাণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

১। প্রাকৃতিক সম্পদ—Natural Resources

উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদই সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করে। যে দেশে প্রচুর উর্বর জমি, নানাজাতীয় বৃক্ষসমন্বিত অরণ্য, নিত্যবহ নদনদী ও অন্যান্য জলস্রোত বিদ্যমান, যে দেশ লৌহ, কয়লা, অভ্র, পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, যে দেশের জলবায়ু উৎপাদনের অনুকূল, সে দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা অধিক। যে দেশ খনিজ সম্পদ হইতে বঞ্চিত, যে দেশের বেশীর ভাগ পার্বত্য অঞ্চল এবং যেখানে মরুভূমির প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, সে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা কম। সুতরাং জাতীয় আয়বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনাও কম।

২। জনবল—Human Factor

মানুষের দ্বারাই এবং মানুষের জন্যই উৎপাদন হয়, সুতরাং মানুষকে বাদ দিয়া কোনপ্রকার উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হইতে পারে না। ভূমি, খনিজ বা বনজ সম্পদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অভাব মিটাইতে

পারে না। মানুষ তাহার পরিশ্রম ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া প্রাকৃতিক সম্পদ-গুলিকে তাহার অভাব মোচনের উপযোগী সামগ্রী করিয়া লয়। সুতরাং যে দেশে কর্মক্ষম লোকের অভাব নাই, সেই দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বেশী এবং যে দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যা স্বল্প, সে দেশে উৎপাদন-পরিমাণও স্বল্প হয়।

৩। লোকের কর্মস্পৃহা ও কর্মক্ষমতা—Will to work and Power to work on the part of the People

কোন দেশ জনবহুল হইলেই যে সে দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বেশী হয়, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। জনসাধারণের যদি কাজের ইচ্ছা না থাকে, তাহারা যদি অলস-প্রকৃতির হয় এবং তাহাদের মধ্যে যদি কর্মক্ষমতার অভাব থাকে তাহা হইলে জনবহুল হওয়া সত্ত্বেও সে দেশের উৎপাদন-পরিমাণ কম হয়। যে দেশের লোক শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও দায়িত্ববোধের সহিত তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে অভ্যস্ত, সে দেশেব জাতীয় আয়-পরিমাণ জনসংখ্যা স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও বৃদ্ধি পাইতে পারে। সুতবাং কর্মস্পৃহা ও কমক্ষমতা উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

৪। নানাজাতীয় মূলধন—Different forms of Capital

শুধু শারীরিক শক্তি বা বুদ্ধি প্রয়োগ করিলেই উৎপাদনে উৎকষ লাভ করা যায় না। বলবান জেলে শুধু গায়ের জোরে বা বুদ্ধি খাটাইয়া বহু মাছ ধরিতে পারে না। বহু মাছ ধরিতে গেলে তাহার নৌকা, পাল ও মাছ ধরিবার অন্যান্য সরঞ্জাম একান্ত প্রয়োজন। একজন মানুষ হাতে যতখানি লিখিতে পারে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক কাজ হইতে পারে। কৃষিকাযেব ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, একজন কৃষক একটি কাঠেব লাঙ্গল ও একজোড়া বলদেব সাহায্যে একদিন যে পরিমাণ জমি চাষ করিতে পাবে, একটি ট্রাক্টর বা কলের লাঙলের সাহায্যে তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী জমি আরও ভালভাবে চাষ করিতে পারে। সুতরাং উৎপাদন-কাযে বাস্তব মূলধন অর্থাৎ নানাজাতীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ ও উৎকৃষ্ট ধরণের জিনিস প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আরও সুবিধা এই যে, কাজটি ভাগ করিয়া যে লোক যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজ দেওয়া চলে। ইহাতে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যন্ত্রের সাহায্য তৈল, বাষ্প, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকেও উৎপাদন-কার্যে ব্যবহার করিয়া উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়।

সুতরাং ছোট-বড় সব রকমের যন্ত্রপাতি, কলকারখানা প্রভৃতি বাস্তব মূলধন-গুলি উৎপাদনের প্রধান সহায়ক সামগ্রী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে যে দেশের বাস্তব মূলধনের পরিমাণ যত বেশী, সে দেশের উৎপাদনের পরিমাণও তত অধিক।

৫। কারিগরি জ্ঞান—Technical Knowledge

যন্ত্রপাতি ও কলকারখানার ব্যাপক ব্যবহার জাতীয় আয় বৃদ্ধির অন্যতম উপাদান। উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা ব্যবহার করিতে গেলে যন্ত্রপাতির প্রস্তুত ও পরিচালনা করিবার সম্যক্ জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। যন্ত্রপাতি যদি বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হয় বা যন্ত্রপাতি খারাপ হইয়া গেলে মেরামত করিবার জন্য বিদেশে পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি হয় সেই বৃদ্ধির পরিমাণ বিদেশী ঋণ পরিশোধে ব্যয় হইয়া যায়। ইহার দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে না। সুতরাং যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার ও পরিচালনা করিবার জন্য যে বিশেষ ধরণের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়, তাহাও উৎপাদন ব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

৬। প্রগতিশীল মনোবৃত্তি—Progressive outlook of life

যে দেশের লোক অত্যধিক মাত্রায় রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন, যাহা কিছু পুরাতন তাহাই আকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, সে দেশে কোন উন্নত ধরণের উৎপাদন-পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব নহে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া আজ বহু দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং দেশের জনসাধারণের মন অগ্রগতির সহায়ক নূতন নূতন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে। নূতনত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইলে আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির ফল সম্পূর্ণভাবে ভোগ করা সম্ভব। যাহা কিছু ভাল তাহাই গ্রহণ করিব, যাহা কিছু মন্দ তাহা পরিত্যাগ করিব—সে নূতনই হউক আর পুরাতনই হউক এইরূপ মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে না পারিলে জাতীয় আয় তথা সমগ্র জাতীয় জীবনের উন্নতি সম্ভব নয়। জাপান, রুশ প্রভৃতি দেশ এইরূপ প্রগতিশীল মনোবৃত্তির সাহায্যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছে।

৭। সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থা—Social and Economic Structure

একটি দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় সেই দেশের সামাজিক সংগঠন ও আর্থিক

কাঠামোর গুরুত্ব নিতান্ত কম নহে। সমাজ-ব্যবস্থায় যদি জাতিভেদ, যৌথ পরিবার, বিশেষ রকমের উত্তরাধিকার আইন থাকে, তাহা হইলে উৎপাদন-ব্যবস্থা একভাবে প্রভাবিত হয়। জাতিভেদ থাকার ফলে একজন লোকের অনিচ্ছা বা দক্ষতার অভাব-ক্ষেত্রেও বাধ্য হইয়া এক ধরণের কাজ করিতে হয়। ইহার ফলে উৎপাদন-পরিমাণ হ্রাস পায়। যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে পারিবারিক নানা কাজ নানা ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইলেও অনেক সময় দেখা যায় যে, পরিবারের একজনের আয়ের দ্বারা অন্যান্য সকলের খরচ সংকুলান হয়। ইহার ফলে কর্ম-বিমুখতা-দোষ প্রশ্রয় পায়, মাথাপিছু পারিবারিক আয় কম হয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

দেশের আর্থিক কাঠামোর উপরও উৎপাদন-পরিমাণ কিছুটা নির্ভর করে। দেশে যদি অধিক সংখ্যক ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও যৌথমূলধনী কারবার থাকে, তাহা হইলে লোকের সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সঞ্চয়-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চিত মূলধনের সাহায্যে যন্ত্রপাতি, কলকারখানা প্রভৃতি বাস্তব মূলধন বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনের উন্নতি করা সম্ভব হয়। দেশের ভূমিব্যবস্থা যদি জমিদারী প্রথায় পরিচালিত হয় অর্থাৎ মুষ্টিমেয় লোক জমির মালিক হয় এবং অধিকাংশ লোককে যদি অনিচ্ছার সহিত জমিদারের অধীনে জমি চাষ করিতে হয়, তাহা হইলে কৃষিজাত উৎপাদন-পরিমাণ নিশ্চিতরূপে হ্রাস পায়। শিল্পের ক্ষেত্রেও যদি উৎপাদন-ব্যবস্থায় কয়েকজন পুঁজিপতি মালিকের একচেটিয়া অধিকার থাকে, তাহা হইলে মালিক উৎপাদন-পরিমাণ হ্রাস করিয়া মূল্যবৃদ্ধি দ্বারা তাহার মুনাফার পরিমাণ স্ফীত করিবার চেষ্টা করিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে সমগ্র জাতীয় উৎপাদন-পরিমাণ হ্রাস পাওয়া আবশ্যম্ভাবী।

৮। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ—Role of the State

বর্তমানে একটি দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি যে সম্ভব নয় তাহা বর্তমান যুগে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং সকল দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থায়ই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের অল্পবিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায়। সরকার নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া একদিকে যেরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে, অপর দিকে সেইরূপে বে-আইনী উৎপাদন বা জনস্বার্থবিরোধী উৎপাদন রহিত করে। অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারী অনুপ্রেরণা, উপদেশ, সাহায্য ও

নিয়ন্ত্রণ একান্ত আবশ্যক। আধুনিক বহু রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে উৎপাদন-বৃদ্ধির ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে।

উৎপাদনের উপাদান—Factors of Production

মানুষের অভাব মিটাইবার জন্য কোন কিছু তৈয়ারী করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন, সেইগুলিকে উৎপাদনের উপাদান বা উপকরণ বলা হইয়া থাকে। ধান হইতে ভাত হয় এবং ভাত খাইয়াই আমাদের দেশের লোক সাধারণতঃ বাঁচিয়া থাকে। সুতরাং ধান উৎপাদন করিতে হইলে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা আলোচনা করিলে উৎপাদনের উপাদান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায়। প্রথমতঃ, জমি ছাড়া ধান হয় না। সুতরাং ধান তৈয়ারী করিতে হইলে প্রথম উপাদান হইল **জমি, ভূমি বা মাটি** এবং ইহার উর্বরতা অর্থাৎ মাটির উৎপাদিকা-শক্তি। জমি ও ইহার উৎপাদিকাশক্তি প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যায়ভুক্ত—মনুষ্যসৃষ্ট নহে। শুধু জমি হইলেই ধান তৈয়ারী হয় না। ধান তৈয়ারী করিতে হইলে জমি চাষ করিতে হয়, এজন্য কৃষি-শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রকৃতিদত্ত জমি হইতে ধান উৎপাদন করিতে হইলে মানুষের **শ্রম** নিতান্ত প্রয়োজন। এইজন্য ভূমি ও শ্রম এই দুইটিকে উৎপাদনের মূল উপাদান বলা হয়। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শুধু ভূমি ও শ্রমের দ্বারা সব সময়ে সব রকম উৎপাদন সম্ভব নয়। চাষ করিতে হইলে লাঙ্গল, বলদ, বীজধান, সার প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। এগুলি ছাড়া শুধু ভূমি ও শ্রম ফলপ্রসূ হয় না। লাঙ্গল, বলদ, বীজধান, সার প্রভৃতিও উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রী। এগুলিকে বাস্তব **মূলধন** বলা হয়। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ পর্যন্ত মানুষ নানাবিধ হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন করিতেছে। সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের অভাবের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে বহুসংখ্যক শ্রমিককে একত্র সমাবেশ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার জন্য একদল লোক চাই, যাহারা আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের বিভিন্ন দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখে। ইহাদিগকে ব্যবস্থাপক, পরিচালক বা সংগঠক বলা হয়। সুতরাং উৎপাদনের জন্য চারিটি উপাদান আবশ্যক যথা, ভূমি, শ্রম, মূলধন ও **ব্যবস্থাপনা**।

উপরি-উক্ত চারিটি উপাদানই উৎপাদন-কার্যে অপরিহার্য। কিন্তু সকলের গুরুত্ব

সমান নহে। আদিম যুগে মানুষ যখন প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত তখন প্রাকৃতিক সম্পদই ছিল তাহার অভাব মিটাইবার প্রধান উপকরণ। কৃষিযুগে ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল। পরবর্তী যন্ত্রশিল্পের যুগে মূলধনের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও শ্রমের গুরুত্ব কমিতে থাকে। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে বিশেষ করিয়া বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রবর্তনের ফলে ব্যবস্থাপনা কার্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে ভূমি, শ্রম ও মূলধন যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন-কার্য-পরিচালনার ক্ষমতার উপর উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ নির্ভর করে। সুতরাং উপাদান-গুলির মধ্যে ব্যবস্থাপকের কার্যই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

পরিচালক বা উদ্যোক্তা (Organiser)—বর্তমান যুগে জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিরাট বহরে উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয়। উৎপাদিত দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারে কেনাবেচা হয় এবং এই আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্য পরিবর্তনের দিকে ও চাহিদার পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উৎপাদন করিতে হয়। কাজেই উৎপাদনের ঝুঁকি ও দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে একত্রে বহু শ্রমিক কাজ করে, সেজন্য শ্রমিকদের জন্য কাজ বণ্টন করা ও প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করাও কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং বর্তমান যুগে পরিচালকের কাজের গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পরিচালকের কাজ—Functions of the Entrepreneur

উৎপাদনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তাকে দেখিতে হয়। তিনিই শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থান নির্বাচন করেন ও উপযুক্ত গৃহাদি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। কাঁচামাল সংগ্রহ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, শ্রমিক নিয়োগ ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়াও তাঁহার কার্য। উৎপাদিত দ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বাজারে বিক্রয় করা ও সেজন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাও তাঁহাকে করিতে হয়। লোকের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে উৎপাদনের নূতন নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে হয়, নতুবা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁহার মুনাফা পরিমাণ কম হয়। উৎপন্ন দ্রব্য হইতে বিক্রয়লব্ধ আয় তাঁহাকে জমির বা গৃহের মালিক, মজুর ও মূলধনের অধিকারীকে যথাক্রমে খাজনা, মজুরি ও সুদ হিসাবে দিতে হয়। অর্থাৎ উৎপাদনের সমস্ত খরচ মিটাইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলেই তিনি তাহা মুনাফা হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন। ঝুঁকি বহন করাই হইল উদ্যোক্তার প্রধান কাজ।

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলি কোন ঝুঁকি লয় না—একমাত্র উদ্যোক্তাই এই ঝুঁকি বহন করেন এবং তাঁহার মুনাফার পরিমাণ তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, এবং কর্মদক্ষতা ও সংগঠন শক্তির উপর নির্ভর করে। এইজন্যই উদ্যোক্তাকে শিল্পের অধিনায়ক (Captain of industry) বলা হয়। কারণ তিনিই ভূমি, মূলধন ও শ্রমের যথাযথ সংযোগ সাধন করিয়া উৎপাদনে সাহায্য করেন। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপক ব্যবসায় পরিচালনা করেন, ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করেন ও নূতন নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

ভারতের জাতীয় আয়-নির্ধারক উৎপাদনসমূহ—Broad Factors determining National Income of India

প্রাকৃতিক সম্পদ—Natural Resources

ভারতের জাতীয় আয় অন্যান্য দেশের জাতীয় আয়ের তুলনায় নগণ্য। যে সমস্ত উপাদানের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যায়, সে সব উপাদান ভারতে কি পরিমাণ আছে ও তাহাদের গুণাগুণ বিচার করা প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য ভারত বিশ্ববিখ্যাত। প্রকৃতিদেবী অকৃপণহস্তে ভারতকে ঐশ্বর্যশালী করিলেও মানুষের অবহেলার ফলেই ভারত আজ জগতের অন্যতম দরিদ্র দেশ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভারতবাসী চেষ্টা করিলেই তাহাদের দারিদ্র্য দূর করিতে পারে। এদিক দিয়া ভারতের কোন প্রাকৃতিক বাধা নাই। ভারতের আয়তন, ব্যবহারযোগ্য জমির পরিমাণ, জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত, নদনদী, খালবিল ও অন্যান্য জলস্রোত, বিস্তীর্ণ সমুদ্রোপকূল, মৎস্যসম্পদ, প্রাণিসম্পদ, বনসম্পদ ও খনিজসম্পদ—যাহার উপর দেশের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে, সেগুলি এত প্রচুর পরিমাণে এই ভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সম্পদগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহার হইতে ভারত পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে।

১। **জলবায়ু**—ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব অপরিসীম। দেশের লোকের কর্মক্ষমতা, বনসম্পদ, প্রাণিসম্পদ, কৃষি ও শিল্প প্রভূত পরিমাণে এই আবহাওয়ার উষ্ণতা ও আর্দ্রতার উপর নির্ভরশীল। আবহাওয়ার উপর বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণ নির্ভর করে এবং দেশের কৃষিকার্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে এই বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। ভারতে বৃষ্টিপাত **মৌসুমী বায়ুর** দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ভারতে মৌসুমী বায়ুর দুইটি প্রধান ধারা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু (South-West Monsoon) ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু (North-East Monsoon)। মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান ব্যতীত ভারতের অধিকাংশ স্থানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর জন্য বৃষ্টিপাত হয়, এবং এই বায়ু সমগ্র বৃষ্টিপাতের প্রায় ৯০ ভাগ ঘটায়। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং সময়মত উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত না হইলে ভারতের শস্যসম্পদ জন্মে না। কৃষিকার্য ব্যাহত হইলে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য, দেশের রেল পরিবহন, আমদানী-রপ্তানী এমন কি সরকারের রাজস্ব পরিমাণও হ্রাস পায়। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং দুর্ভিক্ষ নিরোধকল্পে সরকারকে অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং ভারতের অর্থ নৈতিক জীবন-যে আবহাওয়ার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। আবহাওয়ার উপর এই নির্ভরশীলতা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের জাতীয় সরকার তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাহায্যে ব্যাপকভাবে সেচব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন।

২। **ভূমি**—জম্মু ও কাশ্মীর সমেত ভারতের আয়তন হইল ১২,৬৯,৬৪০ বর্গমাইল। দেশের প্রধান ঐশ্বর্য হইল দেশের মাটি—কারণ এই মাটি হইতেই খাদ্যদ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য খনিজদ্রব্য আহরণ করা হয়। ভারতে মোট জমির পরিমাণ হইল ৮১ কোটি ১০ লক্ষ একর। ইহার মধ্যে কিছু জমির সঠিক হিসাব এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এই জমির মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ হইল ৩২ কোটি ৪০ লক্ষ একর অর্থাৎ শতকরা ৫৩ ভাগ এবং বনভূমি হইল ৯ কোটি ৩০ লক্ষ একর অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগ। ভারতের মাটিকে সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১। **পলিমাটি**—উপকূল ভূমি ও উত্তরাপথের সমতল ভূমিতে এই মাটি দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই মাটি কৃষিকার্যের বিশেষ সহায়ক। উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইলে এই মাটিতে প্রচুর ডাল, কলাই, গম, ইক্ষু, তৈলবীজ, কিছু পরিমাণ ধান, পাট প্রভৃতি জন্মে। ২। দক্ষিণাপথের **কালোমাটি**—এই মাটিতে জোয়ার, বাজরা, গম, প্রভৃতি খাদ্যশস্য ও প্রচুর পরিমাণে কার্পাস জন্মে। ৩। মাদ্রাজ, মহীশূর, ছোটনাগপুর ও বোম্বাইয়ের কিয়দংশের **গেরুয়া মাটি**—এই মাটি নীরস ও কঙ্করময়। জোয়ার, বাজরা, বাদাম ও তৈলবীজ প্রভৃতির চাষ এই মাটিতে সম্ভব। সেচব্যবস্থা করিতে পারিলে এই মাটিতে ধানও উৎপাদন করা যাইতে পারে।

৩। **খনিজসম্পদ**—শিল্পোন্নতির জন্য যে দুইটি খনিজ দ্রব্য সবচেয়ে বেশী

দরকার তাহা হইল কয়লা ও লৌহ। আমাদের দেশে এই দুইটিই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

(ক) কয়লা—ভারতে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, হায়দ্রাবাদের সিঙ্গেরাণী ও রাজস্থান অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লার অধিকাংশই (৮০ ভাগ) পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের একটি অংশে কেন্দ্রীভূত—সুতরাং বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি দূর অঞ্চলে এই কয়লা পাঠাইতে সময়ক্ষেপ হয় ও অনেক মাশুল লাগে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতে মোট নিষ্কাশনযোগ্য কয়লার পরিমাণ হইল ২,১০০ কোটি টন এবং ইহার মধ্যে মাত্র ৫০ কোটি টন উৎকৃষ্ট জাতের কয়লা। কোক্ কয়লার পরিমাণ মাত্র ২০০ কোটি টন। ভারতে বৎসরে মোট ৩৬০ লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতে কয়লা-উৎপাদনের লক্ষ্য বার্ষিক ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন বলিয়া স্থির হইয়াছে। ভারত কিছু কয়লা বিদেশেও রপ্তানী করিয়া থাকে।

(খ) লোহ- লৌহও ভারতের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতে প্রায় ৮০০ কোটি টন লৌহ মজুত আছে। ভারতে যে পরিমাণ লৌহ মজুত আছে, তাহা দ্বারা শুধু ভারত কেন সমগ্র পূর্ব-এশিয়ার চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়। ভাবতের প্রধান প্রধান লৌহখনিগুলি উড়িষ্যার কেওনঝর, বোনাই ও ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে এবং বিহারের সিংহভূম অঞ্চলে অবস্থিত। মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূরের কয়েকটি অঞ্চলেও লৌহখনি আছে। বর্তমান যান্ত্রিকযুগে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য অপরিহার্য। ভারতে প্রতিবৎসর গড়ে প্রায় ২০ লক্ষ টন লৌহ ও ১০ লক্ষ টন ইস্পাত তৈয়ারী হয়। কিন্তু ইহাতে দেশের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মেটে না। ভারতে জামসেদপুরের টাটা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিখ্যাত। ইহা ছাড়াও আসানসোলে এবং মহীশূরের ভদ্রাবতীতে দুইটি কারখানা আছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী আরও তিনটি লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প যথাক্রমে ইংলণ্ড, জার্মানী ও রাশিয়ার সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে, উড়িষ্যার রুরকেল্লা ও মধ্যপ্রদেশের ভিলাইএ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারত হইতে কিছু পরিমাণ আকরিক লৌহ বিদেশেও রপ্তানী হইয়া থাকে। তৃতীয় পরিকল্পনায় লৌহের উৎপাদন ৩ কোটি টনে বৃদ্ধি করা হইবে।

পশ্চিম জার্মান সরকারের সাহায্যে উড়িষ্যার রুরকেল্লায় একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গঠিত হইয়াছে। ১৯৬২ সালে এই কারখানায় ৬'৫ লক্ষ লৌহপিণ্ড এবং ৬ লক্ষের উপর ইস্পাত পিণ্ড তৈয়ারী হয়।

সোভিয়েট সরকারের সাহায্যে মধ্যপ্রদেশের ভিলাইতে দ্বিতীয় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। এই কারখানা উৎপাদনের প্রথম বৎসরেই ইহার নির্ধারিত লক্ষ্য অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। প্রথম বৎসরেই (১৯৬২-৬৩) ১১.৭ লক্ষ টন লৌহপিণ্ড এবং ১০.৬ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড তৈয়ারী করে। নূতন ব্যবস্থা অনুসারে এই কারখানা বৎসরে ২৫ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড তৈয়ারী করিতে পারিবে।

বৃটিশ সরকারের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে তৃতীয় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬২ সালের শেষে এই কারখানা ইহার লক্ষ্য অনুযায়ী লৌহপিণ্ড তৈয়ারী করিতে সমর্থ হয় এবং ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদন ক্ষেত্রে ইহার লক্ষ্যের শতকরা ৯২ ভাগ তৈয়ারী করে। তৃতীয় পরিকল্পনা অনুসারে এই কারখানাটির উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে।

ইহাছাড়াও চতুর্থ পরিকল্পনার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ভারত সরকার মাদ্রাজ ও গুজরাটের ভাটোয়ায় দুইটি বিশুদ্ধ ইস্পাত শিল্প গঠনের সম্মতি দান করিয়াছেন।

(গ) ম্যাঙ্গানিজ—লৌহ ও ইস্পাত, রাসায়নিক ও কাচ-শিল্প প্রভৃতিতে ম্যাঙ্গানিজ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে প্রচুর পরিমাণে এই ধাতু পাওয়া যায় এবং এক সোভিয়েত রাশিয়া ব্যতীত অন্য কোন দেশে এত প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ নাই। ভারতের মধ্যপ্রদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট জাতের ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মধ্যভারত, বিহার ও উড়িষ্যার কয়েকটি স্থানেও ম্যাঙ্গানিজ দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) অভ্র—অভ্র-উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। পৃথিবীর সমগ্র অভ্র-উৎপাদনের প্রায় ৮০ ভাগ ভারতেই হয়। বৈদ্যুতিক শিল্পে ব্যাপকভাবে অভ্রের ব্যবহার হয়। কাচের পরিবর্তেও অনেক সময় অভ্র ব্যবহৃত হয়। বিহার রাজ্যেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ অভ্র প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজ ও রাজস্থানেও কিছু পরিমাণ অভ্র পাওয়া যায়।

(ঙ) স্বর্ণ—ভারতে স্বর্ণ-উৎপাদন হয় কম, কিন্তু এই উৎপাদন-পরিমাণ দ্বারা ভারতের নিজস্ব চাহিদা মোটামুটি মিটিয়া যায়। স্বর্ণ-উৎপাদনের জন্য মহীশূরের কোলার খনি বিখ্যাত। ইহা ছাড়া, হায়দ্রাবাদ ও মাদ্রাজে কিছু পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায়।

(চ) পেট্রোল—বর্তমান যুগে শক্তির উৎস হিসাবে পেট্রোলের গুরুত্ব অত্যধিক। ভারতে খুব কম পরিমাণ পেট্রোলই পাওয়া যায়। একমাত্র আসামের ডিগবয়

অঞ্চলে পেট্রোলের খনি আছে। চাহিদার তুলনায় ভারতে পেট্রোলের পরিমাণ এত কম যে, প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বহু পরিমাণে পেট্রোল আমদানী করিতে হয়।

(ছ) ক্রোমাইট, বক্সাইট, জিপসাম, তামা, দস্তা, সীসা, টিন, গন্ধক, লবণ প্রভৃতিও পাওয়া যায়। বিহার, মহীশূর, অন্ধ্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রোমাইট পাওয়া যায়। ইহার বেশীর ভাগ বিদেশে রপ্তানী হয়। বক্সাইট দ্বারা অ্যালুমিনিয়ম প্রস্তুত হয়। বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা পাওয়া যায়। রাসায়নিক সার, সিমেন্ট প্রভৃতি তৈয়ারীর কাজে জিপসাম ব্যবহৃত হয়। রাজস্থান অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ইহা পাওয়া যায়। পাঞ্জাবে বহু লবণখনি আছে। সিংভূম অঞ্চলে তামা এবং জয়পুর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে সীসা ও দস্তা পাওয়া যায়। টিন ও গন্ধকের পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য।

৪। **বনসম্পদ**—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতে ভূ-ভাগের প্রায় ১৫ ভাগ বনভূমি-সমাচ্ছন্ন। বনভূমি সাধারণতঃ ১। বিশেষভাবে সংরক্ষিত (Reserved), ২। সাধারণভাবে সংরক্ষিত (Protected) ও ৩। সাধারণ (Unclassified), এই তিনভাগে বিভক্ত। বন হইতে নানাপ্রকার মূল্যবান কাঠ, জ্বালানি কাঠ, কাগজ প্রস্তুতের মালমশলা, মানুষের খাবার জন্য নানাজাতীয় ফলমূল, পশুর খাদ্য, গোচারণ ভূমি, মধু, আঠা, রেজিন, টারপিন তৈল প্রভৃতি পাওয়া যায়। রাজ্য সরকারগুলি বনবিভাগ হইতে রাজস্ব পায় এবং বন বিভাগ হইতে বাৎসরিক প্রায় ৩০ কোটি টাকা আয় হয়। বন সম্প্রসারণ ও উন্নতির উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। ১। ৩৮ লক্ষ একর ক্ষয়িষ্ণু বনভূমিকে পুনর্জীবিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ২। খালের তীরে, পথিপার্শ্বে ও গ্রামের পতিত জমিতে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৩। ৫০,০০০ একর জমিতে শাল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বৃক্ষ রোপণ, ১৩,০০০ একর জমিতে কঞ্চি ও আঠাগাছ রোপণ, ৩৫০,০০০ একর জমিতে দেশলাই নির্মাণের উপযোগী কাঠের ও ২০,০০০ একর জমিতে ভেষজ উদ্ভিদ রোপণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। দেরাদুনে অবস্থিত বন গবেষণাগারেরও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে বৃক্ষ-রোপণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সাল হইতে সরকারী অনুপ্রেরণায় প্রতিবৎসর জুলাই মাসে বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ লক্ষ একর জমিতে বনসম্প্রসারণের সুপারিশ করা হইয়াছিল।

দেশের বনসম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ

করা হইয়াছে। ১। গ্রামাঞ্চলে জ্বালানি কাঠের অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে ২০ লক্ষ একর জমিতে দ্রুত বন সৃষ্টি করা, ২। ৫০,০০০ হাজার একর জমিতে শাল ও এই জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করা, ৩। ১০ লক্ষ একর জমিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বনের পুনরুদ্ধার করা, ৪। ১৫,০০০ হাজার মাইলের উপর অরণ্যপথ নির্মাণ করা ও ৫। নিকৃষ্ট কাঠ উৎকৃষ্ট কাঠে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে ৬টি বৃক্ষসংরক্ষণ ও উন্নয়ন কারখানা স্থাপন করা।

৫। **শক্তিসম্পদ**—ভারতে তিনটি উৎস হইতে শক্তি পাওয়া যায়, যথা—কয়লা, পেট্রোল ও জলবিদ্যুৎ। পেট্রোলের অভাবহেতু এতদিন পর্যন্ত কয়লা পোড়াইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইত। বর্তমানে যন্ত্রের সাহায্যে কিছু পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হইতেছে। ১৯৫৬ সালে ভারতে তাপ-বিদ্যুৎ (Thermal-electricity) ও জলবিদ্যুৎ (Hydro-electricity) এই উভয় জাতীয় বিদ্যুৎ-উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৭ লক্ষ কিলোওয়াট্ এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬১ সালে এই বিদ্যুৎ পরিমাণ ৬১ লক্ষ কিলোওয়াট্ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। বর্তমানে ভারতে বহু জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কেন্দ্র হইল—পশ্চিমবঙ্গের দামোদর উপত্যকা কেন্দ্র (৪,২৫,০০০ কিলোওয়াট্), উড়িষ্যার হীরাকুঁদ কেন্দ্র (২ লক্ষ কিলোওয়াট্), পূর্ব-পাঞ্জাবের ভাক্‌রা নাংগাল কেন্দ্র (৪ লক্ষ কিলোওয়াট্), মাদ্রাজের তুঙ্গভদ্রা কেন্দ্র (৩৫,০০০ কিলোওয়াট্)। তৃতীয় পরিকল্পনায় জলশক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে ৭৭ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোওয়াট্-এ।

৬। **প্রাণিসম্পদ**—ভারতের বেশীর ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনে প্রাণিসম্পদ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। প্রাণিসম্পদে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সমগ্র পৃথিবীর প্রাণিসম্পদের সংখ্যা ছিল ৭১৮ মিলিয়ন। ইহার মধ্যে একা ভারতেই ছিল ১৬০ মিলিয়ন। ভারতে গৃহপালিত পশুর মধ্যে গাভী ও বলদ, (১৫৯ হাজার), মহিষ (৪৪.৮ হাজার), ছাগল ও ভেড়া (১১২ হাজার), অশ্ব ও অশ্বতর (১.৫ হাজার), হাঁস-মুরগী প্রভৃতি (৯৭.৪ হাজার) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, গাধা, খচ্চর, উষ্ট্র, শূকর, হস্তী প্রভৃতিও আছে। এই প্রাণিসম্পদ হইতে ভারতের বাৎসরিক প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা আয় হয়।

কিন্তু ভারতের এই বিশাল প্রাণিসম্পদের প্রায় দশভাগ অকেজো। অন্যান্য

দেশের তুলনায় ভারতের গো-মহিষাদির যে পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায় তাহা নিতান্ত কম। যান্ত্রিক চাষব্যবস্থা ও ষ্টীম ও পেট্রোল পরিচালিত দ্রুত যানবাহন প্রবর্তনের ফলে ভারতে গৃহপালিত প্রাণীর উপযোগ হ্রাস পাইতেছে, অথচ ইহাদের পালন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে। ফলে, মানুষের ন্যায় ভারতের প্রাণিসম্পদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাইতেছে।

ভারতের জনবল ও ইহার বৈশিষ্ট্য—Manpower in India and its features

ভারত জনবলেও ঐশ্বর্যশালী। জনসংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে চীনদেশের পরেই ভারত জগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। ১৯৫১ সালের লোকগণনায় ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৫'৫৮ কোটি। ১৯৬১ সালের লোকগণনায় ভারতের জনসংখ্যা হইল ৪৩,৯০,৭২,৮৯৩। ১৮৭১ সালে ভারতে প্রথম লোক গণনা হয়। তখন জনসংখ্যা ছিল কুড়ি কোটির কিছু বেশী। ১৯২১ সাল হইতে ভারতের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসংখ্যা নির্ভর করে জন্মহার, মৃত্যুহার, বিদেশে গমন (Emigration) এবং বিদেশ হইতে আগমন (Immigration)-এর উপর। ১৯৬১-'৫১ এই দশ বৎসরে ভারতে ১৩'২ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে জন্মহার বেশী হওয়ার মূলে রহিয়াছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ। পিতামাতা কন্যার ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতির উদ্দেশ্যে ও অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক চাপে অল্পবয়সে তাহাদের বিবাহ দিয়া থাকেন। অপরপক্ষে জীবনযাত্রার মান অন্যান্য দেশের তুলনায় নীচু হওয়ার ফলে পুত্রসন্তান অযোগ্য হইলেও অল্পবয়সে তাহাদের বিবাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে মৃত্যুর হারও বেশী। প্রতি হাজারে বৎসরে ১৪ জন লোক মরে। মৃত্যুর হার কম হইলে ভারতের জনসংখ্যা গত ১০।১৫ বৎসরে আরও বৃদ্ধি পাইত। ভারতে যত লোক মরে তাহার মধ্যে শিশু ও যুবতী নারীর সংখ্যাই অধিক। বাল্যবিবাহ, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবই হইল মৃত্যুর কারণ। ভারতের এই জনসংখ্যার মধ্যে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী। বর্তমানে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৯৪৭ জন নারী আছেন। হাজারে ৫৩ জন নারী কম আছেন। আবার, বিভিন্ন বয়সের লোকসংখ্যা তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শতকরা ৩৮'৩—শিশু ও বালক-বালিকা, ৩৩'০—যুবক-যুবতী, ২০'৪—মধ্যবয়স্ক, ৮'৩—অধিক বয়স্ক।

আমাদের দেশের লোক খুব কমই দীর্ঘজীবী হয়। শতকরা মাত্র একজন লোক ৭৩ বৎসরের উপরে বাঁচিয়া থাকে। ৫৫ বৎসর পর্যন্ত ভারতের লোক কর্মক্ষম থাকে বলিয়া সম্বকারী হিসাবে ধরিয়া লওয়া হয়। সুতরাং সমগ্র জনসংখ্যার ৩৩'০ + ২০'৪ = ৫৩'৪ জন লোককে প্রকৃত কর্মক্ষম বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ভারতে অভিজাত সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকগণ ও পর্দা-প্রথায় অভ্যস্ত স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ কোনও কাজ করেন না।

জনসংখ্যার ঘনত্ব—Density of Population

জনসংখ্যার ঘনত্ব বলিতে বুঝা যায় যে, প্রতি বর্গমাইলে কত লোক বাস করে। ভারতের জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৩১২। ১৯৬১ সালের লোকগণনার ভিত্তিতে সিকিম এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতীয় অংশ ধরিয়া ভারতের জনসংখ্যার ঘনত্ব হইল ৩৭০। পৃথিবীর বড় বড় যে কোন দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব অপেক্ষা ভারতে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় দ্বিগুণ। চীনে জনসংখ্যার ঘনত্ব হইল ১২৩, মার্কিন দেশে ৪১, রাশিয়ায় ২৩ ও কানাডায় মাত্র ৩। ভারতে এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে প্রতি বর্গমাইলে একহাজার লোক বাস করে।

কিন্তু ভারতের সর্বত্র এই ঘনত্ব সমান নহে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ২০ জন লোক বাস করে, আর দিল্লীতে বাস করে ৪,৬৪০, পশ্চিমবঙ্গে ১,০৩২। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ২৪ কোটিরও কিছু বেশী বিহার, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গে বাস করে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, দেশের জলবায়ু ও আবহাওয়ার উপর জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ বলিয়া উপরি-উক্ত ছয়টি রাজ্যে বেশী লোক বাস করে। দ্বিতীয়তঃ, জমির উর্বরতা ও বৃষ্টিপাত বা কৃত্রিম উপায়ে সেচব্যবস্থা থাকিলে অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনায় সে স্থলে বহু লোক বাস করে। সিন্ধু ও গঙ্গানদীর সমতল ভূমিতে এই কারণে বহুলোক বাস করে। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত অঞ্চলে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য দেখা যায়, সেখানেও বসতির ঘনত্ব অধিক হয়। চতুর্থতঃ, যে সমস্ত স্থলে শিল্প-ব্যবসায় প্রসার লাভ করে সে সমস্ত স্থলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। এই কারণে কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যধিক। পঞ্চমতঃ, যেখানে সু-শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত এবং জীবন ও ধনের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে, সে সমস্ত স্থলেও অধিক লোক বাস করে।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শিক্ষা ব্যবস্থার ও যোগাযোগ ও পরিবহনের অসুবিধা থাকিলে সে সমস্ত অঞ্চলে লোক বাস করিতে চায় না।

জীবিকা অর্জনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, ভারতের এই বিশাল জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ জন কৃষিজীবী, আর মাত্র ১১ জন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া জীবিকা অর্জন করে। ভারতের তুলনায় ইংলণ্ডে ৬৮ জন শিল্প হইতে জীবিকা অর্জন করে ও মাত্র ৮ জন কৃষিজীবী। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির এই প্রাধান্যের জন্যই ভারতে শতকরা ৮৩ জন গ্রামে বাস করে, আর ইংলণ্ডে শতকরা ২০ জন মাত্র গ্রামবাসী।

জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিবার অন্যান্য উপাদান—Other Factors Determining National Income

জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিবার অন্যান্য উপাদানগুলিও ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায় না। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য বাস্তব পুঁজির পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য। কৃষিকার্য সাধারণতঃ পুরাতন পদ্ধতিতে লাঙ্গল ও বলদ দ্বারা পরিচালিত হয়। ট্রাক্টরের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ দুই-এক স্থলে সবেমাত্র সুরু হইয়াছে। শিল্পের ক্ষেত্রেও এখনও পূর্ণ শিল্পায়ন হয় নাই। ভারতে বর্তমানে যে সমস্ত বড বড শিল্পপ্রতিষ্ঠান উৎপাদন-কাযে রত আছে, যথা, পাটকল, বস্ত্রশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প প্রভৃতি, তাহাদের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য নানাবিধ সরঞ্জাম বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। এগুলি মেরামত করিতে হইলেও অনেক সময় বিদেশের সাহায্য লইতে হয়।

যন্ত্রপাতি, কলকারখানা বাড়াইতে গেলে যে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়, ভারতে তাহারও বিশেষ অভাব দেখা যায়। এতদিন পর্যন্ত ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী ছিল। এজন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা সম্পর্কে তাহাদের আদৌ কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বর্তমানে দেশে নানাজাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার ফলে ও কারিগরি বিদ্যালয়-স্থাপনের ফলে এই জ্ঞান ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে প্রসারলাভ করিতেছে।

ভারতের জাতিভেদ, যৌথপরিবার প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থা এতদিন পর্যন্ত এদেশের জনসাধারণকে রক্ষণশীল-প্রকৃতির করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতের বাহিরে যে একটি বৃহত্তর জগৎ আছে, সে সম্পর্কে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ ছিল। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসারের ফলে ক্রমশঃ ভারতের লোক

কুসংস্কার-মুক্ত হইয়া বর্তমানে জগতের বিভিন্ন দেশের নানাজাতীয় প্রগতিমূলক কার্যসম্পর্কে অবহিত হইতে শিখিয়াছে। আশা করা যায় যে, ব্যাপকভাবে শিক্ষার সম্প্রসারণ হইলে ভারতবাসীও অন্য দেশের যাহা কিছু ভাল জাতীয় উন্নতির জন্য তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবে না।

ভারতের আর্থিক কাঠামোও এতদিন পর্যন্ত অনেকটা সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় পরিচালিত হইত। মুষ্টিমেয় জমিদার ও অন্যান্য ভূম্যধিকারী ছিল জমির মালিক। শিল্পের ক্ষেত্রেও কয়েকজন পুঁজিপতি মালিক দ্বারা প্রায় সমগ্র শিল্পব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইত। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর দেশের জাতীয় সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়া দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে (Socialistic Pattern of Society) সমাজ পুনর্গঠন করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। এ সম্পর্কে পর পর তিনটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে গঠনমূলক কার্যও কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

জাতীয় আয়-নির্ধারক বিষয়সমূহ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান উপায় হইল জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা। নিম্নলিখিত উপাদানগুলির উপর জাতীয় আয়বৃদ্ধি নির্ভর করে :—

১। প্রাকৃতিক সম্পদ—উর্বর ভূমি, নদনদী, অরণ্য, লৌহ, কয়লা, অভ্র, পেট্রোল প্রভৃতি খনিজ পদার্থ, দেশের জলবায়ু প্রভৃতি ও নানাজাতীয় শক্তি, যথা, বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক ইত্যাদি।

২। জনবল—উপযুক্ত সংখ্যক কর্মক্ষম ও কর্মেচ্ছুক লোক।

৩। লোকের কর্মস্পৃহা ও কর্মক্ষমতা।

৪। নানাজাতীয় মূলধন—ছোট-বড যন্ত্রপাতি, কলকারখানা ইত্যাদি।

৫। কারিগরি শিক্ষা।

৬। প্রগতিশীল মনোবৃত্তি—যাহা কিছু ভাল তাহা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিবার ইচ্ছা।

৭। সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থা—এই ব্যবস্থাগুলি এরূপ হওয়া চাই যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজে পরিশ্রম করিতে শিক্ষা লাভ করে এবং নিজে তাহার শিক্ষা ও দক্ষতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়। দেশে সঞ্চয়-বৃদ্ধির সুযোগও থাকা চাই। দেশের কৃষি ও শিল্প-ব্যবস্থায় যাহাতে কাহারও

একচেটিয়া অধিকার না থাকে, সেজন্য বিশেষ আইন থাকা প্রয়োজন। দেশের সরকারও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎপাদন-বৃদ্ধি ও ন্যায্য বণ্টন-ব্যবস্থার প্রবর্তনে সাহায্য করিতে পারে।

৮। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ।

উৎপাদনের উপাদান

ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা—এই চারটি হইল উৎপাদনের উপাদান। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার ফলে অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা ব্যবস্থাপনা উপাদানটির গুরুত্ব বাড়িয়াছে।

ভারতের জাতীয় আয়-নির্ধারক উপাদানসমূহ

প্রাকৃতিক সম্পদে ভারত বিশেষ সমৃদ্ধ। ভারত বিস্তৃত দেশ। ইহার মাটিতে ধান, গম, বাজরা, ইক্ষু, পাট, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতি নানাজাতীয় খাদ্যশস্য ও পণ্যশস্য জন্মে। শিল্পোন্নতির জন্য কয়লা, লৌহ, অভ্র, পেট্রোল, তামা, সীসা প্রভৃতি নানাজাতীয় খনিজ সম্পদ এখানে পাওয়া যায়। ভারত অরণ্য-সম্পদেও সমৃদ্ধ। শক্তির উৎস পেট্রোল-উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম হইলেও ভারতে তাপ-বিদ্যুৎ ও বিশেষ করিয়া জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে। ভারতের জনসংখ্যাও ইহার জাতীয় আয়বৃদ্ধির সহায়ক। যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা ও কারিগরি শিক্ষার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু বর্তমান জাতীয় সরকারের প্রচেষ্টায় অন্তরায়গুলি ক্রমশঃ দূর হইতেছে।

প্রশ্ন ও উত্তর

1 Describe the broad factors which determine the national income of a country.

একটি দেশের জাতীয় আয়-নির্ধারক সাধারণ উপাদানগুলি বর্ণনা কর।

উঃ—জাতীয় আয় পরিমাণের উপর দেশের লোকের সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের প্রথম ও প্রধান উপায় হইল জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা। জাতীয় আয় পরিমাণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :—

১। প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ উর্বর জমি, অরণ্য, নিত্যবহ নদ-নদী, লৌহ, কয়লা, অভ্র, পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি খনিজ সম্পদ, ও অনুকূল জলবায়ু।

২। জনবল অর্থাৎ যেখানে কর্মক্ষম লোকের অভাব নাই, সেখানে কর্মক্ষম জনগণ প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে তাহাদের পরিশ্রম ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া অভাব মোচনের সামগ্রী করিয়া লয়।

৩। নানা জাতীয় মূলধন—যে দেশে ছোট বড় যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীগুলির ব্যবহার হয়, দেশে জাতীয় আয় পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৪। যান্ত্রিক দক্ষতা—যন্ত্রপাতি ও কল-কারখানার ব্যাপক ব্যবহার জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সুতরাং যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার ও পরিচালনা করিবার জন্য যে বিশেষ ধরণের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়, তাহাও জাতীয় আয় বৃদ্ধির অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়।

৫। প্রগতিশীল মনোবৃত্তি—অধুনা আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি করা যায়। সুতরাং যাহা কিছু ভাল তাহাই গ্রহণ করিব—যাহা কিছু মন্দ তাহা পরিত্যাগ করিব, সে নূতনই হউক আর পুরাতনই হউক, এইরূপ প্রগতিশীল মনোবৃত্তির উপরও জাতীয় আয় পরিমাণ নির্ভর করে।

৬। সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থা—দেশে যদি জাতিভেদ, যৌথ পরিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রচলিত থাকে তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যবস্থা বাধা পাইয়া জাতীয় আয় হ্রাস পায়। অর্থনৈতিক জীবনে সকলে সমান সুযোগ-সুবিধা পাইলে জাতীয় আয় পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দেশে যদি যথেষ্ট পরিমাণ ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি সঞ্চয়ের সহায়ক প্রতিষ্ঠান থাকে তাহা হইলে সঞ্চয় পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মূলধন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে। দেশের সরকার নানাভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারে এবং আইন দ্বারা জনস্বার্থ বিরোধী উৎপাদন রহিত করিতে পারে। অনুন্নত দেশে সরকারী সাহায্য ব্যতীত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে না। ভারত সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাহায্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

2. What are the factors that determine the density of population in India ?

ভারতে জনসংখ্যার ঘনত্ব কিসের উপর নির্ভর করে ?

উঃ—প্রতি বর্গমাইলে যত লোক বাস করে তাহাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলা হয়। বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বিভিন্ন। ইংলণ্ডে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৬০০, চীনে ১২৩ ও আবার আমাদের ভারতে জনসংখ্যার ঘনত্ব হইল ৩১২। একটি দেশেও আবার জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বত্র সমান নহে। ভারতেও সব রাজ্যে জনসংখ্যার ঘনত্ব সমান নহে। দিল্লীতে প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৩০১৭ জন লোক বাস করে আর আন্দামানে মাত্র ২০ জন লোক বাস করে। পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার ঘনত্ব হইল ১,০৩২।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং এদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব কৃষিকার্যের অনুকূল উপাদানের উপর নির্ভর করে। জমির সমতলতা, উর্বরতা, সেচ, বৃষ্টিপাত, অনুকূল আবহাওয়া প্রভৃতি জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ধারণ করে। উপরি উক্ত কারণে পশ্চিম বাংলায় প্রতি বর্গমাইলে অধিক লোক বাস করে। আসামে জনসংখ্যার ঘনত্ব হইল ১৮৫। ইহার কারণ হইল যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইলেও

আসামের আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর এবং এখানে সমতলভূমি অপেক্ষা পাহাড় ও জংগল বেশী। যেখানে শিল্পের প্রসার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়, সেখানে বেশী লোক বাস করে। শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর, ভিলাই প্রভৃতি স্থান অল্প সময়ের মধ্যে ঘন বসতিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

3. What are the principal factors of production ?

উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি কি ?

উঃ—প্রকৃতি (Nature) ও মানুষ (Man)-এই দুইটি হইল উৎপাদনের প্রধান উপাদান। প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীগুলির উপর মানুষ তাহার পরিশ্রম ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া তাহার প্রয়োজন-মত দ্রব্যাদি উৎপাদন করিয়া তাহার অসংখ্য অভাব মোচন করে। সাধারণতঃ, ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা এই চারিটিকে বর্তমানে উৎপাদনের উপাদান বলা হয়। শ্রম ও ব্যবস্থাপনা হইল মানবীয় উপাদান, (Human factors) আর ভূমি হইল প্রকৃতিদত্ত উপাদান। মূলধন মনুষ্য-সৃষ্ট উৎপাদনের উপাদান হইলেও মূলধনের মূল উপাদান প্রকৃতি হইতে সংগৃহীত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

জনসংখ্যা

(Population)

জাতীয় আয় উৎপাদনে জনসংখ্যার গুরুত্ব পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। একটি দেশে উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হয়, তাহা সেই দেশের শ্রমিকের সংখ্যা ও শ্রমিকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেই যে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ, শিশু, বৃদ্ধ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মহিলারা কাজ করেন না। ইহা ছাড়াও উন্মাদ, ভবঘুরে, সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির প্রভৃতি শ্রেণীর নিষ্কর্মা পরজীবী শ্রেণীর লোকও প্রত্যেক দেশে অল্পবিস্তর পরিমাণে দেখা যায়। সুতরাং শ্রমিকের সরবরাহ শুধু জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না। শ্রমিকের কাজ করিবার ইচ্ছা ও কাজ করিবার দক্ষতা থাকা চাই।

জনসংখ্যা ও খাদ্য-সরবরাহ—Population and Food supply

দেশে লোক বেশী হইলে একদিকে যেরূপ জাতীয় আয়বৃদ্ধির একটি প্রধান উপাদান বাড়ে, অন্যদিকে সেইরূপ খাদ্যদ্রব্যের অভাব ঘটিতে পারে। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না হইয়া শুধু যদি জনসংখ্যা বাড়িতে থাকে তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির আশঙ্কা থাকে। সুতরাং জনসংখ্যা ও খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত।

ম্যালথাসের সংখ্যাতত্ত্ব—Malthusian Theory of Population

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ম্যালথাস্ নামক জনৈক ইংরাজ ধনবিজ্ঞানী খাদ্যদ্রব্যের সহিত জনসংখ্যার সম্পর্ক বিষয়ে একটি মতবাদ প্রচার করেন। ম্যালথাসের মতে মানুষের প্রজনন-শক্তি অত্যধিক, তাই জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা যেরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়, খাদ্যদ্রব্য সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির এই দ্রুতগতিতে গুরুত্ব আরোপ করিবার জন্য ম্যালথাস্ বলেন যে, জনসংখ্যা জ্যামিতিক অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬ হারে বাড়ে আর খাদ্যদ্রব্য বাড়ে পাটিগণিতিক অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৬, ৮ হারে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য-বৃদ্ধির

অনুপাতে জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি দেখা দেয়। কারণ দেশে যে খাদ্য উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা জনসংখ্যার ভরণপোষণ সম্ভব হয় না। এই অবস্থাকে ম্যালথাস্ অতিরিক্ত জনসংখ্যার অবস্থা (Over-population) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একটি দেশের ভরণপোষণের সাধ্যাতীত জনসংখ্যা হইলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটিয়া জনসংখ্যা হ্রাস পায়। কিন্তু অতি-প্রাকৃত কারণে জনসংখ্যা হ্রাস পাইলেও জনসংখ্যার সহিত খাদ্যদ্রব্যের সমতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ মানুষের সহজাত যৌনপ্রবৃত্তির ফলে যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারা বংশবৃদ্ধি করে এবং পুনরায় অতি-প্রাকৃত কারণে জনসংখ্যা হ্রাস পায় ও পুনঃপুনঃ এই হ্রাসবৃদ্ধি চলিতে থাকে।

এই অনিশ্চিত ও সঙ্কটজনক অবস্থা যাহাতে না ঘটে সে জন্য ম্যালথাস্ মানুষকে স্বেচ্ছায় বংশবৃদ্ধি না করিয়া সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ম্যালথাসের মতে বিবাহ না করিয়া, অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া বা জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা সংখ্যাবৃদ্ধি বন্ধ রাখা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। উপরি-উক্ত কৃত্রিম নিরোধ-ব্যবস্থা (Preventive checks) অবলম্বন না করিলে প্রাকৃতিক নিরোধ-ব্যবস্থা (Positive checks) অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী।

ম্যালথাস্ যে তথ্যগুলির ভিত্তিতে তাঁহার সংখ্যাতত্ত্ব-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ তাহার সমালোচনা করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তগুলির ত্রুটি দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ, বলা হয় যে, ম্যালথাস তাঁহার দেশের সমসাময়িক অবস্থাকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার নিজ দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, একটিমাত্র দেশের অবস্থা দেখিয়া এরূপ একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের যৌনপ্রবৃত্তির ফলে সংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক হইলেও সভ্যতাবৃদ্ধির সংগে সংগে এই ইচ্ছা কমিয়া যায়। আর্থিক স্বচ্ছলতার ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে, এই উন্নত মান বজায় রাখিবার জন্য লোক সাধারণতঃ অল্পসংখ্যক পুত্র-কন্যার পিতা হইতে চায়। তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্ত্য অনেক দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন হওয়ায় জন্মহার হ্রাস পাইয়া সংখ্যাধিক্য-সমস্যা সংখ্যাল্পতা-সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাসের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে উৎপাদনের পরিমাণও অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতে কি ম্যালথাসের সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য (ভারত কি জনাকীর্ণ)—
—Is Malthusian Theory applicable to India ? (Is India over-populated ?)

১৯৫১ সালের আদমসুমারী (Census) অনুসারে ভারতের লোকসংখ্যা হইল ৩৫·৬৮ কোটি। ১৯২১ সাল হইতে ভারতের জনসংখ্যা অতিক্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে, উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ভারতবাসীর ভরণপোষণ সম্ভব নয়। ভারতে যে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা দেশবাসীর পক্ষে আদৌ যথেষ্ট নহে। দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব সব সময়েই দেখা যায়। ম্যালথাস্-প্রদত্ত সংখ্যাধিক্যের আরও দুইটি লক্ষণ ভারতে দেখা যায়। এদেশে জন্ম ও মৃত্যু উভয়ের হারই বেশী। ভারতে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক ব্যতীত অন্য কেহ স্বেচ্ছায় জন্মনিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত নহে। এই কারণে ভারতে জন্মের হার ও মৃত্যুর হার বেশী এবং ইহা হইতে অনুমান করা স্বাভাবিক যে, খাদ্যদ্রব্যের তুলনায় ভারতে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই বৃদ্ধির ফলে রোগ, খাদ্যাভাব প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে বহুলোকের অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। সুতরাং ভারতবাসীর অস্বাভাবিক দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হইল সংখ্যাধিক্য।

বর্তমান ভারতের বহু মনীষী উপরি-উক্ত মত গ্রহণ করেন না। ভারতে জন্ম ও মৃত্যু উভয় হারই পাশ্চাত্ত্য দেশ অপেক্ষা বেশী হইলেও মৃত্যুহার বেশী হওয়ার জন্য জনসংখ্যা জন্মহারের অনুপাতে কম বাড়িয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। ভারতের এই অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের যদি যথাযথ সদ্ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধিদ্বারা জনসংখ্যার ভরণপোষণ সম্ভব হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেই আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। জনসংখ্যাকে কর্মদক্ষ করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে পারিলেই সংখ্যা-সমস্যার একমাত্র সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে।

জনসংখ্যা ও জাতীয় আয়—Population and National Income

আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুধুমাত্র খাদ্যদ্রব্য-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না—দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন উৎস হইতে উৎপাদন-পরিমাণের উপর নির্ভর করে। দেশের সম্পদ যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। প্রত্যেক

নবজাত শিশু শুধু খাদ্যের চাহিদা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে না, সঙ্গে সঙ্গে সে দুখানি হাত লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়া দেশের সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে অধিক উৎপাদন দ্বারা অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভরণপোষণ চলিতে পারে। একটি দেশে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন যদি বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে সে দেশ এরূপ অবস্থায় অন্য দেশ হইতে শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ের দ্বারা খাদ্য আমদানী করিয়া খাদ্যসমস্যার সমাধান করিতে পারে। ইংলণ্ডে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন-পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও ইংলণ্ড শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া তাহার জীবনযাত্রার মান উন্নত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র জাতীয় আয়-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে গডপডতা মাথাপিছু আযও বেশী হইবে। কিন্তু যে জনসংখ্যা হইলে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী হয়, জনসংখ্যা যদি তাহার চেয়েও বেশী হয় তাহা হইলে অবশ্য সম্পদ-পবিমাণ কম হইবে এবং মাথাপিছু আয়ও কমিবে। এইরূপ অবস্থাকে অতিরিক্ত জনসংখ্যার অবস্থা (Over-population) বলা হয় এবং এই অবস্থায় প্রতিকাব হইল জনসংখ্যা হ্রাস করা। আবার, যে জনসংখ্যা হইলে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী হয়, জনসংখ্যা যদি তার চেয়ে কম হয় তাহা হইলেও সম্পদ-পরিমাণ কমিবে ও মাথাপিছু আয়ও কমিবে। এই অবস্থাকে সংখ্যাল্পতাব অবস্থা (Under-population) বলা হয় এবং ইহার প্রতিকার হইল সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সুতবাং দেখা যায় যে, একটি দেশ অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে অথবা সংখ্যাল্পতাব জন্য দবিদ্র হইতে পাবে। উৎপাদন-দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিযা একটি দেশে যে জনসংখ্যা হইলে সম্পদ-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী হয, সেই সংখ্যাকে আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ **কাম্য জনসংখ্যা** (Optimum Number) বলেন। দেশের জনসংখ্যা যদি এই কাম্য সংখ্যা অপেক্ষা বেশী বা কম হয়, তাহা হইলে মাথাপিছু আয় কমিয়া যাইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কাম্য জনসংখ্যা একটি স্থির বা নির্দিষ্ট জনসংখ্যা নহে। এই সংখ্যা দেশে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন পরিমাণের উপব নির্ভব কবে না। লোকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইযা উৎপাদন-পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সংখ্যা বৃদ্ধি অনেক সময় উন্নতির সহায়ক হয়। সুতরাং সংখ্যাবৃদ্ধি হইলেই চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই।

শ্রমিক সরবরাহ—Labour Supply

শ্রম উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদান। উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বহুল পরিমাণে শ্রমিকের সংখ্যা ও শ্রমিকের কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে শ্রমিকের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। জনসংখ্যা আবার জন্মহার, মৃত্যুহার, বিদেশ হইতে আগমন ও বিদেশে গমন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এখন দেখা যাউক, কিসের উপর শ্রমিকের কর্মদক্ষতা নির্ভর করে।

শ্রমিকের দক্ষতা—Efficiency of Labour

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা আংশিকভাবে তাহার নিজের উপর নির্ভর করে এবং আংশিকভাবে তাহার মালিকের অর্থাৎ ব্যবস্থাপকের উপর নির্ভর করে।

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা দেশের ভৌগোলিক অবস্থিতি, জলবায়ু প্রভৃতির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। জাতিগত বৈশিষ্ট্যই শ্রমিকের দক্ষতার পরিচায়ক। দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য, শীতাতপ নিবারণের জন্য যথাযোগ্য পরিধেয় ও আলো-হাওযাযুক্ত বাসগৃহ দৈহিক ও মানসিক উন্নতির সহায়ক। তৃতীয়তঃ, দক্ষতা বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে। শিক্ষার দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক্ বিকাশ লাভ করে। সাধাবণ শিক্ষা ব্যতীতও শ্রমিকের কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনও আছে। চতুর্থতঃ, শ্রমিকের দক্ষতা তাহার সততা ও কর্তব্যবোধের উপব নিভর করে। কর্তব্যনিষ্ঠা ও একাগ্রচিত্ততা হইল শ্রমিকের প্রধান গুণ। পঞ্চমতঃ, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা, স্বাধীনভাবে কাজ কবিবাব ক্ষমতা এবং কাজের একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য ভ্রমণ ও বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদেব ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রযোজন। (ষষ্ঠতঃ, শ্রমিকের কাজের নির্ধারিত সময় উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও সময়মত পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা থাকিলে, তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদের কর্তব্য পালন করিতে ইচ্ছুক হয়।) শ্রমিকের কর্মস্থলের পরিবেশও সুরুচিকর হওযা চাই। ইহা ছাড়া মালিক ভাল যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের অন্যান্য সহায়ক সামগ্রীর যোগান দ্বারা শ্রমিকের কর্মদক্ষতা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারেন। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শ্রমিকের দক্ষতা তাহার কাজ করিবার ইচ্ছা (Will to Work) এবং কাজ করিবার ক্ষমতার (Power to Work) উপর নির্ভর করে।

ভারতের শ্রমিকের কর্মদক্ষতা—Efficiency of Indian Labour

ভারতের শ্রমিক অন্যান্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় কম দক্ষ হইলেও স্বভাবতঃই

তাহাদের কম-কর্মদক্ষ বলা উচিত নহে। যে সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশে তাহারা বাস করে, সেই পরিবেশই তাহাদের দক্ষতার অভাবের জন্য বেশী দায়ী। খাদ্য, বস্ত্র ও উপযুক্ত বাসগৃহের অভাব হেতু তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল নহে। সুতরাং দারিদ্র্য হইল তাহাদের দক্ষতার প্রধান অন্তরায়। ইহা ছাড়া জাতিভেদ-প্রথা, পারিবারিক বন্ধন প্রভৃতিও তাহাদের গতিশীলতা রুদ্ধ করিয়াছে। তাহারা তাহাদের প্রকৃতিগত ও রুচিগত কার্যে যোগদান করিবার সুযোগ খুব কমই পায়। সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ করিয়া কারিগরি শিক্ষার অভাবই তাহাদের দক্ষতার অভাবের প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে। কাজের স্থায়িত্ব, মালিকের সহানুভূতি, উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিকের অভাব ও অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাহাদের শরীর ও মন পুষ্ট হইতে পারে না। এই সমস্ত কারণে ভারতের শ্রমিকের কর্মদক্ষতা কম ও তাহাদের উৎপাদন-পরিমাণও কম। ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার দ্বারা উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিলে ভারতের শ্রমিকও উন্নত দেশসমূহের শ্রমিকের সমান দক্ষ হইতে পারিবে।

বেকার সমস্যা—Unemployment Problem.

কাজের অভাব হেতুই দেশে বেকার সমস্যা দেখা যায়। অনেকে ইচ্ছা করিয়া কাজ করে না অনেকে আবার চেষ্টা করিয়াও কাজ যোগাড় করিতে পারে না, কাজেই বাধ্য হইয়া বেকার থাকে। শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা হেতু অনেকে বেকার থাকিতে বাধ্য হয়, আবার শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অনেকে শ্রমবিমুখ হয়। ইহা ছাড়া প্রত্যেক দেশেই কিছুসংখ্যক শিশু, বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তি থাকে। ইহারা কাজের অযোগ্য। কিন্তু ভিক্ষুক, সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির প্রভৃতি একদল লোক থাকে যাহারা সুস্থকায় ও কর্মক্ষম, কিন্তু তাহারা কোন কাজ করে না। বেকার বলিতে সাধারণতঃ সেই সমস্ত লোককে বুঝায়, যাহারা কাজ করিতে ইচ্ছুক কিন্তু প্রচলিত মজুরির হারে কাজ জোগাড় করিতে পারে না।

বেকার সমস্যার প্রকারভেদ—Types of Unemployment

বেকার সমস্যা নানাভাবে দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন কারণে এই বিভিন্ন ধরণের বেকার সমস্যার উদ্ভব হয়।

১। ঋতুগত বেকার সমস্যা—Seasonal unemployment

কোন কোন কাজে সংবৎসরব্যাপী কাজের পরিমাণ সমান থাকে না। হয়ত কখনও কাজ বেশী হয়, আবার কখনও কম হয়। ফলে কাজের অভাবে শ্রমিকগণ

ঐ সময়ে বাধ্য হইয়া বেকার থাকে। কৃষি ও গৃহ নির্মাণক্ষেত্রে এই ঋতুগত বেকার সমস্যা দেখা যায়।

২। সাময়িক বেকার সমস্যা—Casual unemployment

কোন শিল্প ব্যবসায়ে মন্দা উপস্থিত হইলে সাময়িক বেকার সমস্যা দেখা যায়। বহির্বাণিজ্যের প্রসার হ্রাস পাইলেই বন্দর শ্রমিকগণকে (Dock Labourers) সাময়িককালের জন্য বেকার থাকিতে হয়।

৩। বাণিজ্যচক্রজনিত বেকার সমস্যা—Cyclical unemployment

ব্যবসায়-বাণিজ্যের চক্রবৎ উত্থান-পতন ঘটিতে দেখা যায়। ব্যবসায়ের উন্নতির সময় শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়, কিন্তু ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিলে মূল্য হ্রাস পায় এবং ব্যবসায়িগণ ব্যবসায় সংকোচ করে। ফলে এই সময়ে শ্রমিকগণের কর্মপ্রাপ্তির অভাব ঘটে।

৪। যান্ত্রিক কারণে বেকার সমস্যা—Technological unemployment

অনেক সময় নূতন নূতন যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের ফলে উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। পুরাতন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত শ্রমিকগণের পক্ষে নূতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং উৎপাদন কৌশল আয়ত্ত করিতে না পারিবার জন্য শ্রমিকগণকে কর্মচ্যুত হইতে হয়।

৫। সামঞ্জস্যের অভাবহেতু সাময়িককালের জন্য বেকার সমস্যা—Frictional Unemployment

শ্রমিকের গতিশীলতার অভাব হেতু কিংবা কাঁচামালের অভাব হেতু অথবা কর্ম-সংস্থান তথ্য সম্পর্কে শ্রমিকের অজ্ঞতার হেতু সাময়িককালের জন্য এই জাতীয় বেকার সমস্যা দেখা যায়।

কারণঃ একটি দেশে নানা জাতীয় বেকার সমস্যা দেখা যায়। প্রথমতঃ, ঋতুগত কারণে বেকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। কৃষি ও গৃহনির্মাণ কাযে দেখা যায় যে, বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই জাতীয় কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অন্য সময়ে কাজের পরিমাণ খুব কম হয়। কাজের পরিমাণ যে সময়ে কম থাকে তখন এই বৃত্তিগুলিতে বেকার সংখ্যা বেশী হয়। দ্বিতীয়তঃ, সাময়িক কারণেও বেকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। কোন কারণে বাণিজ্যের হ্রাস হইলে ডক-শ্রমিকগণের মধ্যে এই জাতীয় বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ, ব্যবসায়-বাণিজ্যে যখন মন্দা উপস্থিত হয়, তখন ব্যবসায়িগণ তাহাদের ব্যবসায় সংকোচ করে। ফলে, এই সময়ে শ্রমিকের কাজের অভাব ঘটে। নূতন নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহার আরম্ভ

হইলেও অনেক সময় শ্রমিকগণের মধ্যে কাজের অভাব দেখা যায়, কারণ নূতন যন্ত্রপাতি নূতন পদ্ধতিতে তাহারা ব্যবহার করিতে পারে না। শ্রমিকের গতিশীলতার অভাব হেতু অথবা কাজ জোগাড় করিবার সংবাদ-সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য বেকার সংখ্যা বাড়িতে পারে।

প্রতিকার: সাময়িক কারণে জাত বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য দেশের শিল্পসমূহের পুনর্গঠন প্রয়োজন। ছোট ছোট শিল্প ও কুটির শিল্পের উন্নতি করিতে পারিলে ঋতুগত বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে। ব্যাঙ্ক-পরিচালনার নীতি ও ধারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ব্যবসায়ে মন্দাজনিত বেকার সমস্যা দূর করা যাইতে পারে। শিক্ষাবিস্তার ও অল্পখরচে স্থানান্তর গমনের সুবিধা সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকের গতিশীলতা বৃদ্ধি কবা যাইতে পারে। শ্রমবিনিময় সংসদ (Labour Exchange) প্রতিষ্ঠিত করিয়া কর্মসংস্থান-সম্পর্কে শ্রমিককে উপযুক্ত তথ্য সববরাহ কবিতে পাবিলে বেকার সমস্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে। পবিশেষে সরকার রাস্তাঘাট, পার্ক, সেতু, সেচব্যবস্থা প্রভৃতি নানাজাতীয় গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করিয়া বহুসংখ্যক লোকের কাজের ব্যবস্থা করিতে পারে।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, ভোগ-ব্যবহারের জন্য চাহিদার অপ্রাচুর্য হইল বেকার সমস্যার প্রধান কারণ। ভোগ-ব্যবহারের পরিমাণ ও সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগ-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া কর্মসংস্থান করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সরকাব প্রয়োজনক্ষেত্রে নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া গঠনমূলক কার্যের জন্য অধিক পরিমাণ ব্যয় করিতে পারেন।

ভারতে বেকার সমস্যা—Unemployment in India

ভারতে বর্তমানে বেকার সমস্যা উৎকটরূপে দেখা দিয়াছে। সাম্প্রতিক একটি হিসাবে দেখা যায় যে, বর্তমান সময়ে ভারতে বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা ৫০ লক্ষেরও উপর। আমাদের দেশে বেকার সমস্যা শুধু অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, সহরাঞ্চলে শিক্ষিত লোকেব মধ্যেও বহু বেকার দেখা যায়। ভারতে কৃষিশ্রমিকের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বেকার সমস্যা রহিয়াছে, কারণ যতলোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত আছে প্রকৃতপক্ষে তাহা অপেক্ষা কম লোক হইলেও এ কার্য চলিতে পারে। শিল্পের ক্ষেত্রেই ভারতে বেকার সমস্যার অধিক তীব্রতা দেখা যায়। শিল্পে আধুনিক ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শ্রমিকছাঁটাই অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও বহু বেকার আছে, কারণ এই

শ্রেণীর লোক, কোন শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য কাজ করিতে অনিচ্ছুক। ব্যবসায়-বাণিজ্যের মন্দা হেতু ও শিল্প-ব্যবস্থাপনায় নূতন নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের ফলেও অনেক লোক কর্মহীন হইয়া পড়ে।

কারণ : নানাকারণে ভারতে বেকার সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। জনসংখ্যার অত্যধিক হারে বৃদ্ধি, দেশবিভাগ, পশ্চিম ও বিশেষ করিয়া পূর্ব-পাকিস্তান হইতে অসংখ্য উদ্বাস্তুর আগমন, শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকের সংখ্যাবৃদ্ধি, কৃষির দুরবস্থা, শিল্পের অনগ্রসরতা, কুটিরশিল্পের অবনতি প্রভৃতি হইল ভারতে বেকার সমস্যার প্রধান কারণ। সত্য বটে দেশের জাতীয় সরকার কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিসাধন করিয়া বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ও পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তুর আগমন হইতেছে, সে হারে নূতন কাজ সৃষ্টি না হওয়ার ফলে ভারতে বেকারের সংখ্যা দিনদিন বাড়িয়াই চলিতেছে।

প্রতিকার : বেকার সমস্যার সাময়িক প্রতিকারের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প-গুলির প্রসার ও উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে হইবে এবং এজন্য সরকারকে ঋণ ও আর্থিক সাহায্য দিতে হইবে। দেশের সরকারকে যুবকগণ যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া অধিকতরভাবে কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয় তজ্জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য করিতে হইবে এবং দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে কার্যসংস্থানের উদ্দেশ্যে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ-কার্য দ্রুততর করিতে হইবে এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী-গুলি যাহাতে পল্লীগ্রামে তাহাদের শাখা স্থাপন করিয়া নূতন কাজ সৃষ্টি করে সে ব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজন।

স্থায়িভাবে বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে জনসংখ্যা যাহাতে আর বৃদ্ধি না পায় প্রথমে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশে দ্রুত শিল্পের প্রসার ও উন্নতি করিতে হইবে। শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষা ব্যতীতও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। শ্রমিকের গতিশীলতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে ও সহরাঞ্চলে কর্মবিনিময়-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে সরকার নিজে গঠনমূলক কার্য আরম্ভ করিয়া কর্মহীনতা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন।

গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তৎসত্বেও বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালেও প্রতিবৎসর গড়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্য বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনা নির্ধারিত ১০$\frac{১}{২}$ কোটি টন খাদ্যশস্য দেশে উৎপাদিত হইলেও, প্রায় ৫০ কোটি টন ঘাট্‌তি পড়িবে। সুতরাং দেখা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারত খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। ভারতে এই খাদ্যের অভাব শুধু পরিমাণের দিক দিয়া দেখিলে চলিবে না, পুষ্টির দিক দিয়াও এই স্বল্প পরিমাণ খাদ্য অতি নিকৃষ্ট ধরণের।

সুতরাং বর্তমান ভারতে খাদ্যশস্য বৃদ্ধির হার অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। ফলে, দেশে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাইয়া বেকার সমস্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দেখা যাইতেছে। একদিকে জনসংখ্যা হ্রাস, অপর দিকে উৎপাদন বৃদ্ধি ও ন্যায্য বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তন ব্যতীত সংখ্যাধিক্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নহে।

6. Why do many people remain unemployed in India? Suggest some measures which will help to find employment for them

H S. (Hu) 1963

ভারতে বহুলোক বেকার থাকে কেন? বেকার ও ইহার সমাধানের উপায় আলোচনা কর।

উঃ—বেকার বলিতে সেই সমস্ত লোককে বুঝায়, যাহারা কাজ করিতে ইচ্ছুক কিন্তু প্রচলিত মজুরির হারে কাজ যোগাড় করিতে পারে না। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য বেকার সমস্যা দেখা যায়। ১। ঋতুগত বেকারত্ব, ২। শিল্প-বাণিজ্য মন্দাজনিত বেকারত্ব, ৩। শ্রমিকের গতিশীলতার অভাবহেতু বেকারত্ব, ৪। নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহারজনিত বেকারত্ব ও ৫। শ্রমিকের দক্ষতার অভাবজনিত বেকারত্ব।

ভারতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষেও প্রায় ৭৫ লক্ষ লোক বেকার আছে ও এই সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ভারতের সর্বস্তরে বেকার সমস্যা দেখা যায়। বেকার, আংশিক বেকার, অশিক্ষিত ও শিক্ষিত বেকার, এবং গ্রামে ও শহরে সর্বত্রই বেকার লোক দেখা যায়।

ভারতে (১) জনসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু বেকার সমস্যা, (২) কৃষিগত বেকার সমস্যা, (৩) শিল্পগত বেকার সমস্যা ও (৪) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার সমস্যা দেখা যায়।

বেকার সমস্যার সাময়িক প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যথা, ১। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের পুনর্গঠন, ২। বৃত্তিমূলকশিক্ষার প্রসার, ৩। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি লোকের আকর্ষণ সৃষ্টি, ৪। গ্রামাঞ্চলে সমাজ-উন্নয়ন মূলক কাযের প্রসার সাহায্যে কর্মসংস্থান করা প্রয়োজন।

স্থায়িভাবে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ১। পরিবার পরিমিতায়ন (Family Planning) সাহায্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, ২। শিল্পের উন্নয়ন, ৩। শ্রমিকের গতিশীলতা বৃদ্ধি, ৪। কর্ম বিনিময় কেন্দ্র স্থাপন, ও ৫। সরকার কর্তৃক গঠনমূলক কায আরম্ভ করা প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ

(Natural Resources)

প্রাকৃতিক সম্পদ—Natural Resources

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভূমি, অরণ্য, নদনদী, খনিজসম্পদ, প্রাণিসম্পদ ও নৈসর্গিক শক্তিসমূহকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলিয়া ধরা হয়। জাতীয় আয়-নির্ধারণে এইগুলির গুরুত্ব বিশদভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে ভূমি, ইহার বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন-ব্যবস্থায় ইহার গুরুত্বের বিষয় আলোচনা করা হইবে।

ভূমি ও ইহার উৎপাদিকা-শক্তি—Land and its Productivity

ভূমি বলিতে ধনবিজ্ঞানে যাবতীয় প্রকৃতি-দত্ত পদার্থ ও নৈসর্গিক শক্তি বুঝায়। ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা—এই চারিটি হইল উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান। উৎপাদনের উপাদান হিসাবে অন্যান্য উপাদানগুলি হইতে ভূমির বহু পার্থক্য দেখা যায়—

ভূমির বৈশিষ্ট্য—Characteristics of Land

১। ইহার সরবরাহ সীমাবদ্ধ। মূলধনের পরিমাণ বা শ্রমিকের সংখ্যা অন্ততঃ দীর্ঘ মেয়াদে বৃদ্ধি করা যায়, কিন্তু পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগের আয়তনের বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না।

২। দ্বিতীয়তঃ, ভূমির কোন উৎপাদন খরচ নাই। ইহা প্রকৃতির দান হিসাবেই পাওয়া যায়। কিন্তু ভূমি প্রকৃতির দান হইলেও কৃষিকার্য, বাসস্থান-নির্মাণ বা অন্য যে-কোন উদ্দেশ্যই হউক না কেন, ভূমির সংস্কার করিতে হয়। ভূমির অবস্থান, জলবায়ু ও আদিম উর্বরতা-শক্তির জন্য কোন ব্যয় না হইলেও ভূমিকে ব্যবহারযোগ্য ও ইহার উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য উৎপাদন-ব্যয় প্রয়োজন হয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ভূমিরও একটি উৎপাদন-ব্যয় আছে।

৩। ভূমির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার গতিশীলতার অভাব। শ্রমিক ও মূলধনের মত সহজপ্রাপ্য স্থান হইতে ভূমি দুষ্প্রাপ্য স্থানে স্থানান্তর করা যায় না। এইজন্য জমির খাজনার পার্থক্য দেখা যায়।

৪। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা-শক্তি ও অবস্থান-পরিবেশের এত পার্থক্য দেখা যায় যে, একখণ্ড জমি অন্যখণ্ড জমির পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে না। একজন শ্রমিকের পরিবর্তে অপর একজন শ্রমিক নিযুক্ত করা চলে, কিন্তু একখণ্ড জমির পরিবর্তে অন্যখণ্ড জমি সর্বক্ষেত্রে সমান উৎপাদন না করিতেও পারে। সুতরাং জমির ক্ষেত্রে একটির পরিবর্তে অপরটির ব্যবহার চলে না।

পঞ্চমতঃ, ভূমি হইতে উৎপাদন-ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি (Law of Diminishing Returns) আরম্ভ হয়।

ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি কিসের উপর নির্ভর করে—Factors determining the productivity of Land

১। নৈসর্গিক—Natural factors

নৈসর্গিক কারণেই সাধারণতঃ বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা-শক্তির পার্থক্য দেখা যায়। ভূমির রাসায়নিক উপাদান, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র বা পর্বতের নৈকট্য উৎপাদিকা-শক্তিকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে। ইহার উপব মানুষের বিশেষ কোন হাত নাই। নৈসর্গিক কারণে গঙ্গানদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল উর্বর আর রাজপুতানা অঞ্চল অনুর্বর।

২। মানবীয় কারণ—Human factor

মানুষের চেষ্টায়ও জমির উৎপাদিকা-শক্তি পরিবর্তিত হইতে পারে। বর্তমান যুগে মানুষ নানা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, জলাভূমি হইতে জল নিষ্কাশন করিয়া, ও স্থানভেদে নানাভাবে সেচব্যবস্থার দ্বারা জলাভূমি বা মরুভূমি উর্বর জমিতে পরিণত করিতেছে।

৩। ভৌগোলিক কারণ—Geographical factor

জমির উৎপাদিকা-শক্তি অনেক স্থলে জমির অবস্থান-স্থলের উপর নির্ভর করে। খারাপ জমি শহরাঞ্চলের নিকটে হইলে দূরের ভাল জমি অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদনক্ষম বলিয়া ধরা যায়। জমির এই উৎকৃষ্টতা যোগাযোগ-

ব্যবস্থা ও পরিবহন-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। মানুষ যোগাযোগ-ব্যবস্থার আশাতীত উন্নতি সাধন করিয়া বর্তমানে বহু অব্যবহার্য জমিকে প্রথম শ্রেণীর জমিতে পরিণত করিয়াছে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি—Law of Diminishing Returns

জমি হইতে উৎপন্ন ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অধিক ফসল উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। অধিক ফসল উৎপাদন করিতে গেলে হয় বেশী জমি চাষ করিতে হয় নতুবা চাষ-করা জমি আরও গভীরভাবে অর্থাৎ অধিক ব্যয়ে চাষ করিতে হয়। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট-পরিমাণ জমিতে যদি ক্রমাগত বেশী হারে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ বাড়িলেও যে হারে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হয় সে হারে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। শ্রম ও মূলধন-বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপন্ন ফসল-বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে একই পরিমাণ জমিতে দ্বিগুণ পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া দ্বিগুণ ফসল পাওয়া যায় না। তাহা হইলে স্বল্প পরিমাণ জমি গভীরভাবে চাষ করিয়া বহুলোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইত। মার্শাল নিম্নলিখিতভাবে এই বিধিটির সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন: "An increase in the capital and labour applied in the cultivation of land causes in general a less than proportionate increase in the amount of produce raised, unless it happens to coincide with an improvment in the art of agriculture." নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা ক্রমহ্রাসমান-উৎপাদন-বিধির কার্যকারিতা দেখান যাইতে পারে:

জমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধনের মাত্রা	সমগ্র উৎপন্ন পরিমাণ	অতিরিক্ত উৎপন্ন
এক বিঘা	৫	১০ মণ	—
"	৫ + ৫ = ১০	২৫ "	১৫ মণ
"	৫ + ৫ + ৫ = ১৫	৩৫ "	১০ "
"	৫ + ৫ + ৫ + ৫ = ২০	৪৩ "	৮ "

উপরের উদাহরণে দেখান হইয়াছে যে, প্রথমতঃ, এক বিঘা জমিতে যদি ৫ মাত্রা শ্রম ও মূলধন দেওয়া হয়, তাহা হইলে ১০ মণ ফসল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বার যদি শ্রম ও মূলধনের মাত্রা দ্বিগুণ করা হয় তাহা হইলে প্রথম মাত্রা হইতেও অধিক পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইতে পারে। প্রথম মাত্রা প্রয়োগের ফলে ১০ মণ, দ্বিতীয়

মাত্রা প্রয়োগের ফলে ২৫ মণ অর্থাৎ ১৫ মণ বৃদ্ধি পাইল। তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রা প্রয়োগের ফলে সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ বাড়িলেও বৃদ্ধির মাত্রা কমিয়া যথাক্রমে ১০ ও ৮ মণে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার শ্রম ও মূলধন-বৃদ্ধির হারের সমানুপাতিক হয় না অর্থাৎ উৎপাদন-বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে। নিম্নে দেওয়া রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান বিধিটি সুস্পষ্ট করা যাইতে পারে।

কগ রেখা দ্বারা প্রযুক্ত শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ দেখান হইয়াছে এবং **কখ** রেখা দ্বারা অতিরিক্ত উৎপাদন-পরিমাণ দেখান হইয়াছে। জমি উপযুক্তভাবে চাষ না হওয়ার কারণে অধিক মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া অনুপাতের অধিক ফসল পাওয়া যাইতে পারে। মূলধন ও শ্রমের অনুপাতে ফসল-বৃদ্ধি **পছ** বক্র রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে। যখন **কচ** পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হয়, তখন **চচ'** পরিমাণ ফসল পাওয়া যায়। যখন **কছ** পরিমাণ প্রয়োগ করা হয়, তখন **ছছ'** পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহার পর যদি **কজ** ও তারপর **কঝ** পরিমাণ শ্রম ও মূলধন দেওয়া হয়, তাহা হইলে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। তাই রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে যে, **প** হইতে **ছ'** পর্যন্ত বক্ররেখাটি উর্ধ্বাভিমুখী, কিন্তু **ছ** হইতে **ঝ** পর্যন্ত ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী।
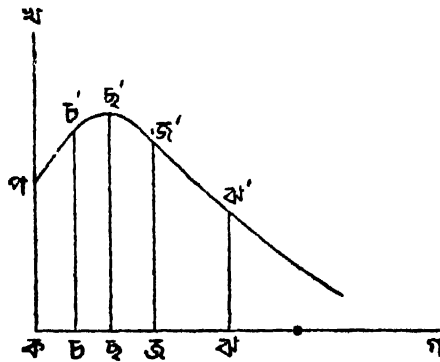
ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জমি হইতে অধিক উৎপাদন করিতে গেলে উৎপাদন-ব্যয়ও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যায়। প্রথমবার ১০৲ টাকা ব্যয় করিয়া যদি ১০/০ মণ ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রতিমণের জন্য ১৲ টাকা ব্যয় হয়। দ্বিতীয়বার ১০+১০=২০৲ টাকা ব্যয় করিয়া যদি ১০+৭=১৭ মণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতিমণ উৎপাদনের ব্যয় হয় ২০÷১৭

—প্রায় ১ টাকা ১৮ নয়া পয়সা। এইরূপে প্রতিবার জমি হইতে অধিক ফসল উৎপাদন করিতে গেলে উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। গভীর চাষ ও ব্যাপক চাষ এই উভয় ক্ষেত্রেই এই বিধিটি কার্যকরী হয়। যদি কোন চাষী তাহার স্বল্পপরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করে বা অধিক পরিমাণ জমিতে সমপরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করে—তাহা হইলে এই উভয় ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি কার্যকরী হয়।

ব্যতিক্রম—Limitations

ক্রমহ্রাসমান সূত্রটির কয়েকটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, চাষবাস-প্রণালীর যদি উন্নতি হয় এবং এই উন্নত ধরণের কৃষিপদ্ধতি যদি জমিতে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উৎপাদন-পরিমাণ না কমিয়া বাড়িতে পারে অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপাদন করিতে ব্যয় হ্রাস হইবে। ভারতের কৃষিকার্যে এই ক্রমহ্রাসমান বিধিটি কাযকরী দেখা যায়। কিন্তু ভারতে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত ধরণের কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তিত করা যায়, লাঙ্গলের পরিবর্তে ট্র্যাক্টর দ্বারা চাষ করা হয়, সেচব্যবস্থার দ্বারা জমিতে জল দিবার ব্যবস্থা হয় ও বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে বিঘাপ্রতি জমিতে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। চাষবাসের প্রণালী অপরিবর্তিত রাখিয়া অধিক শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিলেই জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি কাযকরী হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কোন জমি যদি পূর্বে উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম ও মূলধন দ্বারা চাষ করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া চাষ করিলে অধিক ফসল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু চাষ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের অতিরিক্ত পরিমাণ প্রয়োগ করিলে, শ্রম ও অর্থব্যয়ের তুলনায় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না। প্রয়োজনীয় পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের অতিরিক্ত পরিমাণ প্রযুক্ত হইলেই উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকিবে।

খনি ও মৎস্যস্থলীর ক্ষেত্র—Mines and Fisheries

অধিক পরিমাণ খনিজ দ্রব্য পাইতে হইলে ক্রমশঃই খনির তলদেশে যাইতে হয়। যতই নীচের দিকে যাওয়া যায়, খনিজ দ্রব্য আহরণের জন্য ততই বিশেষ

ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় এবং ইহাতে ব্যয়বৃদ্ধি হয়। সুতরাং অতিরিক্ত খনিজ দ্রব্য পাইতে হইলে অতিরিক্ত ব্যয় হয়। খনিজ দ্রব্য প্রাকৃতিক সম্পদ। ইহার পরিমাণের একটা সীমা আছে। সুতরাং অধিক ব্যয় করিলেও কালক্রমে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং শেষ পর্যন্ত উৎপাদন-পরিমাণ শূন্য হয়।

মাছ ধরিবার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, অধিক মাছ ধরিতে গেলে মাছ ধরিবার জন্য অধিক সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয় এবং ইহাতে অধিক ব্যয় হয়। নদীতে মৎস্যসংখ্যার একটি সীমা আছে। অধিক ব্যয় করিয়া অনিশ্চিত কাল পর্যন্ত অধিক মৎস্য পাওয়া যায় না। কিছুদিন পরেই মৎস্যের পরিমাণ শ্রম ও অর্থব্যয়ের তুলনায় কম হইবে।

শিল্পক্ষেত্র—Industries

কৃষিক্ষেত্রে একই জমিতে ক্রমাগত শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে, উৎপাদন-পরিমাণ কমে অর্থাৎ উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এখানে ধরিয়া লওয়া হয় যে, শ্রম ও মূলধনের পরিমাণবৃদ্ধি পাইলেও জমির পরিমাণ অপরিবর্তিত আছে। যে-কোন উৎপাদন-ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক যদি একটি উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া অন্য দুইটির পরিমাণ বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে সে-ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি কার্যকরী হয়। কিন্তু ব্যবস্থাপক যদি একই সঙ্গে তিনটি উপাদানেরই—জমি, মূলধন ও শ্রম—পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি কার্যকরী হয় না, অধিকন্তু উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক কিছু দিন পর্যন্ত তিনটি উপাদানেরই অনুপাত বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু জমির ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে, কারণ অন্য দুইটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইলেও জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। জমি প্রকৃতির দান, মানুষ ইহার আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে না।

ভারতের ভূমি ও কৃষি-ব্যবস্থা—Land and Agriculture in India

ভারতের মোট আবাদী জমির পরিমাণ হইল ৩২ কোটি ৪০ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র ব্যবহারযোগ্য জমির শতকরা ৫৩ ভাগ। ভারতের মাটিকে সাধরণতঃ তিনভাগে ভাগ করা হয়, যথা—পলিমাটি, কালোমাটি ও গেরুয়ামাটি। এই মাটিতে

নানাজাতীয় খাদ্যশস্য (Food crop) ও পণ্যশস্য (Non-food or Cash crop) এবং ফলমূল ও সব্জী উৎপন্ন হয়। নানা জাতীয় খাদ্যশস্য ও পণ্যশস্যের একটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

খাদ্যশস্য—Food Crops

ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্যই হইল সর্বপ্রধান। সমগ্র কৃষিজাত উৎপাদনের শতকরা ৮৫ ভাগ হইল খাদ্যশস্য। খাদ্যশস্যের মধ্যে **ধান্য** হইল সর্বপ্রধান। ১৯৬১-৬২ সালে ভারতে মোট ধানী জমির পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬৯ হাজার একর অর্থাৎ মোট আবাদী জমির শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ। ঐ বৎসর মোট ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ১০ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ঐ পরিমাণ চাউলেও ভারতের চাহিদা মেটে না—এজন্য বিদেশ হইতে বহু লক্ষ টন চাউল আমদানী করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে চাউল উৎপন্ন হয়।

গম হইল ভারতের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য। পাঞ্জাবে, উত্তরপ্রদেশ ও বোম্বাই অঞ্চলে গমের চাষ হয়। ১৯৬১-৬২ সালে ভারতে ১ কোটি ১৬ লক্ষ ২০ হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা ছাড়া, **জোয়ার, বাজরা, যব** (বার্লি), **ভুট্টা** প্রভৃতির চাষ হয়। এইগুলি মানুষ ও গবাদি পশুর খাদ্যহিসাবে ব্যবহৃত হয়। নানাজাতীয় **ডাল, কলাই**ও ভারতে জন্মে।

ইক্ষু (আখ) ভারতের অন্যতম খাদ্যবস্তু। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর-প্রদেশ ও বোম্বাই রাজ্যে আখের চাষ হয়। আখ হইতে চিনি প্রস্তুত হয় এবং ১৯৬০-৬২ সালে প্রায় ৯ কোটি ৬০ লক্ষ ২১ হাজার টন আখ হইয়াছিল। মোট আবাদী জমির প্রায় ৪ ৬ ভাগে আখের চাষ হয়।

ভারতে নানাজাতীয় ফলেরও চাষ হয়। **আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কমলালেবু, আপেল, ন্যাসপাতি, বেদানা, আঙুর** প্রভৃতি পাওয়া যায়। **তাল, নারিকেল, ও সুপারিরও** চাষ হয়। **চা**-এর উৎপাদন আসাম, দার্জিলিং, নীলগিরি প্রভৃতি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ হইলেও খাদ্য ও বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে চায়ের গুরুত্ব কম নহে। ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ৬১ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয় এবং ইহার শতকরা প্রায় ৭০।৭১ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। দক্ষিণ ভারতে **কফির** চাষ হয়। ভারতে নানাজাতীয় **সব্জীর**ও চাষ হয়। ইহার

মধ্যে **আলুর** চাষ সর্বপ্রধান। আলু ছাড়া নানাজাতীয় **কপি, শালগম, টম্যাটো** প্রভৃতির চাষ হয়।

পণ্যশস্য—Non-food or Cash crop

পণ্যশস্যের মধ্যে **পাটই** হইল সর্বপ্রধান। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে পাট জন্মে। পাট ভারত ও পাকিস্তানের একচেটিয়া। পূর্ববঙ্গ ভারতবর্ষ হইতে বিভাগ হইবার ফলে ভারতের পাট-উৎপাদন হ্রাস পায়। বর্তমানে সরকারী প্রচেষ্টায় পাটের উৎপাদন-পরিমাণ বাড়িয়া ১৯৬১ ৬২ সালে ৬২,৬৯ হাজার টন পাট পাওয়া গিয়াছিল। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি হইল ভারতীয় পাটের প্রধান খরিদ্দার। পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ভারত ডলার উপাজন করিতে পারে।

পাটের পর **কার্পাস** (তুলা) চাষ প্রধান স্থান অধিকার করে। আমেরিকার পর ভারতই পৃথিবীর দ্বিতীয় তুলা-উৎপাদনকারী দেশ। ভারতে জাত তুলার আঁশ লম্বা নহে, এইজন্য আমেরিকা ও পাকিস্তান হইতে ঐ জাতীয় তুলা আমদানী করিতে হয়। ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ৪৫০০ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হয়। কার্পাস ছাড়াও **শিমুল তুলা** ও **রেশম** ভারতে জন্মে। মহীশূর, মাদ্রাজ, কাশ্মীর ও পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মালদহে রেশমের চাষ হয়।

বিহার ও মাদ্রাজের কয়েকটি জায়গায় প্রচুর পরিমাণে **তামাকের** চাষ হয়। আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের কোন কোন স্থলে **লাক্ষার** চাষ হয়। ইহা বিদেশে রপ্তানী হয়।

ভারতে **রবার** পাওয়া গেলেও প্রয়োজনের তুলনায় এই রবার নগণ্য। মালাবার উপকূলে রবারের চাষ হয় এবং ১৯৬০-৬১ সালে প্রায় ৫৬ লক্ষ পাউণ্ড রবার উৎপন্ন হইয়াছিল।

দার্জিলিং ও নীলগিরি অঞ্চলে **সিন্‌কোনার** চাষ হয়। ইহার চাষ সরকারের একচেটিয়া। সিন্‌কোনা হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে বর্তমানে কিছু **নীলের** চাষ হয়। এই দুইটি জায়গায় কিছু পরিমাণ **অফিংয়েরও** চাষ হয়।

ভারতে নানাজাতীয় **তৈলবীজ** উৎপাদিত হয়। ইহার মধ্যে **চীনাবাদাম, তিসি, সরিষা, রাই, রেড়ি, মসিনা ও নারিকেল** উল্লেখযোগ্য। চীনা-

বাদাম ও নারিকেল খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। প্রায় ২৯'৪ লক্ষ একর জমিতে তৈলবীজ জন্মে। কিছু পরিমাণ তৈলবীজ বিদেশেও রপ্তানী হয়।

ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা—ইহার ত্রুটি ও প্রতিকার—Agriculture in India—its drawbacks and remedies

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশে কত বিভিন্ন রকম ফসলের চাষ হয়। অধিকাংশ ভারতবাসীর আয়েব মূল উৎস হইল কৃষিকার্য। কৃষিকার্য যে শুধু আমাদের খাদ্যশস্য, ফলমূল ও শাকসব্জী যোগায় তাহা নহে, শিল্পের জন্য ও বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্য নানাজাতীয় পণ্যশস্য ও কাঁচামাল যোগায়। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ—এই দেশের শতকরা প্রায় ৭০ জন লোককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিজাত আয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল যে, কৃষিকার্য ভারত-বাসীর প্রধান উপজীবিকা হইলেও ভারতের কৃষিপদ্ধতি সন্তোষজনক হওয়া দূরের কথা অন্যান্য অনেক দেশ অপেক্ষা অনগ্রসর। কৃষির এই অনগ্রসরতার জন্য ভারতে প্রতি বিঘা জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অন্যান্য দেশের ফসল-পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশ হইয়া থাকে। প্রতি একর জমিতে আমেরিকার তুলনায় ভারতে মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ তুলা হয়, জাপানের তুলনায় ভারতেব এক একর জমিতে মাত্র এক তৃতীয়াংশ চাউল উৎপন্ন হয়। কৃষিব এই অনগ্রসরতা ভারতের জাতীয় আয়ের স্বল্পতা ও দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভারতে কৃষি-ব্যবস্থার এই ত্রুটির কি কারণ তাহা আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

কৃষির ত্রুটি—Drawbacks of Indian Agriculture

১। **জমির ক্ষুদ্রায়তন**—আমাদের চাষযোগ্য জমির আয়তন খুব ছোট এবং এই ছোট ছোট খণ্ডগুলি দূরে দূরে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। যৌথপরিবার-প্রথা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়ায় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উত্তরাধিকার আইন অনুসারে জমি অধিক লোকের মধ্যে ভাগ হইয়া আকারে এত ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে যে, চাষের ব্যয় বেশী হইয়াছে, কিন্তু উৎপাদন-পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। একখানা লাঙ্গল, একজোড়া বলদ ও একজন চাষী যে জমি চাষ করিত, খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ত হইবার ফলে এখন সে জমি চাষ করিতে

তিনখানা লাঙ্গল, তিনজোড়া বলদ ও তিনজন চাষীর প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক খণ্ড জমির সীমানা স্থির করিতেও অনেক পরিমাণ জমি নষ্ট হয়। এক জমি হইতে অন্য জমিতে যাইতে সময়ও নষ্ট হয়।

২। **সেচব্যবস্থার অভাব**—আমাদের দেশের জমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুষ্ক। প্রচুর জল ব্যতীত কৃষিকার্য সম্ভব নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষকদের জলের জন্য অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিতে হয়। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি বা অসময়ে বৃষ্টি হইলেই ফসল-উৎপাদনে বাধা জন্মে। দেশে যে সেচব্যবস্থা আছে, তাহাতে কর্ষিত জমির মাত্র ১৭ ভাগ জমি কোনমতে জল পাইতে পারে।

৩। **সারের অভাব**—ক্রমাগত চাষের ফলে জমির উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস পায়। ভারতের চাষী এত গরীব যে, তাহার পক্ষে ভাল সার কিনিয়া জমিতে দিবার ক্ষমতা নাই। গোময় ভাল সার এবং আমাদের দেশে সহজে পাওয়া গেলেও এই সার প্রধানতঃ জ্বালানীর জন্য ব্যবহৃত হয়। ফলে জমিতে আদৌ কোন সার পড়ে না।

৪। **কৃষকের ভগ্নস্বাস্থ্য ও অজ্ঞতা**—ভারতের কৃষক যে অতি দরিদ্র তাহা ভারতের লোকেব মাথাপিছু আয় হইতে ধারণা করা যায়। উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান তাহাদের নাই। এইজন্য ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও নানাবিধ রোগে তাহারা কষ্ট পায় ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া তাহাদের কর্মদক্ষতা লোপ পায়। দারিদ্র্য, রোগ ও অজ্ঞতা তাহাদের জীবনের প্রধান অভিশাপ। এই কারণে তাহাদের জীবন নিরাশার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। কৃষককে বাদ দিয়া কৃষির উন্নতি হইতে পারে না। সুতরাং ভারতের কৃষকের নিকট হইতে বর্তমান অবস্থায় কৃষির উন্নতি আশা করা দুরাশা মাত্র।

৫। **বাস্তব মূলধন ও অর্থের অভাব**—কাঠের লাঙ্গলে বলদের সাহায্যে ভারতের চাষী গতানুগতিক পদ্ধতিতে জমি চাষ করে। কাঠের লাঙ্গলে জমি গভীরভাবে কর্ষিত হইতে পারে না। বলদের অবস্থাও তাহার মালিকের অবস্থার ন্যায় সঙ্গীন। ভাল বীজও সব সময় পাওয়া যায় না। মড়কে বা বন্যায় যখন চাষীর বলদ মারা যায়, তখন অর্থের অভাবে চাষীকে মহাজনের নিকট হইতে চড়া সুদে ধার করিতে হয়। অর্থের অভাবে চাষী কলের লাঙ্গল কিনিতে পারে না আর শিক্ষার অভাবে কলের লাঙ্গল ব্যবহার করিতে পারে না।

৬। **কৃষিজাত-পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি**—ফসল উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পরে ফসলের দাম সাধারণতঃ কম থাকে। কৃষকেরা অতি দরিদ্র বলিয়া ভবিষ্যতে চড়া মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না। বর্তমানে অল্পদরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। বিক্রয়-বাজারেও নানাজাতীয় দালাল, ফড়িয়া প্রভৃতি তাহাদের ঠকায়। মহাজনদের নিকট হইতে ফসল দাদন রাখিয়া তাহারা অনেক সময় অগ্রিম ধার লয়। মহাজনদের নিকট হইতে তাহারা কদাচিৎ ন্যায্যমূল্য পাইয়া থাকে।

৭। **কৃষি ব্যতীত অন্য উপজীবিকার অভাব**—কৃষি ব্যতীত আমাদের দেশের চাষীর আর অন্য কোন দ্বিতীয় উপজীবিকা নাই বলিলেও চলে। এই কৃষিকার্য আবার মাত্র কয়েক মাস চলে, তারপর চাষী একরূপ বেকার থাকে। চাষের কাজে যদি বৎসরে ৪।৫ মাস সময় অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে এই ৪।৫ মাসের আয় তাহার বার মাসে ভাগ হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাহার আয় কত স্বল্প এবং তাহার নিজের চেষ্টায় কৃষির উন্নতি অসম্ভব।

প্রতিকার ব্যবস্থা—Remedies

১। **জমির একত্রীকরণ**—ভারতের কৃষিব্যবস্থার উপরি-উক্ত ত্রুটিগুলি দূর করিতে পারিলে কৃষক ও কৃষির উন্নতি সম্ভব; এইজন্য প্রথমতঃ বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলি একত্রিত করিয়া যাহাতে চাষ হয়, তাহার ব্যবস্থা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া জমির ক্ষুদ্রায়তন বন্ধ করা যায়। প্রথমতঃ, পাঞ্জাবে যেরূপ সমবায় পদ্ধতিতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি একত্রিত করিয়া চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে এই ত্রুটি দূর হইতে পারে। পাশাপাশি জমির বিভিন্ন মালিকগণ যদি তাহাদের অন্য স্থানে অবস্থিত জমির সহিত পরস্পরের জমি বদল করিয়া লন, তাহা হইলে বিনা আয়াসে কম খরচায় বড় জমি চাষ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া প্রত্যেক কৃষককে তাহার জমি একত্র করিয়া চাষ করিতে বাধ্য করিতে পারে। যদি কোন গ্রামের অর্ধেকের বেশী চাষী এই ব্যবস্থায় সম্মত হয়, তাহা হইলে অন্য সকলকে জমি একত্র করিতে বাধ্য করা যায়। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতিতে এই আইন অনুযায়ী কিছু কাজ হইয়াছে। ভারতের কৃষিব্যবস্থায় জমির ক্ষুদ্রায়তন হইল একটি প্রধান গলদ। ভারতে

এই গলদ দূর করিবার এখনও পর্যন্ত কোন ব্যাপক চেষ্টা হয় নাই। রুশীয় যৌথ কৃষিপদ্ধতি (Collective Farming) বা অনুরূপ উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন না করিলে কৃষিকার্যের এই ত্রুটি দূর হওয়ার সম্ভাবনা কম।

২। **জলসেচ ব্যবস্থা**—ভারতে কৃষির উন্নতি করিতে গেলে সেচব্যবস্থার প্রসার একান্ত আবশ্যক। আকাশের দিকে জলের জন্য তাকাইয়া থাকিলে কৃষির উন্নতি কোন দিনই সম্ভব হইবে না। বর্তমানে দেশে যে সেচব্যবস্থা আছে, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্ত নগণ্য। কূপ, নলকূপ, পুষ্করিণী ও সেচখাল খনন করিয়া জলের ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। ভারতে সেচ-ব্যবস্থার দ্বারা জমিতে যে পরিমাণ জল দেওয়া হয়, তাহার শতকরা ৩০ ভাগ কূপ হইতে তোলা হয়। কৃষকেরা চাষের জন্য নিজেরাই কূপ খনন করে। সরকারও এই উদ্দেশ্যে বহু কূপ খনন করিতে অর্থ সাহায্য করিয়াছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে কূপের সাহায্যে জমিতে জলসেচ করা হয়। বর্তমানে সরকার নানা জায়গায় নলকূপ খনন করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাদ্রাজে সাধারণতঃ পুকুর খনন করিয়া পার্শ্ববর্তী জমিগুলিতে জল দেওয়া হয়।

কৃষিকার্যে ব্যাপকভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে হইলে সেচখাল খনন করাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হয়। সেচখাল তিন প্রকারের—১। প্লাবন খাল (Inundation Canal), ২। স্থায়ী খাল (Perennial Canal) ও ৩। সঞ্চিত খাল (Storage Canal)। প্রথম শ্রেণীর খাল নদী হইতে খনন করা হইলেও ইহার গভীরতা নদীর গভীরতা হইতে কম হয়। সেইজন্য বর্ষাকালে যখন নদীতে জল বাড়ে তখন এই বাড়তি জল খালে প্রবেশ করিয়া পার্শ্ববর্তী জমিগুলির সেচের সাহায্য করে। গ্রীষ্মকালে এই সব খালে জল থাকে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর খালগুলি এরূপভাবে খনন করা হয় যে, ইহাতে বারমাস জল থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর খালগুলির সাহায্যে কোন নদী উপত্যকার বাঁধ দিয়া যে জল আটকান হয়, সেই আবদ্ধ জল খাল কাটিয়া প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন দিকে পাঠান হয়। ভারতে কর্ষিত জমির মাত্র ১৭ ভাগ এই সেচখালের জল পায়।

৩। **সারের ব্যবস্থা**—জমির উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে, জমিতে ভাল সার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গোময় যাহাতে জ্বালানী

হিসাবে লোকে ব্যবহার না করে, সেজন্য জ্বালানী কাঠের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গ্রামের আবর্জনা ও মল গর্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে জমা রাখিলে কিছুদিন পর ইহা উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়। অল্পমূল্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত-করা নানাজাতীয় সার কৃষককে সরবরাহ করা প্রয়োজন।

৪। **স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শিক্ষার প্রসার**—কৃষক ব্যতীত কৃষির উন্নতি হইতে পারে না। এইজন্য কৃষকের জীবন-ধারণের মান যাহাতে উন্নত হয় ও সে সুস্থ শরীরে ও সবল মনে তাহার কার্য পরিচালনা কবিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, বিনা খরচে বা অল্প খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও তাহার অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন

৫। **সহজ ঋণদানের ব্যবস্থা**—কৃষকের দারিদ্র্যই হইল তাহার দুঃখের প্রধান কারণ। দারিদ্র্যের জন্য সে মহাজনদের নিকট হইতে চড়া সুদে ধার লয়। সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপন কবিয়া কৃষককে অল্পসুদে ধাব দেওয়াব ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সমবায় সমিতির সাহায্যে তাহাদের ভাল বীজ, চাষের বলদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিবাব ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকার কর্তৃক ব্যাপকভাবে কৃষিঋণ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬। **কৃষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত বিক্রয়-ব্যবস্থা**—কৃষকগণ অনেক সময়েই তাহাদের অভাবের তাড়নায় অল্প দরে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে। তাহাদের অজ্ঞতার জন্য অনেক সময় তাহারা মহাজন ও ফড়িয়া কর্তৃক বঞ্চিত হয়। এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য সমবায় বিক্রয়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত প্রয়োজন। শস্য রাখিবার জন্য গোলা প্রস্তুত কবা এবং বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্যও সমবায় সমিতি গঠন কবা একান্ত আবশ্যক। সাধারণ ও কৃষিশিক্ষা বিস্তার করিয়া এবং গ্রামোন্নয়ন ব্যবস্থা দ্বারা কৃষকদের মন কুসংস্কার-মুক্ত করিতে হইবে। শিক্ষার আলোক পাইলে তাহারা স্বাবলম্বী হইয়া নিজেদেব উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে।

৭। **বিবিধ উপজীবিকার ব্যবস্থা**—কৃষিই হইল ভারতের কৃষকের একমাত্র উপজীবিকা। কৃষি হইতে আয় শুধু সামান্য নহে, ইহা আবাব অনিশ্চিত। এইজন্য ভারতের চাষীকে সমস্ত জীবনব্যাপী দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে আয়বৃদ্ধির প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে নানাজাতীয় ছোট ছোট শিল্প ও বিশেষ করিয়া কুটিরশিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন নিতান্ত আবশ্যক।

কৃষকগণ যাহাতে তাহাদের ঋতুগত কৃষিকার্যের অবসরে নানাজাতীয় কাজে লিপ্ত থাকিয়া আয়বৃদ্ধি করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কৃষিঋণ—ইহার কারণ ও প্রতিকার—Agricultural Indebtedness —its Causes and Remedies

ভারতের কৃষক সম্বন্ধে বলা হয় যে, সে ঋণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে, আজীবন ঋণভারগ্রস্ত থাকে এবং মৃত্যুর সময়ও অপরিশোধিত ঋণের ভার পুত্রের স্কন্ধে চাপাইয়া যায়। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, বিপুল ঋণভার তাহার দারিদ্র্যের কারণ; আবার অপর দিক দিয়া বলা যায় যে, দারিদ্র্যের জন্যই তাহারা ঋণভারগ্রস্ত হয়। কৃষকের দারিদ্র্য ও ঋণ এত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, ইহাদের পৃথক করা যায় না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি ১৯৩১ সালে কৃষিঋণের যে বিবরণ দেন, তদনুসারে ভারতে সমগ্র কৃষিঋণ-পরিমাণ ছিল ৯০০ কোটি টাকা। একমাত্র অবিভক্ত বাংলাদেশের ঋণ পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা। বর্তমানে খাদ্য ও পণ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ঋণভারের সামান্য লাঘব হইলেও সমস্যার আদৌ কোন সমাধান হয় নাই। ভারতের কৃষিঋণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই ঋণ পরিমাণের বেশীর ভাগ হইল অনুৎপাদক ঋণ অর্থাৎ এই ঋণ কৃষক খাওয়া পরা, সামাজিক অনুষ্ঠান বা মামলা-মোকদ্দমা করিবার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ঋণ-পরিশোধের উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র কৃষিঋণের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ পৈতৃক ঋণ।

কারণ—নানা কারণে কৃষকেরা ঋণভারগ্রস্ত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, কৃষি হইল কৃষকের একমাত্র আয়ের পথ। এই আয় আবার অতি স্বল্প ও অনিশ্চিত। দ্বিতীয়তঃ, স্বল্প আয়ের জন্য কৃষকের কোন সঞ্চয় নাই, কাজেই অসময়ে তাহাকে ধার করিতে হয়। বীজ ক্রয়, চাষের জন্য বলদ ক্রয়, জমির খাজনা শোধ প্রভৃতির জন্যও তাহাকে ধার করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, অনেক সময় বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধাদি প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে তাহারা সাধ্যাতীত ব্যয় করে। অনেক সময়ে অনাবশ্যক মামলা-মোকদ্দমার জন্য ব্যয় হয়। এই কারণেও তাহারা ধার করিতে বাধ্য হয়। চতুর্থতঃ, আমাদের দেশের লগ্নী কারবার সাধারণতঃ মহাজনদের দ্বারা পরিচালিত হয়। মহাজনেরা অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকের অজ্ঞতা ও আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া চক্রবৃদ্ধিহারে (Compound rate of interest)

সুদ আদায় করে। এইরূপে, চাষী একবার মহাজনের কবলে পড়িলে, তাহার জমি-জমা এমন কি বাস্তুভিটা পর্যন্তও তাহার হাতছাড়া হইয়া সর্বস্বান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রতিকার-ব্যবস্থা—কৃষকগণই হইল জাতির মেরুদণ্ড। যে-দেশের কৃষকগণ গুরু ঋণভারে জর্জরিত সে-দেশে কৃষির উন্নতি সুদূরপরাহত। ঋণমুক্ত করিয়া কৃষককে বাঁচাইতে না পারিলে ভারতে কৃষির উন্নতি অসম্ভব। কৃষিঋণ দূর করিতে হইলে তিনটি উপায় অবলম্বন করা আশু প্রয়োজন। প্রথমতঃ, কৃষকগণ যাহাতে তাহাদের পূর্বঋণ শোধ করিতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করিয়া মহাজনী প্রথার সংস্কার করা প্রয়োজন। ঋণশালিসী বোর্ড গঠন করিয়া তাহার সাহায্যে সহজ কিস্তিতে চাষীদের ধার শোধ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু পূর্ব-ঋণ শোধ করিলেই চলিবে না—কৃষকগণ তাহাদের চাষবাসের কাজের জন্য যাহাতে প্রয়োজনমত অল্প সুদে টাকা ধার পায়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই উদ্দেশ্যে গ্রামীণ সমবায় ঋণদানসমিতি গঠন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, কৃষকগণের যাহাতে ভবিষ্যতে আর ধার করিবার প্রয়োজন না হয়, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইজন্য কৃষির উন্নতিকল্পে সেচব্যবস্থা, ভাল বীজ, সার ও যন্ত্রপাতির যোগান ও উৎপন্ন শস্যের ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়-ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

কৃষির উন্নতির জন্য সরকারী ব্যবস্থা—Government measures for the development of Indian Agriculture

পূর্বতন বৃটিশ শাসনকালে ভারতে কৃষির উন্নতির জন্য কিছু কিছু প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে আইন পাশ করিয়া বিক্ষিপ্ত জমিগুলিকে একত্র করিয়া চাষ করিবার উদ্দেশ্যে আইন পাশ করা হইয়াছিল। ১৯৪৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, পেপসু প্রভৃতি রাজ্যে এই একত্রীকরণ কার্য বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে উক্ত রাজ্যসমূহে বহু লক্ষ জমি একত্রীকরণের ফলে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া, ঐ সমস্ত রাজ্যে জমির আয়তনের একটি সর্বনিম্ন সীমা স্থির করিয়া দেওয়ার ফলে ভবিষ্যতে আর জমির খণ্ডীকরণ হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষিঋণভার লাঘব করিয়া অল্প সুদে যাহাতে কৃষকগণ টাকা ধার

পায়, সেজন্য বৃটিশ শাসনকালেই 'টাকাভি' ঋণ-প্রদান ও সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছিল। মহাজনী প্রথা সংস্কারের জন্য নানাবিধ আইন পাশ করা হইয়াছে। বর্তমান জাতীয় সরকার স্টেট্ ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করিয়া গ্রামে গ্রামে কৃষকদের ঋণ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, **জমিদারী প্রথার** উচ্ছেদ, মধ্যস্বত্বাধিকার লোপ এবং গ্রাম পুনর্গঠন পরিকল্পনার সাহায্যেও বর্তমান সরকার কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। জমিদারী প্রথার প্রধান দোষ ছিল যে, অধিকাংশ জমিদার গ্রাম ত্যাগ করিয়া শহরে বাস করিতেন ও জমির বা প্রজার উন্নতির জন্য কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া শুধু প্রাপ্য খাজনা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে প্রজার উপর অত্যাচার করিতেন। বাংলাদেশে এই প্রথার ফলে জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরাট এক মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত জমিদারী প্রথা কৃষির উন্নতির ও কৃষকের দুরবস্থা দূর করিবার প্রধান অন্তরায় হওয়ার ফলে সরকার এই প্রথা বিলোপ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়ন করা হইতেছে। এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল যে, গ্রামের সকল লোকেরই যেন কিছু-না-কিছু জমি থাকে। আইন প্রণয়ন করিয়া একজন লোক কি পরিমাণ জমি রাখিতে পারিবে তাহাও স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে কোন লোক ৭৫ বিঘার অধিক পরিমাণ জমি রাখিতে পারিবে না। এই আইনের ফলে যাহার আদৌ কোন জমি নাই, সেও কিছু জমি পাইবে। এইরূপে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আচার্য বিনোবা ভাবে-প্রবর্তিত ভূ-দানযজ্ঞও এবিষয়ে যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইতেছে।

চতুর্থতঃ, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সাহায্যে সরকার ব্যাপকভাবে জলসেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণের দ্বারা কৃষির উন্নতির প্রধান অন্তরায় দূর করিয়াছেন। সহায়ক উপায় হিসাবে সরকার বনসম্প্রসারণের ব্যবস্থাও করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ, কৃত্রিম ও রাসায়নিক সার উৎপাদন-বৃদ্ধির অপরিহার্য উপাদান। এই সার উৎপাদনের জন্য সরকার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন ও সিন্ধ্রিতে একটি বিরাট সার-উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

ষষ্ঠতঃ, কৃষকগণের আয়বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সরকার বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কুটিরশিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সপ্তমতঃ, কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকার শস্যের মান-নির্ণয়, ওজনের মান-নির্ণয়, সমবায়-বাজার-সমিতি, ফসল রক্ষা করিবার জন্য শস্যভাণ্ডার এবং যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্তসার

ভূমি—ভূমি বলিতে ধনবিজ্ঞানে যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থ ও নৈসর্গিক শক্তি বুঝায়।

ভূমির বৈশিষ্ট্য—১। ভূমির সরবরাহ সীমাবদ্ধ, ২। ভূমির উন্নতির জন্য ব্যয় হইলেও ইহার কোন উৎপাদন-খরচ নাই, ৩। গতিশীলতার অভাব, ৪। বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা-শক্তির বিভিন্নতার জন্য ভূমির পরিবর্তন সম্ভব নহে, ৫। ভূমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি প্রযোজ্য।

ভূমির উৎপাদিকা-শক্তির উপাদান

ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি নির্ভর করে—১। নৈসর্গিক কারণ, ২। মানবীয় কারণ ও ৩। ভৌগোলিক কারণের উপর।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের অর্থ হইল যে, ভূমির পরিমাণ সমান রাখিয়া যদি অন্য দুইটি উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে শ্রম ও মূলধন যে পরিমাণে জমিতে প্রযুক্ত হয় তদপেক্ষা কম হারে ভূমি হইতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ উৎপাদন-বৃদ্ধি শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির সমানুপাতিক হয় না। ফলে, উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যদি চাষবাসের পদ্ধতির কোন পরিবর্তন না ঘটে বা জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে এই বিধিটি কার্যকরী হয়; ভূমি ব্যতীত খনিকার্যে, মৎস্যস্থলী প্রভৃতিতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। ভূমির আয়তনের ও উৎপাদিকা-শক্তির সীমাবদ্ধতার জন্যই এই বিধি কার্যকরী হয়।

ভারতের ভূমি ও কৃষিব্যবস্থা

ভারতে আবাদী জমির পরিমাণ হইল ৩২ কোটি ৪০ লক্ষ একর অর্থাৎ

সমগ্র জমির শতকরা ৫৩ ভাগ। ভারতে ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, বার্লি প্রভৃতি নানাজাতীয় খাদ্যশস্য, পাট, তুলা প্রভৃতি পণ্যশস্য, বাদাম, তিসি, সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ এবং বহুবিধ ফলমূল, শাকসব্জী প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়। ইহার কিছু পরিমাণ বিদেশেও রপ্তানী হয়।

ভারতের কৃষির ত্রুটি ও ইহার প্রতিকার

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও এদেশের কৃষিব্যবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় পশ্চাদ্পদ এবং বিঘাপ্রতি জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও অনেক কম। এই অবনত অবস্থার কারণ হইল :—

(১) জমির ক্ষুদ্রায়তন, (২) সেচব্যবস্থা ও (৩) সারের অভাব, (৪) কৃষকগণের খারাপ স্বাস্থ্য ও অজ্ঞতা, (৫) মূলধনের অভাব, (৬) পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি ও (৬) স্বল্প ও অনিশ্চিত আয়। এই দুর্গত অবস্থার প্রতিকারের উপায় হইল :—

(১) জমির একত্রীকরণ, (২) জলসেচ-ব্যবস্থার প্রসার ও সুলভে সার যোগানের ব্যবস্থা, (৩) স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শিক্ষার প্রসার-ব্যবস্থা, (৪) অল্পসুদে ধার দিবার ব্যবস্থা, (৫) কৃষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়-ব্যবস্থা ও (৬) কুটিরশিল্প প্রভৃতির উন্নতির দ্বারা তাহাদের আয়বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।

কৃষির উন্নতির জন্য সরকারী ব্যবস্থা

১। বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে জমি একত্রীকরণের আইন পাশ।

২। ঋণভার লাঘব উদ্দেশ্যে সুদের হার নির্দ্দিষ্ট করা ও সমবায় সমিতি গঠন করা।

৩। জমিদারী প্রথা ও মধ্যস্বত্বাধিকার ব্যবস্থার উচ্ছেদ।

৪। পরিকল্পনার সাহায্যে বন্যানিয়ন্ত্রণ, সেচব্যবস্থা ও বনসম্প্রসারণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৫। কুটিরশিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার-ব্যবস্থা।

৬। কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What is meant by 'land' in Economics? In what respects does it differ from other factors of production? (H. S. (Hu) Comp. 1962)
ধনবিজ্ঞানে ভূমি বলিতে কি বুঝ? উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলির সহিত ইহার কি কি পার্থক্য আছে?

উঃ—ধনবিজ্ঞানে ভূমি বলিতে যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থ (খনিজ, বনজ, জলজ) ও নৈসর্গিক শক্তি (বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক) বুঝায়।

ভূমির বৈশিষ্ট্য হইল যে, মূলধন বা শ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইলেও ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না। অন্যান্য উপাদানগুলির ন্যায় ভূমি স্থানান্তর করা যায় না। ভূমির উন্নতির জন্য ব্যয় হইলেও ভূমির কোন উৎপাদন খরচ নাই। ভূমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকরী হয়।

2. Explain the law of Diminishing Returns. Is it applicable to (a) mines and (b) manufacturing industries?
ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন সূত্রটির ব্যাখ্যা কর। এই সূত্রটি কি (ক) খনি ও (খ) শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

উঃ—কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে যদি ক্রমাগত বেশী হারে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ সমগ্র উৎপাদন পরিমাণ বাড়িলেও যে হারে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হয় সে হারে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপন্ন ফসল বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে। কিছুদিন পর্যন্ত হয়ত ফসল বৃদ্ধির হার শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির হারের সমানুপাতিক বা তদপেক্ষা বেশী হইতে পারে, কিন্তু এমন একটি সময় আসিবে যখন একই পরিমাণ জমিতে দ্বিগুণ খরচ করিয়াও দ্বিগুণ পরিমাণ ফসল পাওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং অধিক ফসল উৎপাদন করিতে হইলে অতিরিক্ত খরচ হইবে অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। যদি চাষবাসের পদ্ধতির কোন পরিবর্তন না হয় বা জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে এই বিধিটি কার্যকরী হয়।

(a) খনি ও মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে এই বিধিটি প্রযোজ্য। অধিক পরিমাণে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিতে গেলে খনির নিম্ন দেশে যাইতে হয় এবং এজন্য অধিক খরচ হয়। ব্যয়বৃদ্ধির তুলনায় খনিজ পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। খনিজ ক্ষেত্রে আরও দেখা যায় যে, ব্যয়বৃদ্ধি করিলেও এমন একটি সময় আসিবে, যখন খনিজ পদার্থ আর পাওয়া যাইবে না।

(b) শিল্পের ক্ষেত্রেও এই বিধিটি কার্যকরী হইতে পারে। তবে কৃষিক্ষেত্রে যতটা কঠোরভাবে এই বিধিটি কার্যকরী হয়, শিল্পের ক্ষেত্রে তত হয় না। কারণ কৃষিক্ষেত্রে কৃষক জমির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদক যদি কোন একটি উপাদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখিয়া অপর দুইটির পরিমাণ বৃদ্ধি করে তাহা হইলে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং এই কারণে জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন হয়। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ উৎপাদনের সব কয়টি উপাদান—শক্তি, শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধি করা যায় বলিয়া ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের

পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন হয়। কিন্তু কোন কারণে শিল্পের যদি কোন একটি উপাদানের সরবরাহ নির্দিষ্ট রাখিয়া অন্য উপাদানগুলির সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে সমগ্র উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও উৎপাদন বৃদ্ধির হার অন্য দুইটি উপাদান বৃদ্ধির সমানুপাতিক হইবে না অর্থাৎ অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে।

3. Give an account of the different forms of irrigation in India and discuss their utility.

ভারতের বিভিন্ন জাতীয় সেচব্যবস্থার বিবরণ দাও ও তৎসঙ্গে সেচব্যবস্থার উপযোগিতা আলোচনা কর।

উঃ—ভারতে সাধারণতঃ তিন প্রকারের সেচব্যবস্থা দেখা যায়। যথা, খাল (Canal), কূপ (Well) ও পুষ্করিণী (Tank)। খালগুলিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমতঃ প্লাবন খাল (Inundation Canal)। এই খালগুলি নদী হইতে খনন করা হইলেও ইহাদের গভীরতা কম এবং বর্ষাকালে নদীর অতিরিক্ত জল খালে প্রবেশ করিয়া পার্শ্ববর্তী জমিগুলির সেচের সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ, স্থায়ী খাল (Perennial Canal)—এই খালগুলিতে বারমাস জল থাকে। তৃতীয়তঃ, সঞ্চিত খাল (Storage Canal)—কোন নদী উপত্যকায় বাঁধ বাঁধিয়া যে জল আটকান যায়, সেই আবদ্ধ জল খাল কাটিয়া প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন দিকে পাঠান হয়। ভারতে কর্ষিত জমির মাত্র ১৭ ভাগ এই সেচখালের জল পায়।

উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে সাধারণতঃ কূপের সাহায্যে সেচকাজ করা হয়। কূপ দুই প্রকারের—সাধারণ কূপ ও নলকূপ। সাধারণ কূপ অপেক্ষা নলকূপ খনন ব্যয়সাধ্য। অনেক স্থলে বিদ্যুতের সাহায্যে নলকূপ হইতে জল তোলা হয়। সেচ-ব্যবস্থাধীন জমির এক-চতুর্থাংশ জমিতে এই পদ্ধতিতে জল সরবরাহ করা হয়।

দক্ষিণ-ভারতে প্রধানতঃ পুষ্করিণীর সাহায্যে সেচকাজ করা হয়। এই অঞ্চলের পার্বত্য-ভূমিতে খালকাটা সম্ভব নয়। ভারতে মোট ৬০ লক্ষ একর জমিতে পুষ্করিণীর সাহায্যে সেচকাজ সম্পন্ন হয়। তবে পুষ্করিণীগুলি যাহাতে দ্রুত ভরাট না হয়, সেজন্য অনেক ব্যয় করিতে হয়।

ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে সেচব্যবস্থার যথেষ্ট উপযোগিতা দেখা যায়। পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতি অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে খনন করা যায়। সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়াও সাধারণ লোকে এগুলি খনন করিতে পারে। বিদেশী সাহায্য ব্যতীত দেশীয় প্রচেষ্টা দ্বারা এগুলি কার্যকরী করা সম্ভব। জমিতে জল দেওয়া ছাড়াও এগুলি পানীয় জল সরবরাহ করে। পুষ্করিণীতে মৎস্যের চাষ করা যায় ও মৎস্যের স্থানীয় চাহিদা মেটান যায়। সেচখালগুলি ব্যয়সাধ্য হইলেও এগুলিও বিদেশী সাহায্য ব্যতীত খনন করা সম্ভব। জমিতে জলসেচ করা ব্যতীতও এই খালগুলির সাহায্যে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ করা যায়। স্বল্প খরচে যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত হয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। এই খাল-গুলিতে মৎস্যের চাষ করা যায়। বড় বড় সেচ-পরিকল্পনার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব হয়। সুপরিকল্পিত সেচব্যবস্থার সাহায্যে দেশের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

4 Explain the causes of the low agricultural yield in India. What measures would you suggest for the improvement of agricultural productivity ?

ভারতে জমির উৎপাদন স্বল্পতার কারণ কি ? কি উপায়ে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি করা যাইতে পারে ?

উঃ—ভারতে শতকরা প্রায় ৬৭ জন লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে এবং জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৭'৬ ভাগ কৃষি হইতে পাওয়া যায়। এইজন্য ভারতকে কৃষিপ্রধান দেশ বলা হয়। কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও ভারতের এক একর জমিতে উৎপাদন পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় নগণ্য। জাপানে এক একর জমিতে যে পরিমাণ ধান হয় বা মার্কিন দেশে এক একর জমিতে যে গম হয় অথবা জাভায় এক একর জমিতে যে পরিমাণ ইক্ষু জন্মে ভারতের এক একর জমিতে কোন কোন স্থলে তাহার এক-তৃতীয়াংশ এমন কি এক-চতুর্থাংশ জন্মে। ভারতের জমির এই উৎপাদন স্বল্পতার নানা কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ও গ্রামবাসিগণের বিকল্প বৃত্তির অভাবে জমির অতিক্ষুদ্র আয়তন, উত্তরাধিকার আইন ও যৌথ পরিবার-প্রথার উচ্ছেদের ফলে জমির খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ততা, কুটিরশিল্পের অবনতি, সেচব্যবস্থার অভাব ও বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা, সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা, কৃষি-বিষয়ক শিক্ষার অভাব ও কৃষকের চরম দুরবস্থা প্রভৃতি হইল উৎপাদন স্বল্পতার কারণ।

জমির উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রথমতঃ, কৃষকের দুরবস্থা দূর করিতে হইবে। কারণ কৃষক ছাড়া কৃষির উন্নতি হইতে পারে না। কৃষককে ঋণভার মুক্ত করিয়া তাহার শারীরিক ও মানসিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার চাই। ইহা ছাড়া, সেচব্যবস্থার উন্নতি, সস্তায় সার যোগান দিবার ব্যবস্থা, জমির খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ততা নিরোধ করিতে হইবে। কৃষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত বিক্রয় ব্যবস্থা ও সহজ ঋণদানের ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদিগের আর্থিক সংকট দূর করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

মূলধন বা পুঁজি

(Capital)

মূলধনের সংজ্ঞা—Definition of Capital

ধনবিজ্ঞানে মূলধন শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। ধন বা সম্পদ মাত্রই আমাদের কোন-না-কোন অভাব দূর করিতে পারে। কোন ধন প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অভাব দূর করিতে পারে এবং এই জাতীয় ধনকে ভোগ্যবস্তু বলা হয়; যথা, খাদ্য, বস্ত্র, গায়কের গান ইত্যাদি। আবার, আর কতকগুলি ধন আছে যাহা পরোক্ষভাবে আমাদের অভাব দূর করে; যেমন, লাঙ্গল, মেসিন, তাঁত ইত্যাদি। এইগুলিকে মূলধন দ্রব্য বলা হয়, কারণ এই-গুলির সাহায্যে যে দ্রব্যগুলি তৈয়ারী হয়, সেগুলি আমাদের অভাব দূর করে। সুতরাং মূলধন হইল ধনের সেই অংশ, যে অংশের সাহায্যে আরও অধিক দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। মেশিন, কলকারখানা, কারখানাবাড়ী, কাঁচামাল, শ্রমিকদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি যাহা কিছু উৎপাদনে সাহায্য করে, তাহাকে মূলধন বলা যাইতে পারে।

ভূমি ও মূলধন—Land and Capital

ভূমি ও মূলধন উভয় দ্রব্যই উৎপাদনের উপাদান হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ভূমি প্রকৃতির দান, মানুষ ইহা সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যের উপর মানুষের শ্রম প্রয়োগ করিয়া মূলধনের সৃষ্টি হয়। এইজন্য অনেকে মূলধনকে শ্রমের দ্বারা উৎপাদনের উপাদান (producod means of production) বলেন। দ্বিতীয়তঃ, ভূমির পরিমাণ নির্দিষ্ট। মানুষ চেষ্টা করিয়াও ইহার বৃদ্ধি করিতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘ সময়ে মূলধন-পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। তৃতীয়তঃ, ভূমির গতিশীলতা নাই—ইহা স্থানান্তর করা যায় না। কিন্তু যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি মূলধন স্থানান্তরযোগ্য। চতুর্থতঃ, ভূমির বিনাশ নাই, কিন্তু মূলধন শেষ পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ধন ও মূলধন—Wealth and Capital

ধন ও মূলধনের পার্থক্য করিতে গেলে বলা চলে যে, সকল মূলধনই ধন, কিন্তু সকল ধন মূলধন না-হইতেও পারে। যখন কোন উৎপাদিত দ্রব্য বর্তমান অভাব পূরণের জন্য ভোগ-ব্যবহার করা হয়, তখন তাহাকে ধন বলা হয়—আর উৎপাদিত দ্রব্যটি যদি আশু প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যবহার না করিয়া অধিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপাদান-হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে দ্রব্যটিকে মূলধন বলা যাইতে পারে। উৎপন্ন ধান্যকে যদি চাউলে পরিবর্তিত করিয়া বর্তমানে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে ধন বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ধান্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহার না করিয়া আরও ধান্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যদি বীজধান হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে ঐ ধান্যকে মূলধন বলা যায়। কোন দ্রব্য ধন কি মূলধন তাহা স্থির করিতে হইলে কি উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করা হইতেছে তাহা দেখিতে হইবে। সুতরাং যে ধন মানুষের পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং যাহা আরও অধিক উৎপাদন-কার্যে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহাই হইল মূলধন।

মূলধন ও আয়—Capital and Income

মূলধন হইল আয়প্রদ অর্থাৎ আয়ের উৎস। উৎপাদিত ধনের যে অংশ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত ও একত্রীভূত করিয়া রাখা হয় এবং মূলধনের অধিকারী তাহার এই সঞ্চিত মূলধন হইতে যে নিয়মিত প্রতিদান পান, তাহা হইল আয়। গৃহ নির্মাণ করিয়া অপর ব্যক্তিকে ভাড়া দিলে, গৃহ হইল মূলধন এবং গৃহ হইতে মাসিক যে ভাড়া পাওয়া যায়, তাহাকে আয় বলা হয়। সুতরাং মূলধন হইতে প্রাপ্ত আয়কে একটা প্রবাহ বলা যাইতে পারে, আর মূলধন হইল একটি আয়প্রদ সঞ্চিত তহবিল। মূলধন হইতে প্রাপ্ত আয় সঞ্চিত হইয়া পুনরায় মূলধন সৃষ্টি করিতে পারে।

মূলধন ও অর্থ—Capital and Money

ব্যবসায়ীর ভাষায় অর্থ ও মূলধন একার্থবোধক হইলেও অর্থকে ঠিক মূলধন বলা যায় না। অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই মূলধন বৃদ্ধি পায় না। ভারতে বর্তমানে অর্থের প্রাচুর্য থাকিলেও মূলধনের নিতান্ত অভাব দেখা যায়। অর্থ বিনিময়ের বাহন। অর্থদ্বারা উৎপাদনের উপাদান ও ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করা

যায় এবং এই দ্রব্যগুলির মূল্য পরিমাপ করা যায়। কিন্তু অর্থের সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন পরিচালনা করা যায় না।

মূলধনের প্রকার-ভেদ—Different forms of Capital

মূলধনকে সাধারণতঃ স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital) ও চল্‌তি বা পরিবর্তনশীল মূলধন (Circulating Capital) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, বাড়ীঘর প্রভৃতি যে মূলধনগুলি বহুদিন ধরিয়া উৎপাদন-কার্যে সাহায্য করে, তাহাদিগকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়। উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল, খাদ্যবস্তু যাহা একাধিকবার উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় না—যাহা একবার ব্যবহার করিলে অন্যরূপ ধারণ করে, তাহাকে পরিবর্তনশীল বা চল্‌তি মূলধন বলা হয়। কলে তুলা দিলে তুলা সুতায় রূপান্তরিত হয়—একই তুলা এক-বারের অধিক ব্যবহার করা যায় না। সুতরাং তুলা হইল চল্‌তি বা পরিবর্তনশীল মূলধন, কিন্তু যে কল তুলাকে সুতায় পরিবর্তিত করে তাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া বারবার ঐ একই কাজ করে ; একবার ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং কল হইল স্থায়ী মূলধন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, স্থায়ী এবং চল্‌তি মূলধনের এই পার্থক্য মূলগত পার্থক্য নহে। একই দ্রব্য স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে চল্‌তি ও স্থায়ী উভয়বিধ মূলধন হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। সেলাইয়ের কল ক্রেতার নিকট স্থায়ী মূলধন হইলেও বিক্রেতার নিকট চল্‌তি মূলধন। ৫০ মাইল ভ্রমণে মোটর গাড়ীর পেট্রোল চল্‌তি মূলধন ও চাকার রবার স্থায়ী মূলধন বলিয়া কথিত হইলেও ৫০০ মাইল ভ্রমণ-ক্ষেত্রে পেট্রোল ও টায়ার উভয়কেই চল্‌তি মূলধন বলা চলে।

মূলধনকে আবার উৎপাদক মূলধন (Producer's Capital) ও উপভোগ্য মূলধন (Consumer's Capital) বলা হয়। যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা যাহা উৎপাদনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে, তাহাকে যান্ত্রিক বা উৎপাদক মূলধন বলা হয়। যে সমস্ত মূলধন, যথা, খাদ্য-বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকগণের অভাবমোচন করিয়া উৎপাদনে সাহায্য করে সেগুলিকে উপভোগ্য মূলধন বলা হয়।

যে সমস্ত মূলধন একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন-কার্যে ব্যবহৃত হয়, অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যায় না, তাহাদিগকে নিমজ্জ বা বিশিষ্ট (Sunk or Specialised) মূলধন বলা হয় ; যেমন, কাঠ কাটিবার জন্য করাত শুধু একই কাজে লাগে। যে

মূলধন উৎপাদনের বহুক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, তাহাকে ভাসমান (Floating) মূলধন বলা হয়, যেমন কয়লা বা লৌহ। একাধিক উৎপাদন-কার্যে ইহার ব্যবহার হয়।

মূলধনের কাজ—Functions of Capital

মূলধন ছাড়া উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি ও উৎপাদনের উৎকর্ষ সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, মূলধনের সাহায্যে যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, মূলধন কাঁচামাল সংগ্রহ ব্যাপারে সাহায্য করে। তৃতীয়তঃ, যাহারা উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত থাকে, মূলধন সেই সমস্ত কর্মীকে ভোগ্যবস্তু সরবরাহ করিয়া পরোক্ষভাবে উৎপাদনে সাহায্য করে। চতুর্থতঃ, উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধন প্রয়োগের ফলে শ্রমবিভাগ সম্ভব হইযাছে। উৎপাদনে শ্রমবিভাগ নীতি প্রযুক্ত হওয়ার ফলে শ্রমিক তাহার গুণ ও যোগ্যতানুসারে কাজ করিতে পারে। সুতরাং শ্রমবিভাগ নীতির ভিত্তিতে উৎপাদন কায পরিচালিত হওয়ার ফলে একদিকে শ্রমিকের শ্রমভার লাঘব হইয়াছে, অপর দিকে শ্রমবিভাগ শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি কারয়া উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে।

চলতি মূলধনের সাহায্যে আধুনিক সময়সাপেক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একটি বস্ত্রশিল্প গঠিত হইয়া বস্ত্র তৈয়ারী হইয়া বাজারে বিক্রীত হইতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। শ্রমিকেরা এতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে না। চলতি মূলধন হইতেই এই জাতীয় শিল্পে নিযুক্ত কর্মিগণকে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হইয়া থাকে। মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। মার্কিনদেশ উন্নত, তাহার প্রধান কারণ হইল দেশে মূলধনেব অভাব নাই। আর ভারত অনুন্নত, তাহার প্রধান কাবণ হইল দেশে মূলধনের অভাব—তাই ভারত অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য বিদেশ হইতে মূলধন সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত।

মূলধন গঠনের উপাদান—Factors governing formation of Capital

দেশের মূলধনবৃদ্ধি ইহার সঞ্চয়েব উপর নির্ভর করে। দেশের সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে দুইটি অবস্থার উপর। একটি অবস্থা হইল মানসিক (Subjec-

tive) অর্থাৎ সঞ্চয়ের ইচ্ছা (Will to Save) অপরটি বাহ্যিক (Objective) অর্থাৎ সঞ্চয়ের ক্ষমতা (Power to Save) ।

সঞ্চয়ের ইচ্ছা—মানুষের দূরদৃষ্টি, স্বজনপ্রীতি এবং সমাজে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে। ভবিষ্যৎ অজানা ও অনিশ্চিত। এই ভবিষ্যতের জন্যই মানুষ সঞ্চয় করে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, বিধবা হইলে স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য লোকে সঞ্চয় করে। শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দূরদৃষ্টি ও কর্তব্যবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি মানুষের একটি জন্মগত সংস্কার। অসভ্য মানুষও কোন কিছু পাইলেই তাহার কিয়দংশ আগামী কালের জন্য রাখিয়া দেয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষাও মানুষের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে।

সঞ্চয়ের ক্ষমতা—মূলধন গঠন শুধু সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না—সঙ্গে সঙ্গে লোকের সঞ্চয়েব ক্ষমতাও থাকা চাই। এজন্য ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হওয়া প্রয়োজন। যেখানে কোন উদ্বৃত্ত নাই, সেখানে সঞ্চয় সম্ভব নয়। সুশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া লোকের জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্তা সৃষ্টি না হইলে লোকে সঞ্চয় কবিতে সাহস করে না। দস্যু-তস্কর বা অত্যাচারী সরকার বর্তমান থাকিলে লোকে সঞ্চিত ধন ভোগ করিতে পারে না। সঞ্চয়ের জন্য দেশে সঞ্চয়ের সুযোগ-সুবিধা থাকা চাই। এই উদ্দেশ্যে দেশে বহু ব্যাঙ্ক, বীমা-কোম্পানী, অংশীদারী কারবার প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক। এই প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে। সুদের হার যদি বেশী হয়, তাহা হইলে লোকে সঞ্চয়ে আকৃষ্ট হয়। তবে একথা সব সময়ে সত্য নহে। ইহা ছাড়া, একটি দেশে প্রচলিত ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রথা ও অনুষ্ঠানগুলিও পরোক্ষভাবে সঞ্চয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতবাং দেখা যাইতেছে যে, একটি দেশের মূলধন-গঠন নানা জটিল অবস্থার উপর নির্ভর করে।

মূলধন সংগঠন—Capital Formation

মূলধন সংগঠন সাধারণতঃ তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথমতঃ, ব্যয় সংকোচ সাহায্যে সঞ্চয় সৃষ্টি, দ্বিতীয়তঃ, সঞ্চিত অর্থকে যথাযথভাবে আয়ের উৎসরূপে বিনিয়োগ করা এবং তৃতীয়তঃ, এই নিযুক্ত অর্থকে মূলধনী দ্রব্যে (যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা ইত্যাদি) রূপান্তরিত করা।

সঞ্চয়ের এই তিনটি স্তর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সঞ্চয়ের প্রাথমিক স্তর হইল সঞ্চয়। সঞ্চয়ের জন্য ভোগ নিবৃত্তির প্রয়োজন। এজন্য সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও তৎসঙ্গে সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকা চাই। অনুন্নত দেশগুলিতে লোকের মাথাপিছু আয় এত কম যে, তাহাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতা নাই। মূলধন গঠনের দ্বিতীয় স্তর হইল সঞ্চয়ের যথাযথ বিনিয়োগ। এজন্যও বিনিয়োগের ইচ্ছা ও বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা থাকা একান্ত আবশ্যক। অনুন্নত দেশগুলিতে সঞ্চয় বিনিয়োগের ক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ। ব্যাঙ্ক, বীমা, ব্যবসায় প্রভৃতি সঞ্চয় বিনিয়োগ-কারী প্রতিষ্ঠানের অভাবই হইল বিনিয়োগের প্রধান অন্তরায়। ইহা ছাড়া অনুন্নত দেশের লোকেরা ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প-বাণিজ্যে তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগ করিতে চায় না। তৃতীয়তঃ, সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে মূলধনী দ্রব্য ও উৎপাদনের সহায়ক ভারী ও মূল শিল্পগুলির প্রসার প্রয়োজন। অনুন্নত দেশগুলিতে এই সমস্ত ব্যবস্থার একান্ত অভাবের ফলে মূলধন গঠন সম্ভব হয় না।

ভারতে মূলধনের অভাবের কারণ—Causes of paucity of Capital in India

ভারতে মূলধনের একান্ত অভাব দেখা যায়। ভারতবাসীর চরম দারিদ্র্যই হইল মূলধনের অভাবের প্রধান কারণ। যে দেশের লোকের মাথাপিছু মাসিক আয় হইল মাত্র ২৭ টাকা সে দেশে সঞ্চয় দ্বারা মূলধন বৃদ্ধির আশা দুরাশা মাত্র। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী আর এই কৃষকগণই হইল সর্বাপেক্ষা গরীব। সুতরাং কৃষকদের দারিদ্র্য দূর করিয়া তাহাদের আয় বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা না হইলে মূলধন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। শুধু আয়বৃদ্ধি করিলেই চলিবে না, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিয়া তাহাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করিতে হইবে। ভারতের লোক ধর্মপ্রাণ ও আচারনিষ্ঠ। নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাহারা সাধ্যাতীত ব্যয় করে। এই জাতীয় ব্যয় শিক্ষা বিস্তার করিয়া নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয়ের সুযোগ নাই বলিলেও চলে। সঞ্চয় বৃদ্ধি করিতে হইলে গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ক, সেভিংস ব্যাঙ্ক, সমবায়সমিতি প্রভৃতি গঠন করিয়া গ্রামবাসিগণকে সঞ্চয় করিবার সুযোগ দিবার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। ভারত সরকার বর্তমানে এবিষয়ে অবহিত হইয়া স্টেট ব্যাঙ্কের সাহায্যে গ্রাম-এলাকায় আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সুযোগ সম্প্রসারিত করিতেছেন।

সংক্ষিপ্তসার

মূলধন—ধনের যে অংশ অধিক উৎপাদনে সাহায্য করে, তাহাকে মূলধন বলা হয়। মূলধন হইল আয়ের উৎস। মূলধন ভূমির ন্যায় প্রাকৃতিক উপাদান নহে। মানুষ প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যের উপর শ্রম প্রয়োগ করিয়া মূলধন সৃষ্টি করে।

ভূমি ও মূলধন—উৎপাদনের একটি উপাদান হইলেও ভূমির সহিত মূলধনের পার্থক্য দেখা যায়। ১। ভূমির পরিমাণ নির্দিষ্ট, মূলধনের পরিমাণ পরিবর্তন করা চলে, ২। ভূমি প্রকৃতির দান, মূলধন মনুষ্যসৃষ্ট, ৩। মূলধন শেষ পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভূমির বিনাশ নাই, ৪। মূলধন স্থানান্তরযোগ্য, কিন্তু ভূমি নহে।

মূলধনের প্রকারভেদ—গৃহ, কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়, কারণ ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া উৎপাদনে সাহায্য করে, কিন্তু কাঁচামাল প্রভৃতি একাধিকবার উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় না বলিয়া ইহাদিগকে চলতি মূলধন বলা হয়। মূলধনকে আবার উৎপাদক ও ভোগ্য মূলধন বলা হয়।

মূলধনের কাজ

(১) মূলধন উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে। (২) মূলধন যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি সরবরাহ করে। (৩) উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকগণকে ভোগ্যবস্তু সরবরাহ করে।

মূলধন-গঠনের উপাদান

মূলধন-গঠন নির্ভর করে (১) সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও (২) সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর। সঞ্চয়ের ইচ্ছা লোকের দূরদৃষ্টি, পারিবারিক স্নেহ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু সঞ্চয়ের ক্ষমতা না থাকিলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইতে পারে না। সঞ্চয় ক্ষমতা নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে, যথা, উদ্বৃত্ত আয়, জীবন ও ধনের নিরাপত্তা, সঞ্চয় করিবার সুযোগ, সুদের হার প্রভৃতি।

ভারতে মূলধনের অভাবের কারণ

দারিদ্র্যের জন্য ভারতবাসীর উদ্বৃত্ত আয় নাই, কাজেই সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেও সঞ্চয়ের ক্ষমতা নাই। নানাজাতীয় সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাহারা অত্যধিক ব্যয় করে। শিক্ষার অভাবে দূরদৃষ্টির অভাবহেতু এবং ব্যাঙ্ক ও বীমা-কোম্পানীর অভাবে তাহারা সঞ্চয়ের সুযোগও পায় না।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Define capital.

Distinguish between Fixed capital and Circulating capital.

মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর ও স্থায়ী ও চল্‌তি মূলধনের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

উঃ। উৎপাদিত ধনের যে অংশ পুনরায় উৎপাদন-কার্যে ব্যবহৃত হয় তাহাকে মূলধন বলা হয়। সুতরাং মূলধন হইল (ক) ধনের অংশ ও (খ) মনুষ্য উৎপাদিত। যন্ত্রপাতি, কারখানা-গৃহ, কাঁচামাল, শ্রমিকগণের জন্য মজুত খাদ্যাদি মূলধন পর্যায়ভুক্ত।

যে সমস্ত দ্রব্য দীর্ঘদিন ধরিয়া উৎপাদন-কার্যে সাহায্য করে, একবার ব্যবহারে নিঃশেষ হয় না তাহাদিগকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়, যথা যন্ত্রপাতি, কারখানাগৃহ প্রভৃতি। আর যে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন কার্যে একবারের অধিক ব্যবহার করা যায় না, তাহাকে চল্‌তি মূলধন বলা হয়। কাপড়ের কলে যে সূতা ব্যবহার করা হয় তাহা একবারের অধিক ব্যবহার করা যায় না। কারণ সূতা কাপড়ে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু কাপড়ের কল অপরিবর্তিত থাকিয়া বহুদিন পর্যন্ত বহু পরিমাণ কাপড় প্রস্তুত করিতে সাহায্য করে। সুতরাং কল হইল স্থায়ী মূলধন, আর সূতা হইল চল্‌তি মূলধন।

2. Define 'Capital' and point out how it helps production.

H S (Hu) Comp. 1961

মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উৎপাদনে মূলধনের কার্যকারিতা বর্ণনা কর।

উঃ। প্রথম প্রশ্নের প্রথম প্যারা দ্রষ্টব্য।

মূলধন হইল উৎপাদনের একটি একান্ত সহায়ক উপাদান। বর্তমান যুগে মূলধন (যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা প্রভৃতি) ব্যতীত কোনপ্রকার উৎপাদন কার্যই চলিতে পারে না।

মূলধনের প্রধান কাজ হইল (১) শ্রমিকের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা। (২) মূলধন ব্যবহারের ফলে উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও উৎপাদন-খরচা কম হয়। এই কারণেই হস্তচালিত তাঁত অপেক্ষা কাপড়ের কলে অধিক পরিমাণ বস্ত্র অল্প খরচায় অল্প সময়ে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। (৩) উৎপাদন ব্যয় কমিলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায় ও সাধারণ লোকে অল্পমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। (৪) মূলধনের সাহায্যে সূক্ষ্ম কাজ সম্ভব হয়। (৫) বর্তমানে মূলধন সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনে দীর্ঘ সময় লাগে। কল-কারখানা স্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া ভোগ্যবস্তু উৎপাদন পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। এই অন্তর্বর্তী সময়ে মূলধন শ্রমিক ও মালিককে কাঁচামাল, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সরবরাহ করে।

3. What is capital ? What are the factors upon which the accumulation of capital depends ?

H S (Hu) Comp 1962

মূলধন কি? মূলধন সঞ্চয় কি অবস্থার উপর নির্ভর করে?

উঃ। প্রথম প্রশ্নের প্রথম প্যারা দ্রষ্টব্য। দেশে মূলধন বৃদ্ধি দুইটি অবস্থার উপর নির্ভর করে: (১) সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও (২) সঞ্চয়ের শক্তি।

১। সঞ্চয়ের ইচ্ছা না থাকিলে সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময়ে সঞ্চয় করা যায় না। লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা নির্ভর করে (ক) পারিবারিক স্নেহ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ যশ ও মর্যাদা লাভের ইচ্ছা, (খ) দূরদৃষ্টি অর্থাৎ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করিবার প্রবৃত্তি, (গ) উপার্জিত অর্থের নিরাপত্তা (দেশে সুশাসনব্যবস্থা থাকা চাই), (ঘ) সঞ্চয় করিবার সুযোগ অর্থাৎ দেশে বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি থাকা চাই, (ঙ) সুদের হার অর্থাৎ সুদের হার বেশী হইলে লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা বেশী হইবে।

২। সঞ্চয়ের ক্ষমতা না থাকিলে শুধু ইচ্ছা থাকিলেও সঞ্চয় করা যায় না। সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজন হইল উদ্বৃত্ত আয় অর্থাৎ ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হওয়া।

দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির আধিক্যে অনেক সময় সঞ্চয় ব্যাহত হয়, যেমন, আমাদের দেশে লোকে পূজা পার্বণ সাধ্যাতীত ব্যয় করে—সুতরাং সঞ্চয় করিতে পারে না। ভারতের পিতা মাতা স্নেহশীল হইলেও তাহাদের উদ্বৃত্ত আয় নাই বলিয়া ও সঞ্চয়ের সুযোগ-সুবিধার অভাবে ভারতে মূলধন বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কারিগরি নৈপুণ্য

(Technical Skill)

কারিগরি নৈপুণ্য ও ইহার গুরুত্ব—Technical Skill and its importance

যে-কোন প্রকারের উৎপাদনই হউক না কেন বুদ্ধি ও কৌশল ব্যতীত উৎপাদন-কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। আদিম মানুষ যখন বনের ফল ও পশুপক্ষীর মাংস দ্বারা তাহার ক্ষুধা মিটাইত, তখনও এই কারিগরি নৈপুণ্যের প্রয়োজন ছিল। গাছে সকলেই উঠিতে পারে না—ইহার জন্যও গাছে উঠিবার কৌশল আয়ত্ত করা দরকার। আবার তীরধনুক প্রস্তুত এবং তীরধনুক ব্যবহার করিবার জন্য কৌশলের প্রয়োজন হইত। এই কৌশলের পার্থক্যের জন্যই বিভিন্ন শিকারীর শিকার-লব্ধ মাংসের পরিমাণের পার্থক্য হইত। শুধু তীরধনুক প্রস্তুত অথবা ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করিলেই চলিত না, এইগুলি অকেজো হইয়া গেলে ইহাদিগকে মেরামত করিবার জন্যও বুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োজন হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সহায়ক সামগ্রী তৈয়ারী করিতে, এই সামগ্রীগুলির ব্যবহারক্ষেত্রে এবং এই সহায়ক সামগ্রীগুলি মেরামত করিবার ক্ষেত্রে যে বুদ্ধি ও বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তাহাই কারিগরি জ্ঞান। এই জ্ঞান ব্যতীত উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এই কারিগরি জ্ঞানের পার্থক্যের ভিত্তিতেই বিভিন্ন দেশে তন্তুবায়, কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি শ্রেণীর আবির্ভাব হয়।

যে যুগে আমরা বাস করি তাহা হইল যান্ত্রিক যুগ। বর্তমান যুগে এমন কাজ খুব কমই আছে যাহা যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত করা হয়। চুলছাঁটা, সেলাই করা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য প্রস্তুত করা পর্যন্ত সব কাজেই ছোট-বড় যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। উৎপাদনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দৈহিক শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে বাষ্পীয় অথবা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়। বর্তমান যুগে যন্ত্রের সাহায্যে নৈসর্গিক শক্তিসমূহকে মানুষের কাজে ব্যবহার করা

হইতেছে। বর্তমান যুগে আমাদের অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও প্রস্তুত পদ্ধতি যন্ত্রের সাহায্যে হয়। আমাদের পরিধেয়, স্থানান্তর-গমন, আলো-হাওয়া এবং অবসর-বিনোদনের জন্য বেতার, চলচ্চিত্র প্রভৃতিও যন্ত্রের সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে যন্ত্রের ব্যবহার দিন-দিনই বাড়িতেছে এবং ভবিষ্যতেও বাড়িবে বলিয়া মনে হয়।

যন্ত্রের এই বহুল প্রসারের জন্যই আমরা যন্ত্রনির্মাতা ও যন্ত্রবিশেষজ্ঞ হইতে চাই। যন্ত্রনির্মাণ, যন্ত্রের যথাযথ ব্যবহার ও যন্ত্র খারাপ হইলে তাহা মেরামত করিবার জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন, তাহা আয়ত্ত করিতে না পারিলে কোন দেশই বর্তমান যুগে উৎপাদনেব পরিমাণ ও উৎপাদনের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মধ্যে মার্কিন দেশ, ইংলণ্ড, জার্মানী ও আধুনিক কালে রুশ দেশ যে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে এই যান্ত্রিক জ্ঞান ও কারিগরি নৈপুণ্য। ভারতে উন্নত ধরণের উৎপাদন-পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে হইলে, ভারতের পক্ষে এই যান্ত্রিক জ্ঞান আহরণ ও আয়ত্ত করা এবং উৎপাদন-পদ্ধতিতে কারিগরি নৈপুণ্য প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন।

কি কি বিষয়ের উপর কারিগরি দক্ষতা নির্ভর করে—Factors governing the formation of Technical Skill

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আধুনিক কালে যন্ত্রবিদ্ ও যন্ত্র-পরিচালনার দক্ষতা না থাকিলে উৎপাদন-কার্যে উৎকর্ষ লাভ করা যায় না। এখন দেখা যাউক কি কি বিষয়ের উপর এই কারিগরি নৈপুণ্য নির্ভর করে।

১। বংশগত দক্ষতা—Hereditary Skill

মানুষ অনেক সময় তাহার সহজাত বুদ্ধির সাহায্যে কিছু কিছু উৎপাদন-কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা উৎপাদনের বহু সহায়ক যন্ত্র ও নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে। নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হইলে পরিবারের প্রায় সকলেই সেই কৌশলের সহিত পরিচিত হয়। এইরূপে এই কৌশল ও নৈপুণ্য

পিতা হইতে পুত্রে ও পুত্র হইতে পৌত্রে সংক্রামিত হইয়া বংশানুক্রমিক দক্ষতায় পরিণত হয়। এই বংশানুক্রমিক দক্ষতার ভিত্তিতেই ভারতে কর্মকার, তন্তুবায়, স্বর্ণকার প্রভৃতির আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।

২। *সাধারণ শিক্ষা ও যন্ত্রবিদ্যার প্রসার*—**General and Technical Education**

বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ও কার্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না হইলে শ্রমিকের দক্ষতা জন্মে না। এইজন্য সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ সাধন করিয়া জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে এই শিক্ষা-জাত বুদ্ধি ও বিবেচনা প্রয়োগ করিতে সাহায্য করে। সাধারণ শিক্ষার দ্বারা মানুষের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায় বলিয়া এই শিক্ষা শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু শুধু সাধারণ শিক্ষা যথেষ্ট নহে। বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেচনা-শক্তি তীক্ষ্ণ হইলেও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে যদি বিশেষ জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে শুধু বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কাজ করা যায় না। ইংরেজীতে এম এ. পাশ করিলেই মোটর গাড়ী মেরামত করা যায় না—এজন্য বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় এবং এই জ্ঞানের উৎস হইল কারিগরি শিক্ষা। আধুনিক যুগে ক্ষুদ্র বৃহৎ সব রকম উৎপাদন-ক্ষেত্রেই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। বৃহৎ শিল্পে বহু জটিল যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদন-পদ্ধতিও সাধারণতঃ জটিল হয়। এই সকল যন্ত্র ব্যবহার শুধু বংশগত শিক্ষা বা সাধারণ শিক্ষার দ্বারা সম্ভব নয়। এই সকল যন্ত্র ব্যবহার এবং জটিল পদ্ধতি আয়ত্ত করিবার জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। এই শিক্ষা না থাকিলে আধুনিক যান্ত্রিক যুগে শ্রমিকের দক্ষতা জন্মিতে পারে না। এইজন্য কারিগরি শিক্ষার বহুল প্রসার একান্ত অপরিহার্য।

৩। *কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন*—**Establishment of Technical Institutions**

কারিগরি শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে দেশে যথেষ্ট সংখ্যক কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। কারিগরি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা না থাকিলে লোকে এই দিকে আকৃষ্ট হয় না এবং ফলে দেশে শুধু সাধারণ শিক্ষা প্রসার লাভ করিয়া বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। লোকে কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ হয় ও দেশের উৎপাদন-পরিমাণ হ্রাস পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, রুশ, জাপান প্রভৃতি দেশে কারিগরি শিক্ষা দেশের সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার

করিয়া আছে এবং ঐ দেশগুলির সরকার কারিগরি শিক্ষার জন্য নানাজাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। এজন্য সরকার ব্যয় করিতেও কার্পণ্য করেন না। ভারতে প্রয়োজনের তুলনায় এজাতীয় প্রতিষ্ঠানের নিতান্ত অভাব।

৪। যন্ত্রনির্মাণ কারখানা স্থাপন—Development of Machine and Tool Industries

দেশের লোককে কারিগরি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া যন্ত্রবিদ্ করিতে হইলে যথেষ্ট পরিমাণে যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা থাকা চাই। এজন্য দেশে যন্ত্র তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা থাকা চাই। যন্ত্রের ব্যবহার যতই প্রসার লাভ করিবে, কারিগরি শিক্ষার প্রতি লোকে ততই আকৃষ্ট হইবে।

৫। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প স্থাপন—Development of Small and Large-scale Industries

দেশে যদি নানাজাতীয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান থাকে, তাহা হইলে এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য যন্ত্রনির্মাণ, যন্ত্র-মেরামত ও যন্ত্র-পরিচালনা করিবার দক্ষতার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার জন্য এ দেশের লোক কারিগরি শিক্ষার মর্যাদা ও উপযোগিতা এতদিন বুঝিতে পারে নাই।

৬। প্রগতিশীল মনোবৃত্তি—Progressive outlook of life

যে দেশের লোক অত্যধিক মাত্রায় রক্ষণশীল, যাহা কিছু পুরাতন তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, সে দেশের লোকের কারিগরি নৈপুণ্য জন্মিতে পারে না। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদন-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইলে কারিগরি শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং দেশের জনসাধারণকে অগ্রগতির সহায়ক নূতন নূতন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে। নূতনত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইলে আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির ফল সম্পূর্ণভাবে ভোগ করা সম্ভব। এইজন্য যাহা কিছু ভাল তাহাই গ্রহণ করিব, যাহা কিছু মন্দ তাহা বর্জন করিব—সে নূতনই হউক আর পুরাতনই হউক—এইরূপ মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে না পারিলে দেশে কারিগরি নৈপুণ্য জন্মিতে পারে না। জাপান ও রুশ দেশ এই মনোবৃত্তির ফলে কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও শিল্প-নৈপুণ্যে জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

৭। সরকারী অনুপ্রেরণা—Government Initiative

কোনদেশেই বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশগুলিতে সরকারী প্রচেষ্টা ব্যতীত শিল্পজ্ঞান ও শিল্প-নৈপুণ্য সম্ভব নহে। দেশের সরকার সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা বিস্তার করিয়া জনসাধারণকে এইদিকে আকৃষ্ট করিতে পারে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সরকারী সাহায্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সরকার বিদেশী সাহায্যও সংগ্রহ করিতে পারেন—যাহা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব নহে।

ভারতে কারিগরি শিক্ষা—Technical Education in India

ভারতে বহুদিন পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র ছিল কুটির-শিল্পগুলি। কুটির-শিল্পের ক্ষেত্রে যে কারিগরি নৈপুণ্যের প্রয়োজন হইত তাহা বংশগত শিক্ষার দ্বারা অর্জিত হইত—এজন্য কোন স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ইংরাজ শাসনকালে নানা কারণে এই কুটির-শিল্পগুলির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই বংশানুক্রমিক শিক্ষাও লোপ পাইতে থাকে। ইংরাজ সরকার অবশ্য ইদানীং কালে ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাহাদের প্রয়োজনমত কিছু কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তন করেন। এই শিক্ষার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাই প্রধান ছিল, কিন্তু অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্রে যে কারিগরি নৈপুণ্য প্রয়োজন হয়, সে সম্পর্কে বিদেশী শাসকগণ সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন।

দেশ স্বাধীন হইবার পর জাতীয় সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হইয়া দেশে কারিগরি শিক্ষার বিস্তার-কল্পে নানা স্থানে কারিগরি বিদ্যালয় ও গবেষণাগার-স্থাপন, রাষ্ট্রীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠন, কারিগরি শিক্ষা-সংক্রান্ত সর্বভারতীয় সংস্থা-গঠন প্রভৃতি দ্বারা কারিগরি জ্ঞানবিস্তারে সাহায্য করিতেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণকাল হইতেই ছাত্রগণ যাহাতে এদিকে আকৃষ্ট হয় তজ্জন্য কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির জন্য ভিন্ন পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। কুটির-শিল্পগুলির উন্নতির জন্য সরকার নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সরকার নিজে পাট, কাচ, ঔষধ প্রস্তুত, মৃৎশিল্প, যন্ত্রপাতি-প্রস্তুত প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার এই কারিগরি শিক্ষার বিস্তারকল্পে বহু লক্ষ অর্থব্যয় ধার্য করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্তসার

কারিগরি নৈপুণ্য ও ইহার গুরুত্ব

বর্তমান যুগকে যান্ত্রিক যুগ বলা হয়। এইযুগে সকল কার্যেই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সুতরাং যন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে কোন কাজই ভালভাবে করা যায় না। এইজন্য কারিগরি নৈপুণ্যের একান্ত প্রয়োজন। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে এই কারিগরি জ্ঞান এবং ভারতের দুর্গত অবস্থার জন্য আংশিকভাবে দায়ী হইল এই কারিগরি শিক্ষার অভাব।

কারিগরি নৈপুণ্যের উপাদান

কারিগরি নৈপুণ্য নির্ভর করে :

(১) বংশানুক্রমিক শিক্ষা, (২) সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, (৩) কারিগরি বিদ্যালয়-স্থাপন, (৪) শিল্পের প্রসার ও (৫) যন্ত্র-নির্মাণ ও কল-কারখানা-স্থাপন, (৬) সরকারী অনুপ্রেরণা।

ভারতে কারিগরি শিক্ষা

ভারত কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অনগ্রসর। এজন্য বিদেশী শাসনই প্রধানতঃ দায়ী। বর্তমান জাতীয় সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়া নানাপ্রকারে এই শিক্ষার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What is technical skill ? What are the factors which influence the formation of technical skill ? How do you propose to increase the technical skill of the Indian labour ?

যান্ত্রিক দক্ষতা কি ? যান্ত্রিক দক্ষতা গঠনে কি কি উপাদান সাহায্য করে ? ভারতের শ্রমিকের যান্ত্রিক দক্ষতা কি উপায়ে বৃদ্ধি করা যায় তাহা লিখ।

উঃ—যন্ত্রনির্মাণ, যন্ত্রের যথাযথ ব্যবহার ও যন্ত্র খারাপ হইলে তাহা মেরামত করিবার জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় তাহাকে করিগরি নৈপুণ্য বা যান্ত্রিক কর্মকুশলতা বলা হয়। বর্তমান যুগ যান্ত্রিক যুগ। উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। যন্ত্রের এই বহুল প্রসারের জন্য আমরা যন্ত্রনির্মাতা ও যন্ত্রবিশেষজ্ঞ হইতে চাই।

যান্ত্রিক কর্মকুশলতা ব্যতীত বর্তমান যুগে কোন দেশই উৎপাদনের পরিমাণ, বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে পারে না।

যান্ত্রিক কর্মকুশলতা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বংশানুক্রমিক শিক্ষা, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, শিল্পের প্রসার, যন্ত্রনির্মাণ কারখানা স্থাপন ও সর্বোপরি সরকারী অনুপ্রেরণা একটি দেশে কারিগরি নৈপুণ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। দেশের সরকার সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা বিস্তার করিয়া জনসাধারণকে এই দিকে আকৃষ্ট করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বর্তমানে দেশের মধ্যে নানা স্থানে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ও কলেজ, পলিটেকনিক গবেষণাগার, রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন, কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বভারতীয় শিক্ষাসংস্থান গঠন প্রভৃতি দ্বারা কারিগরি জ্ঞান বিস্তারে সাহায্য করিতেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণকাল হইতেই ছাত্রগণ যাহাতে এ দিকে আকৃষ্ট হয় তজ্জন্য বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয়গুলির জন্য ভিন্ন পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। বহু ভারতীয় ছাত্রকে উচ্চতর কারিগরি জ্ঞান আহরণ করিবার উদ্দেশ্যে বৃত্তি দিয়া বিদেশেও পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

অর্থনৈতিক কাঠামো

(Economic Structure)

অর্থনৈতিক কাঠামো—Economic Structure

একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দেশের ধনোৎপাদন ও ধন-বণ্টন-পদ্ধতির উপর বহুল পরিমাণে নিভর করে। উৎপাদন-পদ্ধতি আবার সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমশক্তি, মূলধন-পরিমাণ ও ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে। উৎপাদনের উপাদানগুলি যদি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নত ধরণের হয়। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো শুধু উৎপাদন-পদ্ধতির উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে না—বণ্টন-ব্যবস্থার দ্বারাও অর্থনৈতিক কাঠামো প্রভাবিত হয়। উৎপাদনের উপাদান-গুলি যদি মুষ্টিমেয় লোকের আয়ত্তাধীন হয়, তাহা হইলে উৎপাদিত ধনের বেশীর ভাগ অল্পসংখ্যক লোকে ভোগ করে ও অধিকাংশ লোক দরিদ্র হয়। যে সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সমস্ত দেশে এইরূপ অসম বণ্টন-ব্যবস্থা দেখা যায়; অসম বণ্টন-ব্যবস্থা হইলেও এরূপ দেশগুলি উন্নত দেশ (Developed Countries) বলিয়া পরিগণিত হয়। আবার, অনেক দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত দেশে উৎপাদনের উপাদানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় আয়ত্তে না রাখিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইয়া আয় বৈষম্য হ্রাস পায়। অনেক দেশ আবার এই উভয় পদ্ধতির সুবিধা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে এক মিশ্র পদ্ধতির ভিত্তিতে তাহাদের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন করিতেছে। ধনতান্ত্রিকই হউক আর সমাজতান্ত্রিকই হউক, উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হইল যান্ত্রিক কৃষি, বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্য।

ধনতান্ত্রিক কাঠামো—Capitalistic Economy

ধনতন্ত্রবাদ বলিতে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বুঝায়, যে ব্যবস্থায়

প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, কোন ব্যক্তি উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলে ব্যক্তিগত লাভের জন্ম স্বাধীনভাবে উৎপাদনকার্যে লিপ্ত হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান ও ভোগের সামগ্রীগুলি যে শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা নহে, উত্তরাধিকার-সূত্রে ভবিষ্যৎ বংশধরগণেরও এইগুলির উপর মালিকানা স্বীকৃত হয়। সুতরাং উৎপাদনের উপাদানগুলি বংশপরম্পরাক্রমে এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহাদের মুনাফা বৃদ্ধি করে। ফলে ভূমি ও শিল্পের মালিকগণ ধনবান হইতে অধিকতর ধনবান হন ও সাধারণ লোক দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হয়। এইরূপে কালক্রমে সমাজে বিত্তবান ও বিত্তহীন এই দুই শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়া পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও উপভোগ-নিয়ন্ত্রণের কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকে না। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় করিতে পারে। উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগ প্রভৃতি দ্রব্যমূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং দ্রব্যমূল্য, চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে নির্ধারিত হইয়া আপনা হইতেই স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বর্তমান যুগে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, বিরাট বহরের উৎপাদনের অবশ্যম্ভাবী ঝুঁকি ও দায়িত্ব বহন করিবার জন্ম ব্যবস্থাপকের আবির্ভাব হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিলেও অনেক সময় শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করিবার জন্ম ইহারা প্রত্যেকে ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিক-সংঘ, ক্রেতা-সংঘ, উৎপাদক-সংঘ প্রভৃতি গঠন করে।

ধনতান্ত্রিক কাঠামোর সুফল—এই ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস হয়। ক্রেতা স্বাধীনভাবে তাহার রুচিমত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যবস্থাপকগণ বিশেষ সাবধানে উৎপাদন-কার্য পরিচালনা করে। এই ব্যবস্থায় শুধু যোগ্যতম পরিচালক টিকিয়া থাকে।

কুফল—কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা ধনবৈষম্য সৃষ্টি করিয়া সমাজে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বৃদ্ধি করে। সমান সুযোগ-সুবিধার অভাবে অধিকাংশ লোকেই ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারে না। অনেক সময় উৎপাদকেরা

সংঘবদ্ধ হইয়া অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করে। নানাজাতীয় বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ক্রেতার ক্রয়-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে বেকার-সমস্যা, ব্যবসায়-চক্র ও শ্রমিক-মালিক বিরোধ সৃষ্টি হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কুফল দূর করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক কাঠামো—Socialistic Economy

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপাদান-গুলির উপর যে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহার পরিবর্তে রাষ্ট্রমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পরিকল্পনা সমিতি সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে, ফলে প্রয়োজনা-তিরিক্ত উৎপাদন, মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি, বেকার-সমস্যা, ব্যবসায়-চক্র প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক কাঠামোর কুফলগুলি দূর হইয়া অর্থনৈতিক জীবন সুগম হয়। রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সে দেশের জাতীয় জীবনে যে অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তে পৃথিবীর বহু দেশই অল্পবিস্তর পরিমাণে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গলদ দূর করিতে পারিলেও এই ব্যবস্থায় কয়েকটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা ও কর্মপ্রচেষ্টা নষ্ট হয়। অনেক সময় সরকারও ভুল করিতে পারেন।

মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামো—Mixed Economy

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর ত্রুটিগুলি বাদ দিয়া উভয় ব্যবস্থার সুবিধাগুলির ভিত্তিতে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠিত হয়। সুতরাং যে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মিশ্র ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে উভয় ব্যবস্থার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সমস্ত ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা-সম্মত অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদন-পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ বাড়িতে পারে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন রাখা হয়। আবার, যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা ও পরিচালনা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, সে-সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ

প্রবর্তন করা হয়। মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সাধারণতঃ সমগ্র উৎপাদনক্ষেত্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় এবং জাতীয় জীবনে গুরুত্ব অনুসারে এই ভাগগুলির কোন্‌টি সরকারী পরিচালনাধীন হইবে এবং কোন্‌টি বে-সরকারী পরিচালনাধীন হইবে, তাহা স্থির করা হয়। সাধারণতঃ কয়লা, বিদ্যুৎ, ইস্পাত প্রভৃতি মূল শিল্প-গুলি, যুদ্ধোপকরণ-নির্মাণকার্যে নিযুক্ত শিল্পগুলি এবং পরিবহন ও যোগাযোগ-সম্পর্কিত শিল্পগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। আবার, কতকগুলি ক্ষেত্রে সরকারী ও বে-সরকারী অর্থাৎ ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন উৎপাদন-ব্যবস্থা পাশাপাশি চলিতে পারে। বর্তমানে ভারত সরকার এই মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

উন্নত ও অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য—Features of Developed and Under-developed Economies

অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে দেখিতে গেলে দেশগুলিকে সাধারণতঃ দুইটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়। কোন কোন দেশকে উন্নত দেশ বলা হয়, আবার কোন কোন দেশকে অনুন্নত দেশ বলা হয়। উন্নত দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া দক্ষতার সহিত কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হয়। যান্ত্রিক কৃষি (কলের লাঙ্গলের সাহায্যে বহুপরিমাণে জমি একসঙ্গে চাষ, আধুনিক সেচব্যবস্থা, উন্নত ধরণের সার প্রয়োগ, একই জমিতে বিভিন্ন ধরণের ফসল উৎপাদন, বীজবপন ও ফসল কাটিয়া মাড়াই করিবার জন্ত যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ), বৃহদায়তনের শিল্প এবং ব্যাপক বহির্বাণিজ্যের সাহায্যে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। জাতীয় আয়বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়া লোকের জীবনধারণের মানও উন্নত হয়। অপরপক্ষে অনুন্নত দেশগুলিতে উৎপাদন-ব্যবস্থার দক্ষতার অভাব দেখা যায়। উৎপাদন-ব্যবস্থা চিরাচরিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় বলিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ কম হয়। ইহা ছাড়া, জাতিভেদ, যৌথপরিবার প্রথা, সামন্ত-তান্ত্রিক জমিদারী-ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা সামাজিক কারণেও বণ্টন-ব্যবস্থায় ত্রুটি দেখা যায়। ফলে, মাথাপিছু আয় হ্রাস পাইয়া লোকের জীবনধারণের মান নীচু হয়।

অনুন্নত-দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল :

১। কৃষি-ব্যবস্থার ত্রুটি—Drawbacks of Agriculture

এই সমস্ত দেশে কৃষির প্রাধান্য থাকিলেও কৃষিকার্য চিরাচরিত প্রথায় পরিচালিত

হয়। জলসেচ-ব্যবস্থার অভাব, চাষের জমির ক্ষুদ্রায়তন, একই জমি বিনাসারে পুনঃপুনঃ কর্ষণ ও কৃষি ঋণ ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি কারণে কৃষি হইতে উৎপাদন-পরিমাণ কম হয়।

২। শিল্পের অনগ্রসরতা—Industrial backwardness

এই সমস্ত দেশ কৃষির ন্যায় শিল্পেও অনগ্রসর। মূলধন ও সুদক্ষ শ্রমিকের অভাব হইল এই অনগ্রসরতার প্রধান কারণ। ইহা ছাড়া, উৎপাদনের আধুনিক পদ্ধতিগুলি ও কারিগরি শিক্ষার অভাবহেতু উৎপাদন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ সম্ভব হয় না। লোকের মাথাপিছু আয় কম বলিয়া শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও কম হয়। অনুন্নত দেশে উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যের নিকৃষ্টতার জন্য ঐ সমস্ত দ্রব্যের বিদেশেও কোন চাহিদা হয় না।

৩। মূলধনের অভাব—Dearth of Capital

অনুন্নত দেশের লোকের মাথাপিছু আয় কম। এই অল্প আয় তাহারা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করে। উদ্বৃত্ত আয়ের অভাবে মূলধন গঠনের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

৪। বেকার সমস্যা—Unemployment Problem

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই সমস্ত দেশে স্থায়িরূপে বেকার সমস্যা দেখা যায়। কৃষির অনগ্রসরতা ও শিল্প-ব্যবসায়ের অভাবহেতু জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফলে বেকার সমস্যা ও অন্য নানাবিধ শ্রমিক-সম্পর্কিত সমস্যার উদ্ভব হয়।

৫। উৎকট ধনবৈষম্য—Worst Inequality of Income

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অত্যধিক পরিমাণ আয়ের পার্থক্য। মুষ্টিমেয় ধনীর হস্তে জাতীয় আয়ের বেশীরভাগ কেন্দ্রীভূত হয়। আর অধিকাংশ লোকেরই অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হয় না। দরিদ্রশ্রেণী সর্বদিক দিয়াই শোষিত ও নির্যাতিত হয়।

৬। কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানী ও শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী—Exports mainly agricultural, imports mainly industrial

জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং দেশের অনুন্নত উৎপাদন-ব্যবস্থার

জন্য বিদেশ হইতে কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করিতে হয়, অথচ অনুন্নত দেশ হইতে উন্নত দেশে রপ্তানী করিবার মত উপযুক্ত পরিমাণ ও উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট পণ্যের অভাব হেতু অনুন্নত দেশ হইতে প্রধানতঃ কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়।

অর্থনৈতিক উন্নতির উপায়—Requirements for Economic Development

অনুন্নত দেশগুলির দুর্গত অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। আধুনিককালে রাষ্ট্রনির্ধারিত নীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণপূর্বক অর্থনৈতিক জীবনের মান উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা (Economic Planning) গ্রহণ করা হইতেছে। অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে গৃহীত পরিকল্পনায় সর্বপ্রথম কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। কৃষি ও শিল্প একটি অপরের পরিপূরক। কৃষিজাত কাঁচামাল না হইলে শিল্পপ্রসার সম্ভব নয়। কৃষির উন্নতির জন্য সেচব্যবস্থার প্রয়োজন। নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার সাহায্যে একদিকে যেরূপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জমিতে জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়, অপরদিকে সেইরূপ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া শিল্পের প্রসার সম্ভব হয়। অনুন্নত দেশের লোকের আয় স্বল্প এবং এইজন্য জীবনযাত্রার মান খুব নীচু। এইজন্য দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া সমগ্র জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষি হইল আয়ের একটি প্রধান উপায়। কৃষির উন্নতির জন্য উন্নত ধরণের চাষবাস প্রণালী অবলম্বন করা প্রয়োজন। এজন্য একসঙ্গে বহু পরিমাণ জমির চাষ, কলের লাঙ্গলের প্রবর্তন, সেচব্যবস্থা, সারের ব্যবস্থা ও কৃষিজাত দ্রব্যের উত্তম বিক্রয়-ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কোন দেশই শুধু কৃষির উন্নতির দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে পারে না। কৃষির সঙ্গে শিল্পের প্রসারও প্রয়োজন। এইজন্য কয়লা, বিদ্যুৎ, লৌহ-ইস্পাত প্রভৃতি মূল ও ভারী শিল্পগুলির উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে চিনি, বস্ত্র ও নানাজাতীয় ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের শিল্পগুলির প্রসার আবশ্যক। পল্লী-অঞ্চলের লোকের অবস্থার উন্নতির জন্য ছোট ছোট শিল্প ও কুটির শিল্পগুলির উন্নতি ও প্রসারের উপর জোর দিতে হইবে। এই শিল্পগুলি প্রসার লাভ করিলে গ্রামীণ বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ও বিদেশের

সঙ্গে যাহাতে ব্যবসায়-বাণিজ্য অবাধে চলিতে পারে, সেজন্য রাস্তা-ঘাট, যান-বাহন ইত্যাদির উন্নতিও একান্ত আবশ্যক। দেশে সাধারণ শিক্ষা যাহাতে প্রসারলাভ করে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশের অনুন্নত অবস্থা দূর করিয়া উন্নত অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইলে প্রচুর মূলধনের আবশ্যক। এজন্য সরকারী, বে-সরকারী এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-পরিমাণ বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। স্বল্প মেয়াদের জন্য সরকার ঘাট্‌তি ব্যয় অর্থাৎ নোট প্রচলনের সাহায্যে নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া ও ভোগ্যবস্তুর উপর কর ধার্য করিয়া উন্নয়নমূলক কার্যের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে ঋণগ্রহণ, করবৃদ্ধি ও নূতন নূতন করস্থাপন করিয়া উন্নয়নের ব্যয় নির্বাহ করা যাইতে পারে।

উন্নয়নের জন্য বিদেশী ঋণ গ্রহণ করা অপরিহার্য। রুশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ বিদেশী ঋণ গ্রহণ করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব করিয়াছে। কিন্তু বিদেশী ঋণগ্রহণ সম্পর্কে প্রধান কথা হইল যে, উন্নয়নের জন্য বিদেশী অর্থঋণ অপেক্ষা বিদেশী কারিগরি নৈপুণ্য ও শিল্প-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করা বেশী প্রয়োজন।

ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো—Economic structure of India

বৃটিশ শাসনকাল হইতে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো আংশিকভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ভারত একটি অতি অনুন্নত দেশ ছিল। অনুন্নত দেশগুলির যে বৈশিষ্ট্যের কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে ভারতে তাহার সবগুলিই বর্তমান। কৃষিব্যবস্থার ত্রুটি, শিল্প-ব্যবসায়ের অনগ্রসরতা, মূলধনের একান্ত অভাব, উৎকট বেকার-সমস্যা ও প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য-গুলি ভারতে বিশেষভাবে দেখা যাইত।

স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আমাদের জাতীয় সরকার এ-বিষয়ে অবহিত হইয়া ভারতের এই দুর্গত অর্থনৈতিক অবস্থার অবসানকল্পে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫১-৫২ সাল হইতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৬ সাল হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ১৯৬১-৬২ সাল হইতে তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই তিনটি পরিকল্পনার সাহায্যে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ভারত সরকার মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেছেন। নিছক ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া

ভারত সরকার উভয় পদ্ধতির সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনপূর্বক জাতীয় আয়বৃদ্ধির দ্বারা ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা, আয় বৈষম্য দূর করা ও বেকার-সমস্যার সমাধান করাই হইল এই পরিকল্পনাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠিত হইতে পারে। এই সকল উন্নয়ন কার্যের জন্য ভারত সরকার প্রচুর পরিমাণে বিদেশী ঋণ ও বিদেশী কারিগরি নৈপুণ্য এবং শিল্প সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। মার্কিন, ইংলণ্ড, রুশ, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে এই উদ্দেশ্যে ভারত বহু সাহায্য পাইয়াছে। এই সমস্ত সাহায্য যদি ভারতবাসী যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করিতে পারে, তাহা হইলে ভারত অচিরে উন্নত দেশগুলির পর্যায়ে পরিণত হইতে পারিবে।

সংক্ষিপ্তসার

অর্থনৈতিক কাঠামো

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ধনোৎপাদন-পদ্ধতি ও বণ্টন-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বা মিশ্রতান্ত্রিক হইতে পারে।

ধনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য

১। অবাধ প্রতিযোগিতা, ২। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ৩। মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ, ৪। উৎপাদন ও বণ্টনে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অভাব, ৫। চাহিদা ও যোগান দ্বারা মূল্য নির্ণয়, ৬। ঝুঁকি গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপক শ্রেণীর আবির্ভাব, ৭। শ্রমিক-মালিক বিরোধ, ৮। আয়-বৈষম্য।

সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

১। ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্র মালিকানা ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ, ২। পরিকল্পনানুযায়ী উৎপাদন ও বণ্টন, ৩। ন্যায্য বণ্টন-ব্যবস্থা।

মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

উৎপাদনের কতিপয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ও অন্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ।

সুতরাং ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন করিয়া মিশ্রতন্ত্র গঠন করা হয়।

উন্নতদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

১। যান্ত্রিক কৃষি, ২। উন্নত ধরণের ও বৃহৎ বহরের শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ৩। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার। ফলে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় এবং লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য

১। কৃষির ত্রুটি, ২। শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অনগ্রসরতা, ৩। মূলধনের অভাব, ৪। বেকার-সমস্যা ও ৫। উৎকট ধনবৈষম্য, ৬। প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত।

প্রতিকার—১। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ, ২। কৃষি ও শিল্পের প্রসার, ৩। দেশের মধ্যে ও বিদেশ হইতে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করা, ৪। বিদেশী ঋণ ও কারিগরি নৈপুণ্য এবং শিল্প অভিজ্ঞতাও প্রয়োজন।

ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে অনুন্নত দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর সকল বৈশিষ্ট্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ও উত্তর

1 What are the principal features of an under-developed economy ? Illustrate your answer with special reference to Indian conditions.

H. S (Hu.) 1960,1962

অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য কি কি তাহা ভারতীয় উদাহরণ সাহায্যে লিখ।

উঃ—ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলিকে উন্নত দেশ বলা হয়, আর ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশকে অনুন্নত বলা হয়। উন্নত দেশগুলিতে বহু অর্থ নৈতিক উন্নতির ফলে দেশের লোকের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়, আর অনুন্নত দেশগুলিতে অর্থ নৈতিক উন্নতির অভাবে লোকের আয় কম হয়। ইংলণ্ড উন্নত দেশ, কারণ এই দেশের লোকের মাথাপিছু আয় হইল ৩২৫২ টাকা, আর ভারতকে অনুন্নত বলার কারণ ভারতের লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় হইল মাত্র ৩২৯ টাকা।

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির প্রাধান্য। চিরাচরিত প্রথায় কৃষিকার্য পরিচালিত হয়। ভারতের শতকরা ৬৮ জন লোক

কৃষির উপর নির্ভরশীল। জমির ক্ষুদ্রতা ও পুরাতন পদ্ধতিতে চাষের ফলে ফসলের পরিমাণও কম হয়।

অনুন্নত দেশের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল শিল্পোন্নতির অভাব। বর্তমানে অবশ্য সরকারী প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে।

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হইল সঞ্চয়ের স্বল্পতার জন্য মূলধনের অভাব, বেকার-সমস্যা ও উৎকট ধনবৈষম্য। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে এই লক্ষণগুলি বিশেষভাবে দেখা যায়। ভারতে সঞ্চয়ের পরিমাণ কম বলিয়া মূলধন বৃদ্ধি পাইতে পারে না। মূলধনের অভাবে ভারতে শিল্পোন্নতিতে বাধা পড়িয়াছে। শিল্পোন্নতি না হওয়ায় ভারতে অসংখ্য বেকার দেখা যায়। ভারতে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। একদিকে জমির মালিক, বড় বড় ব্যবসায়ী ও সরকারী চাকুরিয়া অপরদিকে অগণিত দরিদ্র ভারতবাসী। ধনীর অর্থ তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যয়িত হয়—এই অর্থ কদাচিৎ শিল্প বাণিজ্য স্থাপনে নিযুক্ত হয়। দরিদ্রের আয় এত কম যে, সঞ্চয়ের কথা দূরে থাকুক তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনও এই স্বল্প আয়ে সম্ভব হয় না।

2. What steps should the government take for the development of an under-developed country Illustrate your answer with Indian example

অনুন্নত দেশের উন্নতির জন্য সরকারের কি উপায় অবলম্বন করা উচিত ভারতীয় উদাহরণ সহ লিখ।

উঃ—ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে সরকারী সাহায্য ছাড়াই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট অর্থনৈতিক উন্নতি সে দেশের সরকারী প্রচেষ্টার অবদান। সকল দেশেই অল্প-বিস্তর পরিমাণে সরকারী সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলিতে সরকারী সাহায্য ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নতি আদৌ সম্ভব নহে।

অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে হইলে সরকারকে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করিতে হইবে। সরকার প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকার্য পরিচালনা করিতে পারে না, কিন্তু আইনের সাহায্যে কৃষির অন্তরায়গুলি দূর করিতে পারে। ভারত সরকার জমির ক্ষুদ্রতা নিরোধ করিয়া সমবায় কৃষি প্রবর্তন, সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি, সার যোগান, জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন করিয়া কৃষির উন্নতির পথ সুগম করিতেছেন। শিল্পের ক্ষেত্রেও সরকারী, বে-সরকারী ক্ষেত্র স্থির করিয়া কতকগুলি মূল ও ভারী শিল্প সরকার পরিচালনাধীন করিয়াছেন এবং শিল্পায়নের জন্য নানা জাতীয় ঋণ-প্রদান প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, ঋণদান ও ছোটখাট যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যোগাযোগ, যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারে সাহায্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া, নানা জাতীয় কর প্রবর্তন করিয়া ভারত সরকার ধনী ও দরিদ্রের আয়ের পার্থক্য দূর

করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সুশিক্ষা ব্যতীত কোন দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। ভারত সরকার সাধারণ বিশেষ করিয়া যান্ত্রিক শিক্ষার প্রসার উদ্দেশ্যে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন।

3. What is meant by 'economic development'? State the principal requirements of an under-developed country like India

H.,S (Hu.) 1961

অর্থনৈতিক উন্নতি বলিতে কি বুঝ? ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

উঃ—অর্থনৈতিক উন্নতির অর্থ হইল দেশে উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ন্যায্য বণ্টন ব্যবস্থার ফলে যখন লোকের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। আয় বৃদ্ধির ফলে দেশের লোকে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারে।

ব্যয় সংকোচ দ্বারা সঞ্চয় বৃদ্ধির সাহায্যে দেশে মূলধন বৃদ্ধি করা অর্থনৈতিক উন্নতির প্রাথমিক প্রয়োজন। নানা জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় অধিক পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করিতে পারিলে আয় বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

দশম শ্রেণীর জন্য

অষ্টম অধ্যায় (ক)

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও সমবায়

(Business Organisation and Co-operation)

বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান—Forms of Business organisation

ব্যবস্থাপকগণ নানা পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া থাকেন। সংগঠনের দিক দিয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পাঁচ ভাগ করা যায়।

১। এক মালিকানা ব্যবসায়—Single owner firm

এক মালিকানা কারবারের একজন মাত্র স্বত্বাধিকারী থাকেন। তিনি আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার পরিচালনা করেন ও ব্যবসায়ের সমস্ত ঝুঁকি ও দায়িত্ব বহন করেন। এই ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক স্বয়ং শ্রমিক, মূলধনের মালিক ও ঝুঁকি বহনকারীর স্থান অধিকার করেন। কৃষিকার্যে ও খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ভারতে এই জাতীয় ব্যবসায় দেখা যায়।

সুবিধা : এই জাতীয় ব্যবসায়ের সুবিধা হইল যে, মালিকানা ও পরিচালনা একই হাতে থাকে বলিয়া উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। মালিক স্বয়ং প্রত্যেক ক্রেতার সংস্পর্শে আসিয়া তাহার রুচির পরিচর্যা করিতে পারে। নিজের স্বার্থের জন্য ব্যবসায়ীর চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। ইহার আর একটি সুবিধা হইল যে, এক ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে বলিয়া এই জাতীয় ব্যবসায় সহজে আরম্ভ করা ও গুটান যায়।

অসুবিধা : এক মালিকানা কারবারের প্রধান অসুবিধা হইল মূলধনের অভাব। একজন ব্যক্তির পক্ষে বহুলপরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া, একমাত্র ব্যক্তির পক্ষে ব্যবসায়ের সবদিকে লক্ষ্য রাখাও সম্ভব নয়। এক মালিকানা কারবারের ত্রুটি দূর করিবার উদ্দেশ্যে অংশীদারী কারবারের সৃষ্টি হইয়াছে।

২। অংশীদারী কারবার—Partnership

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন একত্রিত হইয়া কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রত্যেকেই মূলধন জোগায় ও লাভ-লোকসান বহন করে, তখন তাহাকে অংশীদারী কারবার বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অংশীদারগণ সমান পরিমাণ মূলধন জোগান দেন এবং সমান পরিমাণ লাভ-লোকসানের ভাগী হন, আবার কোথাও বা অসমানভাবে মূলধন জোগান দেন এবং লাভ-লোকসানও অসমানভাবে ভাগ হয়। কোথাও বা আবার অংশীদার মূলধন জোগান না দিয়া শুধুমাত্র তাঁহার কর্মদক্ষতার জন্য অংশীদাররূপে পরিগণিত হন। এই জাতীয় ব্যবসায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, অংশীদারগণের দায়িত্ব অসীম (Unlimited liability) অর্থাৎ ব্যবসায় ফেল্ হইলে পাওনাদার একজন অংশীদারের সকল সম্পত্তিই দাবী করিতে পারে।

সুবিধা ঃ অংশীদারী কারবারের প্রধান সুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় অধিক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় বহরে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠন করা সম্ভব। একাধিক অংশীদার থাকার ফলে ব্যবস্থাপনার কাজও শ্রমবিভাগ নীতি অনুযায়ী অংশীদারগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যায়। মালিকানাস্বত্ব ও পরিচালনা একই হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়া ব্যবসায় দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়। ইহার আর একটি সুবিধা হইল যে, প্রয়োজন হইলে নূতন অংশীদার গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ের প্রসার সম্ভব। অংশীদারগণের দায়িত্ব অসীম বলিয়া কেহই কোন অনিশ্চয়তাপূর্ণ উদ্যমে লিপ্ত হন না।

অসুবিধা ঃ ইহার প্রধান অসুবিধা হইল, এই ব্যবসায়ের কোন স্থায়িত্ব নাই। একজন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে অথবা একজন অংশীদার উন্মাদ বা দেউলিয়া হইলে কারবার ভাঙ্গিয়া যায়। দায়িত্ব অসীম বলিয়া কোন অংশীদারই নিশ্চিন্ত-মনে কাজ করিতে পারেন না। এই কারণে পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাসের মনোভাব সৃষ্টি হইয়া শেষ পর্যন্ত ইহার অবসান ঘটে।

বর্তমানে নূতন এক ধরণের অংশীদারী কারবার সৃষ্টি হইয়াছে। কয়েকজন অংশীদার পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে আইনানুমোদিতভাবে তাহাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ করিয়া লইতে পারে। কিন্তু এই জাতীয় অংশীদারগণ কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে পারে না। ইহাকে সসীম অংশীদারী কারবার (Limited Partnership) বলা হয়।

৩। যৌথ-মূলধনী কারবার—Joint-Stock Company or Corporation

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আধুনিক রূপ হইল যৌথ-মূলধনী কারবার। উৎপাদন-বৃদ্ধির সহিত মূলধন পরিমাণের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। অনেক লোক মিলিয়া অংশ (share) কিনিয়া এই কারবার গঠন করে। কারবারের অংশীদারগণ কয়েকজন পরিচালক (Directors) নির্বাচিত করে এবং এই পরিচালক সভা (Board of Directors) ব্যবসায়ের কার্য পরিচালনা করে, কর্মচারী নিয়োগ করে ও হিসাবপত্র প্রস্তুত করে। পরিচালক সভা তাহাদের কার্যের জন্য অংশীদারগণের নিকট দায়ী থাকে। এই জাতীয় কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, প্রত্যেক অংশীদারের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (Limited Liability) অর্থাৎ কোম্পানী ফেল হইলেও, কোম্পানীর দেনার দায়ে পাওনাদার কোন একজন অংশীদার নিকট হইতেই শেয়ারের অর্থমূল্যের অতিরিক্ত তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে আদায় করিতে পারে না।

যৌথ-মূলধনী কারবার শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে পরিমাণ টাকা তুলিতে সরকার কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে, সেই পরিমাণ টাকাকে অনুমোদিত মূলধন (Authorised Capital) বলা হয়। এই অনুমোদিত মূলধনের যে পরিমাণ মূল্যের শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ ছাড়া হয়, তাহাকে প্রচারিত মূলধন (Issued Capital) বলে। এই মূলধনের যে পরিমাণ বাজারে বিক্রীত হয় তাহাকে বিক্রীত মূলধন (Subscribed Capital) বলে। ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত শেয়ার-পরিমাণের যে অংশের মূল্য কার্যতঃ অংশীদারগণ প্রদান করেন তাহাকে আদায়ীকৃত মূলধন (Paid-up-Capital) বলা হয়।

যৌথ-মূলধনী কারবার সাধারণতঃ (১) শেয়ার ও (২) বণ্ড বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে। যাঁহারা শেয়ার কেনেন তাঁহারাই কারবারের প্রকৃত মালিক, কারণ কারবার পরিচালনার সমস্ত ঝুঁকি তাঁহারা গ্রহণ করেন। যদি কারবারের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া বৎসরের শেষে লাভ হয় তাহা হইলেই অংশীদারগণ শেয়ারের মূল্য অনুযায়ী এই লভ্যাংশ (Dividend) পান। কারবারের লোকসান তাঁহাদিগকেই বহন করিতে হয়।

ডিবেঞ্চার-ক্রেতাগণ কারবারের কোন ঝুঁকি গ্রহণ করেন না। তাঁহারা কোম্পানীকে শুধু টাকা ধার দেন, এবং এইজন্য একটা নির্দিষ্ট হারে সুদ পান।

কারবারে লোকসান হইলেও ইহাদের সুদ দিতে হয়। কারবারে ইহাদের কোন স্বত্ব নাই এবং পরিচালনা-ব্যবস্থায়ও ইহাদের কোন হাত নাই।

শেয়ার আবার দুই রকমের হইতে পারে—সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Preference share)। অগ্রাধিকারমূলক শেয়ারের মালিকগণ কোম্পানীর মুনাফা হইলেই নির্দিষ্টহারে লভ্যাংশ পান, কিন্তু লোকসান হইলে তাঁহারা লভ্যাংশ দাবী করিতে পারেন না। সুতরাং এই শেয়ারের মালিকগণ কারবারের সমস্ত ঝুঁকি গ্রহণ করেন না। অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার যদি সঞ্চয়মূলক (Cumulative) হয়, তাহা হইলে যে বৎসর কারবারে লোকসান হয় সে বৎসর এই জাতীয় শেয়ারে মালিকগণ লভ্যাংশ না পাইলেও পরের বৎসর কারবারে লাভ হইলে পূর্ব বৎসরের বাকি লভ্যাংশ পাইতে পারেন। সাধারণ শেয়ারের মালিকগণ কারবারের সমস্ত ঝুঁকি গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাদের লভ্যাংশের কোন স্থিরতা নাই—কারবারের লাভ-লোকসান অনুযায়ী ইহাদের লভ্যাংশ বাড়ে বা কমে।

ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রভৃতি যৌথ-মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে।

সুবিধা : যৌথ-মূলধনী কারবারের প্রধান সুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় অধিক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠন করা সম্ভব হয়। ইহার ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইয়া দ্রব্যমূল্য কমে। দ্বিতীয়তঃ, লোকে স্বল্প-পরিমাণ পুঁজিও এই কারবারে বিনিয়োগ করিয়া একটা অতিরিক্ত আয় পাইতে পারে। ইহার ফলে লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার আর একটি গুণ হইল যে, লোকে ঝুঁকি না লইয়াও ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইতে পারে এবং এই শেয়ারগুলি হস্তান্তর-যোগ্য বলিয়া যে-কোন সময়ে এইগুলিকে অর্থে পরিণত করিতে পারে। এই কারবারের সসীম দায়িত্বও ইহার একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অংশীদারী কারবার অস্থায়ী, কিন্তু এই কারবার স্থায়ী, কারণ একজন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে বা অন্য কোন কারণে ইহা সহসা বিলুপ্ত হয় না। যৌথ-মূলধনী কারবারের পরিচালনা সাধারণতঃ উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হয়। পরিচালকদের কোন ঝুঁকি লইতে হয় না বলিয়া তাঁহারা নূতন নূতন উদ্যমে ব্রতী হইতে পারেন।

অসুবিধা : এই কারবারের অনেকগুলি সুবিধা থাকিলেও ইহা ত্রুটিহীন নহে। পরিচালকগণের স্বার্থহানির সম্ভাবনা নাই বলিয়া অনেক সময় তাঁহারা

অযথা ঝুঁকি গ্রহণ করেন। অংশীদারগণের মূলধনের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহারা নানাপ্রকার ঝুঁকিপূর্ণ দূর-পরিকল্পনায় মূলধন নিয়োগ করেন। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় দক্ষ পরিচালকেরও অভাব দেখা যায়। পরিচালকগণ নির্বাচন-প্রথায় নিযুক্ত হন, সুতরাং দক্ষতা অপেক্ষা ভোটের জোরেই বেশীর ভাগ নির্বাচিত হন। কর্মচারী-নিয়োগ ব্যাপারেও পরিচালকগণ দক্ষতা অপেক্ষা আত্মীয়তা বন্ধন দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হন। এই কারবারের আর একটি অসুবিধা হইল যে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে কোনপ্রকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক না থাকার ফলে উভয়ের মধ্যে বিরোধ জন্মে এবং ইহাতে উৎপাদন-কার্যে অসুবিধা হয়।

যৌথ-কারবারের যে অসুবিধাগুলির উল্লেখ করা হইল, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহা দূর করা যায়। যৌথ-মূলধনী কারবারই হইল একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যাহার সাহায্যে অল্পব্যয়ে বড় বহরে উৎপাদন সম্ভব হয়।

৪। সমবায়—Co-operation

সমবায় কাহাকে বলে—What is Co-operation ?

"ক্ষুদ্রেও মহৎ কার্য করে সম্পাদন,
যদি থাকে তাহাদের একতা-বন্ধন।"

ধনী ও শক্তিশালী ব্যক্তিগণ এককভাবে যে সুখ সুবিধার অধিকারী, দরিদ্র ও দুর্বল ব্যক্তিগণও সমবেতভাবে কাজ করিলে সেই সমস্ত সুখ-সুবিধার অধিকারী হইতে পারে। সমবায়ের মূলনীতি হইল 'একতাই বল'। অন্যান্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পুঁজিপতি মালিক উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের বেশীর ভাগ তাঁহার সুদ ও মুনাফা হিসাবে গ্রহণ করেন। শ্রমিকগণ মজুর হিসাবে অতি কম পায়। এই কারণে তাহারা দরিদ্র থাকে এবং তাহাদের অবস্থার কোন উন্নতি হয় না। সমবায় প্রথায় শ্রমিকগণ পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। কারবারের জন্য যে মূলধন প্রয়োজন তাহা প্রত্যেকেই আংশিকভাবে দেয় এবং প্রয়োজন হইলে ধার করে। তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে একটি কার্যকরী সংসদ নির্বাচিত করিয়া এই সংসদের দ্বারা ব্যবসায় পরিচালনা করে। এই কারবারে শ্রমিকগণ নিজেরাই মালিক এবং নিজেরাই ব্যবস্থাপক। এইরূপে শুধু উৎপাদনক্ষেত্রে নয়, বণ্টন ক্ষেত্রেও ক্রেতা ও ভোগকারিগণ সমবেতভাবে মূলধন

সংগ্রহ করিয়া তাহাদের ভোগ্যবস্তু সরবরাহ করিবার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারে। এখানে ভোগকারী নিজেই ক্রেতা ও মালিক।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিতে পুঁজিপতি মালিকের কোন স্থান নাই। শ্রমিকগণ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেরাই উৎপাদন করে এবং উৎপাদনের সমগ্র লাভই তাহারা নিজেরা ভোগ করে। ভোগের ক্ষেত্রেও ক্রেতাগণ নানাজাতীয় বিক্রেতাগণকে (ফড়িয়া, দালাল প্রভৃতি) বাদ দিয়া নিজেরাই সহযোগিতার ভিত্তিতে তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে। সুতরাং সমবায় প্রথায় উৎপাদন ও বণ্টন উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার দ্বারা সকলেরই সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। প্রতিযোগিতা হইল ধ্বংসাত্মক, সহযোগিতা হইল গঠনমূলক।

সমবায়ের বৈশিষ্ট্য—Features of Co-operative Societies

সমবায় প্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমবায়ের সদস্যগণই হইল কারবারের শ্রমিক ও মালিক। সদস্যগণ ব্যতীত ইহার কোন স্বতন্ত্র মালিক নাই। কারবারের লাভ লোকসান সকলেই সমানভাবে ভাগ করিয়া লয়। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় কোন দালাল (Middleman) থাকে না। সদস্যগণ নিজেরাই ক্রয়-বিক্রয় ও পরিচালনা কার্য সম্পাদন করে। তৃতীয়তঃ, জনপ্রতি এক ভোট নীতিতে সমবায় সমিতিগুলি গঠিত হয়। সদস্যগণ সহযোগিতার মনোভাব লইয়া স্বাধীনভাবে সাম্যের ভিত্তিতে কাজ করে। পরিশেষে বলা যায় যে, সদস্যগণের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যতীতও তাহাদের নৈতিক উন্নতিবিধান করাও সমবায় প্রথার আর একটি বৈশিষ্ট্য।

সমবায়ের মূলনীতি—Fundamental Principles of Co-operation

সমবায় সমিতিগুলিকে শুধু কতকগুলি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করা সমীচীন নহে। এই সমিতিগুলি গঠনের পশ্চাতে একটি উচ্চ আদর্শ আছে। এই আদর্শ সাধনের উদ্দেশ্যে সমিতিগুলি কয়েকটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। নীতিগুলি হইল :

(ক) সান্নিধ্য—Proximity

সমিতির সদস্যগণের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় আবশ্যক। জানাশুনা না

থাকিলে সকলে মিলিয়া-মিশিয়া একসঙ্গে কাজ করিতে পারে না। এইজন্য সমবায় সমিতিগুলি সাধারণতঃ এক গ্রামের বা এক বৃত্তির লোক লইয়া গঠিত হয়।

(খ) সাম্য—Equality

সমবায়ের সকল সদস্যই সমান। যাহার যত টাকা মূল্যের শেয়ার থাকুক না কেন, সকল সদস্যেরই এক ভোট।

(গ) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমিতি—Voluntary association

প্রত্যেক সদস্যই তাহার নিজ ইচ্ছানুসারে এই সমিতিতে যোগদান করে। ইহাতে কোনপ্রকার বাধ্যবাধকতা নাই।

(ঘ) সততা—Honesty

সততাই হইল সমবায়ের প্রধান মূলধন। সুতরাং জাল-জুয়াচোর, মাতাল, মামলাবাজ প্রভৃতি অসৎ প্রকৃতির লোককে সমবায় সমিতির সদস্য করা হয় না।

(ঙ) মিতব্যয়িতা—Economy

সমিতিগুলি সাধারণতঃ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নতির জন্য গঠিত হয়, সুতরাং অংশীদারী কারবার বা যৌথ-মূলধনী কারবারগুলির ন্যায় পরিচালনা-কার্যের জন্য অযথা ব্যয় করে না। অপব্যয় বন্ধ করিয়া যাহাতে অল্প খরচে সমিতির কাজ পরিচালিত হয় সেজন্য সকল সদস্য যত্নবান হয়।

(চ) সমষ্টিবোধ—Solidarity

সমবায় সমিতির পরিচালনা-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল সদস্যই সমান মর্যাদার অধিকারী। এখানে সদস্যগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। ইহার ফলে এই সমিতির সদস্যগণের মধ্যে একাত্মবোধ জন্মে ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে তাহারা সমবেতভাবে কাজ করিতে শিখে। স্বার্থপরতার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সদস্যগণ পরার্থপরতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।

বিভিন্ন ধরণের সমবায় সমিতি—Different types of Co operative Societies

নানা উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠিত হইতে পারে। উৎপাদনের জন্য কয়েক ব্যক্তি মিলিত হইয়া যদি দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, তাহা হইলে এই সমিতিগুলিকে উৎপাদন-সমিতি (Producer's Co-operation) বলা হয়। আবার ক্রেতাগণ

মিলিত হইয়া যদি তাহাদের ভোগ্যবস্তু ক্রয়ের জন্য সমিতি গঠন করেন তাহা হইলে ক্রয় ও বিক্রয় কার্যের মুনাফা বিক্রেতাকে দিতে হয় না। ক্রেতাগণ স্বয়ংই এই মুনাফা ভোগ করিতে পারে। এই সমিতিগুলিকে ভোগকার্যের সমিতি (Consumer's Co-operation) বলা হয়। এই সমিতিগুলি শহরাঞ্চলে (Urban) বা গ্রামাঞ্চলে (Rural) প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। গ্রামাঞ্চলের সমিতিগুলির অধিকাংশ সদস্যই যদি কৃষক শ্রেণীর হয় তাহা হইলে এই সমিতিগুলিকে কৃষি সমবায় সমিতি (Agricultural Co-operative Societies) বলা হয়। সমিতিগুলির সদস্যগণ অ-কৃষি শ্রেণীর হইলে সমিতিগুলিকে অ-কৃষি সমবায় সমিতি (Non agricultural Co-operative Societies) বলা হয়। সমিতিগুলি যখন শুধু ঋণ পাইবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় তখন তাহাকে সমবায় ঋণ সমিতি (Co-operative Credit Societies) এবং অন্য উদ্দেশ্যে হইলে অ-ঋণ সমিতি (Co-operative Non-credit Societies) বলা হয়। কৃষি সমিতিগুলি সাধারণতঃ নানা উদ্দেশ্যে গঠিত হয় বলিয়া নানাজাতীয় কৃষি সমিতি দেখা যায়। চাষীর ঋণ পাইবার উদ্দেশ্য ব্যতীতও ক্রয়ের উদ্দেশ্যে (Co-operative Purchase Societies), বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে (Co-operative Sale Societies), বিক্ষিপ্ত জমিগুলি একত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে (Co-operative Consolidation Societies), জলসেচের উদ্দেশ্যে (Co-operative Irrigation Societies), ম্যালেরিয়া নিরোধ উদ্দেশ্যে ম্যালেরিয়া নিরোধ সমিতি (Co-operative Anti-malarial Societies), গ্রামোন্নয়ন সমিতি (Village Uplift Societies) প্রভৃতি গঠন করিতে পারে। প্রাথমিক (Primary) সমিতিগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়া তাহাদের সুপরিচালনার জন্য কতকগুলি সমবায় কেন্দ্রীয় সমিতিও (Co-operative Central Societies) থাকে। কেন্দ্রীয় সমিতিগুলি প্রাথমিক সমিতিগুলিকে সাধারণতঃ উপদেশ, অর্থসাহায্য ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সাহায্য করে।

সমবায় প্রথার সুবিধা—Benefits of Co-operation

১। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক কর্মীই হইল স্বাধীন ও ব্যবসায়ের মালিক। এই মালিকানা-বোধ তাহাকে আত্মসচেতন করিয়া অধিকতর নিষ্ঠা ও যত্নের সহিত তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিবার শিক্ষা দেয়।

২। এই ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধানের কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রত্যেকের স্বার্থ অপরের স্বার্থের সহিত জড়িত। কর্তব্যে অবহেলা বা অমনোযোগ হইলে নিজের স্বার্থহানি হইবার সম্ভাবনা।

৩। সমবায় প্রথার প্রধান সুবিধা হইল যে, ইহাতে শ্রমিক-মালিক বিরোধের কোন সম্ভাবনা নাই। শ্রমিকেরাই মালিক, সুতরাং ধর্মঘট ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কার্য দ্বারা উৎপাদন কার্য ব্যাহত হয় না।

৪। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি ঘটে। শ্রমিকগণ মজুরি ছাড়াও মুনাফার একটা অংশ পায়। সমবায় ঋণদান সমিতির সাহায্যে তাহারা অল্প সুদে টাকা ধার পায়।

অসুবিধা—Disadvantages

১। সমবায় পদ্ধতি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া অধিক মূলধন সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ আকারে উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

২। সাধারণ শ্রমিকগণের মধ্যে অনুপ্রেরণা ও কর্মদক্ষতার অভাব দেখা যায়। এইজন্য অনেক সময় সমবায় প্রথা সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

৩। সহযোগিতার মনোভাবই হইল সমবায় প্রথার প্রধান ভিত্তি। এই মনোভাবের অবর্তমানে পরিচালনা-কার্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

৪। যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া সমবায় প্রথার নীতি বিরুদ্ধ। সুতরাং এই অবস্থায় কোন প্রথম শ্রেণীর পরিচালক যোগদান করে না। তাহারা অন্যত্র অধিক আয় করিতে পারে। সুতরাং সমবায় প্রথায় সুদক্ষ পরিচালকের অভাব পরিদৃষ্ট হয়।

ভারতে সমবায় আন্দোলন—Co-operative Movement in India

জার্মান দেশে সর্বপ্রথম সমবায় আন্দোলন আরম্ভ হয়। সুলজ্ ডিলিস ও রাইফেসিন নামক দুইজন পরার্থপর ব্যক্তির অনুপ্রেরণায় যখন জার্মানিতে এই আন্দোলন সাফল্যলাভ করে তখন অন্যান্য দেশ সমবায় প্রথা নিজ নিজ দেশে প্রতিষ্ঠা করে। ভারত শুধু কৃষিপ্রধান দেশ নহে,—এই দেশের কৃষকগণ অতিশয় দরিদ্র ও অজ্ঞ এবং মহাজন, ফড়িয়া, দালাল প্রভৃতি শ্রেণীর দ্বারা নির্দয়ভাবে শোষিত হইত। সুতরাং ভারতে যে সমবায়ের বিশেষ প্রয়োজন তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভারতে সমবায় সমিতি স্থাপনে মাদ্রাজ সরকার সর্বপ্রথম অগ্রণী

হন। মাদ্রাজ সরকার ফ্রেডারিক নিকোলসন্ নামক একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে সমবায় সমিতি স্থাপন সম্পর্কে বিবরণী প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে ইয়ুরোপ পাঠান। নিকোলসন্ ইয়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার বিখ্যাত বিবরণীতে ভারতে রাইফেসিন প্রবর্তিত সমবায় সমিতি স্থাপনের জন্য বিশেষ সুপারিশ করেন ("Find Raiffeisen for India")। তাঁহার সুপারিশক্রমে ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের শাসনকালে 'সমবায় সমিতি গঠন আইন' পাশ হইয়া কৃষকদের ঋণ দিবার উদ্দেশ্যে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠিত হয়। তারপর ১৯১২ সালে 'সংশোধিত সমবায় সমিতি আইন' পাশ হওয়ার ফলে ঋণসমিতি ব্যতীতও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হয়। এই দ্বিতীয় আইন পাশ হওয়ার ফলে ভারতে সমবায় আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করে। ১৯১৯ সালে সমবায় বিভাগ প্রাদেশিক হস্তান্তরিত বিষয়ভুক্ত হওয়ার ফলে প্রাদেশিক সরকারগণ নানাভাবে তাঁহাদের স্থানীয় প্রয়োজনানুসারে এই সমিতিগুলি গঠন করিয়াছেন। বর্তমানে অনেক সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতিও (Co-operative Multi-purpose Societies) গঠিত হইয়াছে।

ভারতীয় সমবায় সমিতিগুলির প্রকার ভেদ—Different types of Co-operative Societies in India

ভারতের সমবায় সমিতিগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে :
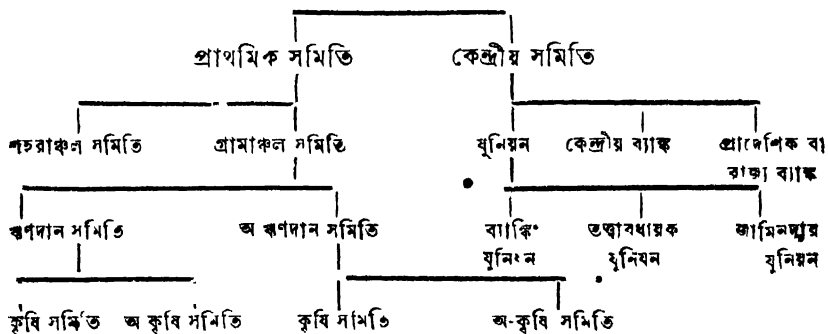
প্রাথমিক সমিতিগুলি গ্রামে গ্রামে ঋণদান বা অন্য নানা উদ্দেশ্যে কাজ করে। কতকগুলি প্রাথমিক সমিতি লইয়া এক একটি য়ুনিয়ন গঠিত হয়। য়ুনিয়নগুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করে। প্রত্যেক জেলায় বা মহকুমায় ইহার

এলাকাস্থিত প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থাকে। সমবায় সমিতিগুলির অভিভাবক হিসাবে প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক আছে।

সমবায় সমিতিগুলি শুধু ঋণদান উদ্দেশ্যে গঠিত হইলে ইহাদিগকে ঋণদান সমিতি এবং ক্রয়, বিক্রয় বা গ্রামোন্নয়ন উদ্দেশ্যে গঠিত হইলে অ-ঋণদান সমিতি বলা হয়। কৃষির উন্নতির জন্য প্রধানতঃ চাষিগণকে লইয়া যে সমিতিগুলি গঠিত হয় তাহাদিগকে কৃষি সমবায় সমিতি বলা হয় এবং যে সমস্ত সমিতির সদস্যগণ চাষী ভিন্ন অন্য শ্রেণীর যথা, তাঁতি বা কাঠের মিস্ত্রি হয় সে সমিতিগুলিকে অ-কৃষি সমবায় সমিতি বলা হয়। যখন একই সমিতি ঋণদান এবং অন্য নানাবিধ উদ্দেশ্যে (ক্রয়, বিক্রয়, সেচব্যবস্থা, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি) গঠিত হয় তখন তাহাকে **সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি** (Co-operative Multi-purpose Societies) বলা হয়।

ভারতের সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য—Features of Co-operative Societies in India

১। ভারতের সমবায় আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই দেশের সমবায় সমিতিগুলি সরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে। সরকার প্রথম হইতে শেষ অবধি এই সমিতিগুলির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। অত্যধিক সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে সমবায় সমিতিগুলি এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই। অন্যান্য দেশে সমবায় আন্দোলন সরকারী সাহায্য ব্যতীত আরম্ভ হইয়াছিল এবং সরকারী সাহায্য ছাড়াই জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায়ই সমিতিগুলি পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

২। ভারতের সমবায় আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলির বেশীর ভাগই হইল কৃষি সমিতি। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, সুতরাং এদেশে কৃষিসমিতিগুলির যে সংখ্যাধিক্য হইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, তবে অন্যান্য বৃত্তিমূলক উৎপাদন-ক্ষেত্রে এই জাতীয় সমিতি প্রসার লাভ করিলে ছোট ছোট শিল্পগুলির উন্নতি দ্রুততর হইত।

৩। বর্তমানে ভারতে কৃষি ও অ-কৃষি, ঋণদান ও অ-ঋণদান প্রভৃতি নানাজাতীয় সমিতি গঠিত হইলেও এই সমিতিগুলির শতকরা ৮১ ভাগই হইল ঋণদান সমিতি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সামাজিক জীবনের নানাদিকে সমবায়

প্রথার যে উপযোগিতা আছে, সে সম্পর্কে ভারতবাসিগণ এখনও পর্যন্ত সচেতন হয় নাই।*

গ্রামীণ সমবায় সমিতির গঠন ও কাজ—Organisation and functions of a Rural Co-operative Society

সমবায়ের প্রধান কাজ প্রাথমিক সমিতিগুলিই করিয়া থাকে। প্রাথমিক সমিতিগুলি শুধু ঋণ-দানের জন্য অথবা ক্রয়, বিক্রয় বা অন্য উদ্দেশ্যেও গঠিত হইতে পারে।

কোনও গ্রাম বা একাধিক গ্রামের কমপক্ষে ১০ জন সাবালক লোক লইয়া এই সমিতিগুলি গঠিত হয়। সমিতির সদস্যগণ পরস্পরের পরিচিত হওয়া চাই। একমাত্র সমিতির সদস্য হইলেই সমিতি হইতে ঋণ ও অন্যপ্রকার সুবিধা পাওয়া যায়। সদস্য হইতে গেলে প্রত্যেক সদস্যকে এক টাকা প্রবেশ-ফি ও সমিতির কয়েকটি শেয়ার কিনিতে হয়। প্রবেশ-ফি, শেয়ারের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও অংশীদারগণের আমানত প্রভৃতি লইয়া সমিতির মূলধন গঠিত হয়। শুধু সদস্যগণই অল্প সুদে টাকা ধার করিতে পারেন। ধার করিতে হইলে সদস্যগণের মধ্য হইতে ঋণগ্রহণকারীর জামিন রাখিতে হয়। সহজ কিস্তিতে ধার শোধ দিতে হয়। সমিতির সদস্যগণের দায়িত্ব অসীম। সমিতি যদি নিজের ঋণ শোধ করিতে না পারে তাহা হইলে সমিতির পাওনাদার যে-কোন সদস্যের সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক দিয়া তাহার প্রাপ্য আদায় করিতে পারে। সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতেই একটি পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচিত করে। একজন সম্পাদক (Secretary) ও একজন কোষাধ্যক্ষ (Treasurer) নির্বাচিত হইয়া সমিতির দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করেন। সমিতির কার্য-পরিচালনা ব্যয়বাহুল্যবর্জিত ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়।

ঋণদান সমিতি ব্যতীত চাষী ও অন্যান্য শ্রেণীর উন্নতির জন্য নানাজাতীয় অ-ঋণদান সমিতি, যথা, ক্রয়-বিক্রয় সমিতি, জলসেচ সমিতি, দুগ্ধ-সরবরাহ সমিতি, ম্যালেরিয়া-নিরোধ সমিতি সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে অ-ঋণদান সমিতির সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। প্রাথমিক সমিতিগুলির কার্য-নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক সাহায্যের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও রাজ্য ব্যাঙ্ক আছে। প্রত্যেক রাজ্যে সমবায় সমিতির কাজের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী (রেজিস্ট্রার)আছেন।

ভারতে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি—Progress of the Co-operative Movement in India

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর হইল ভারতে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই সুদীর্ঘকালে যে সমবায় আন্দোলন ভারতের কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কোনরূপ উন্নতি করিতে পারে নাই, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। এই সময়ের মধ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা, নানাজাতীয় সমবায় সমিতি ও এই সমিতিগুলির মূলধন-পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষকগণকে অল্পসুদে টাকা ধার দেওয়ায় গ্রাম্য মহাজনদের প্রতিপত্তি কিছু পরিমাণে খর্ব হইয়াছে। সমবায়ের সাহায্যে সাধারণ লোকের মধ্যে সঞ্চয় প্রবৃত্তি ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সম্পর্কিত জ্ঞান প্রসারলাভ করিয়াছে। ক্রয়, বিক্রয়, জলসেচ, জমি একত্রীকরণ, বিশুদ্ধ দুগ্ধ-সরবরাহ, ম্যালেরিয়া-নিরোধ প্রভৃতি নানাজাতীয় অ-ঋণদান সমিতির সাহায্যে কৃষি এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্পেরও কিছু পরিমাণ উন্নতি হইয়াছে। গ্রামোন্নয়ন সমিতিগুলি অনেকক্ষেত্রে হতশ্রী-গ্রামগুলিকে পুনর্জীবিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, সমবায় আন্দোলনের সাহায্যে অন্যান্য দেশে কৃষি ও ছোট শিল্পের যে পরিমাণ উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, ভারতে তাহা হয় নাই। ভারতে যত সংখ্যক সমবায় সমিতি আছে তাহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা যায় এরূপ সমিতির সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। ভারতের সমিতিগুলির মধ্যে শতকরা প্রায় ৮১টি হইল ঋণদান সমিতি। সুতরাং যে সমস্ত ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির সাহায্যে জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হইতে পারে (ক্রয়, বিক্রয়, জমি একত্রীকরণ, জলসেচ, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি), সে সমস্ত ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলন খুব কমই প্রসারলাভ করিয়াছে। লোকসংখ্যার তুলনায় ভারতে সমবায় সমিতির সংখ্যাও কম। সমবায় সমিতির দ্বারা শতকরা মাত্র ৬।৭ জন লোক সাহায্য পাইতে পারে। সমিতিগুলির পরিচালনা ব্যবস্থায়ও যথেষ্ট ত্রুটি দেখা যায়। জনসাধারণের অশিক্ষা এবং সমবায় আন্দোলনের মূলনীতি ও আদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞতাই পরিচালনা-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য দায়ী। দীর্ঘদিন ধরিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণের কঠোরতার জন্য এই আন্দোলন ভারতে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই। উপরি-উক্ত ত্রুটিগুলি দূর করিতে পারিলে ভারতের সমবায় আন্দোলন সার্থক হইবে। একমাত্র সমবায় আন্দোলনের সাহায্যে ভারতের গ্রামীণ জীবনের উন্নতি সম্ভব। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনানুসারে ভারতে সমবায় আন্দোলনের

প্রসারকল্পে ৪৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১০৪০০ বৃহৎ সমবায় সমিতি, ১৮০০ সমবায় বাজার সমিতি, ৩৫০টি পণ্যাগার, ৫৫০০টি গুদামঘর স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও, প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতিগুলির উন্নতির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় সমিতি-গুলির যোগসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায় উন্নয়ন কর্মসূচী আরও ব্যাপকতর করা হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রাম-সমাজ লইয়া একটি সমবায় সমিতি গঠন করিবার সংকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। এই প্রাথমিক সমিতিগুলিই গ্রামীণ জীবনের সর্altবিধ উন্নতির দায়িত্ব বহন করিবে। তৃতীয় পরিকল্পনার কাযকালের মধ্যে যাহাতে সমবায় কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে আরও ১৩টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইবে। পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন যে, তৃতীয় পরি-কল্পনান্তে সমবায় সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২ লক্ষ ৩০ হাজার হইবে এবং সদস্যসংখ্যা হইবে ৩৭০ কোটি। আশা করা যায় যে, পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে কৃষকগণকে ৫৩০ কোটি টাকার মত স্বল্প মেয়াদী ও ১৫০ কোটি টাকার মত দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়া সম্ভব হইবে।

ভারতে সমবায় আন্দোলন কিরূপ দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে—

সাল	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	মূলধন পরিমাণ
১৯০৬-'০৭	৮৪৩	৯০,৮৪৪	২৩,৭১,৬৮৩ টাকা
১৯১৪-'১৫	১৭,৩২৭	৮২৪,৫৬৯	১১,২২,৯২০০০ ,,
১৯৫৭-'৫৫	২,১৯ ২৮৮	১৬০,২০,৬৮১	৩৯০ কোটি ,,
১৯৬০-'৬১	৩,৩২,৪৮৮	৩,৫২,৪৪,৫৪৩	১,৩১২,০৯ লক্ষ ,,

৫। সরকারী ও আধা-সরকারী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান—Government and Semi-Government Business

অনেক দেশের সরকার বর্তমানে অনেক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। অনেক সময় কোন সরকারী দপ্তর প্রত্যক্ষভাবে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, আবার অনেক সময় পরিচালনার ভার একটি বিশেষ সমিতির হস্তে ন্যস্ত করা হয়। ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ

পরিচালনার জন্য একটি দপ্তর আছে, কিন্তু রেলপথ পরিচালনার ভার একটি বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। অনেক সময় শহরের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে। ইহা আধা-সরকারী ব্যবস্থা।

সংক্ষিপ্তসার

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সংগঠন

শিল্প-ব্যবসায় একজন মালিকের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে। এরূপক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সাধারণতঃ জমির মালিক, শ্রমিক ও মূলধনের অধিকারী হইতে পারেন এবং উৎপাদনের সমস্ত লাভ-ক্ষতিই তিনি বহন করেন।

দ্বিতীয়তঃ, অংশীদারী কারবারে একাধিক ব্যক্তি তাঁহাদের সমবেত মূলধন ও শ্রমদ্বারা ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারেন। প্রত্যেকেই ব্যবস্থাপনা কার্যে অংশ গ্রহণ করেন ও ব্যবসায়ের ঝুঁকিও বহন করেন।

তৃতীয়তঃ, যৌথ কারবারে বহু ব্যক্তি মূলধন সরবরাহ করে। যাহারা মূলধন সরবরাহ করে তাহারা ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করে না। এই ব্যবস্থায় ব্যবসায় পরিচালনার ভার অংশীদারগণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি সমিতির হস্তে থাকে এবং এই সমিতি পরিচালনা কার্যের জন্য একজন কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে। অংশীদারগণের ঝুঁকি সীমাবদ্ধ হইলেও পরিচালনা কার্যে তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, সমবায় ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকেরা শিল্প ব্যবসায়ের মালিক হয়। তাহারাই পরিচালক এবং পরিচালনা কার্যের ঝুঁকিও তাহাদের বহন করিতে হয়। সমবায়ের মূলনীতি হইল একতাই বল। ইহা ছাড়া, সমবায় সমিতিগুলি সান্নিধ্য, সাম্য, মিতব্যয়িতা, সমষ্টিবোধ প্রভৃতি নীতিগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভারতে সমবায় আন্দোলন

১৯০৪ সালে ভারতে প্রথম সমবায় ঋণদান সমিতি গঠিত হয়। তারপর ১৯১২ সালে নূতন আইন পাশ করিয়া নানাজাতীয় সমবায় সমিতি গঠন করিবার ব্যবস্থা হয়। ভারতে বর্তমানে কৃষি ও অ-কৃষি, ঋণদান ও অন্যান্য এবং নানা কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হইয়াছে। কৃষকদের কম সুদে টাকা ধার দেওয়া, সেচব্যবস্থা, জমির একত্রীকরণ, কৃষি ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে এই

সমিতিগুলি সাহায্য করে। গ্রামোন্নয়ন কাজেও এই সমিতিগুলির কাজ প্রশংসনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে সমবায় আন্দোলন এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত হইয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই এবং ভারতের সমবায় আন্দোলনে ঋণদান সমিতিগুলির প্রাধান্য বিশেষভাবে দেখা যায়।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Name the different forms of business organisation. Point out the sources of strength and weakness in a joint-stock company.

বিভিন্ন রকমের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম লিখ। যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা কর।

উঃ—সাধারণতঃ পাঁচ রকমের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। যথা, ১। এক মালিকানা কারবার—এই কারবারে একজন মাত্র মালিক থাকেন। তিনিই জমির মালিক, তিনিই শ্রমিক এবং তিনি একাই ঝুঁকি বহন করেন।

২। অংশীদারী কারবার—যখন দুই বা ততোধিক লোক মিলিত হইয়া সকলে কিছু কিছু মূলধন দেয়, পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণ করে ও লাভ-লোকসান ভাগ করিয়া লয়, তখন সেই কারবারকে অংশীদারী কারবার বলা হয়। সাধারণতঃ, এই কারবারের প্রত্যেক অংশীদারের দায়িত্ব অসীম।

৩। যৌথ-মূলধনী কারবার—যৌথ মূলধনী কারবারে বহু লোক মিলিত হইয়া শেয়ার কিনিয়া বহু পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করে। শেয়ারের ক্রেতাগণকে অংশীদার বলা হয়। ব্যবসায়ের ঝুঁকি এই অংশীদারগণই বহন করেন, কিন্তু কোম্পানীর দেনার জন্য প্রত্যেক অংশীদারই তাহার শেয়ারের মূল্য পর্যন্ত দায়ী অর্থাৎ অংশীদারগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ—এইজন্য এই কারবারগুলিকে লিমিটেড কোম্পানী বলা হয়। এই কারবারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, শেয়ারগুলি হস্তান্তর-যোগ্য অর্থাৎ শেয়ারের মালিকগণ শেয়ার বিক্রয় করিয়া দিতে পারেন। এই দুইটি হইল অংশীদারের কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই কারবারের পরিচালনভার অংশীদারগণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি পরিচালক সভার উপর ন্যস্ত থাকে।

সুবিধা—১। অধিক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠন করা যায়, ২। লোকের স্বল্প পরিমাণ পুঁজিও বিনিয়োগ করিয়া অতিরিক্ত আয় পাইতে পারে, ৩। অংশীদার-গণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ বলিয়া ইহা জনপ্রিয়, ৪। শেয়ারগুলির হস্তান্তরযোগ্যতা এই কারবারের আর একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, ৫। পরিচালনা-ব্যবস্থা উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইতে পারে ও পরিচালক-গণের ঝুঁকি লইতে হয় না বলিয়া নূতন নূতন উদ্যমে রত হইতে পারেন।

অসুবিধা—১। পরিচালকগণ অযথা ঝুঁকি লইয়া অংশীদারগণের স্বার্থহানি করিতে পারে।

২। নির্বাচন প্রথায় নিযুক্ত পরিচালক সব সময়ে দক্ষ না হইতেও পারে, ৩। শ্রমিক-মালিকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক না থাকার ফলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ ঘটিয়া উৎপাদন বাধা পায়।

৪। সমবায়—সমবায়ে শ্রমিকেরা মালিক। তাহারাই মূলধন যোগায়, ঝুঁকি বহন করে ও মুনাফা ভাগ করিয়া লয়। সমবায়ে সকলেই সমান—পুঁজিপতি বা মধ্যস্বত্বভোগীর কোন স্থান নাই।

৫। সরকারী ও আধা-সরকারী ব্যবসায়—এই ব্যবস্থায় সরকার ও মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে ডাক, তার, রেলপথ, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিয়া থাকে।

2. What is meant by 'Co-operation'? Describe the different types of co-operative societies which prevail in India. H. S (Hu.) 1960

সমবায় বলিতে কি বুঝ? ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের সমবায় সমিতিগুলির বিবরণ দাও।

উঃ—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল দূর করিবার উদ্দেশ্যে সমবায় প্রথা প্রবর্তিত হয়। সমবায়ের অর্থ হইল যৌথ অনুষ্ঠান বা সহযোগিতা, ইহার মূলনীতি হইল—একতাই বল। ধনী ও শক্তিশালী ব্যক্তিগণ এককভাবে যে সুখ সুবিধার অধিকারী, দরিদ্র ও দুর্বল ব্যক্তিগণও সমবেতভাবে কাজ করিলে সেই সমস্ত সুখ-সুবিধার অধিকারী হইতে পারে। সমবায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমবায়ের সদস্যগণই কারবারের কর্মী ও মালিক এবং লাভ লোকসান সমভাবেই তাহারা বহন করে। এই ব্যবস্থায় দালাল বা পুঁজিপতির কোন স্থান নাই। জন প্রতি এক ভোট নীতিতে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। সদস্যগণ সহযোগিতার মনোভাব লইয়া সাম্যের ভিত্তিতে (Equality) স্বাধীনভাবে কাজ করে। সদস্যগণের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যতীতও তাহাদের নৈতিক উন্নতি করাও সমবায়ের আর একটি উদ্দেশ্য।

নানাধরণের সমবায় সমিতি হইতে পারে। উৎপাদনের জন্য উৎপাদকগণ যে সমিতি গঠন করে তাহাকে উৎপাদকগণের সমিতি (Producers' Co-operation) বলা হয়। এইরূপে ক্রয় ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় ও বিক্রয় সমিতি (Purchase and Sale Societies) গঠিত হইতে পারে। কৃষি ঋণদান করিবার উদ্দেশ্যে ঋণদান সমিতি (Co-operative Credit Society) দেখা যায়। ঋণ দেওয়া ছাড়া অন্যান্য সুবিধা দিবার জন্য অ-ঋণদান সমিতি (Non-credit Society) গঠিত হয়। ইহা ছাড়া সমবায়মূলক ব্যাঙ্ক (Co-operative Bank) ও শিল্প সমবায় (Industrial Co-operative) গঠিত হইতে পারে। ভারতের সমবায় সমিতিগুলিকে সাধারণতঃ ঋণদান ও অ-ঋণদান সমিতিতে ভাগ করা হয়। আবার এই উভয় সমিতি কৃষিগত ও অ-কৃষিগত সমিতি হইতে পারে। বর্তমানে অনেক সর্বার্থসাধক (Mutli-purpose) সমিতিও গঠিত হইয়াছে।

3. Describe the part which Co-operation can play in the development of Indian agriculture. H. S. (Hu.) 1961

ভারতে কৃষির উন্নতিতে সমবায় কিভাবে সাহায্য করিতে পারে লিখ।

উঃ—ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও এদেশের কৃষকগণ নিরতিশয় অজ্ঞ ও দরিদ্র।

কৃষকগণের এই অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য হইল ভারতে কৃষির উন্নতির প্রধান অন্তরায়। আত্মসাহায্যই হইল প্রধান সাহায্য (Self-help is the best help) এই নীতি অনুযায়ী বলা যায় যে, কৃষকগণ সমবেতভাবে তাহাদের প্রচেষ্টায় তাহাদের দুরবস্থা অনেক পরিমাণে দূর করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে। এইজন্যই সমবায়ের প্রয়োজন। সমবায় সমিতিগুলি নিম্নলিখিতভাবে কৃষির উন্নতিতে সাহায্য করিতে পারে।

১। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি কৃষকগণকে অল্পসুদে ও কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতিতে টাকা ধার দিতে পারে। ইহাতে তাহাদের মহাজনের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন হয় না।

২। সমবায় জমি একত্রীকরণ সমিতির সাহায্যে জমির খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ততা দূর করা যায়।

৩। সমবায় সেচব্যবস্থা সাহায্যে জমিতে জল দিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

৪। সমবায় ক্রয় ও বিক্রয় সমিতিগুলির সাহায্যে কৃষকগণ একদিকে সস্তায় বীজ সার, কাস্তে-লাঙ্গল প্রভৃতি উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীগুলি ক্রয় করিতে পারে, অপর দিকে বিক্রয় সমিতিগুলির সাহায্যে তাহারা ফড়িয়া, দালাল প্রভৃতি সাহায্য ছাড়াই উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লাভের সমগ্র পরিমাণ নিজেরাই পাইতে পারে। ইহাতে তাহাদের আয় বৃদ্ধি পায়।

৫। সমবায় গ্রামীণ সমিতি, ম্যালেরিয়া-নিরোধ সমিতি, সমবায় ঋণ সালিসী বোর্ড গঠন করিয়া কৃষকগণ তাহাদের সামাজিক জীবনের নানাদিকে উন্নতি করিতে পারে। একমাত্র সমবায়ের সাহায্যে আমাদের হতশ্রী গ্রামগুলির উন্নতি করা সম্ভব।

4. State the principles of Co-operation What are the different types of Co-operative Societies to be found in India? H S (Hu) 1962

সমবায়ের নীতিগুলি বর্ণনা কর। ভারতে কি কি বিভিন্ন ধরণের সমবায় সমিতি দেখিতে পাওয়া যায়?

উঃ—সমবায়ের অর্থই হইল সকলে একত্রে কাজ করা। ধনী ও শক্তিশালী ব্যক্তিগণ এককভাবে যে সুখ-সুবিধার অধিকারী, দরিদ্র ও দুর্বল ব্যক্তিগণ সমবেতভাবে কাজ করিলে সেই সমস্ত সুখ সুবিধার অধিকারী হইতে পারে। সমবায়ের ভিত্তি হইল একতা।

সমবায় সমিতিগুলি শুধু কতকগুলি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নহে। এই সমিতিগুলি কতকগুলি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমিতিগুলি যতই এই মূলনীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গঠিত হয়, সমিতিগুলির কার্যকারিতা তদনুপাতে বৃদ্ধি পায়। নীতিগুলি হইল:

১। সান্নিধ্য—সমিতির সদস্যগণের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় একান্ত আবশ্যক, নতুবা তাহারা এক যোগে কাজ করিতে পারে না। এইজন্যই একই গ্রামের বা একই বৃত্তির সদস্য লইয়া সমিতিগুলি গঠিত হয়।

২। সাম্য—সদস্যগণ সকলেই সমান। শেয়ারের মূল্য নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক সদস্যই এক ভোটের অধিকারী।

৩। স্বেচ্ছা প্রণোদিত সমিতি—প্রত্যেক সদস্যই নিজের ইচ্ছামত সমিতিতে যোগদান করিতে পারে।

৪। সততা—সততাই হইল সমবায়ের প্রধান মূলধন। সুতরাং জাল-জুয়াচোর, মাতাল, মামলাবাজ প্রভৃতি অসৎ লোকদের সমবায়ের সদস্য করা হয় না।

৫। মিতব্যয়িতা—সমবায়ের সদস্যগণ নিজেরাই সমিতির কাজ পরিচালনা করে। সুতরাং অন্যান্য কারবারের ন্যায় পরিচালনা কাযের জন্য অযথা ব্যয় করে না।

৬। সমষ্টিবোধ—সমবায় সমিতির পরিচালনা ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জন প্রতি এক ভোট-নীতিপ্র চলিত থাকার জন্য সদস্যগণের মধ্যে একাত্মবোধ ও সহযোগিতা জন্মে।

উত্তরের দ্বিতীয় ভাগের জন্য ৩নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

5. Explain the nature of a Co-operative Society. In what respects does it differ from a joint-stock company ?

সমবায় সমিতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। যৌথ মূলধনী কারবারের সহিত ইহার কি কি বিষয়ে পার্থক্য আছে ?

উঃ—সমবায় সমিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমবায়ের সদস্যগণই হইল ইহার শ্রমিক ও মালিক। কারবারের লাভ-লোকসান সকলেই সমানভাবে ভাগ করিয়া লয়। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় কোন দালাল নাই—সদস্যগণ নিজেরাই পরিচালনা কায করে। তৃতীয়তঃ, জন প্রতি এক ভোট-নীতিতে সদস্যগণ সহযোগিতার মনোভাব লইয়া স্বাধীনভাবে সাম্যের ভিত্তিতে কাজ করে। পরিশেষে এই সমিতিগুলি সদস্যগণের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যতীতও নৈতিক উন্নতি বিধানে সাহায্য করে।

১। যৌথ মূলধনী কারবার অধিক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠন করিবার উদ্দেশ্যে নানাজাতীয় শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে, অপরপক্ষে সমবায় সমিতি-গুলি অল্প পরিমাণ মূলধন সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করে।

২। যৌথ মূলধনী কারবার প্রধানতঃ মুনাফার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়, সমবায় সমিতিগুলি মুনাফা-লোভে গঠিত না হইয়া সদস্যগণের অবস্থার উন্নতির উপর অধিক জোর দেয়।

৩। যৌথ মূলধনী কারবারে শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ বিভিন্ন, সমবায়ে শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ অভিন্ন।

৪। সমবায়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার সাম্যনীতি, কিন্তু যৌথ মূলধনী কারবারে ইহার অভাব দেখা যায়।

৫। সমবায়ে ব্যবস্থাপনা কায ও ঝুঁকিবহন একই লোকের হস্তে ন্যস্ত, অপরপক্ষে যৌথ মূলধনী কারবারে এই দুইটি কায বিভিন্ন হস্তে ন্যস্ত।

৬। যৌথ মূলধনী কারবারে অংশীদারগণের দায়িত্ব হইল সসীম, সমবায় সমিতিগুলির সদস্যদের দায়িত্ব সাধারণতঃ অসীম।

৭। যৌথ মূলধনী কারবারে শেয়ারগুলি অংশীদার ইচ্ছামত হস্তান্তর করিতে পারে কিন্তু সমবায় সমিতিগুলির শেয়ারগুলি হস্তান্তরযোগ্য নহে।

অষ্টম অধ্যায় (খ)

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন

(Small and Large-Scale Industries)

শিল্পের সংজ্ঞা—Definition of an Industry

শিল্প বলিতে ব্যাপক অর্থে সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থাই বুঝায়। এই অর্থে কৃষিও ভারতের সর্বপ্রধান শিল্প বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু কৃষি ও শিল্প একজাতীয় উৎপাদন-পদ্ধতি নহে। কৃষিকাযে মানুষের শ্রম অপরিহার্য হইলেও প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত কৃষিকার্য সম্ভব হয় না—সুতরাং কৃষি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এখানে প্রকৃতিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিল্পের ক্ষেত্রে প্রকৃতির অবদান থাকিলেও মানুষ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। শিল্পে মানুষ প্রকৃতি হইতেই কাঁচামাল (কৃষিজাত, খনিজ) সংগ্রহ করে বটে, তবে যন্ত্রের সাহায্যে নিজের কায়িক পরিশ্রম ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এই কাঁচামালগুলিকে নানাজাতীয় ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যে পরিণত করে। সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে মানুষই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। যন্ত্রের সাহায্যে বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া যে উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাহাকে বিশেষ অর্থে শিল্প বলা হয়।

বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কাহাকে বলে—What are Large-scale, Small-scale and Cottage industries

শিল্পগুলিকে সাধারণতঃ বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের পর্যায়ে ভাগ করা হয়। (যে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন কায বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে যন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যেখানে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমপক্ষে অন্ততঃ ৫০০ জন, সেই সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থাকে বৃহৎ শিল্প বলা হয়।) নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ হইতে ৫০০ শত হইলে, তাহাকে মাঝারি (Medium-sized) শিল্প বলা হয়। নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা যদি ৫০ জনের কম হয় অথবা শিল্পে কোন শক্তি ব্যবহৃত না হইয়াও যদি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১০০ জন পর্যন্ত হয় তাহা হইলেও এই জাতীয় শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়।

যে শিল্পগুলি সাধারণতঃ পারিবারিক ভিত্তিতে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য ব্যতীত অল্পসংখ্যক শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহাদিগকে কুটিরশিল্প বলা হয়। কুটিরশিল্প প্রধানতঃ গ্রামকেন্দ্রিক হইলেও শহরাঞ্চলেও ইহার প্রসার দেখা যায়।

শিল্প-সংগঠন—Organisation of Industries

বৃহদায়তন শিল্প একমালিকী, অংশীদারী অথবা যৌথ-মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে। কিন্তু বড় বড় শিল্পে এত অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় যে, তাহা একজন মালিকের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। ইহা ছাড়া, এই কারবারের ঝুঁকিও এত বেশী যে, মালিক একাকী এই ঝুঁকি সাধারণতঃ লইতে ইচ্ছুক হয় না। এই কারণে বড় বড় শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমানে অংশীদারী ও বিশেষ করিয়া যৌথ-মূলধনী কারবারের আধিক্য দেখা যায়। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলি সাধারণতঃ একমালিকী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত হয়।

বৃহদায়তন শিল্প আবির্ভাবের কারণ—Causes of the growth of Large-scale Industries

বর্তমান যুগে উৎপাদনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট ছোট শিল্পের পরিবর্তে বড় বড় শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট তাঁত শিল্পের স্থলে বৃহৎ বহরের বস্ত্রশিল্প গঠিত হইয়াছে। ফলে, একদিকে যেরূপ ছোট ছোট শিল্পের সংখ্যা কমিয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ বড় শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম-বিভাগ নীতির প্রবর্তন ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারই হইল বৃহদায়তন শিল্প উদ্ভবের প্রধান কারণ। এখন দেখা যাউক, শ্রম-বিভাগ কি এবং উৎপাদনে শ্রম-বিভাগের কি কাযকারিতা আছে।

শ্রম-বিভাগ—Division of Labour

কোন লোকই তাহার প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্যই তৈয়ারী করিতে পারে না, কারণ তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির একটি সীমা আছে। এইজন্য দেখা যায় যে, বিভিন্ন লোক তাহার রুচি ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ করে। কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করে, শিল্পী শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে কর্মকার লৌহদ্রব্য উৎপাদন করে, শিক্ষক অধ্যাপনা করেন। এইরূপে বিভিন্ন লোক একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন কাজে যখন তাহার কর্মপ্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখে

এখন এই নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টাকেই বিশেষত্বশীলতা (Specialisation) বলা হয়। বর্তমান যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থায় এই বিশেষত্বশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা স্তরে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেকটি অংশ সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু বিশেষত্বশীলতার দোষ হইল যে, এই পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিই একাকী সম্পূর্ণ কাজটি করিতে পারে না। যে কৃষক ধান উৎপাদন করে তাহাকে লাঙ্গলের জন্য ছুতার মিস্ত্রী ও কর্মকারের সাহায্য লইতে হয়, যে জুতা তৈয়ারী করে তাহাকে অপর ব্যক্তির নিকট হইতে পাকা চামড়া (Tanned Leather) সংগ্রহ করিতে হয়। নতুবা তাহার কর্মপ্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে না। এইজন্য বিশেষত্বশীলতা ফলপ্রসূ হয় তখন যখন বিশেষত্বশীলতার সহিত সহযোগিতা (co-operation) যুক্ত হয়। সুতরাং বর্তমান যুগে শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে যে বৃহৎ বহরে উৎপাদন কায পরিচালিত হয় তাহার মূল কারণ হইল বিশেষত্বশীলতা ও সহযোগিতার একত্র সমাবেশ। এইরূপে সমাজের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কাজ করে এবং বিনিময়ের সাহায্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের (সহযোগিতা) দ্বারা তাহাদের নানাজাতীয় অভাব পূরণ করে।

বিভিন্ন ধরণের শ্রম-বিভাগ—Different forms of Division of Labour

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে শ্রম বিভাগ নীতি ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হইয়াছে। আদি মানবসমাজে হয়ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে কাজের ভাগ ছিল। কিন্তু কালক্রমে ইহা বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। গুণ ও কাজের ভিত্তিতেই আমাদের ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—চারিটি জাতির সৃষ্টি হয়। এই বিভাগকে বৃত্তিগত বা ব্যবসায়গত শ্রম-বিভাগ (Division into trades and professions) বলা হয়। সামাজিক অগ্রগতির ফলে পরবর্তী যুগে শ্রম বিভাগ নীতি অধিকতর বিশেষত্বশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রম বিভাগের প্রথম যুগে কৃষককে কৃষিকার্য-সংক্রান্ত সকল কাজই করিতে হইত, কিন্তু পরবর্তী যুগে একজনে শুধু লাঙ্গল তৈয়ারী করিতে লাগিল ও অপর জনে শুধু চাষবাস কাজে রত থাকিল। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন কাজগুলি ছোট ছোট অংশে ভাগ হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি অংশ স্বয়ং-সম্পূর্ণ (Division into process which is complete)। বর্তমান যুগে যন্ত্রের

সাহায্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে মানুষের এই আদিম কর্মবিভাগ নীতি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেকটি উৎপাদন-কার্যই শত শত ক্ষুদ্র পদ্ধতিতে বিভক্ত হয় এবং যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন শ্রমিক দ্বারা প্রত্যেকটি পদ্ধতির কায নিষ্পন্ন হয়। য়্যাডাম্ স্মিথ প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে লিখিয়াছিলেন যে, সামান্য একটি আলপিন প্রস্তুত-কার্য শতাধিক বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভক্ত ছিল। কেহ জড়ানো তার সোজা করে, কেহ তারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটে, কেহ পিনের মাথার বল করে, কেহ বা পিনের নিম্নভাগ সূক্ষ্ম করে। জুতা-তৈয়ারীর কারখানাতেও বর্তমানে দেখা যায় যে, কাঁচাচামড়া পাকা করিবার পদ্ধতি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পযন্ত সম্পূর্ণ জুতা তৈয়ারী কাজ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি পদ্ধতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদ্ধতির সহিত সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু একক-ভাবে প্রত্যেকটি পদ্ধতিই অসম্পূর্ণ ও উপযোগিতাবিহীন (Division into process which is incomplete)। সকল পদ্ধতির সহযোগিতায় সম্পূর্ণ জুতা প্রস্তুত হয়।

ইহা ছাড়াও আর এক ধরণের শ্রম-বিভাগ দেখা যায়। ইহা স্থানীয় বিশেষত্বশীলতার (Territorial Division of labour) বলা হয়। আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত বা জমির বিশেষ উর্বরতা শক্তির জন্য কোন কোন স্থানে বিশেষ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে পাট উৎপন্ন হয় বলিয়া পাটশিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বস্ত্রশিল্পগুলি বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রম-বিভাগের সুবিধা—Advantages of Division of labour

শ্রম-বিভাগের অনেক সুবিধা আছে। এই ব্যবস্থায় একটি কাজ ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়। য়্যাডাম্ স্মিথ যে পিন তৈয়ারীর উদাহরণ দিয়াছেন তাহার সাহায্যেই শ্রম-বিভাগের সুবিধাগুলি বুঝিতে পারা যায়। একজন লোক একাকী যদি পিন তৈয়ারী করে তাহা হইলে তাহাকে পিন তৈয়ারী কাজের প্রত্যেক অংশ নিজেকে করিতে হয়। তাহাকে একটি কাজ শেষ করিয়া অন্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে অন্য কাজ করিতে হয়। এক কাজ ও একটি হাতিয়ার ছাড়িয়া তাহাকে অন্য হাতিয়ারের সাহায্যে নূতন কাজ করিতে হয়। অনেক সময় স্থান ত্যাগ করিতে হয়। ইহার ফলে বহু সময় নষ্ট হয়। কোন যন্ত্রপাতিই সব সময়ে কাজে ব্যবহার হয় না। একজন লোককে পিন তৈয়ারীর সব কাজ করিতে হয় বলিয়া সে কোন কাজই ভাল করিয়া করিতে পারে না, ফলে ভাল পিন তৈয়ারী হয় না।

লোকটিকে নানা কাজ করিতে হয় বলিয়া সে দ্রুত কোন কাজ করিতে পারে না, ফলে উৎপাদন পরিমাণও কম হয়। কিন্তু পিন তৈয়ারীর কাজ যদি বিভিন্ন লোকের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যায় ও সকলে মিলিয়া যদি কাজটি করে তাহা হইলে অল্প সময়ে বহু উৎকৃষ্ট ধরণের পিন তৈয়ারী করা সম্ভব। কারণ প্রথমতঃ, ভাগ হওয়ার ফলে কাজটি সোজা হয়; দ্বিতীয়তঃ, সম্পূর্ণ কাজটির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন শ্রমিকগণের মধ্যে তাহাদের যোগ্যতা অনুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেকেই একই কাজ বার বার করে বলিয়া তাহার কাজের দক্ষতা বাড়ে ও সেই কাজ দ্রুত করিতে পারে। চতুর্থতঃ, ইহাতে সময় আদৌ নষ্ট হয় না, কারণ প্রত্যেকেই একই জায়গায় একই যন্ত্র লইয়া কাজ করে। কাজটি ভাগ হয় বলিয়া কাজটির একটি অংশ শিখিতে বেশী সময় লাগে না। পঞ্চমতঃ, এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রমিক পৃথক পৃথক কাজ করে বলিয়া প্রত্যেকের জন্য একপ্রস্থ যন্ত্রপাতি লাগে এবং এই একপ্রস্থ যন্ত্রপাতির সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয়। ষষ্ঠতঃ, কাজটি ছোট ছোট অংশে ভাগ হয় বলিয়া শ্রমিকের কষ্ট লাঘব হয়। সপ্তমতঃ, ছোট ছোট সরল অংশে বিভক্ত কাজগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এইজন্য শ্রমিকগণ এক অংশের কাজ হইতে অপর অংশের কাজে যাইতে পারে। ইহাতে শ্রমিকের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং দেখা যায় যে, শ্রম বিভাগের ফলে শ্রমিকগণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ অল্প সময়ে তাহারা অধিক পরিমাণ ও উৎকৃষ্ট ধরণের দ্রব্য তৈয়ারী করিতে পারে। ফলে, উৎপাদন ব্যয় কম হয়। উৎপাদন-ব্যয় কম হইলে মূল্য হ্রাস হয় এবং জিনিসের দাম কমিলে ক্রেতা সাধারণের সুবিধা হয়।

শ্রম-বিভাগের অসুবিধা—Disadvantages

সমাজের দিক দিয়া শ্রম বিভাগ কল্যাণকর হইলেও শ্রমিকের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহার কয়েকটি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, একই কাজ বার বার করিতে করিতে কাজে একঘেয়েমি জন্মে। ইহাতে কাজের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ কমিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, একধরণের কাজ করিতে হয় বলিয়া শ্রমিকের চিত্তের প্রসার কমিয়া যায়। যে শ্রমিক নিত্যই কলে সুতা জোগান দেয়, তাহার অন্য কোন বিষয়ে আর তাদৃশ আসক্তি থাকে না। সে নিজেই একটি যন্ত্রে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ, অত্যধিক শ্রম-বিভাগের ফলে বেকার সমস্যা দেখা দিতে পারে।

যদি কোন কারণে একটি বিশেষ কাজে মন্দা দেখা দেয়, তাহা হইলে এই অত্যধিক বিশেষত্বশীলতার ফলে শ্রমিকেরা অন্য কোন কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনে অক্ষম হয়। চতুর্থতঃ, বড বহরের উৎপাদনক্ষেত্রেই শ্রম-বিভাগ সম্ভব। যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক একত্র হইয়া যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করে, সেখানকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। শ্রমিকগণও অস্বাস্থ্যকর বস্তি অঞ্চলে বাস করিতে বাধ্য হয় এবং কাজের একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য নানা অস্বাস্থ্যকর আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়। ফলে, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

উপরে শ্রম-বিভাগের যে দোষগুলির উল্লেখ করা হইল তাহা সহজেই দূর করা সম্ভব। দেশের সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া শ্রমিকের কাজের সময় ও মজুরির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। মালিকও শ্রমিকের বাসস্থান, চিকিৎসা, খেলাধূলা ও রুচিকর আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের কাজের ইচ্ছা ও কাজের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারেন।

শ্রম-বিভাগের সীমা—Limits to Division of labour

শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হইলে বেশী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ও ইহাতে উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পায়। সুতরাং সকল উৎপাদকই বেশী লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যন্ত্রের সাহায্যে শ্রম বিভাগের ভিত্তিতে বহু শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করে। কিন্তু বাজারে যদি দ্রব্যটির বিশেষ চাহিদা না থাকে তাহা হইলে শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিয়া কোন লাভ নাই। একজন তাঁতী যদি মাসে ৫০ খানা কাপড় একাই তৈয়ারী করিতে পারে এবং যদি ঐ জায়গায় ৫০ খানার বেশী চাহিদা না থাকে তাহা হইলে সে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য দ্বিতীয় আর একজন লোক নিযুক্ত করিতে পারে না। সুতরাং শ্রম-বিভাগ সম্ভব তখনই যখন শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে উৎপাদিত দ্রব্যটির বিস্তৃত চাহিদা থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা হইল ঋতুগত অর্থাৎ সাময়িককালের জন্য সে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষেত্রেও শ্রমবিভাগ সম্ভব নয়। যদি কোন দ্রব্যের চাহিদা বৎসরে তিনমাসকাল স্থায়ী হয় (যেমন আমাদের এখানে পশমজাত দ্রব্য) তাহা হইলে সে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যবস্থায় বহু শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া শ্রম-বিভাগ প্রবর্তন করা লাভজনক হয় না।

যন্ত্র—ইহার সুবিধা ও অসুবিধা—Machinery—its advantages and disadvantages.

অষ্টদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডে যে শিল্পবিপ্লব হয় তাহার ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যন্ত্রের ব্যবহার ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করিয়া বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে যন্ত্রব্যবহার এরূপ ব্যাপক হইয়াছে যে, বর্তমান যুগকে যান্ত্রিক যুগ বলা হয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমগ্র উৎপাদন-ক্ষেত্রে যন্ত্র এখন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। যন্ত্রের এই বহুল ব্যবহারের কারণ হইল ইহার বিশেষ কতকগুলি সুবিধা।

সুবিধা :—

১। যন্ত্র মানুষের শ্রমভার বহুলপরিমাণে লাঘব করিতে সাহায্য করিয়াছে। ইজিপ্টের বিস্ময়কর পিরামিডগুলি, ভারতের তাজমহল প্রভৃতি নির্মাণ করিতে কত শত শ্রমিকের জীবনপাত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্তমান যুগে উক্তজাতীয় নির্মাণকায সম্ভব না হইলেও বলা যায় যে, যে-কায সম্পাদনের জন্য সহস্র সহস্র লোকের জীবনপাত করিতে হইত বর্তমান যুগে তাহা অতি সহজেই যন্ত্রসাহায্যে সম্ভব হয়। সুতরাং এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, যন্ত্র মানুষের মুক্তির সন্ধান দিযাছে।

২। যন্ত্র মানুষের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়াছে। যন্ত্র-সাহায্যে মানুষ দ্রুততরভাবে সূক্ষ্ম কায সম্পাদন করিতে পারে। ইহাতে সময়েরও মিতব্যয়িতা হয়।

৩। যন্ত্রসাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্তে আনয়ন করিয়া তাহার সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছে।

৪। যন্ত্র ব্যবহার না করিয়া যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায় যন্ত্র-সাহায্যে তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব। যন্ত্রসাহায্যে অধিক পরিমাণ দ্রব্য ও উৎকৃষ্টতর দ্রব্য অল্প সময়ে উৎপাদন করা সম্ভব।

৫। যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন খরচা হ্রাস পায়। যে-সমস্ত শিল্পগুলি প্রধানতঃ যন্ত্রসাহায্যে পরিচালিত হয়, সে-সমস্ত শিল্পে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন নীতি কাযকরী হয়। উৎপাদনের বহর যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, প্রতি মাত্রা সামগ্রীর উৎপাদন খরচা সাধারণতঃ ততই হ্রাস পাইতে থাকে। ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়।

অসুবিধা :—

১। যান্ত্রিক উৎপাদনের প্রধান অসুবিধা হইল যে, এই পদ্ধতিতে, নির্ধারিত মান অনুযায়ী একই প্রকার দ্রব্য উৎপাদিত হয়। ইহা ক্রেতার রুচির পরিচর্যা করিতে পারে না।

২। যান্ত্রিক উৎপাদনের আর একটি অসুবিধা হইল ইহার একঘেয়েমি। প্রতিদিন একই কাজ করিতে করিতে শ্রমিকের সেই কাজের উপর বিতৃষ্ণা হয়। নূতনত্বের অভাবে নির্ধারিত কাযে তাহার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের অভাব ঘটিতে পারে। কিন্তু উপরি-উক্ত অসুবিধা বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কতদূর প্রযোজ্য তাহা প্রণিধানযোগ্য। একটি বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান যেখানে সহস্র সহস্র লোক বৈচিত্র্যময় পরিবেশে নির্ধারিত কায সম্পাদন করিতেছে, সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থাই শ্রমিকের চিত্তবিনোদনে সহায়তা করে। অন্ততঃপক্ষে একথা বলা চলে যে, যে কৃষক সমস্ত দিন একাকী ভূমিকর্ষণ কাযে নিযুক্ত আছে, তাহার মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ অপেক্ষা বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কোন শ্রমিকেরই অবসাদ ও ক্লান্তি অধিক নহে।

৩। যান্ত্রিক উৎপাদনের বিরুদ্ধে আরও বলা হয় যে, এই ব্যবস্থায় বহু লোক স্বল্পপরিসর স্থানে একত্রিত হয়। যন্ত্র পরিচালনার ফলে আবহাওয়া দূষিত হইয়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শ্রমিকগণও তাহাদের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য নানাবিধ অবাঞ্ছিত আমোদ-প্রমোদে রত হয়। ফলে শারীরিক ও মানসিক অবনতি ঘটে।

কিন্তু উপরি-উক্ত অসুবিধাগুলির অধিকাংশই ব্যবস্থাপক উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া দূর করিতে পারেন। শ্রমিকগণের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সভ্যদেশগুলিতে নানাপ্রকার আইন প্রবর্তিত হইয়াছে।

শ্রমিকের উপর যন্ত্রের প্রভাব—Influence of Machinery on Labour.

শ্রম ও মূলধন উভয়েই উৎপাদনের দুইটি বিভিন্ন উপাদান। মূলধনের একটি রূপ হইল যন্ত্র। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে শ্রম ও মূলধন অর্থাৎ যন্ত্র পরস্পর-বিরোধী। নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে শ্রমের কার্যকারিতা হ্রাস পায়, কারণ যে কার্য সম্পাদন করিবার জন্য একশত শ্রমিকের প্রয়োজন যন্ত্রের সাহায্যে সে

কার্যটি পাঁচজন শ্রমিকের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। সুতরাং উৎপাদনে যন্ত্র ব্যবহৃত হইলেই শ্রমিকের উপযোগিতা হ্রাস পায়। ফলে, বেকার সমস্যা উপস্থিত হয়। সুতরাং শ্রমিকেরা সাধারণতঃ যন্ত্র ব্যবহারের বিরোধী।

উপরি-উক্ত মত আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যন্ত্র ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের শ্রমভারের লাঘব হয়। যন্ত্র শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। যন্ত্রসাহায্যে স্বল্প খরচায় উৎকৃষ্টতর দ্রব্য উৎপাদিত হয় এবং সেজন্য শ্রমিকগণ অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে।

যন্ত্র ব্যবহার শুরু হইলে শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পায় সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যন্ত্র ব্যবহার আরম্ভ হইলে যন্ত্র পরিচালনার জন্য কিছু সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। যন্ত্রের ব্যবহার যতই প্রসারলাভ করে যন্ত্র উৎপাদন করিবার (Machine making) শিল্পগুলির সংখ্যাও তত বেশী হয়। এই নূতন শিল্পগুলিতে শ্রমিকগণ শেষ পর্যন্ত নিযুক্ত হয়। যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদন খরচা হ্রাস পায় ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। ইহার ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেই শিল্পের প্রসার ঘটে। শিল্প প্রসারলাভ করিলে নূতন শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। শিল্পের প্রসার না হইলেও মূল্যহ্রাসের ফলে লোকের উদ্বৃত্ত অধিক হয়। এই উদ্বৃত্ত অর্থ লোকে অন্যভাবে ব্যয় করে। নূতন দ্রব্য বা নূতন কাজের উপর ব্যয় করিবার ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইলে নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং এই নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ কর্মসংস্থান করিতে পারে।

সুতরাং যন্ত্র ব্যবহারের প্রথম অবস্থায় যে বেকার সমস্যা দেখা যায় তাহা দীর্ঘস্থায়ী নহে। যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শ্রমিকগণ নানাভাবে উপকৃত হইয়া থাকে। যন্ত্রের ব্যবহারের যে কুফল তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যন্ত্রের মালিকের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই কুফলগুলি দূর করা সাধ্যাতীত নহে।

বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা—Advantages of Large-scale production.

বর্তমান যুগে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রসারলাভ করিয়াছে, ফলে ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পগুলির সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে হাজার হাজার শ্রমিক বহুপরিমাণ সামগ্রী একসঙ্গে উৎপাদন করিতেছে। অল্প বহর অপেক্ষা বৃহৎ

বহরে উৎপাদন করিবার কতকগুলি সুবিধা আছে। এই সুবিধাগুলির জন্যই বর্তমানে বৃহৎ বহরের উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্ষুদ্র বহরের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সুবিধাগুলি হইল আবার দুই রকমের—আভ্যন্তরীণ (Internal) ও বাহ্যিক (External)। কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকারে বড় হইলে অনেক বিষয়ে ইহার গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। ইহার কারণ হইল যে, বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এক সঙ্গে অনেক কাঁচামাল কিনিতে হয় এবং একসঙ্গে অনেক মাল কেনে বলিয়া সে পাইকারী দরে কিনিতে পারে। অনুরূপভাবে তাহার বিজ্ঞাপনের ব্যয়ও কম। এই সুবিধাগুলিকে আভ্যন্তরীণ সুবিধা বলা হয়। ইহাতে শিল্পটির ব্যয়-সংকোচ হয়।

বাহ্যিক সুবিধাগুলি কোন একটি শিল্পের প্রসারের উপর নির্ভর করে না—এই সুবিধাগুলি নির্ভর করে সমগ্রভাবে শিল্পটির প্রসারের উপর। শিল্প স্থানীয়-করণের ফলে এই সুবিধাগুলি পাওয়া যায়। এক জায়গায় একজাতীয় বহু কারখানা স্থাপিত হইলে বহু অনুপূরক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রধান শিল্পটির কাঁচামাল সরবরাহের জন্য নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হয়। মূলধন সরবরাহ করিবার জন্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিকেরাও কাজ পাইবার জন্য ঐ স্থানে সমবেত হয়। এইজাতীয় সুবিধা সমস্ত শিল্পটির প্রসারের উপর নির্ভর করে এবং এই সুবিধাগুলি একটি শিল্পের অন্তর্গত সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি পাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বস্ত্রবয়ন শিল্পের প্রসার হইলে অধিক পরিমাণে বস্ত্রবয়ন যন্ত্র উৎপাদিত হয়। ফলে, যন্ত্র উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় ও বয়ন-শিল্পগুলি একযোগে কম মূল্যে বস্ত্র-বয়ন যন্ত্র ক্রয় করিয়া ব্যয় সংকোচ করিতে পারে।

আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুবিধাগুলি হইল :—

১। বৃহদায়তন উৎপাদনে শ্রম-বিভাগের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। যদি একসঙ্গে বহু শ্রমিক কাজ করে, তাহা হইলে, পরিচালক শ্রমিকের যোগ্যতানুসারে প্রত্যেক শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করিতে পারে। উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত হইলে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ফলে উৎপাদন-পরিমাণও বাড়িয়া যায়।

২। বহুদ্রব্য একসঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা—বড় বড় শিল্পগুলিতে বহু কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। একসঙ্গে বহুপণ্য ক্রয় করিলে সুবিধাজনক দরে পাওয়া যায়, যাহা ছোট শিল্পের মালিকের পক্ষে সম্ভব নয়। বিক্রয়-ক্ষেত্রেও দেখা

যায় যে, একসঙ্গে অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিলে বিক্রয়-ব্যয় কম হয় এবং একসঙ্গে সমগ্র মুনাফা পাওয়া যায়।

৩। দক্ষতার সুবিধা—বড় বড় শিল্পের মালিকগণ অধিক অর্থব্যয় করিয়া সুদক্ষ শ্রমিক ও কারিগর নিযুক্ত করিতে পারে। দক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত হইলে উৎপাদন-পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

৪। যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা—বড় কারখানার মালিক যাহার প্রচুর মূলধন আছে, একমাত্র তিনিই আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিতে পারেন।

৫। উপজাত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার—বৃহৎ শিল্পের মালিক উপজাত দ্রব্য (By-product) নষ্ট হইতে দেয় না। ইহা হইতে নূতন নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নহে, কারণ ইহার কাঁচা-মালের পরিমাণ কম, সুতরাং অল্পপরিমাণ উপজাত দ্রব্যের দ্বারা অন্য কিছু প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। বড় বড় কাঠের কারখানায় করাতের গুঁড়া প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এই গুঁড়া জ্বালাইয়া তাহারা উত্তাপ সৃষ্টি করে, কিন্তু ছোট কারখানার অল্প পরিমাণ গুঁড়া সাধারণতঃ নষ্টই হয়।

৬। বড় বড় কারখানার মালিকগণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত পরীক্ষা-গবেষণাগার যুক্ত রাখেন। এই সমস্ত গবেষণাগারে নূতন নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি আবিষ্কারের পরীক্ষাকার্য চলে। নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারিলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। ক্ষুদ্র শিল্পের মূলধন কম বলিয়া এই পরীক্ষা ও গবেষণা-কার্য সম্ভব নহে।

৭। বর্তমান যুগে বিক্রয়-পরিমাণ বিজ্ঞাপন ও প্রচার কার্যের উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রেও বড় বড় কারখানার মালিকগণের সুবিধা বেশী। প্রচার কার্যে অধিক পরিমাণ ব্যয় করিয়া তাঁহারা অধিক পরিমাণ পণ্য-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

৮। ইহা ছাড়া, বৃহদায়তন শিল্পের আর একটি সুবিধা হইল যে, যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন সম্ভব হয় অর্থাৎ অধিক পরিমাণ উৎপাদন হইলে দ্রব্য-প্রতি উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পায়; ইহার ফলে মূল্য হ্রাস পাইয়া বিক্রয়-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে, উৎপাদকের বেশী লাভ হয়। বাহ্যিক সুবিধাগুলি সাধারণতঃ শিল্পটির প্রসারের উপর নির্ভর করে। শিল্পসংখ্যা বাড়িয়া

যদি একস্থানে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা হইলে দক্ষ শ্রমিক, কাঁচামাল, মূলধন প্রভৃতি পাইতে অসুবিধা হয় না। ইহার ফলেও নানাপ্রকার ব্যয়সংকোচ হয়।

অসুবিধা—Disadvantages

বড় বড় শিল্পের যে সবই সুবিধা তাহা নহে। ইহাদের কিছু কিছু অসুবিধাও আছে। অসুবিধাগুলি হইল :—

১। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক শ্রমিক একসঙ্গে কাজ করে। ইহার ফলে মালিক ও শ্রমিকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিনষ্ট হইয়াছে। এইজন্য প্রায়ই শ্রমিক-মালিক বিরোধ ঘটে এবং উৎপাদন-কার্য বাধাপ্রাপ্ত হয়।

২। বড় বড় শিল্পে বহু শ্রমিক একস্থানে কাজ করে। শ্রমিকদের বাসস্থান শৃঙ্খলাহীনভাবে গড়িয়া উঠে বলিয়া প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রসারের সীমা—Limits to Large-scale production

অনেকের ধারণা শিল্পপ্রতিষ্ঠান বড় হইলেই একসঙ্গে বহুদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় ও সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ও কমে। কিন্তু বড় বহরে উৎপাদন সবসময়ে সম্ভব হয় না। এই কারণে বৃহৎ শিল্পের সহিত ক্ষুদ্র শিল্পও পাশাপাশি দেখা যায়। নানাকারণে সবসময়ে বৃহৎ বহরের উৎপাদন সম্ভব হয় না।

প্রথমতঃ, যে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা কম এবং সেইজন্য বিক্রয়-বাজার সংকীর্ণ, সে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন বড় বহরে করিলে উৎপাদকের লোকসান হয়। যেখানে জিনিষের চাহিদা নাই, সেখানে চাহিদার অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিয়া লাভ নাই। সুতরাং শিল্পের আয়তন চাহিদার ব্যাপকতা ও বাজারের বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত দ্রব্যের সংবৎসরব্যাপী চাহিদা হয় না, শুধু বৎসরের এক নির্দিষ্ট সময়ে চাহিদা হয়, সে সমস্ত ক্ষেত্রেও বৃহদায়তন উৎপাদন করিয়া লাভ নাই। আমাদের অঞ্চলে শীতকালেই গরম জামাকাপড়ের চাহিদা হয়, অন্য ঋতুতে প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ঋতুগত চাহিদার ক্ষেত্রেও শিল্পের আয়তন ক্ষুদ্র হয়।

তৃতীয়তঃ, উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া

কিছুদিন পর্যন্ত উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়, কিন্তু শিল্প ক্রমাগত বাড়িয়া চলিলে এক সময়ে এই উৎপাদন-ব্যয় না কমিয়া বৃদ্ধি পাইবে। ব্যবস্থাপকের পরিচালনা-শক্তিরও একটা সীমা আছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান যদি এতবড় হয় যে, ব্যবস্থাপকের পক্ষে সবদিকে লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় না, তাহা হইলে শিল্প-পরিচালনায় দক্ষতার অভাব দেখা দিবে। ফলে, ব্যয় হ্রাসের পরিবর্তে ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, কারণ একা পরিচালকের পক্ষে শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের উপর সমান দৃষ্টি রাখা সম্ভব নয়।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-বিধি—Law of Increasing Returns

ভূমি হইতে উৎপাদন-ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি প্রযোজ্য, কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন শিল্পে যদি অধিক পরিমাণে শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করা যায় তাহা হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও অধিকহারে বৃদ্ধি পায়। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অধিকহারে হয় বলিয়া গড়পড়তা ব্যয়ও হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন শিল্পে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ২০ হাজার দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা হইলে প্রতি দ্রব্যের গড়পড়তা ব্যয় ২৲ টাকা। কিন্তু এই শিল্পে যদি মূলধন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৬০ হাজার করা হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ হাজার হইতে পারে। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গড়পড়তা উৎপাদন-ব্যয় হইল এক টাকা আট আনা। এইরূপে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিলে উৎপাদনের হার বাড়িবে এবং গড়পড়তা উৎপাদনব্যয় কমিবে।

ইহার কারণ হইল যে, শিল্পসম্পর্কিত উৎপাদন-ক্ষেত্রে মানুষ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন-বৃদ্ধির সহিত শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পায়। শিল্পের আয়তন যতই বাড়িতে থাকে, বৃহদায়তন উৎপাদনের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুবিধাগুলি ততই বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার ফলে প্রতিমাত্রা উৎপাদন-খরচ কমে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শিল্পের উৎপাদন-ক্ষেত্রে এমন এক সময় আসিবে যখন শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও সমানুপাতিক হারে উৎপন্ন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না অর্থাৎ শিল্পের ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাস-মান উৎপাদন বিধি কার্যকরী হইবে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি ও ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-বিধি কৃষি ও শিল্প উভয় উৎপাদন-ক্ষেত্রে কার্যকরী হইতে পারে। কৃষিক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে

চাষবাস করিলে উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে, আবার শিল্পের ক্ষেত্রেও কোন কোন সময়ে উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। তবে সাধারণতঃ কৃষিকার্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন হয়, তাহার কারণ হইল জমির সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায় না বলিয়া শ্রম-বিভাগের সুবিধা পাওয়া যায় না। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রম-বিভাগের সাহায্যে বহুদিন পর্যন্ত সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা—Advantages of Small-scale production

বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধাগুলি আলোচনা করিলে এই কথাই মনে হয় যে, বড় বড় শিল্পগুলির সহিত ছোট ছোট শিল্পগুলি প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না—কারণ বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুবিধার সাহায্যে অনেক পরিমাণে ব্যয়সংকোচ করিতে পারে, যাহা ছোট শিল্পগুলির পক্ষে সম্ভব নহে। কাজেই ছোট শিল্পগুলি প্রতিযোগিতার অসামর্থ্যের জন্য ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল নহে। বাজারে এখনও পর্যন্ত বহু ছোট-খাট শিল্পপ্রতিষ্ঠান টিকিয়া আছে, তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় অল্প হইলেও তাহারা একেবারে মরিয়া যায় নাই। দেশে বড় বড় কাপড়ের কল স্থাপিত হইলেও তাঁতি এখনও পর্যন্ত তাঁতের সাহায্যে কাপড় বুনিতেছে। ইহার কারণ হইল যে, ছোট ছোট শিল্পগুলির কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে, যে সুবিধাগুলি বড় শিল্পগুলির নাই।

ছোট ছোট শিল্পগুলির বিশেষ সুবিধা হইল :—

১। ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ক্রেতার রুচিমত সৌখিন ও নানাজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করিয়া ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে। বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যন্ত্রের সাহায্যে শুধু একধরণের দ্রব্য (Standardized goods) প্রস্তুত করিতে পারে বলিয়া ক্রেতাগণের বিভিন্ন রুচির পরিচর্যা করিতে পারে না। দর্জির কাজ, চুল ছাঁটাইয়ের কাজ প্রভৃতি এই জন্যই ছোট বহরে হয়।

২। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ক্রেতার রুচি সচরাচর পরিবর্তিত হয় বা লোকের অভ্যাস ও রীতি পরিবর্তিত হয়, সেখানেও ছোট ছোট শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা অধিক হয়। অলঙ্কার-নির্মাণের ক্ষেত্রে ইহা দেখা যায়। স্বর্ণকার ফ্যাসান-পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ক্রেতার সন্তুষ্টিবিধান করিতে পারে বলিয়া এখনও টিকিয়া আছে।

৩। ছোট ছোট কারখানায় যেখানে অল্পসংখ্যক শ্রমিক কাজ করে, সেখানে মালিকের পক্ষে সবদিকে লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয়। মালিক নিজে সবদিকে দেখা-শুনা করে বলিয়া উৎপাদনের অপচয় কম হয়। ইহা ছাড়াও, ক্ষুদ্র শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। ইহার ফলে ছোট শিল্পে শ্রমিক মালিক বিরোধ ঘটে না বলিয়া উৎপাদনকার্য সুষ্ঠু হয়।

৪। এমন অনেক কাজ আছে যাহাতে শিল্পীর ব্যক্তিগত দক্ষতা ও ক্রেতার সহিত ব্যক্তিগত সংস্পর্শের প্রয়োজন হয়। ভাল পোষাক তৈয়ারীর ক্ষেত্রে দর্জির দক্ষতা ও ক্রেতার রুচি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৫। উপরি-উক্ত সুবিধাগুলি ব্যতীতও আধুনিক কালে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির বৃহৎ শিল্পগুলির তুলনায় পূর্বে যে পরিমাণ অসুবিধা ছিল তাহাও অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। ছোট ছোট শিল্পগুলি এখন অনেক অধুনা আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া অল্প সময়ে বেশী কাজ করিতে পারে। ছুরি-কাঁচি শান দেওয়া ও চুল ছাটাইয়ের ক্ষেত্রে শিল্পী ছোট ছোট যন্ত্র ব্যবহার করিয়া অনেক মিতব্যয়িতা করিতে পারে। সুতরাং ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে না।

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ বা শিল্পের স্থানীয়করণ—Localisation of Industries

যখন একই দ্রব্য অথবা একই জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন অথবা বিক্রয় করে এইরূপ কতকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থাপিত হয়, তখন শিল্পগুলির এই একত্র সমাবেশকে শিল্পের স্থানীয়করণ বলা চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পাটকলগুলি কলিকাতার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে হুগলী নদীর তীরে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। শিল্পের এই স্থানীয়করণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কলেজ ষ্ট্রীটে পুস্তক-প্রকাশকের ভীড়, বাগবাজারে ঘড়ির দোকান প্রভৃতি ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে শিল্পের এই স্থানীয়করণ-প্রবণতার পরিচয় দেয়। আবার সমগ্র দেশের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রীভূত, পাটকলগুলি বাংলা অঞ্চলেই স্থাপিত হইয়াছে।

শিল্প স্থানীয়করণের কারণ—Causes of Localisation of Industries.

নানা কারণে এক একটি শিল্প একই অঞ্চলে স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি হইল প্রধান—

১। নৈসর্গিক কারণ—Natural or Physical Causes.

(ক) যে অঞ্চলে শিল্প-স্থাপনার অনুকূল আবহাওয়া পাওয়া যায়, সেই অঞ্চলে এক একটি বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়,

(খ) যে অঞ্চলে কাঁচামাল, খনিজ পদার্থ, বনজাত দ্রব্য বা কৃষিজাত দ্রব্য সহজে পাওয়া যায়,

(গ) যেখানে কয়লা প্রভৃতি জ্বালানী দ্রব্য এবং সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়।

২। অর্থনৈতিক কারণ—Economic Causes.

বর্তমান যুগে অন্য কারণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পগুলির একত্র সমাবেশ হয়। অর্থনৈতিক কারণগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

(ক) যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া যায়,

(খ) যেখানে যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন পাওয়া যায়,

(গ) যেখানে যোগাযোগ-ব্যবস্থার সুবিধার জন্য কাঁচামাল ক্রয় করিবার সুবিধা ও উৎপন্নজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের সুবিধা আছে।

উপরি-উক্ত কারণে পাটকলগুলি কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

৩। রাজনৈতিক কারণ—Political Causes.

পূর্বে অনেক সময় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি রাজা-বাদশাহদের আনুকূল্যে স্থাপিত হইত। বর্তমান যুগেও বহু জাতীয় সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

৪। প্রথম স্থাপনের অনুপ্রেরণা—Momentum of earlier start.

যখন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থাপিত হইয়া বিখ্যাত হয় অর্থাৎ সুনাম অর্জন করে, তখন পূর্ববর্তী শিল্পের সুনামের অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ জাতীয় আরও অনেক শিল্প উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিল্প স্থানীয়করণের সুবিধা—Advantages of Localisation of Industries.

১। কোন একটি স্থানে শিল্পের সমাবেশ হইলে তত্রত্য শিল্পগুলি সহজেই সুনাম অর্জন করিয়া জনপ্রিয় হয়।

২। শিল্প স্থানীয়করণের ফলে সেই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের সন্তানসন্ততিগণ সহজেই উক্ত শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করে। এইরূপ বংশপরম্পরাক্রমে শিল্পনৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়।

৩। একত্র সমাবেশ দ্বারা শিল্পগুলি অনেক সুবিধা পায়। সহযোগিতামূলক-ভাবে তাহারা উৎপাদনের উপাদানগুলি ক্রয় করিতে পারে এবং উৎপন্নজাত দ্রব্যগুলি সহযোগিতামূলকভাবে বিক্রয় করিয়া অধিকতর লাভবান হয়।

৪। যখন কোন অঞ্চলে শিল্প সমাবেশ হয় তখন ঐ শিল্পের কাঁচামাল যোগান দিবার উদ্দেশ্যে বা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অনুপূরক অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান (Supplementary industries) কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। একই অঞ্চলে নানা জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু কর্মসংস্থান হয়। ফলে বেকার সমস্যার সমাধান হয়।

৬। শিল্প সমাবেশের আরও একটি সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পগুলি একই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের মূলধন ও শ্রমিকের সন্ধান করিতে হয় না। যেখানে শিল্প সমাবেশ হয়, মূলধন ও শ্রমিক বিনিয়োগ উদ্দেশ্যে সেই অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

শিল্প স্থানীয়করণের অসুবিধা—Disadvantages of Localisation of Industries

শিল্প স্থানীয়করণের অনেক সুবিধা থাকিলেও ইহার কয়েকটি গুরুতর অসুবিধা আছে।

১। অত্যধিক স্থানীয়করণের ফলে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হইতে পারে।

২। শিল্প স্থানীয়করণের আর একটি ত্রুটি হইল যে, ইহার ফলে বেকার সমস্যা উৎকটরূপে দেখা দিতে পারে। যদি কোন কারণে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পে মন্দা উপস্থিত হয় তাহা হইলে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ইহার ফলে বেকার

সমস্যার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য প্রধান শিল্পের অনুপূরক শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা যায়।

৩। শিল্পের অত্যধিক স্থানীয়করণের ফলে এক অঞ্চলে এক শ্রেণীর শ্রমিকের চাহিদার সৃষ্টি হয়। যেখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে শুধু পুরুষ শ্রমিক কাজ করিতে পারে। স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্ক পুরুষের অন্য স্থানে যাইতে হয়।

৪। অতিরিক্ত স্থানীয়করণের ফলে একই অঞ্চলে অধিক লোকের সমাবেশ হয়। ইহার ফলে বাসগৃহের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে।

৫। শিল্প স্থানীয়করণের তাৎপর্য হইল যে, দেশের একটি অঞ্চল একটি বা কয়েকটি নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনে রত থাকে। ইহার ফলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য সেই অঞ্চলকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থায় গোলযোগ ঘটিলে বা যুদ্ধকালে এই পরনির্ভরশীলতার জন্য সেই অঞ্চলকে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়।

৬। শিল্প একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইলে বর্তমান যুগে ইহা শত্রুপক্ষের প্রধান আক্রমণস্থলরূপে পরিগণিত হয়।

শিল্প স্থানীয়করণের যে সকল অসুবিধার কথা উপরে আলোচিত হইল তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় হইল শিল্পগুলিকে একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত না করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন করা।

ভারতের শিল্প-সংগঠন—Industrial Organisation in India

আমাদের দেশ শিল্পক্ষেত্রে কত অনুন্নত তাহা আমাদের জাতীয় আয় বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায়। জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ১৬·১ পরিমাণ খনিজ, শিল্পজাত এবং হস্তশিল্প হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে বৃহৎ শিল্প হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ৬ ভাগ পাওয়া যায় এবং বৃহৎ শিল্পে দেশের শতকরা মাত্র ২ জন নিযুক্ত আছে। ভারতে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য হইলেও বর্তমানে আমাদের জাতীয় সরকার নানাভাবে শিল্প-সম্প্রসারণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতের শিল্প-সংগঠনগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে বস্ত্র, চিনি, কাগজ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের শিল্পগুলি উল্লেখ করা যায়। এই

শিল্পজাত দ্রব্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের ভোগব্যবহারে কাজে লাগে এবং এইজন্য শিল্পগুলিকে ভোগ্যবস্তু উৎপাদন-শিল্প (Consumer's Goods Industries) বলা হয়। বিদ্যুৎ শক্তি, সিমেণ্ট, লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রনির্মাণ প্রভৃতি শিল্পগুলিকে মূল বা গুরু (Basic or Heavy Industries) বলা হয়, কারণ এই শিল্পজাত দ্রব্য সরাসরি ভোগ্যব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয় না। এই শিল্পজাত দ্রব্যগুলি ভোগ্যবস্তু-উৎপাদনের সহায়ক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই গুরু বা মূল শিল্পগুলির উন্নতি না হইলে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। ভারতে এই মূল শিল্পগুলির নিতান্ত অভাব দেখা যায় এবং এইগুলির অভাবের জন্যই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত হইতে পারে নাই।

ভারতে বর্তমানে যে সমস্ত শিল্প গঠিত হইয়াছে তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

বস্ত্র-শিল্প— কাপড়ের কলই হইল ভারতের সর্বপ্রধান শিল্প। এই শিল্পে নিযুক্ত মোট মূলধনের পরিমাণ ১০৫ কোটি টাকারও অধিক এবং শ্রমিকসংখ্যা হইল ৮ লক্ষ। ১৮১৮ সালে ভারতে কলিকাতার নিকট প্রথম বস্ত্র শিল্পের সূচনা হইলেও প্রকৃতপক্ষে বলা যায় যে, ১৮৫৩ সালে বোম্বাইয়ে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয় এবং এখনও পর্যন্ত বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলেই বেশীর ভাগ কাপড়ের কল অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশেও কাপড়ের কল আছে। ১৯২৭ সাল হইতে ভারতের বস্ত্র-শিল্প সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে বাড়িতে থাকে এবং বর্তমানে বস্ত্র শিল্পের এত উন্নতি হইতেছে যে, দেশের সমগ্র প্রয়োজনের প্রায় ৭০ ভাগই এদেশের কাপড়ের কলে প্রস্তুত হয়। ১৯৪৭ সাল হইতে বস্ত্র শিল্পকে সংরক্ষণমুক্ত করা হইয়াছে। বস্ত্র শিল্প যৌথমূলধনী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত এবং এদেশের বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত মূলধন ও পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনানুসারে ভারতে বস্ত্র-শিল্পের উৎপাদন-পরিমাণ বর্তমান উৎপাদন-পরিমাণ ৫০০ কোটি গজ হইতে ৫৫০ কোটি গজ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল। ১৯৬২ সালের প্রথম দিকে ভারতে সর্বসমেত ৪৮০টি কাপড়ের কল ছিল এবং আনুমানিক ৪৯৮'৮৩ লক্ষ গজ কাপড় তৈয়ারী হয়।

লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প—দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই শিল্পটির গুরুত্ব খুব বেশী, কারণ ইহা একটি মূল শিল্প। ভারতে এই শিল্প প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সহিত স্যর্ জেমসেদ্‌জি টাটার নাম অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই শিল্প-

প্রতিষ্ঠানটি বিহারে অবস্থিত এবং সমগ্র এশিয়া ও বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। টাটা ব্যতীতও পশ্চিমবাংলায় বার্ণপুরে ও মহীশূরে আরও দুইটি লৌহ ও ইস্পাতের শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য-উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা-অনুযায়ী ভারত লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ১৯৬০-৬১ সালে ৬০ লক্ষ টন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে সরকারী চেষ্টায় বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করিয়া গঠিত হইয়াছে আরও তিনটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প-প্রতিষ্ঠান।

পাট-শিল্প—১৮৫৫ সালে বাংলাদেশে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। পাটকলগুলি কলিকাতার সন্নিকটে হুগলী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। পাটজাত দ্রব্য প্রধানতঃ বিদেশে রপ্তানী করা হয় এবং ভারতের অর্জিত ডলারের বেশীর ভাগ পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া পাওয়া যায়। পাট-শিল্পগুলির অধিকাংশের মালিক ছিল স্কটল্যাণ্ডবাসী। বর্তমানে ভারতীয়গণও কিছু কিছু কল স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গবিভাগের পর কাঁচামালের অভাবে এই শিল্পটির দুর্দিন আসিয়াছিল। বর্তমানে ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে পাট উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়াতে এই শিল্পটির কাঁচামালের জন্য আর পূর্ব পাকিস্তানের উপর তেমন নির্ভর করিতে হয় না।

শর্করা (চিনি) শিল্প—দেশীয় পদ্ধতিতে বহুকাল পূর্ব হইতেই ভারতে চিনি প্রস্তুত হইত এবং এ বিষয়ে কাশীর চিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বর্তমানে সাদা চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতে বহু চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ চিনির কল বিহার ও উত্তরপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতঃ ইক্ষু হইতেই চিনি প্রস্তুত হয়। ভারতের কলগুলি হইতে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয়, তাহাতে দেশের চাহিদা মিটিয়া যায়। চিনি-শিল্প ১৯৩২ সাল হইতে সংরক্ষিত হয়।

কাগজ-শিল্প—হুগলী জেলায় ১৮৭০ সালে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। বর্তমানে ভারতে প্রায় ১০।১২টী কাগজের কল আছে, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই বিদেশী পরিচালনাধীন। এই শিল্পটিও একটি সংরক্ষিত শিল্প।

চা-শিল্প—রপ্তানী বাণিজ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতে চা-শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। চীনদেশে ভারত অপেক্ষা অধিক পরিমাণ চা উৎপন্ন হইলেও ভারতই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ চা বিদেশে রপ্তানী করে। ভারতের উৎপন্ন চায়ের

প্রায় ৮০ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে জন্মে। তবে চা-বাগানের অধিকাংশের মালিক হইল য়ুরোপীয়।

সিমেন্ট-শিল্প—১৯০১ সালে মাদ্রাজে সর্বপ্রথম সিমেন্টের কারখানা স্থাপিত হয়। বর্তমানে সিমেন্টের উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও দেশের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন-পরিমাণ যথেষ্ট নহে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনানুসারে ভারতে ১৯৬০-৬১ সালে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৯৬২-৬৩ সালে আনুমানিক উৎপাদন হইল ৮৮,৬০,০০০ টন।

দেশলাই-শিল্প—প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই ভারতে এই শিল্পটি প্রসার লাভ করে। সংরক্ষিত শিল্পগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। দেশলাই-উৎপাদনে ভারত এখন সম্পূর্ণ আত্ম নির্ভরশীল।

যন্ত্রপাতি-নির্মাণ-শিল্প—বাইসাইকেল, সেলাইয়ের কল, ডিজেল ইঞ্জিন প্রভৃতি লঘুযন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতের অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়াছে। দেশে বর্তমানে রেডিও সেট, ইলেকট্রিক বাল্‌ব ও পাখা প্রভৃতির উৎপাদন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। গুরুযন্ত্রের নির্মাণ-ক্ষেত্রে উন্নতি অবশ্য আশানুযায়ী হয় নাই।

গুরু রাসায়নিক শিল্প—নানাজাতীয় এ্যাসিড, কস্টিক সোডা প্রভৃতি গুরু রাসায়নিক শিল্পগুলি মূল শিল্প নামে অভিহিত হয়। কারণ, এই শিল্পজাত দ্রব্যগুলি সাবান, বস্ত্র, কাচ প্রভৃতি শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে এ জাতীয় শিল্প ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে এবং তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় এই জাতীয় শিল্পের প্রসারের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

সরকার-পরিচালিত শিল্প—উপরে যে শিল্পগুলির বিবরণ দেওয়া হইল, সেগুলি দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন শিল্প। এই শিল্পগুলি ব্যতীতও বর্তমানে ভারত সরকার পরিকল্পনানুযায়ী অনেকগুলি শিল্পগঠনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে এই শিল্পগুলির গঠনকার্যও অনেকক্ষেত্রে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনও আরম্ভ হইয়াছে। সরকার-পরিচালিত শিল্পগুলির মধ্যে **সিন্ধ্রি রাসায়নিক সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা,** বাঙ্গালোরের মেশিনটুল কারখানা, পুনার পেনিসিলিন কারখানা, ভিজিগাপট্টমের হিন্দুস্থান জাহাজনির্মাণ কারখানা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিন্ধ্রির সার কারখানা

এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। এই কারখানা নির্মাণ করিতে ২৩ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং প্রতিদিন এই কারখানা হইতে প্রায় এক হাজার টন রাসায়নিক সার প্রস্তুত হয়। ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে চিত্তরঞ্জনে ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানার কাজ আশাতীতভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী ভারত সরকার গুরু বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের আরও কয়েকটি কারখানা স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন।

ভারতের কুটিরশিল্প—Cottage Industries in India

একসময়ে ভারত যে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভ হইতে ভারতে কুটিরশিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়। এই অবনতি সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কুটিরশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এখনও ভারতের শতকরা ১১·২ জন লোক কুটিরশিল্পে নিযুক্ত এবং জাতীয় আয়ের শতকরা ৯·৬ ভাগ এই ছোট ছোট শিল্পগুলি হইতে পাওয়া যায়।

কুটিরশিল্পের সুবিধা হইল যে, পারিবারিক পরিবেশে এই শিল্পগুলির কাজ পরিচালিত হয় বলিয়া এখানে শহরের দূষিত আবহাওয়া নাই এবং শ্রমিকগণ তাহাদের অভিভাবকগণের তত্ত্বাবধানে কাজ করে বলিয়া কোন প্রকার বদ অভ্যাসের দাস হয় না। ইহা ছাড়া, যে সময়টা আলস্যে অতিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা, সেই সময়টা এই কাজে ব্যয় করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, ইহা কৃষক ও অন্যান্য শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি করিবার একটি অতিরিক্ত উপায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

কুটিরশিল্পের ত্রুটির কারণ—Defects of Cottage Industries

ভারতে কুটিরশিল্পগুলির বর্তমানে নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কুটিরশিল্পে যে সমস্ত কারিগর ও শ্রমিক নিযুক্ত আছে তাহারা গতানুগতিক পদ্ধতিতে তাহাদের উৎপাদন করে। সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার অভাবে তাহারা আধুনিক রুচিসম্মত সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ক্রেতার সন্তুষ্টিবিধান করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, কুটিরশিল্পীও কৃষকের ন্যায় অতি দরিদ্র। মূলধনের অভাবে তাহারা আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয় করিয়া উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারে না। মহাজনদের নিকট হইতে তাঁহারা চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করে এবং মহাজনদিগের নিকটই স্বল্পদরে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

তৃতীয়তঃ, যান্ত্রিক শিক্ষার অভাবে তাহারা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে না। তাহাদের রক্ষণশীল মনোবৃত্তিও তাহাদের নূতন নূতন পদ্ধতি গ্রহণের অন্তরায় হয়।

চতুর্থতঃ, কুটির শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের কোন সুসংবদ্ধ বাজার-ব্যবস্থা নাই। এই কারণে তাহারা বিচ্ছিন্নভাবে ফড়িয়া ও দালালের সাহায্যে দ্রব্য বিক্রয় করে। ফলে, লাভের বেশীর ভাগ এই দালালগণ পায় ও কুটিরশিল্পীর অবস্থার কোন উন্নতি হয় না।

পঞ্চমতঃ, আমাদের দেশের কুটিরশিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় না, শুধু তাহাই নহে, এখানে বাষ্প বা বিদ্যুৎ-শক্তিও ব্যবহৃত হয় না। এই কারণে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বেশী হয় এবং এই শিল্পগুলি বৃহদায়তন শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না বলিয়া ভটিয়া যায়।

কুটিরশিল্পের উন্নতির উপায়—Measures for the improvement of Cottage Industries

কুটিরশিল্পগুলিকে পুনর্জীবিত করিতে পারিলে বহুলোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। এই শিল্পগুলি প্রসার লাভ করিলে গ্রামীণ বেকার সমস্যারও কিছু সমাধান হইতে পারে। সুতরাং এজন্য জনসাধারণ ও দেশের সরকারের তৎপর হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ, এই উদ্দেশ্যে দেশে ব্যাপক শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞান বিস্তার করিতে হইবে। কুটিরশিল্পিগণ যদি লোকের পরিবর্তিত রুচি অনুযায়ী সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারে তাহা হইলে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া শিল্পীর আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় শিল্পজাত দ্রব্যের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার। ইহা ছাড়া, কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের মেলা প্রদর্শনী

প্রভৃতির দ্বারাও জনসাধারণকে শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত পরিচিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদেশেও এইরূপ প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, কুটিরশিল্পে নিযুক্ত কর্মিগণ যাহাতে অল্পসুদে ঋণ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, কুটিরশিল্পিগণ যাহাতে অল্পমূল্যে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে পারে ও দালালের সাহায্য ব্যতীত ন্যায্য মূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সমগ্র পরিমাণ লাভ পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। এজন্য সমবায় ক্রয় ও বিক্রয় সমিতি স্থাপন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

পরিশেষে কুটিরশিল্পিগণ যাহাতে স্বল্পহারে বিদ্যুৎশক্তি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিলে একদিকে যেমন তাহাদের শ্রমের লাঘব হইবে, অপর দিকে সেইরূপ উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইয়া তাহাদের বড় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা বাড়িবে। আমাদের দেশের শিল্পের বিশেষ করিয়া কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য জাতীয় সরকার যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে সেগুলির আলোচনা হইবে।

ভারতের কয়েকটি প্রধান কুটিরশিল্প—Some Important Cottage Industries of India

তাঁত-শিল্প—ভারতের সর্বপ্রধান কুটিরশিল্প হইল হস্তচালিত তাঁত। এই শিল্প বর্তমানে প্রায় ১৫০ কোটি গজ বস্ত্র বয়ন করে এবং ৬০ লক্ষ লোক এই তাঁত-শিল্পের সাহায্যে জীবিকা অর্জন করে। ভারতের প্রায় সর্বত্রই এই শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুরের ধুতি ও ধনেখালির শাড়ি বিখ্যাত। আসামে তাঁত-শিল্পের প্রচলন আছে। তাঁতের কাপড়ের বৈশিষ্ট্যের জন্য এখনও পর্যন্ত এই শিল্পটি মিলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া আছে এবং আশা করা যায় যে, উপযুক্ত সরকারী সাহায্য পাইলে এই শিল্পটি আরও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

রেশম-বয়ন—তাঁত ব্যতীত গুটিপোকা হইতে রেশম-উৎপাদন ও কাপড়

তৈয়ারী করা আর একটি শিল্প। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে, আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যে এই শিল্পের প্রচলন দেখা যায়।

কাঁসা-পিতল শিল্প—ভারতে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কাঁসা-পিতলের ব্যবহার খুব বেশী। বর্তমানে অবশ্য অ্যালুমিনিয়ম-নির্মিত বাসনপত্রের ব্যাপক ব্যবহার হয় বলিয়া এই শিল্পের প্রসার বাধা পাইয়াছে। পশ্চিমবাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া এজন্য বিখ্যাত।

মৃৎ-শিল্প—ভারতের মৃৎ-শিল্প খুব প্রাচীন এবং দেশের সর্বত্র ইহার প্রচলন দেখা যায়। দরিদ্র শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ মাটির বাসনপত্র ব্যবহার করে। ইহা ছাড়া, নানাজাতীয় মাটির খেলনা ও দেবদেবীর মূর্তি তৈয়ারী করিয়াও বহুলোকে জীবিকা অর্জন করে। কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্প ভারতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

ইহা ছাড়া, আরও বহুরকমের কুটিরশিল্প এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতিও কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাঁশের ও বেতের কাজ, বিড়ি উৎপাদন, মক্ষিকা পালন, সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ হইতে তৈল উৎপাদন, কাচদ্রব্য নির্মাণ, মিষ্টান্ন তৈয়ারী প্রভৃতি নানা কাজে বহু সহস্র লোক নিযুক্ত আছে। সুতরাং এই শিল্পগুলির উন্নতি করিতে পারিলে যে কত লোক উপকৃত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ভারতে শিল্পে অনগ্রসরতার কারণ—Causes of Industrial draw-back in India

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। যে দেশে শিল্পের উন্নতি হয় নাই, সে দেশের জাতীয় আয়-পরিমাণ কম, ফলে মাথাপিছু আয়ও কম হয়। শিল্পোন্নতির জন্য উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীগুলি প্রচুর পরিমাণে দেশে থাকা চাই। এই সামগ্রী হইল—প্রাকৃতিক সম্পদ, দক্ষ শ্রমিক, প্রচুর মূলধন ও ব্যবস্থাপনা নৈপুণ্য। এখন দেখা যাউক আমাদের দেশে উপরি-উক্ত শিল্পোন্নয়নের সহায়ক উপাদানগুলি কি পরিমাণে আছে এবং এই উপাদানগুলির সাহায্যে আমাদের দেশে শিল্পোন্নয়ন কতখানি সম্ভব।

প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, মোটামুটিভাবে ভারতে শিল্পোন্নয়নের সহায়ক নানা উপাদান আছে। নানাজাতীয় শস্য ও কাঁচা-

মাল উৎপন্ন করিবার উপযুক্ত জমি ভারতে বর্তমান। নানাজাতীয় আবশ্যকীয় খনিজ সম্পদেও ভারত সমৃদ্ধ। শিল্পের উন্নতির জন্য কয়লা প্রয়োজন। ভারতে কয়লার খনির প্রাচুর্য থাকিলেও এই খনিগুলি দেশের একটিমাত্র অঞ্চলেই (পশ্চিমবাংলা ও বিহার) কেন্দ্রীভূত। এই কারণে অন্য অঞ্চলে কয়লার পরিবহন খরচা অত্যধিক পড়ে। ভারতে পেট্রোলিয়ামেরও একান্ত অভাব। এজন্য বিদেশী আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়। এ দেশের শক্তিসম্পদও শিল্পোন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট নহে। জলবিদ্যুৎ ও তাপ-বিদ্যুতের উৎসগুলির এখনও পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় নাই। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদ বর্তমান থাকিলেও তাহার যথাযথ ব্যবহার হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে সুদক্ষ শ্রমিকের একান্ত অভাব। আধুনিক যন্ত্রপাতির সহিত পরিচিত কারিগরি শিক্ষায় নিপুণ শ্রমিক দেশে নাই বলিলেও চলে। দক্ষ শ্রমিকের সাহায্য ব্যতীত শিল্পের উন্নতি সম্ভব নহে।

তৃতীয়তঃ, মূলধনের অভাবই হইল ভারতের শিল্পোন্নতির প্রধান অন্তরায়। ভারতে এ পর্যন্ত যতগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের বেশীর ভাগই বিদেশী মূলধনের সাহায্যে গঠিত হইয়াছে। দেশের লোক দরিদ্র বলিয়া তাহাদের সঞ্চয়ক্ষমতা নাই এবং দেশে যে সামান্য পুঁজি ছিল তাহাও শিল্পক্ষেত্রে ঝুঁকির জন্য নিযুক্ত হয় নাই। দেশে ব্যাঙ্ক বা যৌথ মূলধনী কারবার প্রভৃতি সঞ্চয়ের সহায়ক প্রতিষ্ঠানেরও অভাব।

চতুর্থতঃ, শিল্প পরিচালনার জন্য যে সংগঠন-শক্তি ও নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় তাহাও এদেশে খুব বিরল। প্রাতঃস্মরণীয় জেমসেদ্‌জি টাটা ও আর. এন মুখার্জির মত প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাপক নাই বলিলেও চলে। ইহা ছাড়া, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অত্যধিক মাত্রায় চাকুরি-প্রিয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ কোন আকর্ষণ নাই। পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতের ব্রিটিশ শাসকগণ এদেশে শিল্পোন্নতির কোন ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। দেশ কৃষি-জীবী হইয়া দরিদ্র থাকিলে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিত। তাই তাঁহারা এ দেশে শিল্পপ্রসারের কোন চেষ্টা করেন নাই।

শিল্পোন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা—Measures for the development of Industries

ভারতে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হইল সরকারী

হস্তক্ষেপ ও সরকারী সাহায্য। ব্যাপকভাবে শিল্পের প্রসার করিতে হইলে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন, তাহা ব্যক্তিগত সঞ্চয় হইতে পাওয়া সম্ভব নহে। একমাত্র সরকারই বিদেশী ঋণ সংগ্রহ করিয়া শিল্পের প্রসারে সাহায্য করিতে পারে। ইহা ছাড়া, শিল্পোন্নয়নের জন্য সংরক্ষণ-নীতিও অনেক ক্ষেত্রে অবলম্বন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, দেশে সঞ্চয়-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে মূলধন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য করিবার জন্য শিল্পসহায়ক নানাজাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রেও সরকারী সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকগণকে কর্মদক্ষ করিতে হইবে। এজন্য সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার বহুল প্রসার অত্যাবশ্যক। শ্রমিকগণকে কার্যে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের মজুরির হার বৃদ্ধি করিয়া যাহাতে তাহারা কর্মদক্ষতা অটুট রাখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিকগণের বাসস্থান ও সামাজিক পরিবেশেরও উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি এ দেশের জনসাধারণকে কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। সুদক্ষ পরিচালক না হইলে শিল্পের উন্নতি সম্ভব নহে। যাহাতে দেশের শিক্ষিত যুবকগণ শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট হন সেই উদ্দেশ্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন নিতান্ত প্রয়োজন। ইংরাজ, জার্মান বা রুশীয়গণের সাহায্যে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প গঠিত হইলেই শুধু চলিবে না, ভারতবাসীর মনে রাখিতে হইবে যে, এগুলির পরিচালনা-ভার তাহাদের স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইবে—নতুবা পরমুখাপেক্ষী হইয়া চির-দারিদ্র্য বরণ করিতে হইবে।

ভারতে নিযুক্ত বিদেশী মূলধন—Foreign Capital in India

ভারতের নিজস্ব-মূলধনের পরিমাণ অতি স্বল্প বলিয়া এপর্যন্ত এ দেশে যে, সামান্য শিল্পোন্নয়ন হইয়াছে তাহার বেশীর ভাগই বিদেশী মূলধনের সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে। ভারতের পাট, চা, কয়লা, রবার, কাগজ, ট্রাম প্রভৃতি কোম্পানীগুলি বিদেশী মূলধনে গঠিত হইয়াছে। ১৯৫১ সালে এই মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। এই ঋণ-পরিমাণের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গ্রেটবৃটেন হইতে লওয়া হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দুইটি কার্যকরী

করিবার জন্য এই ঋণ-পারমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯৪·২২ কোটি টাকা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ২,২০০ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণের সম্ভাবনা আছে।

সুবিধা ঃ ভারতের শিল্পোন্নয়নের প্রথম দিকে বিদেশী মূলধন যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিদেশীয়গণ যদি এদেশে রেল, ট্রাম, পাটকল, চা-শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া না তুলিতেন, তাহা হইলে এ দেশ শিল্পক্ষেত্রে আরও অনগ্রসর থাকিত।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্প-ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে যে স্বাভাবিক ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে হয়, সে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদেশীয়গণ সম্পূর্ণভাবে বহন করিয়াছেন—সেজন্য ভারতবাসীকে আদৌ কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, বিদেশীয়গণ তাঁহাদের মূলধনের সহিত এদেশে তাঁহাদের সংগঠন-শক্তি ও কারিগরি-নৈপুণ্য আমদানী করিয়াছেন। এই সংগঠন শক্তি ও কারিগরি-নৈপুণ্যের সাহায্যে ভারতীয়গণ আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা ছাড়া, বিদেশীয়গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া ভারতীয়গণ তাহাদের জীবিকা সংস্থান করিতে পারিয়াছে।

অসুবিধা ঃ বিদেশী মূলধনের কার্যকারিতা অস্বীকার না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, অত্যধিক পরিমাণ বিদেশী মূলধন নিয়োগের ফলে ভারতের জাতীয় স্বার্থ নানাভাবে ব্যাহত হইয়াছে। প্রথমতঃ, বিদেশীয়গণ ভারতের স্বার্থের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদগুলির (বনজ, খনিজ ইত্যাদি) যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। এই যথেচ্ছ ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতির অন্তরায় হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশীয়গণ তাঁহাদের স্বার্থের অনুকূল শিল্পগুলিই প্রসার করিয়াছেন, ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রতি তাঁহারা উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা সৈন্য চলাচলের সুবিধা ও ভারত হইতে কাঁচামাল রপ্তানী করিবার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ রেলের প্রবর্তন করেন, কিন্তু কৃষির উন্নতির জন্য সেচ-ব্যবস্থার কোন উন্নতি করেন নাই। তৃতীয়তঃ, বিদেশী-পরিচালিত শিল্প-ব্যবসায়ে ভারতীয়েরা প্রধানতঃ কুলি ও কেরাণী হিসাবে কাজ করিবার সুযোগ পাইলেও কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাহাদের নিযুক্ত করা হয় না। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি প্রায়ই বিদেশীয়গণের একচেটিয়া দখলে ছিল। সুতরাং ভারতীয়গণ

শিল্প-পরিচালনা শিক্ষা বা কারিগরি-নৈপুণ্য অর্জন করিবার সুযোগ পায় নাই। চতুর্থতঃ, বলা যায় যে, বিদেশী মূলধন নিয়োগের ফলে দেশ দরিদ্রতর হইতেছে। বিদেশীয়গণ শুধু নিযুক্ত মূলধনের সুদ লইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, মুনাফা হিসাবেও এ দেশ হইতে তাঁহারা বহু অর্থ লইয়াছেন। পরিশেষে বলা যায় যে, বিদেশী মূলধন নিয়োগের ফলে এ দেশে একটি বিদেশী কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি হয়। এই কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকগণ নিয়মিতভাবে ভারতের দ্রুত অগ্রগতিতে বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন।

উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য ভারতে বিদেশী মূলধন নিয়োগের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী জনমত গঠিত হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশ দরিদ্র। বিদেশ হইতে আর্থিক ঋণ, যন্ত্রপাতি ও কারিগরি সাহায্য না পাইলে আমাদের দেশে শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। সেইজন্য বিদেশী সাহায্য একেবারে বর্জন করিবার নীতি আমাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে না। বিদেশী ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে পূর্বতন ভারত সরকার কয়েকটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কমিটি বিদেশী ঋণগ্রহণ সম্পর্কে কয়েকটি শর্ত স্থির করিয়াছিলেন মাত্র। বর্তমানে ভারতে জাতীয় সরকার বিদেশী মূলধনের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে বিদেশী মূলধন গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারের বর্তমান নীতি হইল, দেশী ও বিদেশী মূলধনের প্রতি সমান ব্যবহার। শিল্প-প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত মুনাফা বিদেশে পাঠান সম্ভব হইলেও বৈদেশিক বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা আসল মূলধন এদেশ হইতে তুলিয়া লইয়া যাওয়া বিদেশীর পক্ষে লাভজনক হইবে না। সরকারের নূতন নিয়ম অনুসারে বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানেও ভারতীয় মূলধনের অংশ অধিক হইবে এবং ভারতীয়গণ কর্তৃক এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত হইবে। ইহা ছাড়া, বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়গণকে নিযুক্ত করিতে হইবে এবং শিল্প-পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহাদের কর্মদক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। দেশের স্বার্থে সরকার বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু একপক্ষেত্রে বিদেশী শিল্পের মালিকগণকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং ভারত সরকারের বিদেশী মূলধন সম্পর্কিত বর্তমান নীতি বিদেশী মূলধনের অসুবিধাগুলিকে দূর করিয়া সুবিধাগুলির ভিত্তিতেই পরিকল্পিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন

ভারতে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কিছু বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। যে সমস্ত শিল্পে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, সেই শিল্পগুলিকে বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বলা হয়। ভারতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি সাধারণতঃ একমালিকানা বা অংশীদারী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত, কিন্তু বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়ই যৌথ-মূলধনী কারবার।

শ্রম বিভাগ—শ্রম-বিভাগ বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি কাযকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া এক একটি ভাগ যখন পৃথক্ পৃথক্ লোক দ্বারা সম্পাদিত হয় তখন তাহাকে শ্রম-বিভাগ বলা হয়। একজোড়া জুতা একজন চর্মকার প্রথম হইতে শেষ অবধি প্রস্তুত করিতে পারে অথবা এই প্রস্তুত-কার্য বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া এক একটি ভাগ পৃংক্ ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করা যায়। বর্তমান যান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রম বিভাগ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তির দিক দিয়া এই শ্রম-বিভাগ বিশেষত্বশীলতা সূচিত করে, সমাজের দিক দিয়া শ্রম-বিভাগ সহযোগিতা সূচিত করে।

সুবিধা—১। শ্রম-বিভাগের দ্বারা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, সময়েব অপব্যয় রহিত হয়, যন্ত্রপাতিরও কোন অপচয় হয় না। ২। শ্রম-বিভাগের ফলে জটিল কার্য সরল হয় ও ৩। শ্রমিকগণের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। ৪। শ্রম বিভাগ উৎপাদন-খরচা হ্রাস করিয়া দ্রব্যমূল্য নিম্নাভিমুখী করে। ৫। ইহাতে লোকে সস্তায় উৎকৃষ্টতর দ্রব্য পাইতে পারে।

অসুবিধা—শ্রম বিভাগের অসুবিধা হইল যে, ১। ইহাতে শ্রমিকের সাধারণ কর্মপটুতা হ্রাস পায় ও ২। কাজে নূতনত্ব থাকে না। ৩। একই কাজ করিতে করিতে শ্রমিকেব চিত্তের বহুমুখীতা নষ্ট হয়।

সীমা—উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা ও উৎপাদনের ধারাবাহিতকার উপরই শ্রম-বিভাগের সম্ভাব্যতা নির্ভর করে।

যন্ত্র—ইহার সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা—১। যন্ত্র মানুষের শ্রমভার লাঘব করিয়া বহুলপরিমাণে উৎকৃষ্টতর দ্রব্য তৈয়ারী করিতে সাহায্য করে। ২। যন্ত্র উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিয়াছে। ৩।

যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া তাহার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে।

অসুবিধা—যন্ত্রের অসুবিধা হইল যে, ১। ইহাতে একই দ্রব্য উৎপাদন করা যায়, কিন্তু বিভিন্ন লোকের রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়। ২। এই অবস্থায় মানুষের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ নষ্ট হয় ও মানুষ নিজেই যন্ত্রের দাস হইয়া সৃষ্টির আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। ৩। যন্ত্র ব্যবহারের ফলে আপাততঃ শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পাইয়া বেকার-সমস্যা উপস্থিত হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১। যন্ত্র উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করে। ২। ফলে মূল্য কমে ও ৩। শ্রমিকেরা অল্পমূল্যে দ্রব্যাদি কিনিতে পারে। ৪। নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও যন্ত্র-উৎপাদন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়া শেষ পর্যন্ত ৫। শ্রমিকের বেকার-সমস্যা দূর হয়।

বৃহৎ শিল্পের সুবিধা—বড় বড় শিল্পগুলির অনেক সুবিধা দেখা যায়, যথা, একসঙ্গে কাঁচামাল ক্রয়, একসঙ্গে বিক্রয়, বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রভৃতি কার্যে ব্যয়-সংকোচ করিতে পারে। ইহা ছাড়া, নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া ও গবেষণা-মূলক কাযের দ্বারাও ব্যয় সংকোচ করিতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাজারের বিস্তৃতি যদি কম হয় এবং চাহিদা যদি সাময়িককালের জন্য হয়, তাহা হইলে বড় বহরে উৎপাদন লাভজনক হয় না।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-বিধি

কোন শিল্পে যদি অধিক হারে মূলধন ও শ্রম নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও অধিকহারে বৃদ্ধি পায়, ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। ইহার কারণ হইল যে, শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানগুলির মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া শিল্পের প্রসার সম্ভব এবং এইজন্য নানাবিধ ব্যয় সংকোচ হয়।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা

ছোট ছোট শিল্পগুলি যে বড় শিল্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া আছে তাহার কারণ হইল যে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি :

১। ক্রেতার রুচিমত দ্রব্য তৈয়ারী করিতে পারে, ২। মালিকের পক্ষে সবদিকে লক্ষ্য রাখা সম্ভব, ৩। ক্রেতার সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসা সম্ভব, ৪। ছোট খাট যন্ত্রপাতির ব্যবহার।

ভারতের শিল্প-সংগঠন

ভারতের বড় বড় শিল্পগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বস্ত্র, চিনি, চা প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর উৎপাদক শিল্প এবং লৌহ-ইস্পাত, বৈদ্যুতিক শক্তি, সিমেণ্ট প্রভৃতি মূল বা গুরু শিল্প। এই শিল্পগুলির মধ্যে বস্ত্র, লৌহ, ইস্পাত, চিনি, চা, কাগজ, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ও গুরু রাসায়নিক শিল্পগুলি প্রধান।

ইহা ছাড়াও সরকারী পরিচালনাধীনে বর্তমানে বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতেছে; যথা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা, সিন্ধ্রি রাসায়নিক সার কারখানা, হিন্দুস্থান জাহাজ কারখানা ইত্যাদি।

ভারতের কুটিরশিল্প—

ভারতের কুটিরশিল্প এক সময়ে জগদ্বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে নানাকারণে ইহাদের অবনতি ঘটিয়াছে। অবনতির কারণগুলি হইল :

১। শিল্পিগণের মধ্যে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার অভাব।

২। মূলধনের অভাব।

৩। বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি।

৪। শিল্পে শক্তি ব্যবহারের অভাব।

নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়া কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব :

১। সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, ২। অল্পসুদে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা, ৩। শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে ব্যাপক প্রচার-কার্য, ৪। শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের সু-ব্যবস্থা করা, ৫। শিল্পে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের সুযোগদান। তাঁত, রেশমবয়ন, কাঁসা-পিতলের বাসন প্রস্তুত, মাটির বাসন ও খেলনা প্রস্তুত প্রভৃতি এ দেশের কয়েকটি প্রধান কুটিরশিল্প।

ভারতে শিল্পের অনগ্রসরতার কারণ

১। ভারতে নানাজাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকিলেও শক্তি-সম্পদের অভাব। ইহা ছাড়া, ভারতের কয়লার খনিগুলি মাত্র একটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত।

২। সুদক্ষ শ্রমিকের অভাব, ৩। মূলধনের একান্ত অভাব, ৭। শিল্প-পরিচালনার জন্য সংগঠন-শক্তি ও নেতৃত্বের একান্ত অভাব, ৫। শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতি ভারতীয়গণের বিরূপ মনোভাব।

সাধারণ লোক বৃহৎ শিল্পের মালিক হইতে পারে না। বৃহৎ শিল্পের সমগ্র মুনাফা মুষ্টিমেয় ধনীর হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে দেশে উৎকট ধনবৈষম্য দেখা দেয়। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের প্রসারের ফলে মালিকের সংখ্যা বেশী হইবে এবং প্রত্যেকের আয় কম হইবে। সুতরাং দেশের ধনবৈষম্য হ্রাস পাইবে।

তৃতীয়তঃ, কৃষিপ্রধান দেশে বিশেষ করিয়া ভারতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কৃষিকাযের দীর্ঘ অবসরে কৃষকগণ কুটিরশিল্পের কাজ করিয়া তাহাদের আয় বৃদ্ধি করিতে পারে, ইহাতে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও রুচিবোধের উন্নতি হইবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উৎপাদনের অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি লোকের রুচি-মত চাহিদা পূরণ করিতে পারে না। কুটিরশিল্পগুলি ক্রেতার রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য সরবরাহ করিয়া একদিকে যেমন দেশের পরিবর্তনশীল রুচির পরিচর্যা করিতে পারে অপর দিকে সেইরূপ দেশের শিল্পরুচি ও শিল্পপ্রতিভা রক্ষা করিতে পারে। এইজন্যই ভারত সরকার পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে এই শিল্পগুলিকে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সুতরাং দেখা যায়, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলিও বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে কোন বিরোধের স্থান নাই। এই শিল্পগুলির উন্নতির জন্য প্রথমতঃ সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার বহুল প্রসার প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, সমবায় সমিতির সাহায্যে এই শিল্পগুলিকে ঋণদান ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, এই শিল্পগুলিকে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন প্রণালী শিখাইতে হইবে। পঞ্চমতঃ, শিল্পজাত দ্রব্যগুলি ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে বিক্রয় কেন্দ্র ও প্রদর্শনী খুলিতে হইবে।

নবম অধ্যায়

সরকারের ভূমিকা

(Role of the Government)

অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা—Role of the Government in relation to economic functions

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল যে, অপরাধ নিবারণ করিয়া দেশে শান্তি-শৃঙ্খল রক্ষা করাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান কার্য; ইহা ছাড়া ব্যক্তির সামাজিক, নৈতিক বা অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত বলিয়া পরিগণিত হইত। অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সর্বাপেক্ষা কম ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে রাষ্ট্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কালক্রমে শক্তির আধার পুলিশি রাষ্ট্র আজ কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে রূপায়িত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতেই সামাজিক জীবনের নানাক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানকালে এই নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ কাযতঃ সর্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে এই নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ সর্বাধিক পরিমাণে অনুভূত হয়। ইহার কারণ হইল যে, মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করিতে হইলে দেশের ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত আবশ্যক। সামগ্রিকভাবে দেশের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা একমাত্র রাষ্ট্র ব্যতীত কোন ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নহে। এই কারণে সমাজের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে রাষ্ট্রই আজ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ—Economic functions of the Government

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতে পারে। রাষ্ট্রের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আরম্ভ করা সম্ভব

নহে, সেইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সুপরিচালিত করে। প্রত্যেক দেশেই কৃষিকার্য ধনোৎপাদনের একটি প্রধান উপায়। কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নহে। অথচ কৃষির ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর ছাড়িয়া দিলেও সমাজের সামগ্রিক স্বার্থহানির সম্ভাবনা। এইজন্য রাষ্ট্র কৃষি-উৎপাদন ক্ষেত্রে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। ভূমিস্বত্ব আইন, জমির খণ্ডীকরণ-নিরোধ, খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ, সেচব্যবস্থা, কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়-ব্যবস্থা, কৃষিঋণ দান-ব্যবস্থা সম্পর্কিত নানা বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়া সরকার কৃষির উন্নতির পথের সমস্ত বাধা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এক কথায় বলিতে গেলে দেশে ধনোৎপাদনের যতগুলি বিভিন্ন উপায় আছে তৎসমুদয়ই রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্র শুধু উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, বিনিময়, বণ্টন ও প্রয়োজনক্ষেত্রে ভোগব্যবহার-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া সামাজিক স্বার্থের সহিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সামঞ্জস্য বিধান করে। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নানাবিধ অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সহিত যুক্ত থাকে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপগুলিকে নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করা যায়।

(১) সরকার ও কৃষি—Government and Agriculture

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সরকারের সাহায্য ব্যতীত কৃষির উন্নতি সম্ভব নহে। বিভিন্ন দেশের সরকার এই উদ্দেশ্যে নানাভাবে কৃষির উন্নতির প্রতিকূল অবস্থা দূর করিয়া অনুকূল অবস্থার সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে।

কৃষির উন্নয়নে ভারত সরকারের অবদান—আমাদের ভারত সরকার এবিষয়ে অবহিত হইয়া নানাভাবে কৃষির উন্নতির জন্য সাহায্য করিতেছেন। বহু পূর্বে বৃটিশ শাসনকালেও সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৮৯ সালে ডাঃ ভোয়েলকার নামক জনৈক কৃষিবিশেষজ্ঞকে কৃষির উন্নতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া একটি বিবরণী দিতে বলা হয়। ১৯২৬ সালেও লর্ড লিনলিথগোর সভাপতিত্বে কৃষির উন্নতি সম্পর্কে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। এই সমস্ত কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে কৃষির উন্নতির জন্য ভারত সরকার বহু ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেচ-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সরকার নলকূপ-খনন ও বহু অর্থব্যয়ে

বড় বড় খাল কাটাইয়াছেন। বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র জমিগুলিকে একত্রিত করিয়া চাষবাসের সুব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন রাজ্যে আইন করিয়া সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। উৎপন্ন ফসলগুলি যাহাতে ন্যায্যদরে বিক্রীত হয় সেজন্য বিক্রয়-ব্যবস্থারও উন্নতিবিধান করা হইয়াছে। ১৯০৪ সাল হইতে সমবায় আন্দোলনের সাহায্যে ঋণদান, ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি নানাজাতীয় সমবায় সমিতি গঠন করিয়া কৃষির উন্নতির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ভারত সরকার অল্পদরে উৎকৃষ্ট সার সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে সিন্ধ্রিতে সারের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। পশু চিকিৎসালয় স্থাপন, কৃষি-গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা এবং মহাজনী প্রথার ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়া ভারত সরকার কৃষির উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় সরকার কৃষির উন্নতির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন এবং পরিকল্পনার জন্য ধার্য মোট ব্যয়ের শতকরা ৪৫ ভাগ কৃষির উন্নতির জন্য ধরা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় কৃষিকে প্রথম স্থান না দেওয়া হইলেও এই খাতে পাঁচ বৎসরের ৩৪১ কোটি টাকা ধার্য হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় পুনরায় কৃষির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

(২) সরকার ও শিল্প—Government and Industry

শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র সাধারণতঃ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে। প্রথমতঃ, প্রায় প্রত্যেক দেশেই রাষ্ট্র কতকগুলি মূল-শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে। বৈদ্যুতিকশক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, গুরু রাসায়নিক দ্রব্য, যুদ্ধোপকরণ নির্মাণ, এবং মাদক দ্রব্য, ও কুইনাইন প্রভৃতি রোগ-প্রতিষেধক দ্রব্যের উৎপাদন সরাসরি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। অংশীদারী কারবার, যৌথ-মূলধনী কারবার ও সমবায় সমিতি গঠন করিতে হইলে রাষ্ট্রের অনুমোদন অপরিহার্য; বিদেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র-প্রবর্তিত নানাজাতীয় বিধি-নিষেধ মানিতে হয়। বিদেশ হইতে অবাধভাবে পণ্য আমদানী এবং বিদেশে অবাধভাবে পণ্যের রপ্তানী বর্তমান যুগে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নহে। রাষ্ট্র বিদেশী বিনিময়ের হার নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাণিজ্যের গতি সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র

শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ স্থির করিয়া দেয়। মূল্যনিয়ন্ত্রণ দ্বারা রাষ্ট্র একচেটিয়া ব্যবসায়ে অস্বাভাবিক মুনাফা-অর্জন নিরোধ করিতে পারে।

শিল্পের উন্নয়নে ভারত সরকারের অবদান—ভারতের পূর্বতন বৃটিশ সরকার এদেশে শিল্পের উন্নতির জন্য কোন সাহায্য করেন নাই বলিলেও চলিতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধ চলিবার কালে ভারত সরকারের দৃষ্টি সর্বপ্রথম এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং ১৯১৬ সালে সরকার একটি শিল্পকমিশন নিযুক্ত করেন। এদেশে শিল্পোন্নতির জন্য উক্ত কমিশন কয়েকটি সুপারিশ করেন। ইহার পর ভারতে শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ও প্রত্যেকটি প্রাদেশিক সরকারের অধীনে এক একটি শিল্প বিভাগ স্থাপন করা হয়। কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার শিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিবার উদ্দেশ্যে আইনও প্রণয়ন করিয়াছিলেন (State Aid to Industries Act)। ১৯২২ সালে ভারত সরকার একটি রাজস্ব কমিশন (Fiscal Commission) নিয়োগ করেন। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ভারতে শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি (Discriminating Protection) গ্রহণ করা হয় এবং লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ, চিনি প্রভৃতি কয়েকটি শিল্প এই সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে প্রসারলাভ করিতে সমর্থ হয়।

দেশের বর্তমান জাতীয় সরকার শিল্পের উন্নতির জন্য পরিকল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন-প্রচেষ্টায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া না হইলেও শিল্পসম্প্রসারণ শুধু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। বৃহৎশিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনানুসারে ৯৪ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হইয়াছিল, মাঝারি ও কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য ৭৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার ফলে এদেশে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সিন্ধ্রির সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা, টেলিফোন তার ও যন্ত্রপাতির কারখানা, কোক কারখানা প্রভৃতির বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শিল্প-উন্নয়নের উপরই সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং লৌহ ও ইস্পাত, সিমেণ্ট, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি মূল শিল্পগুলি যাহাতে দ্রুত প্রসার লাভ করিতে পারে সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা

হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে ·৬৯০ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া শিল্পের মূলধন সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী অনুপ্রেরণায় কেন্দ্রীয় ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Industrial Finance Corporation) ও রাজ্য ঋণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (State Finance Corporation) ও শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (Industrial Credit and Investment Corporation) ও আরও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। ভারত সরকার জনস্বার্থের খাতিরে জীবনবীমা কোম্পানীগুলি ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে (স্টেট্ ব্যাঙ্ক) রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছেন।

ভারত সরকারের নূতন শিল্পনীতি—New Industrial Policy of the Government of India

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হইবার পর জাতীয় সরকার বুঝিতে পারেন যে, শিল্পের প্রসার ও উন্নতি না হইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া লোকের জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইতে পারে না। এইজন্য ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার শিল্প সম্পর্কে তাঁহাদের নীতি ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ভারত সরকার কার্যকরীভাবে শিল্পের উন্নতির কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার তাহার পূর্বতন শিল্পনীতি সংশোধন করিয়া শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও কার্যকরী নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন শিল্পনীতি গ্রহণে সরকার প্রধানতঃ তিনটি উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য ১৯৪৮ সালে গৃহীত নীতির পরিবর্তন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী ও সমবায় শিল্প-প্রচেষ্টার সাহায্যে দ্রুত শিল্পের উন্নতি করিয়া যাহাতে পরিকল্পনা নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছান যায়। তৃতীয়তঃ, দ্রুত শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে বে-সরকারী শিল্প প্রচেষ্টাকেও অনেক সুবিধা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৪৮ সালের নীতির মত নূতন নীতি অনুসারেও শিল্পগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে আণবিক শক্তি, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেলওয়ে, লৌহ ও ইস্পাত, খনিজ উৎপাদন, এরোপ্লেন ও জাহাজ নির্মাণ, বেতার-যন্ত্র নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি সতেরটি শিল্প সরকারের

একচেটিয়া উৎপাদনের অধিকারে থাকিবে। উপরি-উক্ত শিল্পগুলির মধ্যে যেগুলি পূর্ব হইতেই বে-সরকারী পরিচালনাধীন আছে, সেগুলিকে আরও দশ বৎসর পর্যন্ত বে-সরকারী পরিচালনায় থাকিতে দেওয়া হইবে। তবে এই জাতীয় বে-সরকারী শিল্পগুলির প্রসারের জন্য সরকারী সাহায্য সব সময়ে পাওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়ভাগে মেসিনটুল, প্রয়োজনীয় ঔষধ, সার, রবার, স্থল ও জল পরিবহন প্রভৃতি বারটি শিল্পে সরকার নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারিবে। অবশ্য এই সমস্ত শিল্পে বে-সরকারী প্রচেষ্টা সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বা সরকারের সহিত একযোগে চলিতে পারিবে।

অবশিষ্ট অন্যান্য শিল্পগুলি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। সরকার আশা করেন এই সমস্ত শিল্পগুলি বে সরকারী উদ্যম ও প্রচেষ্টায় প্রসারলাভ করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে সবকার পক্ষ হইতে এই শিল্পগুলিকে নানারকমে উৎসাহ এবং সাহায্য দিবাব ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে সরকার নিজেও এই সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারিবে।

সুতবাং নূতন নীতি অনুসারে ভারতে শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টা পাশাপাশি চলিবে। শিল্পগুলি সরকারী ও বে-সরকারী অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানা এই উভয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে—এইজন্য এই ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Mixed Economy) বলা হয়।

(৩) সরকার ও শ্রমিক—Government and Labour

শিল্পোন্নয়নে শ্রমিকের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। সুতরাং শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিসাধন করিয়া তাহাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে পারিলে শিল্পের উন্নতি সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান সভ্য দেশের সরকারগুলি শ্রমিক কল্যাণের জন্য বিশেষ করিয়া স্ত্রী ও অল্পবয়স্ক শ্রমিকের শারীরিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার জন্য নানাবিধ আইন প্রণয়ন করিতেছেন। শ্রমিকগণের কার্যকাল ও মজুরির পরিমাণ-নির্ধারণ, অসুস্থ বা বেকার অবস্থায় ভাতা-প্রদান, শ্রমিক মালিক বিরোধক্ষেত্রে সন্তোষজনক সমাধান ইত্যাদি নানা-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণে ভারত সরকার—শিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধ ঘটিলে উৎপাদন-বৃদ্ধি হ্রাস পায়। কাজের অসুবিধা, বাসস্থানের অভাব ও

অব্যবস্থা, ন্যায্য মজুরির অভাব, শ্রমিক ছাঁটাই, কাজের নিরাপত্তা ও ছুটির অভাব, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহানুভূতির অভাব প্রভৃতিই হইল ভারতে শ্রমিক-মালিক বিরোধের প্রধান কারণ। স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বে ভারতের বিদেশী সরকার শ্রমিকের স্বার্থ-সম্পর্কে কাযতঃ উদাসীন ছিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্রমিক কল্যাণকর দু'চারটি আইন পাস করিলেও পূর্বতন সরকার শ্রমিকের স্বার্থরক্ষাকল্পে সক্রিয়ভাবে কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ১৯২৯ সালে একটি শিল্পবিরোধ আইন পাস করিয়া বিরোধ-নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩৮ সালে এই আইন সংশোধিত হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি শ্রমিক-মালিক বিরোধক্ষেত্রে বিরোধের মধ্যস্থতা করিবার জন্য কিছু অধিকার লাভ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর ভারতে শ্রমিক-মালিক বিরোধ চরম আকার ধারণ করে এবং এই সময় ১৯৪৭ সালে আর একটি শিল্পবিরোধ আইন প্রণয়ন করিয়া বিরোধ নিবারণের ব্যবস্থা করা হয়। এই আইনের বলে প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও মালিক উভয়দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি কর্মসমিতির (Works Committee) সাহায্যে বিরোধ-নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হয়। কর্মসমিতির নিষ্পত্তি গ্রহণযোগ্য না হইলে শিল্পবিরোধ আদালতগুলিতে আপীল করিবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫৬ সালে পুনরায় শিল্পবিরোধ সংশোধনী আইন পাস করিয়া পূর্ব আইনের কিছু পরিবর্তন করা হয়।

ইহা ছাড়াও ভারত সরকার ১৯৪৬ ও ১৯৪৮ সালে দুইটি শ্রমিক আইন পাস করিয়া শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা, স্ত্রী ও শিশুশ্রমিক নিয়োগের আইন প্রবর্তন করেন। এই আইনানুসারে ১৪ বৎসর বয়সের কম কোন বালককে কাযে নিযুক্ত করা চলিবে না। শিশুদের দৈনিক ৪½ ঘণ্টার অধিক কাজ করিতে দেওয়া চলিবে না ও পূর্ণ বয়স্কদের একঘণ্টা বিশ্রাম না দিয়া ৫ ঘণ্টার বেশী কাজ করান চলিবে না। সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়াও শিশুদের বৎসরে ২৪ দিন ও বয়স্কদের ১৮ দিন ছুটি দেওয়া স্থির হইয়াছে। ইহা ছাড়াও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ন্যূনতম মজুরি বীমাব্যবস্থা প্রভৃতি শ্রমিক কল্যাণকর নানা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারের শ্রমিক-সম্পর্কিত নূতন নীতি ঘোষিত হইয়াছে। শ্রমিক ও মালিককে পারস্পরিক বিরোধ না করিয়া সংঘবদ্ধভাবে পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজ গঠন করিবার

উদ্দেশ্যে শিল্পে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ১৯৫২ সালে আইন পাস করিয়া (Employees' Provident Fund Act, 1952) কর্মীদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সৃষ্টির ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৪) সরকার ও বহির্বাণিজ্য—Government and Foreign trade

বহির্বাণিজ্যের সাহায্যে স্বদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা পূর্বকাল হইতেই রাষ্ট্রের একটি কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং দেশের রাজার নিকট হইতেই সনদ লইয়া একদেশের লোক অপর দেশের সহিত বাণিজ্য করিত। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলি অবাধ বাণিজ্য-নীতি বা সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিতে পারে। অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাধভাবে আমদানী ও রপ্তানী চলে, কিন্তু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বিদেশ হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুসৃত হইলেও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই সংরক্ষণ-নীতির প্রাধান্য দেখা যায় এবং এ বিষয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে অগ্রণী বলা চলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতেই রাষ্ট্র কর্তৃক মুদ্রাবিনিময়-নিয়ন্ত্রণও আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমানে বহির্বাণিজ্যের কোন কোন ক্ষেত্র রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে (State trading)।

ভারত সরকারের বাণিজ্য-নীতি—১৯২১ সালে পূর্বতন ভারত সরকার শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই নীতি অনুযায়ী কয়েকটি বিশেষ শিল্প সংরক্ষণের সাহায্য লাভ করে। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার কৃষ্ণমাচারি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে যুদ্ধোপকরণ-শিল্প, মূলশিল্প এবং এই দুই শ্রেণীর শিল্পের সহায়ক শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সংরক্ষণ-নীতি প্রসারের জন্য সুপারিশ করেন। বর্তমান ভারত সরকারের বহির্বাণিজ্যের নীতি উপরি-উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তরকালে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত নিরোধকল্পে ভারত সরকার আমদানী-নিয়ন্ত্রণ, রপ্তানী-বৃদ্ধি ও মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছেন।

(৫) সরকার ও বেকার সমস্যা—Government and Unemployment

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপগুলির মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান করা আধুনিক কালের রাষ্ট্রগুলির একটি কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বেকার সমস্যা হইতে অন্য নানাবিধ সমস্যার উৎপত্তি হয় ও ফলে সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বর্তমান রাষ্ট্রগুলি কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, ধনবণ্টন-ব্যবস্থার ত্রুটি দূরীকরণ, শ্রমিকের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা, বিভিন্ন বৃত্তিগুলির মধ্যে শ্রমবিনিময়-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে শ্রমিক-নিয়োগের সামঞ্জস্য বিধান করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

ভারত সরকার ও বেকার সমস্যা—বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে ভারত সরকার স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৬) সরকার ও আয়-বৈষম্য—Government and Inequality of Income

আয়-বৈষম্য এবং ইহার ফলে ধনী ও দরিদ্রের অসম্ভব পার্থক্য বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার একটি প্রধান অভিশাপ। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি আয় বৈষম্যের কুফল সম্পর্কে অবহিত হইয়া এই কুফলগুলি দূর করিবার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি একদিকে ক্রমবর্ধহারে কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি ধার্য করিয়া ধনিক শ্রেণীর নিকট হইতে অধিক পরিমাণ কর আদায় করিয়া এবং অপরদিকে দরিদ্র শ্রেণীর উন্নতিকল্পে বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা, অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন, বৃদ্ধ বয়সে ভাতা দেওয়া প্রভৃতি নানাবিধ সমাজসেবা-মূলক কার্যের দ্বারা বণ্টন-ব্যবস্থার এই বৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা করেন।

ভারত সরকার ও আয়-বৈষম্য—ভারতের জাতীয় আয় আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, ভারত দরিদ্র দেশ হইলেও এদেশে চরম আকারে আয়-বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই আয়-বৈষম্য দূর করিতে না পারিলে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে কল্যাণকর রাষ্ট্রগঠন সম্ভব নহে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি প্রধান লক্ষ্য হইল আয়ের এই বৈষম্য হ্রাস করা (To reduce inequality of income)। এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার দরিদ্র শ্রেণীর আয় বৃদ্ধি করিবার

উপায়গুলির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন, উচ্চহারে আয়কর-স্থাপন, উত্তরাধিকার কর-প্রবর্তন ব্যতীতও ভারত সরকার উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা জাতীয় আয়-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

৭। সরকার ও মুদ্রাস্ফীতি—Government and Inflation

মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে সাধারণতঃ দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি বাধা পায়। মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে সরকার দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য স্থির করিয়া দেন। প্রয়োজন ক্ষেত্রে দ্রব্যাদির বিক্রয় পরিমাণ বরাদ্দ করিয়া (Rationing) দেয়। বাজারে যাহাতে অধিক পরিমাণ টাকা-পয়সা চালু না থাকে, সেজন্য সরকার উচ্চ হারে কর ধায করেন ও অন্য নানা উপায়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে অর্থ পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করেন।

ভারত সরকার ও মুদ্রাস্ফীতি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে নানা কারণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে থাকে এবং ইহার ফলে জিনিসপত্তরের দাম অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং এখনও পযন্ত এই মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস পায় নাই। মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, যথা, করবৃদ্ধি, রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্কস্থাপন, জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহদান, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

(৮) সরকার ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা—Government and Development Planning

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানিগণের ধারণা ছিল যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ দ্বারাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব—এইজন্য তাঁহারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আধুনিক কালে বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে এই ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নহে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য

শুধু রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ যথেষ্ট নহে, এজন্য রাষ্ট্রের সক্রিয়-সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ধনোৎপাদনের বিভিন্ন উপায়গুলি এত ঘনিষ্ঠসম্পর্কযুক্ত যে, বিক্ষিপ্তভাবে ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা এই উপায়গুলির যথাযথ ব্যবহার সম্ভব নহে। এইজন্য রাষ্ট্র কর্তৃক এই উপায়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমাজের সর্বাধিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার সাহায্যে এই উপায়গুলির পূর্ণ সু-ব্যবহার প্রয়োজন। একমাত্র রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সাহায্যেই দেশের সামগ্রিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। চরম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে সমাজে যে আয়-বৈষম্য, বেকার সমস্যা, ব্যবসায়চক্র প্রভৃতি কুফল দেখিতে পাওয়া যায়, একমাত্র সরকার কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে তাহা দূর করা সম্ভব। অনুন্নতদেশগুলির পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র উপায় হইল রাষ্ট্র-পরিচালিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি দেশ এই উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সাহায্যে স্বল্পকালের মধ্যে আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বহু রাষ্ট্রই আজ তাহাদের দুর্গত অর্থনৈতিক অবস্থা দূর করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ পরিকল্পনার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা—Definition of Economic Planning

রাষ্ট্র-নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণপূর্বক জীবনধারণের মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাহাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলা যাইতে পারে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির কতকগুলি সাধারণ মূলনীতি থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন দেশের অবস্থার ও উদ্দেশ্যের পার্থক্যের জন্য পরিকল্পনাগুলি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারত তাহার বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ অনুযায়ী যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে নানাদিক্ দিয়া তাহা রুশ দেশের পরিকল্পনা হইতে পৃথক। পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের যাবতীয় সম্পদ সুনির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্র-নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সমিতির নির্দেশে এরূপভাবে

উৎপাদন-কার্যে প্রযুক্ত হয়, যাহার ফলে এই সুনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থার দ্বারা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়।

পরিকল্পনার উপাদান—Elements of Planning

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কতকগুলি মূলনীতি থাকে। এই নীতিগুলির ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-সমিতি পরিকল্পনাগুলি প্রস্তুত করেন; পরিকল্পনাগুলির মূলনীতিগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে:

১। মূল উদ্দেশ্য নির্ণয়—প্রত্যেক অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় প্রথমেই পরিকল্পনাটির মূল উদ্দেশ্য স্থির করিতে হয়, কারণ নির্ধারিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই পরিকল্পনাটিকে রূপদান না করিতে পারিলে মূল উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি অথবা যুদ্ধ-জনিত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ, অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

২। অগ্রাধিকার নির্ণয়—পরিকল্পনাগুলি সাধারণতঃ একাধিক উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত প্রস্তুত করা হয়। এই বহুমুখী উদ্দেশ্যের কোনটিকে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিতে হইবে তাহা প্রথমেই স্থির করা হয় এবং উদ্দেশ্যের গুরুত্ব অনুসারে পরিকল্পনা-কার্য পরিচালিত হয়। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষির উপর ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

৩। লক্ষ্য নির্ণয়—প্রত্যেক পরিকল্পনার কাজ একটি পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করিবার সংকল্প লইয়াই আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকরী করিবার জন্য পাঁচ বৎসর সময় স্থির করা হয়। প্রতিবৎসর পরিকল্পনার কাজ কতদূর অগ্রসর হইলে নির্ধারিত সময়ের শেষে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যস্থলে যাওয়া সম্ভব তাহা সঠিকভাবে স্থির করা একান্ত আবশ্যক।

৪। সংগতি নির্ণয়—পরিকল্পনা প্রস্তুত করা কষ্টসাধ্য নহে, কিন্তু পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করা দুরূহ। পরিকল্পনাটির সাফল্যের জন্য সামর্থ্য থাকা চাই। পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য দেশের যাবতীয় সংগতি সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা করা নিতান্ত প্রয়োজন। পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, জনবল, অর্থবল ও বৈদেশিক সাহায্য,

প্রভৃতি সহায়ক উপাদানগুলির নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের অনুপাতে দেশের সংগতি যদি কম হয়, তাহা হইলে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হইতে পারে না।

৫। প্রশাসন ব্যবস্থা নির্ণয়—পরিকল্পনার সাফল্য বহুল পরিমাণে পরিকল্পনা কার্যে নিযুক্ত কর্মিবৃন্দের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। এইজন্য কর্মদক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ ও স্বাধীনচেতা কর্মীর প্রয়োজন। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকিলে সংগতি থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়া যায় না।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—The First Five Year Plan of India

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ১৯৪৭ সালে ভারতের বৃটিশ শাসকগণ ভারতকে স্বাধীনতা দান করিয়া যখন এ দেশ পরিত্যাগ করিলেন তখন ভারত কার্যতঃ হৃতসর্বস্ব। নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকারকে নানাজাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তন্মধ্যে খাদ্য সমস্যা, বেকার সমস্যা, উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন সমস্যা প্রভৃতি এরূপ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল যে, একটি শিশু রাষ্ট্রের পক্ষে এজাতীয় মারাত্মক সমস্যাগুলির সাময়িক সমাধান করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সুখের বিষয় আমাদের প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত সরকার এই উৎকট সমস্যাগুলির সাময়িক ও স্থায়ী সমাধানের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনকে সমস্যামুক্ত করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। ১৯৫০ সালে মার্চ মাসে প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রথম পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভার ন্যস্ত করা হয়।

১। দেশের সম্পদ, মূলধন এবং জনবল নির্ণয় করা,

২। উপরি-উক্ত উপাদানগুলির যথাযথ ও সর্বাধিক পরিমাণ সু-ব্যবহার সম্পর্কে প্রস্তাব করা,

৩। এ সম্পর্কে গুরুত্ব অনুসারে কোন্ কাজটি পূর্বে আরম্ভ হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া,

৪। সমগ্রভাবে পরিকল্পনাটিকে সফল করিবার জন্য কি ধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন তাহা নির্ধারণ করা।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত

উদ্দেশ্য ছিল—ভারতের অব্যবহৃত সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের সাহায্যে উৎপাদন-বৃদ্ধির দ্বারা ও সকলের জন্য হিতকর কাজের সংস্থান দ্বারা জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা।

পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য—প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য সরকারী ও বে-সরকারী প্রয়াস পাশাপাশি চলিতে থাকিবে। ১৯৪৮ সালে সরকার যে নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন তদনুসারে প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী উৎপাদন-ক্ষেত্র (Public Sector) ও বে-সরকারী উৎপাদন-ক্ষেত্র (Private Sector) স্থির হইয়াছিল। যুদ্ধোপকরণ-উৎপাদন ও আণবিক শক্তির উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ এবং রেলওয়ে পরিবহন ব্যবস্থার মালিকানা ও পরিচালনায় সরকারের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। দ্বিতীয়তঃ, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, এরোপ্লেন ও জাহাজ নির্মাণশিল্পও সরকারের একচেটিয়া অধিকারে থাকিবে এবং এই সমস্ত শিল্প যাহা পূর্ব হইতে ব্যক্তিগত মালিকানায় এতদিন পর্যন্ত পরিচালিত হইয়াছে, সেগুলি আবও দশ বৎসর পর্যন্ত ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন থাকিতে পারিবে। তৃতীয়তঃ, অন্য জাতীয় শিল্পগুলি সরকারী ও বে-সরকারী উভয়রূপ পরিচালনাধীন থাকিতে পারিবে। চতুর্থতঃ, ক্ষুদ্র ও কুটিবশিল্পগুলিকে সমবায় পদ্ধতির সাহায্যে পুনর্জীবিত করিয়া জাতীয় উন্নতির একটি প্রধান সহায়ক উপায় করিয়া গঠিত করিবার সংকল্প গ্রহণ কবা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনায় ভারতে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (Mixed Economy) প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থায় সরকারী ও বে-সরকারী উৎপাদন ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্প পাশাপাশি চলিতে থাকিবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, কৃষির উপর সর্বাধিক পরিমাণ গুরুত্ব প্রদান করা। কৃষিকে অগ্রাধিকার দিবার উপযুক্ত কারণও ছিল। দেশে খাদ্যশস্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামালের অভাব পূরণ করিবার উদ্দেশ্যেই কৃষিকার্য এবং সেইসঙ্গে সেচব্যবস্থা ও শক্তি-উৎপাদনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল।

এই পরিকল্পনায় মাচ ১৯৫১ সাল হইতে মার্চ ১৯৫৬ সাল এই পাঁচ বৎসরে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে কত টাকা ব্যয় করা হইবে, তাঁহার মোট একটা হিসাব দেওয়া হইল। সর্বসমেত ২০৬৯ কোটি টাকা বিভিন্ন উন্নয়ন-কার্যে ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছিল।

	কোটি টাকার হিসাবে ব্যয়ের পরিমাণ	মোট ব্যয়ের শতাংশ	
কৃষি ও সমাজসেবা	৩৬১	১৭'৫	৪৪'৬
জলসেচ	১৬৮	৮'১	
জলসেচ ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন	৩৯৩	১৯'০	
পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৯৭	২৪'০	
শিল্প	১৭৩	৮'৪	
সমাজসেবা	৩৪০	১৬'৪	
পুনর্বাসন	৮৫	৪'১	
বিবিধ	৫২	২'৫	
	২০৬৯ কোটি	১০০ ০	

কৃষি—উপরি-প্রদত্ত ব্যয়ের বিভিন্ন বরাদ্দ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছিল এবং কৃষি, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সমগ্র ব্যয়-পরিমাণের শতকরা ৪৪'৬ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের ভীষণ অভাব হয় এবং দেশবিভাগের ফলে এই অভাব আরও তীব্র হইয়া উঠে। দেশবিভাগের ফলে আরও একটি প্রধান অসুবিধা হইল যে, পাটকল ও কাপড়ের কলগুলির কাঁচা-মালের (পাট ও কার্পাস) উৎপাদন স্থান পাকিস্তানভুক্ত হওয়ায় এই দুইটি কাঁচামাল উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়। খাদ্যশস্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামালের ঘাটতি পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল এবং ভারতে কৃষির উন্নতি করিতে গেলে সেচব্যবস্থার উন্নতি করা অপরিহার্য, ইহা বলাই বাহুল্য।

প্রথম পরিকল্পনানুসারে আশা করা গিয়াছিল কৃষিকার্যে অধিক পরিমাণ ব্যয় করিলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন-পরিমাণ ৫২৭ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬১৬ লক্ষ টন হইবে এবং পাট ও তুলা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দেশ অনেক পরিমাণে স্বাবলম্বী, হইতে পারিবে। জলসেচ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে প্রায় ৬০ লক্ষ একর অতিরিক্ত পরিমাণ জমিতে সেচব্যবস্থা হইবে। ইহা ছাড়া, ৭৪ লক্ষ একর পতিত জমির উদ্ধার ও জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপসাধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

শিল্প—শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়-পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। প্রথম

পরিকল্পনানুযায়ী দেশে শিল্প উন্নয়নের দায়িত্ব ব্যক্তিগত শিল্প-মালিকদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং সরকার শিল্পের মালিকদের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেন। বস্ত্র ও সিমেণ্ট উৎপাদনক্ষেত্রে বে-সরকারী উৎপাদন-পরিমাণ পরিকল্পনানুযায়ী বৃদ্ধি পাইলেও চিনি ও লৌহ-ইস্পাত শিল্পে উৎপাদন-পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই।

পরিবহন ও যোগাযোগ—মোট ব্যয়পরিমাণের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই খাতে ধার্য হয়। এই ব্যয়ের অধিকাংশই রেলপরিবহনের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হয়। ইহা ব্যতীত রাস্তাঘাট বিশেষ করিয়া জাতীয় সড়কগুলি (National Highways) ও রাজ্য সড়কগুলির (State Roads) সংস্কার ও প্রসারের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করা হয়। বন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

সমাজসেবা—সমাজসেবার জন্য ৩৪০ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়। শিক্ষার জন্য ১৫২ কোটি টাকা ধার্য হয়। গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ইহা ব্যতীত জনস্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে প্রায় ২০০ কোটি, গৃহনির্মাণ বাবদ ৪৮ কোটি, শ্রমিক কল্যাণের জন্য ৭ কোটি, অনগ্রসর জাতিগুলির জন্য ২৯ কোটি এবং ম্যালেরিয়া-নিয়ন্ত্রণ, প্রসূতি ও শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি নানাজাতীয় সমাজসেবামূলক কার্যের জন্য ৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ হয়।

উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন—পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত উদ্বাস্তুগণের পুনর্বাসন উদ্দেশ্যে ৮৩ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হয়। এই ব্যয়পরিমাণ পরে আরও বৃদ্ধি পায়।

জাতীয় সম্প্রসারণ-কার্য ও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য স্বতন্ত্র ব্যয় ধার্য হয়। পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছিলেন যে, পরিকল্পনানুযায়ী অর্থব্যয় হইলে পাঁচ বৎসর পরে জাতীয় আয় শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং ২৭ বৎসর পরে জন প্রতি আয় ২৫৫ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ অর্থাৎ ৫১০ টাকা হইবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব-সংস্থান—Financing of the First Five Year Plan

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য সরকারী ক্ষেত্রে মোট ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হইয়াছিল। এই অর্থ সরকার বিভিন্ন উপায়ে সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলি তাহাদের সাধারণ ব্যয় হ্রাস করিয়া যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত আয় সঞ্চয় করিতে পারিবে, তাহা পরিকল্পনা-কার্যে ব্যয় করার৹ সিদ্ধান্ত করা হয়। এই উৎস হইতে ৭৩৮ কোটি টাকা পাওয়া যায়।

২। দ্বিতীয়তঃ, দেশের মধ্যে নানাভাবে সঞ্চয় বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে সরকার ঋণ গ্রহণ করিয়া ৫২০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেন।

৩। বিদেশ বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া ১৫৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়।

৪। ইহা সত্ত্বেও ৬৫৬ কোটি টাকার ঘাটতি হয়। এই ঘাট্‌তি আরও বৈদেশিক ঋণ, আভ্যন্তরীণ ঋণ, করবৃদ্ধি ও ঘাটতি ব্যয় অর্থাৎ নোট ছাপাইয়া সংকুলান করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত হিসাব অনুসারে ব্যয়-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২০৬৯ কোটি টাকার স্থলে ২৩৫৬ কোটি টাকা হয়। উন্নয়ন-পরিকল্পনাগুলির প্রত্যেক খাতেই ব্যয়-পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য—Success of the First Five Year Plan

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে সাফল্যলাভ করিতে না পারিলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রসূ হইয়াছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিকল্পনার লক্ষ্য অতিক্রম করিয়াছিল।

কৃষির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এককোটি ৩ লক্ষ একর পরিমাণ জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। পাঁচ বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ২০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধি পরিকল্পনার লক্ষ্য অপেক্ষা বেশী। সমগ্র কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শিল্পের ক্ষেত্রেও বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন-পরিমাণ পরিকল্পনার লক্ষ্যকে ছাড়াইয়া যায়। সরকারী পরিচালনাধীন শিল্পগুলিতে এই সময়ে কাজ আরম্ভ হয়।

পরিবহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়। পাঁচ বৎসরে মোট ৩৮০

মাইল নূতন রেলপথ নির্মিত হয়। বন্দর-উন্নয়নের কার্যও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়।

গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি সমাজসেবামূলক কার্যগুলি সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইয়া পল্লী অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে নূতন আশা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে।

বিভিন্নক্ষেত্রে এই উন্নতির ফলে জাতীয় আয় আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিকল্পনানুযায়ী পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কার্যতঃ ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে মূল্যস্তর হ্রাস পায় এবং ভারতের বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি দূর হইয়া উদ্বৃত্ত দেখা যায়। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে প্রায় ১০ বৎসর পরে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িতে পারে।

বেকার সমস্যার সমাধানক্ষেত্রে পরিকল্পনার ব্যর্থতা সূচিত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রিপোর্টেও সরকার স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা এ সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু দিন দিন এই সমস্যা তীব্রতর হইতেছে। উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন ক্ষেত্রেও আশানুরূপ কার্য হয় নাই। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ১৯৫৪-৫৫ সালে হ্রাস পাইলেও পরবর্তী কালে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—The Second Five Year Plan

১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ প্রথম পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হয় ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ হয়। প্রথম পরিকল্পনা আরম্ভ করিতে সরকারের যে পরিমাণ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ততটা অসুবিধা হয় নাই। কারণ, দেশের খাদ্যসমস্যা দূর হইয়াছিল, মূল্যস্তরও কমিয়াছিল এবং সরকার পরিকল্পনা কার্যের জন্য অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। ১৯৫৫ সালে সরকার দ্বিতীয় পরিকল্পনার একটি খসড়া কাঠামো প্রকাশ করেন। এই খসড়া কাঠামোর অনেক আলোচনা হওয়ার পর ১৯৫৬ সালের মে মাসে চূড়ান্তভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাঠামো প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—Objectives of the Second Five Year Plan

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইল চারিটি। এই উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অনেক সুদূরপ্রসারী।

১। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য জাতীয় আয় অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা।

২। কয়লা, লৌহ-ইস্পাত, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল ও গুরু শিল্পগুলির দ্রুত উন্নতি দ্বারা শিল্পোন্নয়নের পথ সুগম করা।

৩। বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান। পাঁচ বৎসরে অন্ততঃ ১১০ লক্ষ নূতন কাজ সৃষ্টি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

৪। আয় ও ধনবণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করিয়া সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রথমতঃ, জাতীয় আয়বৃদ্ধি দ্বারা লোকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিতে হইলে দ্রুত শিল্পে উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক। এই জন্যই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। শিল্পের প্রসার ও উন্নতি করিতে হইলে মূল ও ভারি শিল্পগুলির অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু-উৎপাদনের সহায়ক শিল্পগুলির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন আবশ্যক। মূল ও ভারি শিল্পের প্রসারের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের সে পরিমাণ অর্থ নাই। ইহা ছাড়া এই শিল্পগুলিতে বেশী লোক নিযুক্ত করা যায় না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই শিল্পগুলির উন্নতি হইলে শুধু যে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে তাহা নহে, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া এই শিল্পগুলি মুদ্রাস্ফীতিও নিরোধ করিতে পারিবে। উপরি-উক্ত ব্যবস্থার সাহায্যে অসম ধনবণ্টন-ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করা সম্ভব হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সরকারী খাতে ব্যয়

এই পাঁচ বৎসরে উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃক বিভিন্ন খাতে নিম্নলিখিত পরিমাণ ব্যয় ধার্য হইয়াছে :

	কোটি টাকা হিসাবে ব্যয়ের পরিমাণ	মোট ব্যয়ের শতাংশ	প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শতকরা কত ভাগ ব্যয় বাড়িয়াছে
কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন	৫৬৮	১১'৮	৫৯'৯
সেচ ও বিদ্যুৎ	৯১৩	১৯'০	৩৮'৯
শিল্প ও খনি	৮৯০	১৮'৫	৩৯৭'২
পরিবহন ও যোগাযোগ	১৩৮৫	২৮'৯	১৪৮'৭
সমাজসেবা	৯৪৫	১৯'৭	৭৭'৩
বিবিধ	৯৯	২'১	৫৩'৫
	৪৮০০	১০০'০	

বে-সরকারী উৎপাদন ক্ষেত্রে আনুমানিক ব্যয় ২,৪০০ কোটি টাকা হইবে এবং এই ব্যয় নিম্নলিখিতভাবে ধার্য হইয়াছিল :—

বড় শিল্প ও খনিজ দ্রব্য উৎপাদন—	৫৭৫ কোটি
কৃষি ও কুটির শিল্প—	৩০০ ,,
চা, কফি প্রভৃতি শিল্প, বিদ্যুৎ ও রেলওয়ে ছাড়া অন্যান্য পরিবহন শিল্প—	১২৫ ,,
গৃহ নির্মাণ	১০০০ ,,
অন্যান্য	৪০০ ,,
	২,৪০০ কোটি

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ৪৮০০ কোটি টাকা ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে আরও ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয় স্থির হইয়াছে।

রাজস্ব সংস্থান—Financing of the Plan

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে সংগৃহীত হইবে :

১।	রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত	৮০০ কোটি টাকা
২।	আভ্যন্তরীণ ঋণ	১২০০
৩।	বিদেশী ঋণ	৮০০
৪।	বাজেটের অন্যান্য উৎস, যথা, রেল-বিভাগ হইতে প্রাপ্ত আয়, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ও অন্যান্য আমানত	৪০০
৫।	ঘাটতির ব্যয়	১২০০
৬।	অবশিষ্ট ঘাটতির পূরণের জন্য দেশের মধ্যে করবৃদ্ধি, অতিরিক্ত ঋণগ্রহণ ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন	৪০০
		৪৮০০ কোটি টাকা

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট ব্যয় পরিমাণের ২৫৫৯ কোটি কেন্দ্রীয় সরকার ও ২২৪১ কোটি টাকা যথাক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি যুক্তভাবে বহন করিবে।

পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন যে, এই পরিকল্পনার সাহায্যে ১৯৬০-৬১ সালে জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। জনপ্রতি আয়ও বৃদ্ধি পাইয়া ঐ সময়ে ৩৩০্ টাকা হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারতে একটি সুস্পষ্ট বিরুদ্ধ মতের সৃষ্টি হইয়াছে। বিরুদ্ধ মতাবলম্বিগণ বলেন যে, এই পরিকল্পনার জন্য যে, পরিমাণ ব্যয় ধার্য হইয়াছে তাহা ভারতের সাধ্যাতীত। এই ব্যয় সংকুলান করিবার উদ্দেশ্যে সরকার ইতি-মধ্যেই করভার বহুপরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মূল্যস্তরও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি হেতু বেকার সমস্যা উৎকটরূপে দেখা দিয়াছে। উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য অনেকে বলেন যে, হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছাঁটাই করা হউক অথবা পরিকল্পনাকাল পাঁচ বৎসর হইতে আরও দু'তিন বৎসর বৃদ্ধি করা হউক।

এ কথা সত্য যে, পরিকল্পনার ফলে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। কিন্তু জীবনযাত্রার মান উচ্চ করিতে হইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। আর জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিবার প্রধান উপায় হইল দ্রুতগতিতে শিল্পোন্নয়ন। এজন্য দেশের লোকের ত্যাগ স্বীকার করিতে

হইবে। ক্ষুদ্র পরিকল্পনার সাহায্যে দ্রুতহারে বর্দ্ধিত জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান দ্রুত বৃদ্ধি করা কতটা সম্ভব তাহা বিচার-সাপেক্ষ।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনামূলক বিচার—Comparative Study of the First and Second Five Year Plans

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দুইটির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু দুইটি পরিকল্পনার নীতি ও কার্যসূচী বিশ্লেষণ করিলে ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। যদিও প্রথম পরিকল্পনাটিকে কাযকরী করিয়াই দ্বিতীয় পরিকল্পনাটির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় তথাপি বলিতে হইবে প্রথম পরিকল্পনায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কোন সুদূর-প্রসারী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-জনিত ক্ষয়, ক্ষতিপূরণ ও দেশ বিভাগের ফলে যে-সমস্ত সমস্যা উপস্থিত হয় সেগুলির সমাধান করাই ছিল প্রথম পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণের সময় দেশে খাদ্যাভাব ছিল। কৃষিজাত কাঁচামাল, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি শিল্পোন্নয়নের অপরিহার্য উপাদানগুলির অভাব ছিল। এইজন্য প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প অপেক্ষা কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রথম পরিকল্পনার সাহায্যে ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি ও বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়। বিদ্যুৎশক্তি ও পাট, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতি নানাজাতীয় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া শিল্পের বিস্তার করা সম্ভব হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। শিল্পগুলির মধ্যে আবার মূলশিল্পগুলির প্রসারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ফলে, ভোগ্যবস্তু-উৎপাদন শিল্পগুলির উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনায় মূলশিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য কোন ব্যবস্থা হয় নাই, শুধু ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী উৎপাদন-ক্ষেত্র (Public Sector) সীমাবদ্ধ ছিল। দুই একটি বিচ্ছিন্ন সরকারী প্রচেষ্টা ব্যতীত ব্যাপকভাবে শিল্পের প্রসারের জন্য সরকার কোন উদ্যোগ করেন নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী

উদ্যোগ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। শিল্পোন্নয়ন-ক্ষেত্রে বড় ও মাঝারি ধরণের শিল্পোন্নয়ন ব্যতীতও ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের প্রসারের জন্য মোট দুইশত কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অধিক পরিমাণ ব্যয় ধার্য হইয়াছে। রেলপথের উন্নতিসাধন, বন্দর-উন্নয়ন ও নূতন জাতীয় সড়ক নির্মাণ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ বহুগুণ সুদূর-বিস্তারী হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই আয় ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধরা যায়।

বেকার সমস্যার সমাধান ও সমাজসেবার কাযেও দ্বিতীয় পরিকল্পনা অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণের ফলে পাঁচ বৎসরে প্রায় ১০ মিলিয়ন লোকের কম সংস্থান হইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় প্রধানতঃ কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকার্য-সম্পর্কিত অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্রেও (মৎস্য-চাষ, দুগ্ধের জন্য গো মহিষাদি পালন, শাক-সব্জি, ফলমূল প্রভৃতির উৎপাদনে) গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের কোন কথা পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা গঠন করা। এই সমাজব্যবস্থার মূলনীতি হইল ব্যক্তিগত লাভ অপেক্ষা সমষ্টিগত লাভের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যদি সফল হয়, তাহা হইলে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজকে পুনর্গঠন করিয়া আয়-বৈষম্য দূর করা সম্ভব হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি—Progress of the Second Plan

১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হয়। এই পরিকল্পনার সাহায্যে ১৯৫৬-৫৭ সালে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ সেচ-ব্যবস্থার

সাহায্যে অতিরিক্ত ৩১ লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট ও যন্ত্রবিশেষজ্ঞের অভাব না হইলে সেচব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন ক্ষেত্রে আরও উন্নতি হইত। এই সময়ে অন্ততঃ ২৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু কার্যতঃ ১৪ লক্ষ টন মাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাইলেও তৈলবীজ, কার্পাস, পাট প্রভৃতি পণ্যশস্যের উৎপাদন পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়া, জাপানী পদ্ধতিতে বহু জমিতে ধান চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ সালে খাদ্যশস্য ও পাটের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় কমিয়াছে। ধানের উৎপাদনও ৩৫ লক্ষ টন কম। রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত ও প্রশস্ত করিবার কার্যও সন্তোষজনক-ভাবে চলিতেছে। এই সময়ে জাহাজের টনেজ বৃদ্ধি ও বে-সামরিক বিমান বিভাগেরও উন্নতি হইয়াছে। নূতন রেল লাইন স্থাপন ও পুরাতন লাইনের সংস্কার সাধনের কাজও দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে শিল্পের ক্ষেত্রেও কিছুটা উন্নতি দেখা যায়। সিমেণ্ট ও চিনির উৎপাদন পূর্ব বৎসর হইতে এই সময়ে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টন বৃদ্ধি পায়। সিমেণ্ট বর্তমানে অপেক্ষাকৃত সহজপ্রাপ্য হওয়ার ফলে নানাবিধ নির্মাণকার্য সম্ভব হইয়াছে। সাইকেল, মোটর ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক মোটর, ও বিদ্যুৎচালিত পাম্পের উৎপাদন শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ইস্পাতের উৎপাদন ৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের লক্ষ্যে তুলনায় কম হইলেও কয়লার উৎপাদনও প্রায় ১২ লক্ষ টন বৃদ্ধি পায়। সূতী কাপড়ের ও চায়ের উৎপাদনক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন বৃদ্ধি হয় নাই। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ছোট ছোট শিল্পের ক্ষেত্রেও কিছু উন্নতি দেখা যায়। তাঁত বস্ত্রের উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৫৬ সালে ১৫৪১ মিলিয়ন গজ—১৯৫৭ সালে ইহা ১৬০০ মিলিয়ন গজে বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রসারের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন গঠিত হওয়ার ফলে এই প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি সাহায্য করিয়াছে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও প্রথম দুই বৎসরে ২০ লক্ষ অতিরিক্ত লোকের চাকুরির ব্যবস্থা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া, দেশে কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার পর হইতে জাতীয় আয় পরিমাণ ১০৪০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১,০১০ কোটি টাকা হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা আরম্ভ হইবার প্রথম দিকে জাতীয় আয় যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ১৯৫৭-৫৮ সালে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির গতিবেগ হ্রাস পাওয়ার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারও পূর্বাপেক্ষা কম হইয়াছে।

১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে মূল্যস্তর বাড়িতে থাকে। ঐ সময় হইতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত মূল্যস্তর প্রায় ২০% বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার আরম্ভ হইতেই ভারতের বৈদেশিক ব্যালেন্সের ঘাট্‌তি বাড়িয়াছে। এই ঘাট্‌তি বাড়িবার প্রধান কারণ হইল বিদেশ হইতে ভারতের আমদানি বৃদ্ধি ও বিদেশে ভারতের রপ্তানি হ্রাস পাওয়া। সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের জন্য বিদেশ হইতে অধিক পরিমাণ ক্রয় ও খাদ্য আমদানীর জন্য ভারতের আমদানি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপর দিকে দেশের মধ্যে ভোগের পবিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, ভাবতের রপ্তানি দ্রব্যে আমেরিকার চাহিদা হ্রাস পাওয়া ও সুয়েজ খাল সমস্যার জন্য বিদেশে ভারতীয় রপ্তানি পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংশোধন—Revision of the Second Plan

১৯৫৮ সাল হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের পথে অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে। অসুবিধার প্রধান কারণ হইল যে, উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। মূল্যবৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনার ব্যয়ভারও বাড়িয়াছে, কারণ মূল্যবৃদ্ধির ফলে পূর্ব-পরিকল্পিত হিসাবে আর পরিকল্পনার কাজ নিষ্পন্ন করা যায় না। তিন বৎসর পূর্বে যে কাজের জন্য ২ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হইয়াছিল বর্তমানে সেই কার্য সম্পাদন করিতে আড়াই কোটি টাকা প্রয়োজন। অথচ কর বৃদ্ধি, ঋণ গ্রহণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রভৃতি সম্ভাব্য উৎসগুলি হইতেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া পরিকল্পনা কমিশন ভারত সরকার ও জাতীয় উন্নয়ন সমিতির সহিত (National Development Council) পরামর্শ করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনাটির কিছু ছাঁটাই করিয়াছেন।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল। পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যগুলিকে, যথা, কৃষিজ উৎপাদন, লৌহ-ইস্পাত শিল্প, রেলপথ, প্রধান বন্দর প্রভৃতি উন্নয়নের কার্যসূচী ও যে সমস্ত কার্যসূচী সফল করা নিতান্ত প্রয়োজন বা যে কার্যসূচীগুলি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল, সেই-গুলিকে প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। এই প্রধান লক্ষ্যগুলি সফল করিবার জন্য ৪৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করিতেই হইবে। আর যে সমস্ত কার্যসূচী অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বসম্পন্ন, সেগুলি সফল করিবার জন্য অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা হইলে ধার্য ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে।

পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা সফল করিবার জন্য কোন মতেই ৪২৬০ কোটি টাকার বেশী পাওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং ছাঁটাই করিয়াও প্রায় (৪৫০০—৪২৬০) = ২৪০ কোটি টাকা ঘাটতি দেখা যায়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য সংশোধিত অর্থ সংগ্রহের উপায় স্থির করা হইয়াছে। সংশোধিত পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতে কত ব্যয়বরাদ্দ স্থির হইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

	কোটি টাকা হিসাব ব্যয়ের পরিমাণ		মোট ব্যয়ের শতাংশ
কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন	— ৫১০	—	১১.৩
সেচ ও বিদ্যুৎ	— ৮২০	—	১৮.২
শিল্প ও খনি	— ৯৫০	—	২১.১
পরিবহন ও যোগাযোগ	—১৩৪০	—	২৯.৮
সমাজসেবা	— ৮১০	—	১৮.০
বিবিধ	— ৭০	—	১.৬
	৪,৫০০		১০০

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—Third Five Year Plan

১৯৬১ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ শেষ হইলে তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিতে গিয়া যে অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ও যে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার

ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনাটির কার্যসূচী রচিত হইলে তৃতীয় পরিকল্পনায় কাজ সহজসাধ্য হইবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনাকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

১। ভারতে অতি দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই বৃদ্ধির জন্য খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উপর গুরুত্ব হ্রাস করিয়া শিল্পের উপর যে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল, তৃতীয় পরিকল্পনায় তাহার পরিবর্তন করিয়া খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনের উপর জোর দিতে হইবে।

২। বর্তমানে ভারতে মৃত্যুর হার কমিলেও জন্মের হার আদৌ হ্রাস পায় নাই। ফলে জনসংখ্যা অত্যধিক হারে বাড়িতেছে। জাতীয় আয় কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও অত্যধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু আয় আনুপাতিক হারে বাড়িতেছে না। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক।

৩। তৃতীয় পরিকল্পনায় শুধু লৌহ-ইস্পাত দ্বারা নির্মিত বড় কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রস্তুত করা ব্যতীতও এমন সব ছোট খাট যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার উপর জোর দিতে হইবে যেগুলির দ্বারা দেশের ছোট ছোট শিল্প-ব্যবসায়-গুলি সহজে ও অল্প সময়ে ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করিতে পারে।

৪। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাহায্যে বেকার সমস্যার বিশেষ কোন স্থায়ী সমাধান হয় নাই। তাই তৃতীয় পরিকল্পনাটি এরূপভাবে রূপায়িত করা প্রয়োজন যাহাতে দ্রুত হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার স্থায়ী কর্মসংস্থান হয়। এই উদ্দেশ্যে বেকার সমস্যা সমাধানের নীতির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

৫। এ যাবৎ পরিকল্পনা সমিতি জনসাধারণের অভিমত না লইয়া, তাহাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, অভিরুচি ও সামর্থ্যের কথা বিবেচনা না করিয়া দিল্লীতে বসিয়া পরিকল্পনা রচনা করিয়া তাহা কার্যকরী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরিকল্পনার সাফল্য দেশের লোকের কাজ করিবার ইচ্ছা ও কাজ করিবার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া পরিকল্পনার কাজ সফল হইতে পারে না। কিন্তু সরকার এ সহযোগিতা চান নাই। এইজন্য তৃতীয় পরি-কল্পনাটিকে সফল করিতে হইলে সরকারের পক্ষে গণসংযোগ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। পরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজে যদি জনসাধারণের মতামত লওয়া হয় তাহা

হইলে পরিকল্পনার কাজ সফল করিবার জন্য তাহাদের উৎসাহ, সক্রিয়তা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পাইবে।

সরকার কর্তৃক বিগত ৫ই জুলাই, ১৯৬০ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এক খসড়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এই খসড়ায় আনুমানিক ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনার আয়-ব্যয় ও কার্যসূচীর এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হইয়াছিল। বিগত ৭ই আগষ্ট, ১৯৬১ সংসদে ১১ হাজার ৬ শত কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব সমন্বিত যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হয় তাহা হইতে এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যগুলি জানিতে পারা যায়।

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—Objectives of the Third Plan

উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে কিছু পরিমাণ মূলগত ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ন্যায় তৃতীয় পরিকল্পনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল (১) প্রতি বৎসর শতকরা ৫ ভাগের বেশী জাতীয় আয় বৃদ্ধি। এই উদ্দেশ্যে অর্থলগ্নীর পরিকল্পনা এরূপভাবে করা হইয়াছে যাহাতে পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে এই জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বজায় থাকে। (২) খাদ্যশস্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতালাভ এবং শিল্প ও রপ্তানীর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধি। (৩) ইস্পাত, রাসায়নিক শিল্প, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ন্যায় মূল শিল্পগুলির সম্প্রসারণ এবং দশ বৎসর বা ঐরূপ সময়ের মধ্যে দেশের নিজস্ব সম্পদ হইতে যাহাতে অধিকতর শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজন মিটান যায় সেজন্য যন্ত্রপাতি নির্মাণে সামর্থ্য বৃদ্ধি। (৪) দেশের জনবলকে যথাসম্ভব কার্যে নিয়োগ এবং কর্মসংস্থান ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ। (৫) ক্রমশঃ অধিকতর সুযোগদানের ব্যবস্থা এবং আয় ও সম্পদের ক্ষেত্রে অসাম্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক সাম্যের অপেক্ষাকৃত সমবণ্টন।

উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে তৃতীয় পরিকল্পনাটিকে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূর্ণ পরিণতি বলা যায়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা-লাভ করিয়া দেশকে বেকার সমস্যা মুক্ত করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাচে সমাজব্যবস্থা পুনর্গঠন করাই হইল তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

পরিকল্পনা সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত হার অপেক্ষা অধিকহারে অতিক্রান্ত

গতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনার নিম্নলিখিত দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য স্থির হইয়াছে।

১। প্রথমতঃ, আগামী ১৫ বৎসরে (১৯৬০-৬১ হইতে ১৯৭৫-৭৬) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গড়পড়তা বার্ষিক শতকরা ৬ জনে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে যাহাতে এই ১৫ বৎসরে জাতীয় আয় পরিমাণ দ্বিগুণিত হইয়া ১৪,৫০০ কোটি হইতে ৩৪,০০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায় এবং মাথা পিছু আয় এই সময়ে ৩৩০ টাকা হইতে ৫৩০ টাকায় বৃদ্ধি পায়।

২। দ্বিতীয়তঃ, এই ১৫ বৎসরে কৃষিক্ষেত্রের বাহিরে অন্যান্য কাজে এত অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে নূতন ৪'৬ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হইয়া কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা শতকরা ৭০ হইতে ৬০ জনে হ্রাস পায়।

৩। তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত চতুর্দশ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার জন্য সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা।

ইহা ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি রুদ্ধ করা। উৎপাদনে জাতীয় আয়ের বিনিয়োগ পরিমাণের ক্রম-বৃদ্ধি ও বিদেশী সাহায্য গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস করা তৃতীয় পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যের প্রধান লক্ষ্য।

তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ ও বিনিয়োগ—Outlay and investment of the Third Plan

তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়ায় সরকারী ও বে-সরকারীক্ষেত্রে (Puplic and Private Sector) মোট বিনিয়োগ পরিমাণ হইবে ১১,৬০০ কোটি টাকা। সরকারী ক্ষেত্রে ৭,৫০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। আর বে-সরকারী ক্ষেত্রে ৪,১০০ কোটি টাকা নিয়োগ হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। সরকারী ক্ষেত্রের মোট ৭,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে লগ্নীখাতে ব্যয় হইবে ৬৩০০ কোটি টাকা এবং সমাজ সেবা, অন্যান্য উন্নয়নমূলক পৌনঃপুনিক ব্যয় বাবদ চলতি খাতে ব্যয় হইবে ১২০০ কোটি টাকা।

সরকারী ক্ষেত্রে কোন্ খাতে কত ব্যয় হইবে নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল :

ব্যয় বরাদ্দ

	ক্ষেত্র	কোটি টাকা	মোট ব্যয়ের শতাংশ
১।	কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	১০৬৮	১৪
২।	বৃহৎ ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থা	৬৫০	৯·০
৩।	বিদ্যুৎ উৎপাদন	১০১২	১৩
৪।	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	২৬৪	৪
৫।	শিল্প ও খনি	১,৫২০	২০
৬।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১,৪৮৬	২০
৭।	সমাজ-সেবা ও বিবিধ	১,৩০০	১৭
৮।	উদ্ভাবনী কার্যকলাপ	২০০	৩
	মোট	৭,৫০০	১০০·০

বে-সরকারী ক্ষেত্রে যে ৪,১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইবে তাহা বিভিন্ন খাতে নিম্নলিখিতভাবে বরাদ্দ করা হইয়াছে ঃ

	ক্ষেত্র	কোটি টাকা
১।	কৃষি ও জলসেচ	৮৫০
২।	বিদ্যুৎ	৫০
৩।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৫০
৪।	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৩২৫
৫।	বড, মাঝারি শিল্প ও খনি	১,১০০
৬।	গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য নির্মাণকায	১,১২৫
৭।	অস্থাবর সম্পত্তি	৬০০

মোট ৪১০০+২০০=৪৩০০

সরকারী উদ্যম খাত হইতে গৃহীত দুই শত কোটি টাকা ইহাতে ধরা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য—Targets of the Third Five Year Plan

পরিকল্পনার বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, উপরি-উক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের

ফলে পাঁচ বৎসর পর (১৯৬৫-৬৬ সালে) বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিম্নলিখিতরূপ উন্নয়ন আশা করা যায়।

১। খাদ্যশস্য উৎপাদন—১০ কোটি টন, ২। ইস্পাত পিণ্ড—৯২ লক্ষ টন, ৩। পেট্রোলজাত দ্রব্য—৯৯ লক্ষ টন, ৪। মিলজাত কাপড়—৫৮০ কোটি গজ, ৫। হস্ত চালিত তাঁত ও বিদ্যুৎ চালিত তাঁত বস্ত্র ও খদ্দর বস্ত্র ৩৫০ কোটি গজ, ৬। আকরিক লৌহ—৩ কোটি টন, ৭। কয়লা—৯ কোটি ২০ লক্ষ টন, ৮। বিদ্যুৎ—১ কোটি ২৭ লক্ষ কিলোওয়াট, ৯। জাহাজ নির্মাণ—১০ লক্ষ ৯০ হাজার টন দ্রব্য বহনোপযোগী জাহাজ নির্মিত হইবে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যসূচী সমগ্র ভারতের গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সমবায় আন্দোলন সম্প্রসারণ করিয়া কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য করা হইবে। সমবায় সাহায্যপুষ্ট কৃষি অধিক উৎপাদনে সমর্থ হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিবহন ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। দুর্গাপুর, রাউরকেল্লা ও ভিলাই-এর কারখানাগুলির সম্প্রসারণ করিয়া ইহাদের মিলিত উৎপাদন পরিমাণ ৫৫ লক্ষ টন বৃদ্ধি করা হইবে। ইহা ছাড়া বোকারোর চতুর্থ ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইবে। শিল্পের অন্যান্য উৎপাদনক্ষেত্রেও ১৩০ লক্ষ টন সিমেণ্ট, ৭৫,০০০ হাজার টন এ্যালুমিনিয়ম, ৩০ লক্ষ টন চিনি, ২০ লক্ষ সাইকেল, ৪৫ লক্ষ সেলাইয়ের কল, ১ লক্ষ মোটর গাড়ী প্রস্তুত করা হইল লক্ষ্য। **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের** উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। তাঁতশিল্প হইতে ৩৫০ কোটি গজ কাপড় তৈয়ারী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। **পরিবহন ও যোগাযোগ** ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ১,২০০ মাইল নূতন রেলপথ নির্মিত হইবে। রেলপরিবহন ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ টন মাল বহন করিবার ক্ষমতা অর্জন করিবে। ইহা ছাড়া, ২০ হাজার মাইল দৈর্ঘ্য বড় সড়ক নির্মিত হইবে।

নিম্নে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণ দেওয়া হইল :

বিষয়	দ্বিতীয় পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি (১৯৬০-৬১) কোটি টাকা	তৃতীয় পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি (১৯৬৫-৬৬) কোটি টাকা	১৯৬০-৬১ হইতে ১৯৬৫-৬৬ তে শতকরা বৃ
জাতীয় আয়	১৪,৫০০	১৯,০০০	৩৩০
মাথাপিছু আয়	৩৩০৲ টাকা	৩৮৫৲ টাকা	২৬
খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ টন)	৭৯৩	১০,০০	৩৩৫
সেচ সাহায্য প্রাপ্ত জমি (লক্ষ একব)	৭০০	৯০০	২৯
সমবায় কৃষি ঋণদান পবিমাণ (কোটি টাকা)	২০০	৫৩০	১৬৫
ইস্পাত পিণ্ড (লক্ষ টন)	৩৫	৯২	৬৩
মোসিন টুল (কোটি টাকা)	৫ ৫	৩০·০	৭৪৫
লৌহ আকরিক (লক্ষ টন)	১,০৭	৩,০০	১৮০
কয়লা („)	৫,৪৬	৯,৭০	৭৬
মিলজাত কাপড (লক্ষ গজ)	৫১২,৭০	৫৮০,০০	১৩
হস্ত ও যন্ত্র চালিত তাঁত, খদ্দর (লক্ষ গজ)	২৩৪,৯০	৩৫০,০০	৪৯
রেলওয়ে মালবহন পরিমাণ (লক্ষ টন)	১৫,৪০	২৪,৫০	৫৯
সাধারণ শিক্ষা—স্কুলের ছাত্রসংখ্যা (লক্ষ)	৪,৩৫	৬,৩৯	৪৭
হাসপাতাল-শয্যা সংখ্যা (হাজার)	১,৮৬	২,৪০	২৯
দৈনিক মাথা পিছু খাদ্য পরিমাণ (কেলরি)	২,১০০	২,৩০০	১০

তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থ সংস্থান—Financing of the Third Plan

নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে এই বৃহৎ ব্যয়-বরাদ্দের অর্থ সংগৃহীত হইবে :

	কোটি টাকা
১। চল্‌তি রাজস্বের উদ্বৃত্ত	৫৫০
২। অতিরিক্ত কর হইতে আদায়	১,৭১০
৩। রেলওয়ে হইতে আয়	১০০
৪। স্বল্প সঞ্চয়	৬০০
৫। আভ্যন্তরীণ ঋণ	৮০০
৬। সরকারী উদ্যোগের উদ্বৃত্ত অর্থ	৪৫০
৭। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ও অন্যান্য তহবিল	২৬৫
৮। বৈদেশিক সাহায্য	২,২০০
৯। পরিকল্পনা বহির্ভূত মূলধন	১৭০
১০। ঘাটতি ব্যয়	৫৫০
১১। ইস্পাতসমীকরণ তহবিল	১০৫
	৭,৫০০

উপরে যে সমস্ত হিসাবের কথা বলা হইল কার্যকালে তাহার কোন কোনটিতে প্রকৃত অর্থ পরিমাণ অনুমিত হিসাব অপেক্ষা কম বেশী হইতে পারে।

সমাজোন্নয়ন কার্য—Community Development Projects

জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যের (National Extension Service) সাহায্যেই গ্রামোন্নয়ন কার্য পরিচালিত হইবে। সমাজোন্নয়ন কাযের প্রধান উদ্দেশ্য হইল গ্রামগুলির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি জনহিতকর সকল ব্যবস্থা একই সঙ্গে আরম্ভ করিবার সংকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নলিখিতভাবে গ্রামোন্নয়ন কার্য পরিচালিত হইবে।

প্রায় ৩০০ গ্রাম লইয়া এক একটি গ্রামোন্নয়ন অঞ্চল স্থাপিত হইবে। প্রত্যেক অঞ্চলে ২ লক্ষ লোক ও মোট দেড় লক্ষ একর আবাদী জমি থাকিবে। এইরূপ একটি উন্নয়নমূলক অঞ্চলকে আবার ১০০ গ্রাম ও ৬৫,০০০ লোক লইয়া গঠিত তিনটি উন্নয়নমূলক কেন্দ্রে ভাগ করা হইবে। এই উন্নয়নমূলক কেন্দ্রগুলিকে

আবার ১৫টি হইতে ২৫টি গ্রাম লইয়া গঠিত কয়েকটি উপকেন্দ্রে ভাগ করা হইবে। এই উপকেন্দ্রগুলিকে 'মণ্ডি' নাম দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং গ্রামোন্নয়ন কার্যের প্রাথমিক স্তর হইল মণ্ডি। কয়েকটি মণ্ডি লইয়া একটি উন্নয়নকেন্দ্র গঠিত হইয়াছে এবং কয়েকটি উন্নয়নকেন্দ্র লইয়া এক একটি উন্নয়নমূলক অঞ্চল স্থাপিত হইয়াছে। আজ পর্যন্ত এইরূপ প্রায় ৬০টি উন্নয়নমূলক অঞ্চল গঠিত হইয়াছে ও অধিকাংশ অঞ্চলের কার্য সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে।

গ্রামোন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক উন্নয়ন-বিভাগে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১। **গ্রাম**—প্রত্যেক গ্রামে পানীয় জলের জন্য দুইটি পুকুর, নলকূপ বা ইন্দারা খনন করা হইবে। যাতায়াতের জন্য পথঘাট নির্মিত হইবে ও প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।

২। **মণ্ডি**—প্রত্যেক মণ্ডিতে ডাক ও তার-অফিস খোলা হইবে। একটি করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকিবে। ইহা ছাড়া চিকিৎসালয়, বাজার, ফসল রাখিবার গুদাম, কুটিরশিল্প কেন্দ্র প্রভৃতি থাকিবে।

৩। **উন্নয়নমূলক কেন্দ্র**—প্রত্যেক কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিবে। ইহা ছাড়া, গবাদি পশুর জন্য হাসপাতাল ও একটি কৃষিবিদ্যালয় থাকিবে।

৪। **উন্নয়নমূলক অঞ্চল**—প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করিয়া ছোট শহর গঠিত হইবে এবং নাগরিক জীবনের সব রকম সুবিধা সেখানে পাওয়া যাইবে। আদালত, স্কুল-কলেজ, কলকব্জা-মেরামতি কারখানা ও অন্য যাবতীয় ব্যবস্থা থাকিবে। গ্রামীণ জীবনেব সমগ্র অভাব-অভিযোগই এই উন্নয়ন এলাকাস্থিত শহরে মিটাইবার ব্যবস্থা থাকিবে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল যে, গ্রামবাসিগণ যাহাতে তাহাদের সমবেত প্রচেষ্টার সাহায্যে নিজেদের অভাব-অভিযোগ দূর করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও ব্যাধি প্রভৃতি সমস্যাগুলি দূর হইবে। যে সমস্ত জায়গায় সমাজোন্নয়নমূলক কায আরম্ভ হইয়াছে, সে সমস্ত স্থানের অধিবাসিগণের অবস্থার ইতিমধ্যেই অনেক উন্নতি হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ যদি এই সমাজোন্নয়ন কার্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যথাযথভাবে কাজ করেন তাহা হইলে আমাদের হৃতশ্রী

গ্রামগুলির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। দেশের সরকারও এজন্য মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই বাবদ মোট ৯০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে আরও অধিক পরিমাণ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলায় প্রায় ১০টি উন্নয়নমূলক কেন্দ্র গঠিত হইয়াছে। গ্রামবাসীদের উদ্যম ও সমযোগিতার উপর এই বিরাট পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

সমাজ উন্নয়ন খাতে তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ১,২৫০ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনা ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী—Third Five Year Plan and Programmes of Economic Development

১। কৃষি-উন্নয়ন—Development of Agriculture

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি অপেক্ষা শিল্প-উন্নয়নের উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি হইতে এই অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে যে, ভারতের ন্যায় গ্রাম-প্রধান দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি শেষ পর্যন্ত কৃষির উন্নতির উপর নির্ভর করে। এই কারণে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুনরায় কৃষির উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বী হওয়া এবং শিল্প ও রপ্তানীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করিবার জন্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ ও সমাজ-উন্নয়ন উদ্দেশ্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ১৭১৮ কোটি টাকা। এই ব্যয় পরিমাণ তৃতীয় পরিকল্পনার সরকারী ব্যয়ের ২৩ শতাংশ। এই অতিরিক্ত ব্যয়ের দ্বারা কৃষি উৎপাদনের হার প্রায় দ্বিগুণ করা হইবে। ইহাতে আগামী পাঁচ বৎসরে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ৫০ শতাংশ, অন্যান্য ফসলের উৎপাদন ৩১ শতাংশ ও সকল ফসলের মোট উৎপাদন ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ ৭ কোটি একর হইতে ৯ কোটি একরে বৃদ্ধি পাইবে। জমিতে সারের ব্যবহারও ২১ গুণ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। উন্নত ধরণের কৃষি-যন্ত্রপাতি

ব্যবহার, প্রগাঢ় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন (Intensive Cultivation), গ্রাম পঞ্চায়েৎ ও সেবা-ভিত্তিক সমবায় সমিতিগুলির প্রসার সাহায্যেও কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা হইয়াছে। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসূচী ১৯৬৩ সালের শেষে ভারতের সমগ্র পল্লী-অঞ্চলে সম্প্রসারিত হইবে। ইহার ফলে সমাজোন্নয়ন ব্লকের সংখ্যা ৩,১১২ হইতে ৫,২১৭ বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ছাড়া, বে-সরকারী ক্ষেত্রে কৃষি ও আনুষঙ্গিক কার্যে ৮৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী রূপায়িত হইলে জন প্রতি খাদ্যের পরিমাণ ১৬ আউন্স হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৭·৫ আউন্স হইবে।

২। শিল্প-উন্নয়ন—Development of Industry

জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হইল তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য শক্তি উৎপাদন, পরিবহন ব্যবস্থার প্রসার, খনিজ উৎপাদনে স্বাবলম্বী হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

শিল্প-উন্নয়নেব জন্য মোট ব্যয় হইবে ২,৫৭০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ পরিমাণ হইবে ১,৫২০ কোটি ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে ১,০৫০ কোটি টাকা। সরকারী ক্ষেত্রে লৌহ-ইস্পাত, ভারি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি খনিজ তৈল পরিশোধন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি মূল ও ভারি শিল্পগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, প্রয়োজনীয় ঔষধ, কাগজ, কাপড়, চিনি, সিমেণ্ট প্রভৃতি দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণ সাহায্যে মিটাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই পরিকল্পনা সফল হইলে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

৩। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন—Development of Small and Cottage Industries

তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির উন্নতির জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে: এই শিল্পগুলির উন্নতির জন্য সরকারী ক্ষেত্রে ২৬৪ কোটি ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে প্রায় ২৭৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির উন্নতির জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা হইয়াছে: কারিগরি ও শিল্প-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত শিক্ষাদানের প্রসার, যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য কিস্তিবন্দি-ক্রয়ের ব্যবস্থা, গ্রামাঞ্চল ও ছোট ছোট শহরে শিল্পগুলির প্রসার, সুবিধাজনক সর্তে এবং যথাশীঘ্র স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান, ছোট ও বড় ৩০০টি শিল্প-উপনিবেশ (Industrial Estates) স্থাপন করিবার সংকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনানুযায়ী যদি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির উন্নতি হয় তাহা হইলে ৯ লক্ষ লোকের পূর্ণকর্মসংস্থান ও ৮০ লক্ষ লোকের আংশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে।

৪। সমবায় উন্নয়ন—Development of Co-operation

তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায় উন্নয়নের ব্যবস্থা ব্যাপকতর করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসের জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায় সম্পর্কিত কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রাথমিক গ্রাম সমিতির সংখ্যা ২·৫ লক্ষ হইবে এবং এই সমিতিগুলির মোট সদস্যসংখ্যা হইবে ৪ কোটি। এই সমিতিগুলি গঠিত হইলে গ্রামবাসীদের শতকরা ৭৪ ভাগ সমিতিগুলি হইতে সাহায্য পাইবে। এই সমিতিগুলি নিম্নলিখিত পরিমাণ ঋণদান করিতে পারিবে: স্বল্পমেয়াদী—৪০০ কোটি টাকা, মধ্যমেয়াদী ১৬০ কোটি টাকা, দীর্ঘমেয়াদী ১১৫ কোটি টাকা।

ইহা ছাড়া ৬০০ শত প্রাথমিক বাজার সমিতি, গ্রামাঞ্চলে ৯,২০০ গুদাম ও বাজার কেন্দ্রে ৯৮০টি গুদাম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে। মধ্য ও দীর্ঘ ও মেয়াদী ঋণদান করিবার উদ্দেশ্যে একটি কৃষি-উন্নয়ন ঋণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গঠনের সংকল্প করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালের সমবায়ের প্রসার—Progress of Co-operation under the Second and the Third Plans

দ্বিতীয় পরিকল্পনান্তে সমবায়ের সাফল্য	তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য
প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা—২.১ লক্ষ	২.৩ লক্ষ
সদস্য সংখ্যা—১.৭ কোটি	৩.৭ কোটি
সমবায়ের আওতায় কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণ—৩৩ শতাংশ	৬০ শতাংশ
সমবায়ের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী ঋণ-পরিমাণ —২০০ কোটি টাকা	৫৩০ কোটি টাকা
দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ-পরিমাণ—৩৫ কোটি টাকা	১৫০ কোটি টাকা

৫। পরিবহন ও যোগাযোগ উন্নয়ন—Development of Transport and Communication

শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তৃতীয় পরিকল্পনার পরিবহন ব্যবস্থার কার্যসূচী রচিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য সরকারী ক্ষেত্রে ১,৪৮৬ কোটি টাকা ও বে-সরকারী খাতে ২৫০ কোটি টাকা ধার্য হইয়াছে। আগামী পাঁচ বৎসরে ১,২০০ মাইল নূতন রেলপথ নির্মিত হইবে এবং প্রায় ১৬০০ মাইল রেলপথে দ্বিতীয় লাইন খোলা হইবে। অতিরিক্ত ১৫ হাজার মাইল দীর্ঘ বাঁধানো রাস্তা নির্মিত হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয়পরিবহন প্রসারের জন্য ২৬ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য করা হইয়াছে। ইহাতে রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহন ক্ষেত্রে গাড়ীর সংখ্যা ৭,৫০০ বৃদ্ধি পাইবে। যাত্রী ও মালবাহী গাড়ীর উৎপাদন ৮২ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ৭.৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সমুদ্র পরিবহন উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিমান পরিবহন উন্নয়নের জন্য ২৫.৫ কোটি টাকা ব্যয় করা স্থির হইয়াছে।

৬। সমাজ-উন্নয়ন কার্যাবলী—Social Service

তৃতীয় পরিকল্পনায় সমাজ-উন্নয়নের জন্য ব্যাপকতর কার্যসূচী গ্রহণ করা

হইয়াছে। সমাজ-উন্নয়ন ও সমবায় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ হইয়াছে। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সমগ্র পল্লীঅঞ্চল সমাজ-উন্নয়নমূলক কার্যসূচীর আওতায় আনা হইবে। ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। প্রত্যেক গ্রামের সুখ-সুবিধা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যালয় স্থাপন ও রেল স্টেশন বা বড় সড়কের সহিত প্রত্যেক গ্রামের সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ এই কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য।

৭। কর্মসংস্থান—Creation of Employment

বেকার সমস্যার সমাধান করা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও ঐ পরিকল্পনায় দেশের বেকার অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। দেশের বেকার সমস্যার সমাধান তৃতীয় পরিকল্পনারও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এই পরিকল্পনায় কৃষিকর্মে ৩৫ লক্ষ লোকের এবং অন্যান্য কর্মে ১ কোটি ৫ লক্ষ লোকের—মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কাযকালে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি ৭০ লক্ষ হইবে বলিয়া আশংকা করা হয়। সুতরাং অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার। এই বেকার সংখ্যার কিয়দংশের কর্মসংস্থানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, ছোট ছোট শহরে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করিয়া ক্ষুদ্র শিল্পগুলির সম্প্রসারণ। দ্বিতীয়তঃ, শস্য বাছাইকরণ শিল্পগুলিকে গ্রামাঞ্চলে স্থাপন। তৃতীয়তঃ, কর্মীদের শিক্ষাদান ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত। চতুর্থতঃ, পরিকল্পনা রূপদান কার্যে যে সমস্ত ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করিয়া মজুর দ্বারা কাজ করান সম্ভব, সে সমস্ত ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির পরিবর্তে মজুর নিয়োগ। পঞ্চমতঃ, বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপদ্ধতি প্রবর্তন দ্বারা গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

৮। জাতীয় আয়, ভোগ ও বিনিয়োগ—National Income, Consumption and Investment

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যের ভিত্তিতে জাতীয় আয়-

পরিমাণ ছিল ১৪,৫০০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনা সফল হইলে জাতীয় আয় পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৯,০০০ কোটি টাকা হইবে। মাথা-পিছু আয়ও ১৯৬০-৬১ সালের হিসাবের তুলনায় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে ৩৮৫ টাকায় দাঁড়াইবে। মাথা-পিছু ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমান সঞ্চয়ের হার হইল ৮·৫ ভাগ, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সঞ্চয়ের হার ১১·৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। বিনিয়োগ পরিমাণও বর্তমানের ১১ শতাংশ হইতে ১৪ শতাংশে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের ভূমিকা

বর্তমান যুগে পুলিশি রাষ্ট্রের পরিবর্তে কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তাই রাষ্ট্র আজ মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যতীত রাষ্ট্রের কল্যাণ সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে সক্রিয়ভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া ধরা হয়।

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ

সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করিতে পারে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া এইগুলির উন্নয়নের অন্তরায় দূর করিতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এবং জাতীয় স্বার্থের খাতিরে অনেক শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সরাসরি রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে পারে।

শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ, বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসার ও বিনিময়হার-নির্ধারণ, বেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতি বর্তমানে রাষ্ট্র কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। দেশের কর-ধার্য নীতির মাধ্যমেই সরকার ধনী-দরিদ্রের আয়-বৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা করেন। ইহা ছাড়া, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম করা আধুনিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ভারত সরকার ১৯৫০-৫১ সাল হইতে পর পর তিনটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে ভারতের জাতীয় আয়পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মাথাপিছু আয় বাড়াইয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছেন। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল এবং কৃষি, শিল্প, পরিবহন, সমাজসেবা প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্যে সরকারী খাতে ২ ৬৯ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হইয়াছিল। এই পরিকল্পনার ফলে দেশে খাদ্যাভাব হ্রাস পায় ও লোকের মাথাপিছু আয়ও কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী খাতে মোট ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির তুলনায় শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। জাতীয় আয়পরিমাণ বৃদ্ধি, মূল শিল্পগুলির উন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান ও আয়-বৈষম্য দূর করাই হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যগুলি সার্থক করিবার চেষ্টা চলিয়াছে।

প্রশ্ন ও উত্তর

Write a short note on the economic functions of a modern Government. [H S (Hu), 1962 Comp]

আধুনিক সরকারের অর্থনৈতিক কাযকলাপের উপর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

উঃ—শক্তির আধার পুলিশি রাষ্ট্র বর্তমানে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে রূপায়িত হইয়াছে। সামাজিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে। অর্থনৈতিক জীবনে এই নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের মাত্রা সর্বাধিক অনুভূত হয়। ইহার কারণ হইল যে, মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করিতে হইলে দেশের ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত আবশ্যক। সামগ্রিকভাবে দেশের উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা রাষ্ট্র ব্যতীত কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নহে। এই কারণে সমাজের অর্থনৈতিক কাযকলাপে রাষ্ট্রই আজ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

সরকার ও কৃষি—প্রত্যেক দেশেই কৃষিকার্য ধনোৎপাদনের একটি প্রধান উপায়। কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এইজন্য রাষ্ট্র কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। ভূমিস্বত্ব আইন, জমির খণ্ডীকরণ-নিরোধ, খাজনার পরিমাণ-নির্ধারণ, সেচব্যবস্থা, কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়-ব্যবস্থা, কৃষি ঋণদান-ব্যবস্থা সম্পর্কিত নানা বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়া সরকার কৃষির উন্নতির পথের অন্তরায় দূর করে।

সরকার ও শিল্প—শিল্পের ক্ষেত্রেই সরকার সাধারণতঃ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রথমতঃ,

প্রায় সব দেশেই রাষ্ট্র কয়লা, বৈদ্যুতিক শক্তি, লৌহ-ইস্পাত, যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি মূল ও ভারী শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া থাকে। অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী কারবার ও সমবায় সমিতি গঠন করিতে হইলে রাষ্ট্রের অনুমোদন অপরিহার্য। সরকারী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে রাষ্ট্র দেশের আর্থিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করে। বিদেশী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানী-রপ্তানীর পণ্য ও বিনিময় হার রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। উৎপাদন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ দ্বারা রাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মুনাফা-অর্জন নিরোধ করিতে পারে।

সরকার ও শ্রমিক—শ্রমিকের কর্মক্ষমতার উপর দেশের উৎপাদন পরিমাণ নির্ভর করে। এই উদ্দেশ্যে সকল সভ্যদেশের সরকার শ্রমিক কল্যাণের জন্য বিশেষ করিয়া স্ত্রী ও অল্পবয়স্ক শ্রমিকদের শারীরিক ও নৈতিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য নানাবিধ আইন প্রণয়ন করিতেছেন। শ্রমিকগণের কার্যকাল ও মজুরিপরিমাণ নির্ধারণ, অসুস্থ বা বেকার অবস্থায় ভাতা প্রদান, শ্রমিক-মালিক বিরোধ ক্ষেত্রে সন্তোষজনক সমাধান ইত্যাদি নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

সরকার ও বেকার সমস্যা—বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে আধুনিক সরকারগুলি কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, ধন-বণ্টন ব্যবস্থার অসাম্য দূরীকরণ, শ্রমিকের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

সরকার ও আয়-বৈষম্য—আয়-বৈষম্য ও ইহার ফলে ধনী ও দরিদ্রের অসম্ভব পার্থক্য বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান অভিশাপ।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলি একদিকে ধনীর উপর উচ্চহারে নানাবিধ কর স্থাপন ও অন্যদিকে দরিদ্র শ্রেণীর উন্নতিকল্পে বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা, অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন, বৃদ্ধ বয়সে ভাতা দেওয়া প্রভৃতি নানাবিধ সমাজসেবা-মূলক কার্যের দ্বারা আয়-বৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সরকার ও মুদ্রাস্ফীতি—মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, ফলে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি বাধা পায়। মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে সরকার (১) দ্রব্যমূল্য স্থির করিয়া দেয়, (২) দ্রব্যাদির বিক্রয় পরিমাণ বরাদ্দ করে (Rationing), (৩) উচ্চহারে কর ধার্য করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে অর্থপরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

সরকার ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা—দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শুধু রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ যথেষ্ট নহে, এজন্য রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন প্রভৃতি ধনোৎপাদনের বিভিন্ন উপায়গুলি এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে বিক্ষিপ্তভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা এই উপায়গুলির যথাযথ ব্যবহার সম্ভব নহে। এজন্য রাষ্ট্র কর্তৃক এই উপায়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমাজের সর্বাধিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার সাহায্যে এই উপায়গুলির পূর্ণ সু-ব্যবহার প্রয়োজন। এইজন্য সোভিয়েত রাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্র-নির্ধারিত পরিকল্পনার সাহায্যেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে।

2. What do you mean by 'economic planning'? What are its elements?
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝ? ইহার উপাদান কি কি?

উঃ—রাষ্ট্র নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রণপূর্বক জীবনযাত্রার মান,

উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাহাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলা হয়। পরিকল্পনা ব্যতীত কোন দেশেরই উন্নতি হইতে পারে না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও পরিকল্পনার প্রয়োজন। যে ছাত্র ভাল করিয়া পরীক্ষায় পাশ করিতে চায়, তাহার পক্ষেও কোন বিষয় কখন ও কত সময় পড়িবে, কি কি বই পড়িবে ইত্যাদি সমস্ত বিষয় নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী করিতে হয়। প্রয়োজন অনুসারে পরিশ্রম না করিলে ও নিয়মানুবর্তী না হইলে পরীক্ষায় ভাল ফল করা যায় না। একটি দেশের পক্ষেও সেইরূপ চাহিদা ও সামর্থ্যানুযায়ী উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা পূর্বপরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত না হইলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় না। ভারত দরিদ্র দেশ—ইহার জাতীয় আয়পরিমাণ স্বল্প। সুতরাং এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে গেলে পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ইহার কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন প্রভৃতি জাতীয় আয়ের উৎসগুলির সুষ্ঠু ব্যবহার অপরিহার্য। এই জন্যই পরিকল্পনার প্রয়োজন। তবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গঠন করা ও ইহাকে কার্যে রূপদান করা সম্পূর্ণরূপে সরকারের কাজ।

নিম্নলিখিত উপাদানগুলি লইয়া আর্থিক পরিকল্পনা গঠিত হয়:

১। মূল উদ্দেশ্য নির্ণয়—প্রথমতঃ, পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য স্থির করিতে হয়। লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি অথবা যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতিপূরণ, অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

২। অগ্রাধিকার নির্ণয়—দ্বিতীয়তঃ একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত পরিকল্পনার কোনটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হইবে তাহাও প্রথমেই স্থির করা হয়। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষির উপর এই গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং কৃষিখাতে সবচেয়ে বেশী ব্যয় হয়।

৩। লক্ষ্য নির্ণয়—তৃতীয়তঃ, পরিকল্পনার কাজ একটি পূর্ব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করিবার সংকল্প লইয়া আরম্ভ হয়। প্রতি বৎসর পরিকল্পনার কাজ কতদূর অগ্রসর হইলে নির্ধারিত সময়ের শেষে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যস্থলে যাওয়া সম্ভব, তাহা সঠিকভাবে স্থির করা একান্ত প্রয়োজন।

৪। সংগতি নির্ণয়—পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, জনবল, অর্থবল, ও বৈদেশিক সাহায্য প্রভৃতি সহায়ক উপাদানগুলির নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। নতুবা সংগতির অভাবে সুপরিকল্পিত পরিকল্পনাও সাফল্য লাভ করিতে পারে না।

৫। প্রশাসন ব্যবস্থা নির্ণয়—পরিকল্পনার সাফল্য বহুল পরিমাণে পরিকল্পনাকার্যে নিযুক্ত কর্মীবৃন্দের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। এজন্য কর্মদক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ ও স্বাধীনচেতা কর্মীর প্রয়োজন। ভারতে এই উপাদানটির বিশেষ অভাব দেখা যায়।

3 Describe the main features of our Second Five Year Plan In what ways does it differ from our first Five Year Plan ?

দ্বিতীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সহিত ইহার কি কি বিষয়ে পার্থক্য তাহা বুঝাইয়া দাও।

উঃ—প্রথম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য :

ভারত সরকার যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত

বিভাগের ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভগ্নপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় খাদ্যসমস্যা, বেকার সমস্যা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে। এই সমস্ত সমস্যাগুলির সাময়িক সমাধানের উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষে তখন উন্নয়নমূলক কোন দূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। তাই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষির উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিল্পের উন্নতি ও প্রসার, বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও আয়-বৈষম্য দূর করিয়া সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা পুনর্গঠন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সরকারী ক্ষেত্রে ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে ভাগ করা হইলেও সরকারী ক্ষেত্রে এই সময় বিশেষ কোন কাজ হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য :

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ ছিল পরিমিত কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার সমগ্রভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ও বিশেষ করিয়া মূল ও ভারী শিল্পগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান যাহাতে উন্নত হয়, বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও আয়-বৈষম্য দূর হইয়া যাহাতে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাটিকে প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় ব্যাপকতর করা হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার পার্থক্য :

প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা
১। প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল পরিমিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দেশ বিভাগ-জনিত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণই ছিল এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য।	১। দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাপকতর। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন করা হইল এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।
২। কৃষি ও সেচব্যবস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান।	২। শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার বিশেষ করিয়া মূল ও ভারী শিল্পগুলির উপর গুরুত্ব প্রদান।
৩। প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী উৎপাদন ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল।	৩। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যম প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।
৪। প্রথম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল।	৪। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই আয় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধরা হয়।
৫। প্রথম পরিকল্পনায় বেকার সমস্যা সমাধানের কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় নাই।	৫। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণের ফলে পাঁচ বৎসরে প্রায় ১০ মিলিয়ন লোকের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার পার্থক্য

প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা
৬। প্রথম পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা স্থাপনের কোন কথা পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয় নাই।	৬। দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা গঠন করা।
৭। প্রথম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪০০ কোটি টাকা।	৭। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১,২০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

4. Discuss the schemes of development of
   (a) Agriculture, (b) Co-operation, and (c) Industries under the three Plans

   ভারতের তিনটি পরিকল্পনায় (ক) কৃষি, (খ) সমবায় ও (গ) শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উঃ—কৃষির উন্নয়ন—১৯৪৭ সালে ভারতের বৃটিশ শাসকগণ ভারতকে স্বাধীনতা দান করিয়া যখন এ দেশ পরিত্যাগ করিলেন, তখন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যয়গ্রস্ত। ইহা ছাড়া দেশ বিভাগ হওয়ার ফলে পাকিস্তান হইতে ক্রমাগত অসংখ্য উদ্বাস্তু আগমন হেতু ভারতে খাদ্যসমস্যা উৎকটরূপে দেখা দিল। কাঁচা পাট ও তুলার উৎপাদন স্থানগুলি পাকিস্তানভুক্ত হওয়ার ফলে ভারতের পাট-কল, কাপড়ের কল প্রভৃতি প্রধান শিল্পগুলি কাঁচামালের অভাবের সম্মুখীন হইল। কাঁচামালের অভাবে শিল্পগুলির উৎপাদন পরিমাণ হ্রাস পাইবার ফলে বেকার সমস্যা তীব্রতর হইল। সুতরাং খাদ্যসমস্যার সমাধান ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষির উন্নতি বহুল পরিমাণে জলসেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। এই কারণেই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেচব্যবস্থার প্রসার উদ্দেশ্যে বহু অর্থ ব্যয় করা হয় এবং পরবর্তী দুইটি পরিকল্পনায়ও সেচব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সমান দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনা অনেকাংশে কার্যকরী হওয়ার ফলে ভারতের খাদ্যসংকট অনেক পরিমাণ হ্রাস পায়। তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ না করিয়া শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সাল হইতে পুনরায় খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং খাদ্য-সংকট দূর করিয়া খাদ্যে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকে পুনরায় অগ্রাধিকার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কৃষির উন্নতির জন্য এই তিন পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা হইয়াছে, যথা, সেচব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার, জাপানী প্রথায় ধানের চাষ, উৎকৃষ্ট ধরণের বীজ ও সার প্রয়োগ, সমবায় প্রথায় চাষের ব্যবস্থা, পতিত জমির উদ্ধার ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার প্রসার।

সমবায়ের উন্নয়ন—প্রধানতঃ, কৃষক ও কৃষির উন্নতির জন্য ১৯০৪ সালে ভারতে সর্বপ্রথম সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে ক্ষুদ্র কারিগর, কুটিরশিল্প ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকদেরও সমবায়ের আওতায় আনা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশের লোকের অজ্ঞতা,

সমবায়ের মূলনীতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ও অত্যধিক সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে এ দেশে সমবায় আন্দোলন কার্যতঃ বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। কিন্তু সমবায়ের সাহায্য ছাড়া ভারতের কৃষি ও ক্ষুদে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নতি সম্ভব নয়। তাই সমবায়ের সর্বাধিক উপযোগিতা পাইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার গ্রাম্য-ঋণ জরিপ কমিটি (Rural Credit Survey) নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন এবং এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনা অনুসারে রাষ্ট্রকে সকল শ্রেণীর সমবায় সমিতির অংশীদার হইতে হইবে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ধরণের সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে সহযোগিতা সাধন, প্রাথমিক সমিতিগুলির সংস্কার, সমবায় কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও পণ্য রাখিবার জন্য বহুসংখ্যক গুদাম স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুসারে দেশের মধ্যে যাহাতে সমবায় আন্দোলন আরও প্রসার লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বহু সেবা সমবায় সমিতি (Service Co-operatives) স্থাপন করা হইয়াছে। এই সমিতিগুলির সাহায্যে এক সঙ্গে ঋণদান, কৃষি-যন্ত্রপাতি, বীজ ও সার প্রভৃতি সরবরাহ করা হইয়াছে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে কৃষককে তাহার কুটিরশিল্প পরিচালনায় সাহায্য করিতেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায়ও সমবায়ের সম্প্রসারণ সাহায্যে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিল্পের ক্ষেত্রেও সমবায়ের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া শিল্প সমবায় সমিতি (Industrial Co-operatives) গঠন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শিল্পের উন্নয়ন—শিল্পের ও বিশেষ করিয়া মূল ও গুরু শিল্পগুলির উন্নতি ও প্রসার না হইলে কোন দেশই অর্থনৈতিক উন্নতি করিয়া দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিতে পারে না। এইজন্য চাই কাঁচামাল, শক্তি, মূলধন, সংগঠন-নৈপুণ্য ও সরকারী অনুপ্রেরণা ও সাহায্য। ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পের উপর তত্টা গুরুত্ব দেওয়া না হইলেও সরকার এই সময় হইতে শিল্পের উন্নতির জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ও ১৯৫৬ সালে তাহাদের শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। এই নূতন নীতি অনুসারে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, আণবিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, খনিজ তৈল, রেল, এরোপ্লেন, জাহাজনির্মাণ ও বিদ্যুৎউৎপাদন প্রভৃতি ১৭টি শিল্প সরকারের একচেটিয়া উৎপাদনের অধিকারে থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, মেসিনটুল, ঔষধ, সার, রবার প্রভৃতি ১২টি শিল্পের বর্তমানে বে-সরকারী পরিচালনাধীন থাকিলেও সরকার ক্রমশঃ এইগুলিকে সরকারী পরিচালনাধীন করিতে পারিবেন। অবশিষ্ট শিল্পগুলি বে-সরকারী পরিচালনাধীন থাকিবে, তবে এগুলিকে সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা হইবে।

সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুসারে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে এবং এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টা পাশাপাশি চলিবে। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে এই মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Mixed Economy) গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প ও খনির উন্নতির জন্য ১৭৯ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য ছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই ব্যয় ধার্য হয় ৮৯০ কোটি টাকা। রুরকেল্লা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে তিনটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। ইহা ছাড়া, সিন্ধ্রীতে সার কারখানা,

চিত্তরঞ্জনে ইঞ্জিন কারখানা প্রভৃতি সরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় বোকারের চতুর্থ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইবে। ইহা ছাড়া, তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও একটি জাহাজনির্মাণ কারখানা স্থাপন করা হইবে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির উন্নতির জন্যও এই পরিকল্পনাগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এই শিল্পগুলির উন্নতির জন্যও প্রথম পরিকল্পনায় ৩০ কোটি, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শেষ পর্যন্ত ১৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ২৬৪ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হইয়াছে।

5 Give a brief account of the aims and objectives of India's Five Year Plans. H S. (Hu) 1960, Comp 1961 1962 Comp , 1963 Comp.

ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

উঃ—১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল সমাপ্ত হইবার পর তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ শুরু হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ ও দেশবিভাগের ফলে যে খাদ্য সমস্যা, বেকার সমস্যা, ও উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দিয়াছিল সেগুলির সমাধান করাই ছিল প্রথম পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। প্রথম পরিকল্পনায় সরকার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল—ভারতের অব্যবহৃত সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা ও সকলের জন্য ক্রিতকর কর্মসংস্থান দ্বারা জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে আয়ের পার্থক্য দূর করিয়া ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রথমে মোট ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হইয়াছিল। পরে ইহা ২৩৭৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইল চারিটি। এই উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অনেক সুদূরপ্রসারী। উদ্দেশ্যগুলি হইল—১। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য জাতীয় আয় অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা। ২। কয়লা, লৌহ-ইস্পাত, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ভারী ও মূল শিল্পগুলির দ্রুত উন্নতির সাহায্যে শিল্পোন্নয়নের পথ সুগম করা। ৩। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান। পাঁচ বৎসরে অন্ততঃ ১১০ লক্ষ নূতন কাজ সৃষ্টি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৪। আয় ও ধন বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করিয়া সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলিও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কার্যকরী করিবার জন্য সরকারী ক্ষেত্রে ৪,৮০০ কোটি ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ২,৪০০ কোটি টাকা ব্যয় স্থির হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—(১) পাঁচ বৎসরে বাৎসরিক শতকরা ৫ ভাগ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ ব্যবস্থা এরূপভাবে করা হইয়াছে যাহাতে পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বজায় থাকে। ২। খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বী হওয়া এবং শিল্প ও রপ্তানীর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। ৩। ইস্পাত, রাসায়নিক শিল্প,

জ্বালানী, বিদ্যুৎ প্রভৃতি মূল শিল্পগুলির সম্প্রসারণ যাহাতে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে দেশের নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভর করিয়াই শিল্পায়নের প্রয়োজন মিটান যায়। ৪। দেশের জনবলকে যথাসম্ভব কাযে নিয়োগ এবং কর্মসংস্থান ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ। ৫। আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অপেক্ষাকৃত সমবণ্টন করা।

উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তৃতীয় পরিকল্পনাটিকে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা দুইটির পূর্ণ পরিণতি বলা যাইতে পারে। কৃষি ও শিল্পে স্বাবলম্বী হওয়া, দেশকে বেকার সমস্যা মুক্ত করা এবং সমাজতান্ত্রিক ধাচে সমাজ ব্যবস্থা পুনর্গঠন করাই হইল তৃতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য কাযে রূপদান করিবার জন্য সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭,৫০০ কোটি ও ৪,১০০ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হইয়াছে।

তিনটি পরিকল্পনার কর্মসূচী ও লক্ষ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, "গণতন্ত্রের মাধ্যমে এবং জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় দেশের সামগ্রিক উন্নতি বিধানই হইল ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য এবং ইহাই ভারতের আদর্শ। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে দেশ গঠনের লক্ষ্য লইয়া এই পরিকল্পনাগুলি রচিত হইয়াছে। সম বণ্টন, আয় ও সম্পদের ক্ষেত্রে অসাম্য দূরীকরণ, সমান সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে সমাজ গঠন—এই সব নীতিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া দেশের তথা জনসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণসাধনের ব্যবস্থা এই সব পরিকল্পনায় স্থান লাভ করিয়াছে।

দশম অধ্যায়

সরকারী আয়-ব্যয়

(Government Finance)

সরকারী আয়-ব্যয় কাহাকে বলে—What is Public Finance ?

আধুনিককালে সরকারী আয়-ব্যয় ধনবিজ্ঞানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। বর্তমান রাষ্ট্রের বহু লোকহিতকর কর্তব্য পালনের জন্য প্রভূত পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনীয় অর্থ রাষ্ট্র নানা উপায়ে আহরণ করিয়া নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করে। রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থ সংগ্রহ ও সংগৃহীত অর্থের ব্যয়-পদ্ধতির উপর সামাজিক অগ্রগতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

সরকারী আয়-ব্যয়কে সাধারণতঃ চারিভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা হয়। প্রথম ভাগ হইল সরকারী আয় (Public Income)। এই ভাগে সরকার কি নীতি অনুসারে কোন্ কোন্ উৎস হইতে আয় করে, তাহা আলোচনা করা হয়।

দ্বিতীয় ভাগে সরকারী ব্যয় (Puplic Expenditure) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সরকার তাহার আয় কি কি কাজের জন্য এবং কি কি উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং সমাজের উপর সরকারী ব্যয়ের কি ফল হয় তাহা এই অংশে আলোচনা করা হয়।

তৃতীয় ভাগে আলোচিত হয় সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ (Public Debt)। সরকারী ঋণের বৈশিষ্ট্য হইল যে, সরকার যখন ঋণ গ্রহণ করে, তখন ইহাকে একজাতীয় সরকারী আয় বলা যাইতে পারে। আবার সরকার যখন সুদ সহিত আসল ঋণ পরিশোধ করে তখন তাহা সরকারী ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয়। এই অংশে সরকারী ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য, যুক্তিযুক্ততা, দেশী ও বিদেশী ঋণের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

চতুর্থতঃ, আয় ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত

করা ও এই হিসাব পরীক্ষা করাও (Financial Administration) সরকারী আয়-ব্যয়ের আর একটি অংশ বলিয়া গণ্য করা হয়।

ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের সহিত সরকারী আয়-ব্যয়ের পার্থক্য—
Distinction between Private Finance and Public Finance

ব্যক্তি যেরূপ তাহার নানাবিধ খরচ সংকুলানের জন্য আয় করিয়া থাকে, সরকারকে তদ্রূপ নানাজাতীয় ব্যয়-নির্বাহের জন্য আয়ের কথা ভাবিতে হয়। ব্যক্তি ও সরকার উভয় ক্ষেত্রেই আয় ও ব্যয় পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ, লোকে সাধারণতঃ আয় অনুসারে ব্যয় করে, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই আয়ের একটা সীমা আছে। সে নিজের খুসীমত আয় বৃদ্ধি করিতে পারে না। কাজেই তাহাকে আয় অনুসারে ব্যয় করিতে হয় (cuts his coat according to his cloth)। কিন্তু সরকার আগে ব্যয়ের পরিমাণ ঠিক করিয়া ব্যয়ের অনুপাতে আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে। সরকার নূতন নূতন কর ধার্য করিয়া, ঋণ গ্রহণ করিয়া, নূতন নোট ছাপাইয়া আয় বৃদ্ধি করিতে পারে—যাহা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং ব্যক্তি অপেক্ষা সরকারের আয় বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা বেশী বলিয়া সরকার ব্যয় অনুসারেই তাহার আয় নির্ধারণ করে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি তাহার আয় এরূপভাবে ব্যয় করে যে, এই ব্যয় করা অর্থের সুখ-সুবিধা সে নিজের জীবদ্দশায় ভোগ করিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র ইহার সমগ্র আয় এরূপভাবে ব্যয় করে যাহাতে বর্তমান সমাজের সুখ-সুবিধা সৃষ্টি করা ছাড়াও ভবিষ্যৎকালের জনগণও বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

তৃতীয়তঃ, সরকার দেশের মধ্যে বা বিদেশ হইতেও ঋণ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি শুধু দেশের মধ্যে অপর ব্যক্তির নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

চতুর্থতঃ, ব্যক্তির পক্ষে আয় অনুসারে ব্যয় করা বাঞ্ছনীয় হইলেও রাষ্ট্রের সব সময়ে এই নীতি অনুসারে কাজ করা উচিত নহে। রাষ্ট্র যদি ঠিক আয় অনুসারে ব্যয় করে তাহা হইলে বহু গঠনমূলক ও জনহিতকর কার্য সম্পাদিত হইতে পারে না। বর্তমান ভারত সরকার যদি তাহার আয় অনুসারে ব্যয় করিত তাহা হইলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাহায্যে এ পর্যন্ত দেশের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা সম্ভব হইত না।

সুতরাং নীতি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সরকারী আয়-ব্যয় ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

আয়ের উৎস—Sources of Income

আধুনিক রাষ্ট্রীয় সরকারগুলির বহু রকমের কাজ করিতে হয়। এই কাজগুলি নিষ্পন্ন করিবার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হয়। সরকার নানা উপায়ে বিভিন্ন উৎস হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ আহরণ করিয়া থাকে। সরকার যে-সমস্ত বিভিন্ন উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহ করে, সেই উৎসগুলিকে সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়, যথা, কর ও অন্যান্য। অন্যান্য উৎসগুলিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা, সরকারী সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয়, সরকারী ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতে আয় ও বিবিধ আয়।

প্রথমতঃ, ব্যক্তিবিশেষের যেরূপ সম্পত্তি থাকে, সরকারও তদ্রূপ খাস জমি, বন, খাল-বিলের মালিক হইতে পারে এবং এইগুলি হইতে যে আয় হয় তাহা সরকারী আয়ের অন্তর্ভুক্ত। ভারতের অনেক রাজ্যসরকার খাস মহাল, সেচ-বিভাগ ও বনবিভাগ হইতে প্রচুর রাজস্ব পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় সরকারও নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারে। ভারত সরকার রেল, ডাক ও তার-বিভাগ হইতে বহু কোটি টাকা পাইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, সরকার জনসাধারণকে নানাজাতীয় সুবিধাজনক কাজ দেয়। জমি বা বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়, অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আদালতের সাহায্যে বিচার প্রভৃতি কার্য দ্বারা সরকার জনসাধারণকে অনেক সুবিধা দেয় এবং সুবিধাগুলির প্রতিদান হিসাবে কিছু মূল্য আদায় করে। ইহাও সরকারী আয়ের আর একটি উৎস।

কিন্তু সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হইল কর।

করের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য—Definition and Characteristics of a tax

সরকার কার্যের জন্য খরচ (Fee), দ্রব্যের জন্য মূল্য (price), অপরাধীর নিকট হইতে জরিমানা (Fine), বিশেষ সুবিধা দান করিয়া বিশেষ মূল্য (Special assessment) বা ঋণ (Loan) গ্রহণ করিতে পারে। সরকারের

এই আয়ের উৎসগুলি কর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নাগরিকগণের সাধারণভাবে মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে কার্যগুলি করে তাহার ব্যয় সংকুলানের জন্য নাগরিকগণ ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠান-হিসাবে সংঘবদ্ধভাবে তাহাদের সম্পদের যে অংশ বাধ্যতামূলকভবে রাষ্ট্রকে প্রদান করে, তাহাকেই 'কর' বলা হয়। ("Taxes are general compulsory contributions of wealth levied upon person, natural or corporate, to defray the expenses incurred in conferring a common bennfit upon the residents of the state.")

কর-সম্পর্কে উপরি-উক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে উহার দুইটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে কর দিতে হয়। যাহার উপর কর ধার্য হয় তাহাকে কর দিতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কর প্রদান করিয়া কর-দাতা সরকারের নিকট হইতে কোনপ্রকার প্রতিদান দাবী করিতে পারে না। সরকার ব্যক্তিবিশেষকে সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে কাহারও নিকট হইতে কর আদায় করে না। কর আদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হইল জনগণের সাধারণভাবে মঙ্গল করা। কোন লোক একখানি পোস্টকার্ড কিনিয়া সরকারের নিকট হইতে সংবাদ-প্রেরণের সুবিধা পায় এবং এই সুবিধার জন্যই সে একটা মূল্য দেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আয়কর দেয়, সে সরকারের নিকট হইতে পোস্টকার্ড ক্রেতার ন্যায় প্রত্যক্ষভাবে কোন কাজ পায় না।

করের শ্রেণীবিভাগ—Classification of taxes

কর সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা, **প্রত্যক্ষ কর (Direct taxes)** ও **পরোক্ষ কর (Indirect taxes)**। করের আপাতভার (Impact) ও শেষভার (incidence) যদি একই ব্যক্তি বহন করে, তাহা হইলে সেই করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সরকার কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর আয়কর ধার্য করিলে সেই ব্যক্তিকেই নিজেকে কর দিতে হয়। ঐ কর কোনমতে অন্যের ঘাড়ে চাপাইতে পারে না। সুতরাং আয়কর হইল প্রত্যক্ষ কর। কিন্তু প্রমোদ করের (Amusement tax) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সরকার সিনেমার স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে এই কর আদায় করেন, কিন্তু স্বত্বাধিকারী প্রবেশমূল্য বৃদ্ধি করিয়া শেষ পর্যন্ত দর্শকগণের নিকট হইতে এই কর আদায় করেন। সিনেমার স্বত্বাধিকারী প্রমোদ করের

আপাতভার বহন করিলেও শেষভার দর্শকগণের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। সুতরাং প্রমোদ কর হইল পরোক্ষ কর। বিক্রয় করও (Sales tax) পরোক্ষ কর। বিক্রেতা কর প্রদান করিয়া ক্রেতার নিকট হইতে এই কর আদায় করে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় করব্যবস্থার কতকগুলি সুবিধা ও অসুবিধা আছে।

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা ঃ

(ক) নিশ্চয়তা—প্রত্যক্ষ করের সুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় করদাতা জানে যে, তাহাকে কি পরিমাণ কর দিতে হইবে।

(খ) সমতা—এই কর আয় অনুসারে ধার্য হয়। যাহার যেমন আয় তাহার উপর সেই আয় অনুসারে কর ধার্য হয় বলিয়া প্রত্যেকের সামর্থ্যানুসারে কর দিতে হয়। সুতরাং এই করব্যবস্থা দ্বারা লোকের যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় তাহাতে সমতা আনয়ন করা যায়।

(গ) উৎপাদনশীলতা—এই কর দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা যায়। সাধারণতঃ উচ্চ আয়ের লোকগণই এই কর দেন এবং সেইজন্য এই কর প্রত্যেক দেশের রাজস্বের একটি প্রধান উৎস বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রয়োজন-মত করের হারও বৃদ্ধি করা যায়।

(ঘ) মিতব্যয়—এই কর সংগ্রহ করিবার ব্যয়ও অল্প। আদায়ী করের পরিমাণের তুলনায় আদায় করিবার ব্যয় খুব কম বলিয়া ইহা লাভজনক হয়।

(ঙ) নাগরিক চেতনা—এই কর করদাতাকে প্রত্যক্ষভাবে দিতে হয় বলিয়া প্রত্যেক করদাতাই এবিষয়ে সচেতন। সরকারের ব্যয়নির্বাহের জন্য কর দিতে হয় এই জ্ঞান থাকার ফলে করদাতাগণের নাগরিক চেতনা জাগরিত হয়।

অসুবিধা ঃ

(ক) করদাতাকে এক সময়ে একসঙ্গে কর প্রদান করিতে হয়। লোকের নিজের পকেট হইতে এই কর দিতে হয় বলিয়া প্রত্যেকে ইহা অনুভব করে। সুতরাং এই কর জনপ্রিয় হয় না। লোকে ইহা পছন্দ করে না।

(খ) লোকে এই কর দেওয়া পছন্দ করে না বলিয়া অনেক সময় কর ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। কর ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে লোকে নানা অসাধু উপায় অবলম্বন করে। ফলে জনসাধারণের নৈতিক মান নীচু হয়।

(গ) এই করের আর একটি অসুবিধা হইল যে, শুধু ধনীশ্রেণীর নিকট হইতে উহা আদায় করা যায়। যাহাদের আয় কম তাহাদিগকে এই কর দিতে হয় না।

(ঘ) এই কর ধার্য করিবারও কোন ন্যায়সঙ্গত প্রণালী নাই। অনেক সময় করের হার সরকারী কর্মচারিগণের খুসীমত ধার্য হয়। ইহার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর উপর করভার সমানভাবে নাও পড়িতে পারে।

পরোক্ষ করের সুবিধা ঃ

(ক) পরোক্ষ কর সাধারণতঃ জনপ্রিয় হয়, কারণ করদাতা জানিতে পারে না যে, তাহাকে কর দিতে হইতেছে। সিনেমার টিকিট কিনিবার সময় লোকে জানে না যে, তাহাতে কর দিতে হইতেছে, সুতরাং সে এজন্য অসন্তুষ্ট হয় না।

(খ) পরোক্ষ করের সাহায্যে সরকার ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর নিকট হইতে কর আদায় করিতে পারে। আয়কর সকলকে দিতে হয় না, কিন্তু বিক্রয় কর সকলকেই দিতে হয়।

(গ) মাদক দ্রব্য ও সৌখিন দ্রব্যের উপর এই কর ধার্য করিয়া এই দ্রব্যগুলির ব্যবহার কমান যায়। আবার যাহারা এই দ্রব্যগুলি ব্যবহার করে না তাহাদের এই কর দিতে হয় না। সুতরাং এই করপ্রদান বাধ্যতামূলক নহে।

(ঘ) প্রয়োজন ক্ষেত্রে সরকার পরোক্ষ কর স্থাপন করিয়া আয় বৃদ্ধি করিতে পারে। সুতরাং এই কর উৎপাদনশীলও বটে।

অসুবিধা ঃ

(ক) এই করের প্রধান অসুবিধা হইল যে, ইহা সামর্থ্যানুসারে ধ্যার্য করা যায় না বলিয়া অনেক সময় করভার দরিদ্রের উপরই বেশী পড়ে। লবণের উপর কর বসিলে ধনী ও দরিদ্রের সমান করই দিতে হয়। সুতরাং দরিদ্রের উপর অবিচার করা হয়।

(খ) পরোক্ষ করের আর একটি অসুবিধা হইল যে, কর দিবার সময় লোকে জানিতে পারে না যে সে কর দিতেছে। এইজন্য সে-কর দেওয়া সম্পর্কে অবহিত নহে এবং এই কারণে তাহার নাগরিক চেতনা জাগে না।

(গ) এই কর কখন কি পরিমাণে দিতে হইবে তাহা করদাতা জানে না। সুতরাং ইহা অনিশ্চিত ও অসুবিধাজনক।

(ঘ) এই কর আদায় করিবার ব্যয়ও অধিক। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে ইহা উৎপাদনশীল হয় না।

সমানুপাতিক হারে কর ও ক্রমবর্ধমান হারে কর—Proportional and Progressive Taxation

যখন করের হার সকল রকম আয়ের বা সম্পত্তির মূল্যের উপর সমানভাবে ধার্য হয়—বেশী আয় ও কম আয় ইহার উপর কোন পার্থক্য করা হয় না, তখন এই করকে সমানুপাতিক হারে কর বলা হয়। ধরা যাউক, যে ব্যক্তির আয় ১,০০০৲ টাকা, সে টাকায় দুই পয়সা কর দেয়, আবার যাহার ১০,০০০৲ টাকা আয়, সেও টাকায় দুই পয়সা কর দেয় এরূপ ক্ষেত্রে আয়ের পার্থক্যের জন্য করের হারের কোন পার্থক্য করা হয় না।

কিন্তু যখন আয়বৃদ্ধির সহিত করের হারেরও পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে করের হারও বৃদ্ধি পায়, তখন তাহাকে ক্রমবর্ধমান হারে কর বা প্রগতিশীল কর বলা হয়। ভারতের আয়কর হইল ক্রমবর্ধমান হারে করের দৃষ্টান্ত।

ক্রমবর্ধমান হারে করের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, বাজারে ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণীকে একই দ্রব্যের জন্য একই মূল্য দিতে হয়। ধনীর আয় অধিক বলিয়া তাহাকে অধিক মূল্য দিতে হয় না। সুতরাং করধার্য কালে ধনীর নিকট হইতে অধিক হারে কর আদায় করা উচিত নহে। ইহা ছাড়া বলা হয় যে, ধনীর নিকট হইতে অধিক হারে কর আদায় হইলে ধনীর সঞ্চয়-প্রবৃত্তি হ্রাস পাইয়া দেশে মূলধন-সৃষ্টিতে বাধা পড়িবে।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বর্তমান কালে সকল দেশের সরকারই ক্রমবর্ধমান করা প্রবর্তন করিয়াছেন। এই কর নানাভাবে সমর্থন করা হয়। প্রথমতঃ, দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর করদান করিবার ক্ষমতা অধিক। সুতরাং সামর্থ্যানুসারে কর ধার্য হইলে দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর অধিক হারে কর দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, ধনী ও দরিদ্র উভয়েই যদি সমান হারে কর দেয় তাহা হইলে দরিদ্রের উপর করভার বেশী পড়ে। এই ব্যবস্থায় কর দিতে যে ত্যাগস্বীকার হয় তাহা দরিদ্রেরই বেশী হয়। সুতরাং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ত্যাগস্বীকার যাহাতে সমান হয়, সেজন্য ধনীরও উপর অধিক হারে কর ধার্য হওয়া যুক্তি-সঙ্গত। তৃতীয়তঃ, বর্তমানে ধনী ও দরিদ্রের

মধ্যে আয়-বৈষম্য খুব বেশী। এই অসম বণ্টন-ব্যবস্থা দূর করিবার জন্যও ধনীর উপর অধিক হারে কর ধার্য করিয়া সেই কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ দরিদ্রের হিতার্থে ব্যয় করা উচিত।

করধার্যের নীতি—Canons of Taxation

সরকার তাহার খুসীমত কর ধার্য করিতে পারে না। কর ধার্য করিবার সময় সরকারের নানা বিষয় চিন্তা করিতে হয়। কর ধার্য করিবার কতকগুলি নীতি আছে এবং সরকার সাধারণতঃ এই নীতি-অনুযায়ী কর ধার্য করিয়া থাকে। এ্যাডাম্ স্মিথ কর ধার্য সম্পর্কে চারিটি নীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যথা সামর্থ্যের নীতি, নিশ্চয়তার নীতি, সুবিধার নীতি ও মিতব্যয়িতার নীতি। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ কর ধার্য করিবার আরও দুইটি নীতির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, উৎপাদনশীলতার নীতি ও প্রসার-ক্ষমতার নীতি। এই নীতিগুলি সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

১। সামর্থ্যের নীতি—Canon of ability

করব্যবস্থাকে ন্যায়-সঙ্গত করিতে হইলে সামর্থ্য-অনুসারে কর ধার্য হওয়া উচিত। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইল যে, আয়-পরিমাণের উপর সব সময়ে লোকের সামর্থ্য নির্ভর করে না। আয় বেশী হইলেও পোষ্যসংখ্যা যদি অধিক হয় তাহা হইলে তাহার সামর্থ্য কম হয়, আবার আয় সমান কিন্তু পোষ্যসংখ্যাও কম, সে ক্ষেত্রে কর দিবার ক্ষমতা বেশী হয়। সুতরাং আয়ের পরিমাণ দ্বারা সবসময়ে সামর্থ্য নির্ণয় করা যায় না। সামর্থ্য-নীতির অর্থ হইল যে, দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর অধিক কর দেওয়া উচিত।

২। নিশ্চয়তার নীতি—Canon of certainty

নিশ্চয়তার নীতি অনুসারে বলা হয় যে, কর এরূপভাবে ধার্য হওয়া উচিত যে কি পরিমাণ কর দিতে হইবে তাহা করদাতা পূর্বে জানিতে পারে। সরকার খুসীমত যখন-তখন কর বসাইলেই চলিবে না। কখন, কি পদ্ধতিতে এবং কি পরিমাণ কর দিতে হইবে তাহা করদাতাকে জানাইয়া দিতে হইবে।

৩। সুবিধার নীতি—Canon of convenience

কর এরূপভাবে ধার্য করা উচিত যাহাতে করদাতার পক্ষে কর দেওয়া সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক হয়। জমির খাজনা ফসল তুলিবার পর ধার্য হইলে চাষীর

পক্ষে এই কর দেওয়া সুবিধাজনক হয়। আবার অনেক সময় অনেক কর একসঙ্গে দিতে হইলে করদাতার অসুবিধা হয় বলিয়া কিস্তিতে কিস্তিতে দিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৪। মিতব্যয়িতার নীতি—Canon of economy

কর এরূপভাবে ধার্য করিতে হইবে যাহাতে সরকারের কর আদায় করিবার ব্যয় কম হয় এবং ব্যয় কম হইলে সরকারের আয় বেশী হইবে। এই উদ্দেশ্যে স্বল্প পরিমাণ আয়ের উপর আয়কর ধার্য করা হয় না, কারণ স্বল্প আয়ের উপর হইতে আয়কর আদায় করিবার জন্য সরকারের এত ব্যয় করিতে হইবে যে, সে তুলনায় সরকারের আয় নগণ্য হইবে।

৫। প্রসার-ক্ষমতার নীতি—Canon of elasticity

এই নীতি অনুসারে বলা হয় যে, কর এরূপভাবে ধার্য হওয়া উচিত যাহাতে প্রয়োজন হইলে করের হার বৃদ্ধি করিয়া অধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায় করিয়া ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হয়। সরকার যদি প্রয়োজন-ক্ষেত্রে বিক্রয় কর টাকা প্রতি এক পয়সা হারে বেশী করে তাহা হইলে সরকারের বহু আয় হইতে পারে।

৬। উৎপাদনশীলতার নীতি—Canon of productivity

কর এরূপভাবে বসান উচিত যাহাতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির সহিত যথেষ্ট পরিমাণে কর আদায় হইয়া আয়-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সম্ভব হয়। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইলে সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়। সুতরাং যথেষ্ট পরিমাণে কর আদায়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

ভারতে কর ব্যবস্থা—Tax System in India

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্নরাজ্য সরকারগুলি নানাভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া থাকে। ভারত সরকার আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের উপর শুল্ক (Customs Duty), উৎপাদন শুল্ক (Excise Duty), আয়কর (Income Tax), উত্তরাধিকার কর (Estate Duty), আদায় করেন। ১৯৫৭-৫৮ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে সম্পদ কর (Wealth Tax) ও ব্যয়কর (Expenditure Tax) নামে আরও দুইটি কর বসান হইয়াছে।

রাজ্য সরকারগুলি সাধারণতঃ আবগারী কর (Excise Duty), স্ট্যাম্প শুল্ক (Stamp Duty), সেচকর, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আয় করের প্রাপ্ত

অংশ, কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্কের অংশ, বিক্রয় কর, প্রমোদ কর, বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর কর ও উত্তরাধিকার করের অংশ পায়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য কৃষি আয় কর (Agricultural Income Tax) ধার্য করিয়াছে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির আয়ের উৎস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ভারতে প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ কর অধিক পরিমাণে আদায় করা হয়। ইহার ফলে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের উপরই করভার বেশী পড়ে। সামর্থ্যনীতি অনুযায়ী এরূপ করব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য নহে। দরিদ্রগণ অধিক পরিমাণ করভার বহন করিলেও রাষ্ট্রের নিকট হইতে তাহারা বেশী সুবিধা পায় না।

সরকারী ব্যয়—Government expenditure

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ সুদূরবিস্তারী। এজন্য বহুপরিমাণ ব্যয় করিতে হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি কল্যাণকর কায।

ব্যয়নীতি—রাষ্ট্র যেরূপ যথাখুসী কর ধার্য করিতে পারে না সেইরূপ খুসীমত ব্যয়ও করিতে পারে না। ব্যয়ের ক্ষেত্রেও সরকার কতকগুলি নীতি মানিয়া ব্যয় পরিচালনা করে। প্রথমতঃ, সরকার এরূপভাবে ব্যয় করিবে যাহাতে সমাজের সর্বাধিক পরিমাণ কল্যাণ সাধিত হয় (Maximum Social Advantage)। দ্বিতীয়তঃ, ব্যয় এরূপভাবে হওয়া উচিত যাহাতে সরকারী ব্যয়ের দ্বারা ধনী অপেক্ষা দরিদ্র অধিক উপকৃত হয়। তৃতীয়তঃ, সরকার কর্তৃক ব্যয়ের আর একটি উদ্দেশ্য হইবে যে, ব্যয়ের দ্বারা যাহাতে দেশে অধিক কর্মসংস্থান হইয়া বেকার সমস্যার সমাধান হয় এবং ভোগ্যবস্তু-উৎপাদনের সহায়ক মূল শিল্পগুলির প্রসার হয়।

পূর্বতন ধনবিজ্ঞানীগণের মতে ব্যয়-সংকোচ করাই ছিল রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, সু-পরিকল্পিত কর-স্থাপন ও ব্যয়বৃদ্ধির দ্বারা জনসাধারণের নানাবিধ হিত-সাধন করা সম্ভব। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, আইন-শৃংখলা রক্ষা করা, বে-সামরিক শাসন পরিচালনা করা, দেশ রক্ষা করা ও উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য ব্যয় করা। সরকারী ব্যয়ের আর একটি উদ্দেশ্য হইল পূর্ণ কর্মসংস্থান ও আয়-বৈষম্য দূর করা।

সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ—Classification of public expenditure

১। সরকারী ব্যয় উৎপাদনক্ষম (Productive) ও অনুৎপাদনক্ষম (Unproductive) এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। রাস্তাঘাট-নির্মাণ, সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি গঠনমূলক কার্যের জন্য সরকার যে ব্যয় করে তাহাকে উৎপাদনক্ষম ব্যয় বলা হয়, কারণ এই ব্যয় দ্বারা ভবিষ্যতে একটা অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা থাকে। যুদ্ধজনিত ব্যয় যাহার দ্বারা কোনরূপ গঠনমূলক কার্য হয় না, তাহাকে অনুৎপাদনক্ষম ব্যয় বলা হয়।

২·। সরকারী ব্যয়কে আবার আসল ব্যয় (Real Expenditure) ও হস্তান্তরিত ব্যয় (Transferred Expenditure) বলা হয়। যখন সরকার কোন সেবামূলক কার্য গ্রহণ করিয়া তাহার পরিবর্তে অর্থ ব্যয় করে তখন এই ব্যয়কে আসল ব্যয় বলা হয়। পুলিশ বা বিচারকের কার্যের জন্য যে ব্যয় করা হয় তাহাকে আসল ব্যয় বলা হয়, কারণ পুলিশ বা বিচারকের নিকট হইতে কায লইয়াই সরকার তাহাদিগকে বেতন দেন। কিন্তু সরকার যখন বৃদ্ধ ও অসমর্থ বা বেকারগণকে অর্থ সাহায্য করেন তখন এই অর্থসাহায্য হস্তান্তরিত ব্যয় বলিয়া অভিহিত হয়। এই ব্যয়ের জন্য সরকার কোন সেবামূলক কায পায় না।

২। সরকারী ব্যয়কে আবার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ব্যয় (Expenditure by the Central Government), প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক ব্যয় (Expenditure by the State Government), স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যয় (Local Expenditure) বলা হয়।

ভারত সরকারের ব্যয়—Expenditure of the India Government

ভারতে দেশরক্ষা-বিভাগের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যয় হয়। ইহা ছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়নমূলক বে-সামরিক বিভাগের জন্যও ব্যয় করা হয়। ভারত সরকারের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ব্যয় করিতে হয়। বর্তমান রাজ্য সরকারগুলির সাহায্য-খাতেও প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালে ভারতের অনুমিত আয়-ব্যয়ের তালিকা হইতে দেখা যায় যে এই বৎসর আয় হইবে ১,৫৮৫·৭৩ কোটি টাকা আয়-ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ১,৮৫২·৪০ কোটি টাকা।

রাজ্য সরকারগুলির পুলিশ, বিচারবিভাগ, কারাবিভাগ প্রভৃতি সাধারণ

শাসনকার্যের জন্য বেশী ব্যয় হয়। ইহা ছাড়া কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য শিক্ষা-প্রসারকল্পে, জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে ও পথঘাট নির্মাণের জন্য অনেক ব্যয় হয়।

ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির ব্যয়ের তালিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ধার্য করের বেশীর ভাগ দরিদ্র শ্রেণীর নিকট হইতে আদায় হইলেও দরিদ্রের সুখ-সুবিধার জন্য ব্যয়ের ভাগ অপেক্ষাকৃত কম। সরকার বড বড রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু এই প্রশস্ত রাজপথে বড লোকের, শিল্পপতিব ও ব্যবসায়ীর মোটর চালনের সুবিধা হইয়াছে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে, কিন্তু গ্রামের রাস্তাঘাটের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই, সুতরাং বেশীর ভাগ লোকই পথঘাট-নির্মাণের ব্যয়ের সুবিধা পায় নাই। রেলে সুব্যবস্থার জন্য সরকার অনেক ব্যয় করিয়াছেন কিন্তু যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের নিকট হইতে অধিক আয় হয় তাহাদেব ভ্রমণের সুবিধার জন্য ব্যয়পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। বর্তমানে অবশ্য ভারত সরকার তিনটি পরিকল্পনার সাহায্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিযা যাহাতে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য হ্রাস পায়, সেজন্য কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, কুটিরশিল্প ও গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি কার্যের জন্য বহু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতেছেন।

সরকারী ঋণ—Public borrowing

ব্যক্তির ন্যায় সরকারও অনেক সময় তাহার ব্যয়সংকুলান করিবার জন্য বা অন্য উদ্দেশ্যে ধার করিয়া থাকে। সরকার নিজের দেশের মধ্যে নাগরিকগণের মধ্য হইতে অথবা অপর দেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

সরকারী ঋণের শ্রেণীবিভাগ—Classification of Public borrowing

১। উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ঋণ—রেলপথ, সেচব্যবস্থা প্রভৃতি গঠনমূলক কার্যের উদ্দেশ্যে সরকার যখন ধার করে তখন এই ধারকে উৎপাদনশীল ঋণ (Productive debt) বলা হয়। এই ধার-করা অর্থ সরকার এরূপভাবে উৎপাদন-কার্যে খাটায় যে, তাহা হইতে যে আয় হয়, সেই আয় দ্বারা আসল ও সুদ পরিশোধ করা যায়। যুদ্ধ প্রভৃতি পরিচালনার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হয়, তাহাকে অনুৎপাদনশীল ঋণ (Unproductive debt) বলা হয়।

২। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ—সরকার যখন দেশের লোকের নিকট

হইতে ঋণ গ্রহণ করে তখন তাহাকে আভ্যন্তরীণ ঋণ (Internal debt) বলা হয়। বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে বৈদেশিক ঋণ (External debt) বলা হয়।

৩। স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ—সরকার ঋণ গ্রহণ করিয়া অল্প সময় অন্তে ঋণ পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার করিলে তাহাকে স্বল্প-মেয়াদী (Floating or Unfunded debt) বলা হয়। দীর্ঘ-মেয়াদের জন্য ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে দীর্ঘ-মেয়াদী (Funded debt) বলা হয়। দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের জন্য সরকার নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিবার অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে।

ঋণ-পরিশোধ পদ্ধতি—Methods of debt repayment

ঋণভার লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে আধুনিক সরকারগুলি নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ধার শোধ দিবার জন্য বর্তমানে প্রত্যেক সরকারই একটি 'নিমজ্জিত তহবিল' (Sinking fund) সৃষ্টি করে। প্রত্যেক বৎসর বাজেটে ঋণ-পরিশোধ করিবার উদ্দেশ্যে কিছু পরিমাণ অর্থ পৃথক করিয়া রাখা হয় এবং এই জমা টাকা হইতে পরে ঋণ পরিশোধ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, সুদের হারের পরিবর্তন করিয়াও (Conversion) সরকার ঋণ-ভার কমাইতে পারে। বাজারে সুদের হার হ্রাস পাইলে সরকার পাওনাদারগণকে কম সুদ দিতে পারে অথবা যাহারা কম সুদ লইতে অনিচ্ছুক তাহাদের ঋণ-পরিশোধ করিয়া দিতে পারে। আর একটি উপায়ে ঋণ-পরিশোধ করা যায়। যুদ্ধ প্রভৃতি কারণে যখন সরকারের ঋণ-পরিমাণ অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায় তখন মূলধনের উপর কর ধার্য (Capital levy) করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব।

সমাজের উপর সরকারী ঋণের প্রতিক্রিয়া—Effects of Public borrowing on society

১। সরকার দেশের মধ্য হইতে ঋণ-গ্রহণ করিলে অর্থ শুধু হস্তান্তরিত হয়। সরকারী ঋণের বেশীর ভাগই ধনিগণের নিকট হইতে লওয়া হয়। কিন্তু ঋণ-পরিশোধ করিবার উদ্দেশ্যে সরকার ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে কর আদায় করিয়া থাকে। এই আদায়ীকৃত কর দ্বারা ধনিগণের নিকট হইতে গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ দেওয়া হয়। ফলে ধনিগণ অধিকতর ধনবান হন, আর দরিদ্রগণ দরিদ্রতর

হওয়ায় সমাজে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সরকার যদি এই ধার করা অর্থ দরিদ্রের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করে তাহা হইলে ধন-বৈষম্য হ্রাস পায়।

২। সরকার যদি গঠনমূলক কার্যের জন্য ঋণ-গ্রহণ করে তাহা হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে করদাতার উচ্চহারে কর প্রদান করিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু অনুৎপাদনশীল ঋণের ক্ষেত্রে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পায়। ফলে করভার বৃদ্ধি পাইয়া করদাতার অসুবিধা সৃষ্টি করে।

৩। বৈদেশিক ঋণ-গ্রহণের ফলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ সমগ্র জাতীয় আয়-পরিমাণ হ্রাস পায়।

সরকার কর্তৃক ঋণ-গ্রহণের যুক্তিযুক্ততা—Justification for public borrowing

অবাধভাবে ঋণ-গ্রহণ করা সরকারের পক্ষে সঙ্গত নহে। অধিক পরিমাণে কর ধার্য করিলে সমসাময়িক করদাতার অসুবিধা হয় বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরগণের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু সরকার ঋণ-গ্রহণ করিলে এই ঋণের ভার সাধারণতঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় বংশধরগণকেই বহন করিতে হয়। এইজন্য বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত সরকারের পক্ষে ধার করা উচিত নহে। কেবলমাত্র নিম্নলিখিত অবস্থায় সরকারী ঋণ সমর্থনযোগ্য।

প্রথমতঃ, কোন অদৃষ্টপূর্ব কারণে যদি বেশী ব্যয় হয় তাহা হইলে ঋণ-গ্রহণ করিয়া এই ঘাটতি পূরণ সরকারের পক্ষে অপরিহার্য হয়। কারণ কর ধার্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু জরুরী অবস্থায় ভবিষ্যৎ আয়ের উপর নির্ভর করা সমীচীন নহে।

দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে যে অপরিমিত ব্যয় হয় তাহা শুধু কর ধার্য করিয়া সংকুলান করা সম্ভব নয়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় সরকার ঋণ-গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

তৃতীয়তঃ, দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ও অন্যান্য গঠনমূলক কার্যের ব্যয়নির্বাহের জন্যও সরকার ধার করিতে পারে। এই ঋণের অর্থ উৎপাদনে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া ঋণ-ভার লাঘব করে।

চতুর্থতঃ, নাগরিকগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্য নানাবিধ সাধারণ সুবিধার জন্য

সরকার ঋণ-গ্রহণ করিয়া যে পরিমাণ ব্যয় করে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে ফলপ্রসূ না হইলেও পরোক্ষভাবে নাগরিক জীবনের মান-উন্নয়নে সাহায্য করে। সুতরাং জনসাধারণের মঙ্গল-বিধানার্থেও সরকার কর্তৃক ঋণ-গ্রহণ সমর্থনযোগ্য।

ভারতের সরকারী ঋণ—Public debt of India

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকাল হইতেই ভারত সরকার ঋণ-গ্রহণ করিতে থাকে। ইংরেজ শাসনকালে ভারত সরকারকে যে ঋণ-গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহার বেশীর ভাগই ভারতে বৃটিশ শাসন কায়েমী করিবার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য লওয়া হইয়াছিল। ভারত সরকার দেশের মধ্য হইতে এবং ইংলণ্ড হইতে ঋণ-গ্রহণ করিত। দেশের মধ্য হইতে যে ঋণ লওয়া হইত, তাহাকে দেশী ঋণ (Rupee Loan) ও ইংলণ্ড হইতে গৃহীত ঋণকে স্টার্লিং ঋণ (Sterling Loan) বলা হইত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই স্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৪৫ কোটি টাকা। এই ঋণ যুদ্ধের সময় প্রায় শোধ হইয়া যায়।

বর্তমানে ভারত সরকারের স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী, উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল এবং দেশী ও বিদেশী ঋণ আছে। ১৯৬২ সালের ৩১শে মার্চ ভারত সরকারের মোট সুদ প্রদেয় ঋণ পরিমাণ ছিল ৬৭৯৩·৯ কোটি টাকা। এই ঋণের পরিমাণ ১৯৬৪ সালে বৃদ্ধি পাইয়া আনুমানিক ৪৯৩৭·২৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। এই ঋণের মধ্যে ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে আভ্যন্তরীণ ঋণ পরিমাণ ছিল ৫৭০৪·০৪ কোটি টাকা এবং অনুমান করা যায় যে, ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে এই ঋণ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৬১৮০·৩৮ কোটি টাকা হইবে। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১৯৬২-৬৩ সালে ছিল ১,৩৫৮ কোটি টাকা। বিভিন্ন দেশ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে: ১। ইংলণ্ড—১৯২·৮১ কোটি টাকা, ২। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—৭২৬·৩৯ কোটি টাকা, ৩। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র —১৬৪·৩০ কোটি টাকা, ৪। পশ্চিম জার্মানী—১৮৯·৯৪ কোটি টাকা, ৫। অন্যান্য—৭৪·৮২ কোটি টাকা।

ভারতে সরকারী ঋণের পরিমাণ দেখিয়া আতংকিত হইবার কোন কারণ নাই। সমগ্র ঋণের প্রায় শতকরা ৮৩ ভাগ উৎপাদনশীল, আর মাত্র ১৭ ভাগ

অনুৎপাদনশীল। সুতরাং ঋণের অধিকাংশই সরকার উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য ব্যয় করিয়াছেন।

অপরদিকে এই বিশাল ঋণ-পরিমাণের প্রায় ৮০ ভাগ আভ্যন্তরীণ ঋণ, আর ২০ ভাগ মাত্র বিদেশী ঋণ। এই কারণে ভারত হইতে বেশী টাকা সুদ বাবদ বিদেশে যায় না।

উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য অর্থসংস্থান—Financing of Development

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে হইলে একদিকে যেরূপ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থাগমের উপায়গুলির উন্নতি করিতে হয়, অপরদিকে সেইরূপ জনশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নানা প্রকার সমাজসেবামূলক কার্যও সম্প্রসারিত করিতে হয়। এজন্য সরকারকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এখন প্রশ্ন হইল যে, এই উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য যে বিপুল পরিমাণ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় তাহা কি উপায়ে সংগ্রহ করা সম্ভব।

উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য সরকার প্রথমতঃ অধিক পরিমাণে কর ধার্য করিতে পারে। অতিরিক্ত করধার্যের ফলে করদাতার উপর আপাততঃ করভার বৃদ্ধি পাইলেও উন্নয়নমূলক কার্যের ফলে জাতীয় আয়-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শেষ পর্যন্ত করভার লঘু হয়। কিন্তু শুধু অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য যে পরিমাণ ব্যয় হয় তাহা সংকুলান করা সম্ভব নহে। সেইজন্য সরকার দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। এই উপায়টি হইল ঋণ-গ্রহণ করা। নানাভাবে লোকের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া সরকার দেশের অভ্যন্তর হইতে স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ-গ্রহণ করিতে পারে। শুধু দেশের মধ্য হইতে ঋণ-গ্রহণ করিলে চলে না—বিদেশ হইতেও ঋণ-গ্রহণ করা হয়। এই দুইটি উপায়েও প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত না হইলে সরকার প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট অর্থ নূতন টাকা সৃষ্টি করিয়া অর্থাৎ নোট ছাপাইয়া (Deficit financing) সংগ্রহ করে। ইহার ফলে দেশে অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সরকার নানা উপায়ে এই মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত এই উন্নয়নমূলক কার্যের ফলে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং লোকের কর্মসংস্থান হয়। ভারত সরকার কি উপায়ে তাহার উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য অর্থসংস্থান করিয়াছেন তাহা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

সরকারী আয়-ব্যয়

সরকারের আয়ের অনেক উৎস আছে। এই উৎসগুলির মধ্যে করই হইল প্রধান। করের সঙ্গে খরচ, মূল্য, জরিমানা, ধার প্রভৃতি সরকারী অন্যান্য আয়-গুলির প্রধান পার্থক্য হইল যে, কর দেওয়া হইল বাধ্যতামূলক এবং করদান করিয়া সরকারের নিকট হইতে কোন প্রতিদান পাওয়া যায় না।

করের শ্রেণীবিভাগ

কর দুই রকমের হইতে পারে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ কর সরাসরি করদাতার নিকট হইতে আদায় হয়। সে উহা অন্য কাহারও নিকট হইতে আদায় করিতে পারে না, যথা—আয়কর। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে ব্যক্তির নিকট হইতে সরকার কর আদায় করে, সে ঐ কর শেষ পর্যন্ত অন্য লোকের ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়, যথা—প্রমোদ কর।

কর আনুপাতিক হারে ধার্য হইতে পারে, আবার ক্রমবর্ধমান হারেও ধার্য হইতে পারে। যখন সকলের উপর সমান হারে কর ধার্য করা হয় তখন তাহাকে আনুপাতিক হারে কর বলা হয়, কিন্তু আয়বৃদ্ধির সহিত যখন করের হারও বৃদ্ধি পায় তখন তাহাকে ক্রমবর্ধমান হারে কর বলা হয়।

কর-ধার্য নীতি

এ্যাডাম্ স্মিথ্ কর্তৃক চারিটি নীতি উল্লিখিত হইয়াছিল, যথা, সামর্থ্য, নিশ্চয়তা, সুবিধা ও মিতব্যয়। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ আরও দুইটি নীতির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, প্রসার-ক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা।

ভারতে করব্যবস্থা

ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার আমদানী-রপ্তানী শুল্ক, আয়কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি আদায় করেন। রাজ্য সরকারগুলির করের প্রধান উৎস হইল—আবগারী কর, ষ্ট্যাম্প শুল্ক, সেচকর ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য। ভারতের কর-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ অপেক্ষা পরোক্ষ করের গুরুত্ব বেশী।

সরকারী ব্যয় ও ইহার উদ্দেশ্য

আধুনিক সরকারগুলির কার্যক্ষেত্র বহুদূর বিস্তারী বলিয়া বহুপরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হয়। সরকারী ব্যয় এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাহাতে সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয় ও ধনী অপেক্ষা দরিদ্র অধিক পরিমাণে উপকৃত হয়।

সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ

সরকারী ব্যয়কে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়, যথা—১। উৎপাদনক্ষম ও অনুৎপাদনক্ষম ব্যয়; ২। আসল ও হস্তান্তরিত ব্যয়; ৩। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ব্যয়, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় সরকার কর্তৃক ব্যয়।

ভারত সরকারের ব্যয়

ভারত সরকারের সর্বাধিক ব্যয় হয় দেশরক্ষা-খাতে। ইহা ছাড়া বে-সামরিক বিভাগগুলির জন্যও ব্যয় হয়। ঋণ-পরিশোধের জন্যও একটা বড ব্যয় আছে। পুলিশ, বিচার-বিভাগ, জনশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিশিল্প প্রভৃতি উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে ব্যয় করিতে হয়।

সরকারী ঋণ

সরকার ব্যয়-সংকুলানের উদ্দেশ্যে অনেক সময় ধার করে। সরকারী ঋণ নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়—

১। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ; ২। স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ; ৩। উৎপাদনশীল ঋণ ও অনুৎপাদনশীল ঋণ।

ঋণ-পরিশোধ পদ্ধতি

১। নিমজ্জিত তহবিল সৃষ্টি; ২। ঋণ-পরিবর্তন; ৩। মূলধনের উপর কর।

ঋণ-গ্রহণের যুক্তিযুক্ততা

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সরকার ধার লইতে পারে—

১। অদৃষ্টপূর্ব কারণে ব্যয়াধিক্যের ক্ষেত্রে; ২। যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে; ৩। গঠনমূলক কার্যের জন্য. ৪। শিক্ষা, স্বাস্থ্য-রক্ষা প্রভৃতি সমাজসেবামূলক ব্যয়ের জন্য।

ভারতের জাতীয় ঋণ

বৃটিশ শাসনকালে যুদ্ধের ব্যয় সংকুলান করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের নিকট হইতে ধার লইত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই ঋণ পরিমাণ হয় ৪৪৫ কোটি টাকা। এই ঋণের অধিকংশই শোধ হইয়া গিয়াছে। বর্তমান সরকার পরিকল্পনানুযায়ী দেশের উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য মার্কিন দেশ, ইংলণ্ড ও সোভিয়েত রাশিয়া হইতে প্রায় ১৭৬ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে আরও বহু কোটি টাকা ধার লওয়া স্থির হইয়াছে। তবে সুখের বিষয় ভারতের এই বিশাল ঋণের বেশীর ভাগই হইল উৎপাদনশীল ঋণ।

উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য অর্থসংস্থান

১। নূতন করধার্য; ২। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণগ্রহণ; ৩। ঘাটতি ব্যয় অর্থাৎ নোট ছাপাইয়া নূতন টাকা প্রবর্তন।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What are taxes? How should the burden of taxes be distributed among the different sections of society? H.S. (Hu.), 1961

কর কাহাকে বলে? সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর কি ভাবে করভার বণ্টিত হওয়া উচিত?

উঃ—সরকার যে সমস্ত উৎস হইতে রাজস্ব আদায় করে তন্মধ্যে করই হইল প্রধান। সরকার সকল নাগরিকের নিকট হইতে সর্বসাধারণের সুবিধার্থে যে রাজস্ব আদায় করে তাহাকে কর বলা হয়। করের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা বাধ্যতামূলক এবং ইহার পরিবর্তে নির্দিষ্ট কোন সুবিধা পাওয়া যায় না।

সরকার এমনভাবে কর স্থাপন করিবে যাহাতে করভার সমাজের সকল শ্রেণীর উপর সমভাবে পড়ে। ধনী অপেক্ষা যদি করভার দরিদ্রের উপর বেশী হয় তাহা হইলে অন্যায় হয়। এইজন্য সামর্থ্য (Ability) অনুযায়ী কর ধার্য করা হয়। সামর্থ্য নীতির অর্থ হইল যে, যার যত বেশী আয়, কর দিবার সামর্থ্যও তার তত বেশী। সুতরাং অধিক আয়ের লোকের উপর অপেক্ষাকৃত অধিক হারে কর ধার্য করিলে সেই ব্যবস্থা ন্যায়সম্মত হইবে। দরিদ্রগণ যাহাতে সরকারকে কিছু কর দেয়, সেজন্য কর ব্যবস্থায় পরোক্ষ কর ধার্য করিবারও ব্যবস্থা থাকা দরকার।

2 What is Progressive taxation and what are its merits? Give two examples of progressive taxes

ক্রমবর্ধমান কর কাহাকে বলে? ইহার গুণ কি কি? ইহার দুইটি উদাহরণ দাও।

উঃ—যখন আয় বৃদ্ধির সহিত করের হারেরও পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে করের হারও বৃদ্ধি পায়, তখন তাহাকে ক্রমবর্ধমান হারে কর বলা হয়। ভারতের আয়কর ও সম্পত্তি কর (Estate duty) হইল এই শ্রেণীর কর।

এই করের সুবিধা হইল যে, ইহা লোকের সামর্থ্যানুসারে ধার্য করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থার সাহায্যে ধনী ও দরিদ্রের উপর করভার সমানভাবে বসান যায়। তৃতীয়তঃ, ইহার দ্বারা সমাজের আয় বৈষম্য দূর করা যায়।

3 What is tax? Explain the characteristics of a good tax?

কর কাহাকে বলে? সুসম-কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি কি?

উঃ—প্রথম প্রশ্নের প্রথম ভাগের উত্তর দ্রষ্টব্য।

সরকার যদৃচ্ছাক্রমে কর ধার্য করিতে পারেন না। কর ধার্যের সময় কতকগুলি নীতি অনুসরণ করিতে হয়। এই নীতিগুলি ইংরাজ লেখক এ্যাডাম স্মিথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নীতিগুলি হইল : ১। সামর্থ্যের নীতি অর্থাৎ সামর্থ্য অনুসারে কর ধার্য করিতে হইবে। ২। নিশ্চয়তার নীতি অর্থাৎ করদাতাকে কতটা কর দিতে হইবে তাহার তাহা জানা উচিত। ৩। সুবিধার নীতি অর্থাৎ করদাতার সময় ও সুবিধামত যাহাতে কর আদায় করা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। মিতব্যয়িতার নীতি অর্থাৎ কর আদায় করিবার খরচ বেশী না হইয়া যাহাতে কম হয়—আদায় করিবার খরচ বেশী হইলে সরকারী আয় কম হইবে।

বর্তমান লেখকগণ আরও দুইটি নীতির উল্লেখ করেন, যথা, ৫। উৎপাদনশীলতার নীতি ও ৬। প্রসার ক্ষমতার নীতি। পঞ্চম নীতি অনুসারে বলা হয় যে, কর এরূপভাবে ধার্য করিতে হইবে যে, প্রয়োজন হইলে প্রচুর পরিমাণ কর আদায় হইতে পারে এবং ষষ্ঠ নীতি অনুসারে বলা হয় যে, হঠাৎ প্রয়োজনক্ষেত্রে করের হার বৃদ্ধি করিয়া বেশী পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করা যায়। ইহা ছাড়া, কর ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় করের সাহায্যে রাজস্ব আদায় হইবে। এই নীতিগুলি অনুসারে কর ধার্য হইলে সেই কর ব্যবস্থাকে ন্যায়সম্মত কর ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে

4 Define a tax Discuss the merits and defects of direct and indirect taxes H S (Hu), 1960

কর কাহাকে বলে? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের গুণ ও দোষ আলোচনা কর।

উঃ—প্রথম প্রশ্নের প্রথম ভাগের উত্তর দ্রষ্টব্য।

সরকার কর্তৃক ধার্য কর দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। সরকার যে ব্যক্তির উপর কর ধার্য করে, সেই যে সব সময় সেই কর নিজের পকেট হইতে দেয় এরূপ নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে, সেই ব্যক্তি আপাততঃ সরকারকে কর দেয় বটে, তবে শেষ পর্যন্ত অপর কাহারও নিকট হইতে সেই কর আদায় করিয়া লয়। কিন্তু সব সময়ে ইহা সম্ভব নহে। যে করের

তার ধার্য ব্যক্তিকেই বহন করিতে হয় এবং সে অপরের ঘাড়ে চাঁপাইতে পারে না, সেই করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়, যেমন, ভারতের আয়কর, উত্তরাধিকার কর, সম্পদ কর প্রভৃতি। এই করগুলি ধার্য ব্যক্তিকেই দিতে হয়, সে অন্য লোকের ঘাড়ে এই করের ভার চাপাইতে পারে না।

অপর পক্ষে কর যাহার উপর ধার্য হয় সে যদি প্রথমে ঐ কর দেয় এবং পরে ঐ কর অপরের নিকট হইতে আদায় করে তাহা হইলে তাহাকে শেষ পর্যন্ত আর করের বোঝা বহন করিতে হয় না। এই করকে পরোক্ষ কর বলা হয়। ভারতের বিক্রয় কর, আমদানী শুল্ক, প্রমোদ কর প্রভৃতি হইল পরোক্ষ করের উদাহরণ। সরকার ব্যবসায়ীর উপর কর ধার্য করিয়া তাহার নিকট হইতে কর আদায় করে। ব্যবসায়ী আবার বেশী দাম লইয়া ক্রেতার নিকট হইতে তাহা আদায় করে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ক্রেতাকেই কর দিতে হয় যদিও সরকার ব্যবসায়ীর নিকট হইতে তাহা আদায় করে।

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা হইল ইহার নিশ্চয়তা। করদাতা জানিতে পারে যে, তাহাকে কি পরিমাণ কর দিতে হইবে। ইহার দ্বিতীয় গুণ হইল যে, যাহার যেমন আয় তাহার উপর সেই আয় অনুসারে কর ধার্য হয় বলিয়া প্রত্যেকের সামর্থ্যানুসারে কর দিতে হয়। তৃতীয়তঃ, এই কর সংগ্রহের ব্যয় কম বলিয়া ইহা উৎপাদনশীল (লাভজনক) হয়। চতুর্থতঃ, প্রত্যক্ষভাবে এই কর দিতে হয় বলিয়া প্রত্যেক করদাতাই এ বিষয়ে সচেতন—ফলে করদাতার নাগরিক চেতনা জন্মে।

প্রত্যক্ষ করের প্রধান অসুবিধা হইল যে, প্রত্যক্ষভাবে এই কর দিতে হয় বলিয়া লোকে ইহা অনুভব করে ও সেইজন্য পছন্দ করে না। দ্বিতীয়তঃ এই কর লোকে দিতে পছন্দ করে না বলিয়া অনেক সময় লোকে অসাধু উপায়ে কর ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ, স্বল্প আয়ের লোকের এই কর দিতে হয় না। চতুর্থতঃ, এই করধার্যের কোন ন্যায়সঙ্গত প্রণালী না থাকার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপর করভার সমান নাও হইতে পারে।

পরোক্ষ করের প্রধান গুণ হইল যে, এই কর জনপ্রিয় হয়, কারণ কর দিবার সময় লোকে জানিতে পারে না যে, তাহাকে কর দিতে হইতেছে, যেমন, প্রমোদ কর। দ্বিতীয়তঃ, সকল শ্রেণীর লোকের নিকট হইতেই এই কর আদায় করা যায়। তৃতীয়তঃ, মাদক দ্রব্য ও সৌখীন দ্রব্যের উপর এই কর ধার্য করিয়া এই দ্রব্যগুলির ব্যবহার কমান যায়। চতুর্থতঃ, এই কর বাধ্যতামূলক নহে, বায়স্কোপে না গেলে প্রমোদ কর দিতে হয় না।

এই করের প্রধান দোষ হইল যে, ইহা সামর্থ্যানুসারে ধার্য করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, লোকে কর দিতেছে ইহা জানে না বলিয়া তাহার নাগরিক চেতনা জাগে না। তৃতীয়তঃ, এই কর অনিশ্চিত ও অসুবিধাজনক, কারণ লোকে জানে না যে, কখন এবং কি পরিমাণে কর দিতে হইবে। চতুর্থতঃ, এই কর আদায় করিবার ব্যয়ও অধিক বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে ইহা উৎপাদনশীল হয় না।

5 What are the different purposes of public expenditure? Explain your answer with special reference to Indian conditions H S (Hu), 1962

সরকারী ব্যয়ের বিভিন্ন উদ্দেশ্য কি? ভারতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর ব্যাখ্যা কর।

উঃ—বর্তমান রাষ্ট্রগুলি ক্রমশঃই কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছে। কল্যাণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা। কিন্তু কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত বহুল পরিমাণে

ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ নীতিই হইল রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

পূর্বতন অর্থনীতিবিদগণের মতে ব্যয়-সংকোচ করাই ছিল রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, সু-পরিকল্পিত কর স্থাপন ও ব্যয়বৃদ্ধি দ্বারা জনসাধারণের নানাবিধ হিতসাধন করা সম্ভব। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হইল:

১। আইন-শৃংখলা রক্ষা করা (Maintenance of law and order)

২। বে-সামরিক শাসন (Civil Administration)

৩। দেশরক্ষা (Defence)

৪। উন্নয়নমূলক কার্য (Development)

প্রত্যেক রাষ্ট্রই ইহার আয়ের একটি অংশ আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা খাতে ব্যয় করে। এই খাতে ব্যয়ের উদ্দেশ্য হইল যে, দেশে যদি শান্তি-শৃংখলা না থাকে তাহা হইলে ব্যক্তি স্বাধীনতা, সম্পত্তির নিরাপত্তা প্রভৃতি মানুষের প্রাথমিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হয়। এইজন্য পুলিশবাহিনী, বিচারবিভাগ, জেলখানা প্রভৃতি রাখিতে হয়। ভারত সরকার ও বিশেষ করিয়া বিভিন্ন রাজ্য-সরকারগুলির এই বাবদ অনেক ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু দেশের লোক যদি সুশিক্ষিত হইয়া সু-নাগরিক হয়, তাহা হইলে শান্তি-শৃংখলা খাতে ব্যয় হ্রাস পায় এবং এই ব্যয় অন্য নানাবিধ উন্নয়নকার্যে প্রযুক্ত হইতে পারে। বে-সামরিক শাসনখাতে সব দেশেই রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি অংশ ব্যয় করা অপরিহার্য। বে-সামরিক শাসন বলিতে বুঝায় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর-সংক্রান্ত ব্যয়। ভারত সরকারের এই খাতে ব্যয় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বেতার, সমাজ-উন্নয়ন প্রভৃতি জনহিতকর বিভাগগুলি সম্প্রসারণের ফলে ১৯৬১-৬২ সালে এই বিভাগগুলির ব্যয় ১৭৩.৪৬ কোটি টাকা ধার্য হইয়াছিল।

প্রতিরক্ষা খাতে বর্তমানে প্রত্যেক দেশেই অত্যধিক ব্যয় হয়। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা রাষ্ট্রের যেরূপ অপরিহার্য কার্য দেশরক্ষা করাও তদপেক্ষা অধিক অপরিহার্য কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তে সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় দেশ-রক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে এই খাতে ৭০৮.৫১ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হইয়াছে।

উন্নয়ন খাতে ভারত সরকারের ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে ভারতের ন্যায় অনগ্রসর দেশে এই ব্যয় কাম্য। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায়, বেতার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি কাজের জন্য ভারত সরকার প্রচুর ব্যয় করিতেছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সফল করিতে সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে ১১,৬০০ কোটি টাকা মোট ব্যয় ধার্য হইয়াছে।

সরকারী ব্যয়ের আর একটি উদ্দেশ্য হইল পূর্ণকর্মসংস্থান ও আয়-বৈষম্য দূর করা। ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে কৃষি, সেচব্যবস্থা, শক্তিসম্পদ, শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রচুর পরিমাণ ব্যয় করিয়া কর্মসংস্থান সাহায্যে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আয়-বৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

একাদশ অধ্যায়

অর্থ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

Money and Banking

অর্থের উৎপত্তি—Origin of Money

আদিম যুগে মানুষ অর্থের ব্যবহার জানিত না। এখনও বনে-জঙ্গলে ও মরুপ্রদেশে অনেক জাতি আছে যাহারা অর্থ ব্যবহার করে না। তাহা হইতে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে তাহারা কি করিয়া কেনা-বেচা করে। মানুষ যখন অর্থের ব্যবহার জানিত না, তখন তাহারা প্রত্যক্ষভাবে **দ্রব্য-বিনিময়** (**Barter**) করিয়া অভাব মিটাইত। কৃষক ধানের বিনিময়ে তাঁতির নিকট হইতে কাপড় সংগ্রহ করিত এবং এইরূপে পারস্পরিক পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যের আদান-প্রদানের সাহায্যে তাহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত।

দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধা—Difficulties of Barter

দ্রব্য-বিনিময়ের কতকগুলি অসুবিধা ছিল।

১। পারস্পরিক অভাবের অসামঞ্জস্য—

২। মূল্য নির্ধারণের মানের অভাব—

৩। ভাগ করিবার মানের অভাব—

১। প্রথমতঃ, পারস্পরিক অভাবের সামঞ্জস্য না হইলে দ্রব্য-বিনিময় করা যাইত না। কৃষকের কাপড়ের প্রয়োজন হইলেও তাঁতির ধানের প্রয়োজন না হইলে সে ধানের পরিবর্তে কাপড় বিনিময় করিতে রাজী হইত না।

২। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ ক্ষেত্রে কত ধানের পরিবর্তে একখানা কাপড় পাওয়া যাইতে পারে তাহারও কোন নির্দিষ্ট বিনিময় হার ছিল না।

৩। তৃতীয়তঃ, অনেক দ্রব্যই ভাগ না করিয়া বিনিময় করা যাইত না, অথচ ভাগ করিলে দ্রব্যটির উপযোগিতা নষ্ট হইত।

ভাল অর্থের গুণাবলী—Qualities of good money

প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময় ব্যবস্থার এই অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য অর্থের

সৃষ্টি হয় এবং স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুগুলি তাহাদের স্থায়িত্ব, সহজবহন-যোগ্যতা, নমনীয়তা ও বিভাজ্যতা গুণগুলির জন্য বিনিময়ের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। স্বর্ণ ও রৌপ্য—শুধু দীর্ঘস্থায়ী নয়, ইহাদিগকে সহজেই একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া যায়। স্বর্ণ ও রৌপ্য গলান যায় এবং ইহার ফলে ইহাদিগকে নানা মূল্যের মুদ্রায় পরিবর্তিত করা যায়। সব গম বা সব হীরা একরকম নহে, কিন্তু সব খাঁটি সোনা ও রূপা একই ধরণের। সুতরাং অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা সোনা ও রূপার মুদ্রাগুলিকে লোকে সহজে চিনিতে পারে। একমাত্র সোনা ও রূপা ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য বা ধাতুগুলিতে উপরি-উক্ত সব গুণগুলি নাই। তাই এই দুইটি ধাতুই অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অর্থের সংজ্ঞা—Definition of Money

এখন প্রশ্ন হইল অর্থ কাহাকে বলে? সাধারণতঃ অর্থ বলিতে লোকে ধাতু নির্মিত টাকা-পয়সা ও কাগজী নোট বুঝে। কিন্তু সব টাকা-পয়সা বা কাগজী নোটকে অর্থ বলা যায় না। পাকিস্তানের একটা আনি বা দুয়ানি ভারতে চলে না; ইহা দ্বারা কোন দ্রব্যই ক্রয় করা চলে না। আবার দেশী মুদ্রাও যদি খুব পুরাতন হয় তাহাও কেহ না লইতে পারে। অর্থ বলিতে আমরা সেই সমস্ত বিনিময়ের বাহনকে বুঝি যাহা সকলেই গ্রহণ করে এবং যাহার সাহায্যে ক্রয়-বিক্রয় ও দেনা-পাওনা শোধ হয়। অর্থের এই সংজ্ঞানুসারে একখানি চেক্ বা হুণ্ডি অর্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, কারণ লোকে চেক্ লইতে অস্বীকার করিতে পারে এবং তাহাকে চেক্ লইতে আইনতঃ বাধ্যও করা যায় না। কিন্তু পাঁচটি টাকা বা পাঁচ টাকার একখানি নোট লইতে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

অর্থের কাজ—Functions of Money

১। বিনিময়ের বাহন—Medium of exchange

প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই অর্থের ব্যবহার আরম্ভ হয়। অর্থ সব সময়েই লোকে গ্রহণ করিতে রাজি থাকে, সেইজন্য অর্থসাহায্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে কোন অসুবিধা হয় না। তাঁতি ধানের পরিবর্তে কাপড় দিতে অস্বীকার করিলেও অর্থের পরিবর্তে কাপড় দিতে অস্বীকার করে না। কারণ অর্থ দ্বারা সে তাহার প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য

সংগ্রহ করিতে পারে। সুতরাং অর্থের সাহায্যে একে অপরের দ্রব্য পাইতে পারে।

২। মূল্যের পরিমাপক—Measure of value

অর্থ দ্বারাই দ্রব্য ও কাজের মূল্য পরিমাপ করা হয় এবং প্রকাশ করা হয়। দুইটি দ্রব্যের বিনিময়ের হার একমাত্র অর্থমূল্যের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। চাউল, কাপড়, গরু, মোটর গাড়ী প্রভৃতির বিনিময়-মূল্য অর্থ দ্বারা পরিমাপ ও প্রকাশ করা হয়।

৩। সঞ্চয়ের বাহন—Store of value

জিনিসপত্রের দাম সচরাচর বাড়ে কমে কিন্তু অর্থের মূল্য মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। এইজন্য লোকে সঞ্চয় করিতে হইলে দ্রব্য সঞ্চয় না করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে, কারণ সে জানে যে প্রয়োজন হইলে যে-কোন সময়ে অর্থের বিনিময়ে সে সকল দ্রব্যই পাইতে পারে। দ্রব্যগুলি ভবিষ্যতে নষ্ট হইতে পারে কিন্তু অর্থ দ্বারা সে সবই পাইতে পারে।

৪। স্থগিত আদান-প্রদানের বাহন—Standard of deferred payment

অর্থের আর একটি কাজ হইল দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ করা। লোকে বর্তমানে যে মূল্য ধার দেয় ভবিষ্যতে সেই মূল্য ফিরিয়া পাইবে এই আশা করে। অর্থের মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বলিয়া বর্তমান মূল্যের সহিত অর্থ ভবিষ্যৎ মূল্যের সংযোগ সাধন করে। এইজন্য বর্তমানে অর্থ ধার করিয়া বা ধারে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ভবিষ্যতে অর্থের মাপ কাঠিতে ধার শোধ বা দ্রব্যমূল্য শোধ করা সহজ হয়। অর্থের কাজ ইংরেজীতে নিম্নলিখিত দুইটি পংক্তির সাহায্যে বুঝান হইয়াছে।

Money is a matter of functions four
A medium, a measure, a standard, a store.

মুদ্রা মান—Monetary Standards

বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত মুদ্রামান প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইলে দেশে যে বিভিন্ন ধরণের মুদ্রা প্রচলিত থাকে সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা প্রয়োজন। একটা দেশে প্রামাণিক বা মানমুদ্রা ও প্রতীক মুদ্রা থাকিতে পারে। এই মুদ্রা বিহিত অর্থ বলিয়া পরিগণিত হইতেও পারে আবার নাও পারে।

প্রামাণিক মুদ্রা—Standard Money

একটি দেশে বিনিময়ের মান হিসাবে যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে মান মুদ্রা বা প্রামাণিক মুদ্রা বলা হয়। এই মুদ্রায় সব হিসাবপত্র রাখা হয়। প্রামাণিক মুদ্রার অর্থমূল্য এই মুদ্রাঙ্কিত ধাতব মূল্যের সমান হয়। সুতরাং প্রামাণিক মুদ্রা গলাইয়া ধাতুহিসাবে বিক্রয় করিলে কোন লাভ হয় না। প্রামাণিক মুদ্রার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এজন্য পাওনাদার তাহার প্রাপ্য পাওনা এই মুদ্রায় গ্রহণ করিতে বাধ্য। প্রামাণিক মুদ্রার প্রচলন সাধারণতঃ অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। জনসাধারণ তাহাদের সোনা বা রূপা টাঁকশালে লইয়া গেলে সরকার আনীত ধাতু উপযুক্ত পরিমাণ মুদ্রায় পরিবর্তিত করিয়া দেয়। প্রামাণিক মুদ্রা সাধারণতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতু দ্বারা নির্মিত হইতে পারে। ভারতের টাকা, ইংলণ্ডের পাউণ্ড স্টার্লিং, আমেরিকার ডলার প্রভৃতি প্রামাণিক মুদ্রার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রতীক মুদ্রা—Token Money

প্রতীক মুদ্রার সাহায্যে সাধারণতঃ ছোট-খাট আর্থিক আদান-প্রদান চলে। ইহা নিকেল, তামা, দস্তা প্রভৃতি কম মূল্যবান ধাতু দ্বারা নির্মিত হয়। এই মুদ্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার মুদ্রা-মূল্য ধাতব মূল্য অপেক্ষা বেশী। ইহা সসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে ধরা হয় অর্থাৎ পাওনাদার এই মুদ্রার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক তাহার পাওনা অর্থপরিশোধ বাবদ গ্রহণ করিতে আইনতঃ বাধ্য নহে। প্রতীক মুদ্রার অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা থাকে না। ভারতে পঁচিশ নয়া পয়সা, দশ নয়া পয়সা, পাঁচ নয়া পয়সা প্রভৃতি ও ইংলণ্ডের শিলিং, পেন্স প্রভৃতি হইল প্রতীক মুদ্রা।

বিহিত অর্থ—Legal tender money

বিহিত অর্থ বলিতে সেই সমস্ত অর্থ বুঝায় যাহা সরকার কর্তৃক বিহিত বলিয়া ঘোষিত হইবার ফলে পাওনাদারগণ এই অর্থে তাহাদের পাওনা লইতে আইনতঃ বাধ্য। বিহিত অর্থে পাওনা মূল্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু একটি দেশে প্রচলিত সব অর্থই বিহিত অর্থ নহে। চেক্ বিহিত অর্থ নহে কাজেই লোকে ইহা লইতে অস্বীকার করিতে পারে। বিহিত অর্থ আবার অসীম,

বিহিত অর্থ (Unlimited legal tender money) ও সসীম বিহিত অর্থ (Limited legal tender money) হইতে পারে। যে অর্থ পাওনাদার যে কোন পরিমাণ লইতে বাধ্য তাঁহাকে অসীম বিহিত অর্থ বলা হয়, যথা, ভারতের টাকা, ইংলণ্ডের পাউণ্ড স্টার্লিং, মার্কিণ দেশের ডলার। যে অর্থে পাওনাদার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক লইতে বাধ্য নহে তাহাকে সসীম বিহিত মুদ্রা বলা হয়। ভারতের পঁচিশ নয়া পয়সা, দশ নয়া পয়সা প্রভৃতি হইল সসীম বিহিত অর্থ, কারণ এই অর্থে কোন পাওনাদার এক টাকা পরিমাণের অধিক গ্রহণ না করিতেও পারে।

ভারতের টাকা—The Indian Rupee

ভারতের টাকা দেশের মধ্যে প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে চলে। কিন্তু ইহা প্রামাণিক অর্থ নহে, ইহা প্রতীক মুদ্রা। কারণ প্রামাণিক মুদ্রার সব বৈশিষ্ট্য ভারতের টাকায় নাই। প্রামাণিক মুদ্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার মুদ্রা-মূল্য ও ধাতব মূল্য সমান। কিন্তু ভারতের টাকায় এক টাকা মূল্যের রৌপ্য ত নাই-ই অধিকন্তু বর্তমানে প্রচলিত টাকায় আদৌ কোন রৌপ্য আছে কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের টাকায় অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা নাই। এই মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা একমাত্র সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। বিদেশী পাওনাদারগণের ঋণ এই মুদ্রায় পরিশোধ করা যায় না। ভারতের টাকা ভারতে বিনিময়ের মান হিসাবে ও অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইহাই হইল ইহার প্রামাণিক মুদ্রার একমাত্র নিদর্শন। সুতরাং ভারতের টাকায় প্রামাণিক ও প্রতীক উভয় মুদ্রার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের নূতন দশমিক মুদ্রা—New Decimal Coin in India

১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারত সরকার নূতন দশমিক মুদ্রা প্রচলন করিয়াছেন। নূতন মুদ্রা প্রচলিত হইলেও পরবর্তী ৩ বৎসর পর্যন্ত নূতন মুদ্রার সহিত পুরাতন মুদ্রাও বাজারে চালু ছিল। নূতন এক পয়সার নামকরণ হইতেছে **নয়া পয়সা**। পূর্বে ৬৪ পয়সায় ১৲ টাকা হইত। বর্তমানে ১০০ নয়া পয়সায় ১৲ টাকা হইয়াছে। সুতরাং পুরাতন পয়সা ও নয়া পয়সার বিনিময় হার নিম্নলিখিতভাবে স্থির করা হয়।

৩ নয়া পয়সা		পুরাতন ২ পয়সা	
৬	”	১	আনা
১২	”	২	”
১৯	”	৩	”
২৫	”	৪	”
৩১	”	৫	”
৩৭	”	৬	”
৪৪	”	৭	”
৫০	”	৮	”
৫৬	”	৯	”
৬২	”	১০	”
৬৯	”	১১	”
৭৫	”	১২	”
৮১	”	১৩	”
৮৭	”	১৪	”
৯৪	..	১৫	..
১০০	”	১৬	”

নয়া পয়সার অসুবিধা—দশমিক মুদ্রা চালু হইবার ফলে বাজারে আর্থিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এক টাকা, আট আনা, চার আনার ক্ষেত্রে পুরাতন পয়সার সহিত নূতন পয়সার বিনিময়ের কোন অসুবিধা না হইলেও ২ আনার ক্ষেত্রে একটু অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। নয়া পয়সা প্রবর্তিত হওয়ায় পুরাতন পয়সার তুলনায় অনেক জিনিসের মূল্য বাড়িয়াছে। পুরাতন দু' আনার খামের মূল্য বাড়িয়াছে। সাধারণ লোকের পক্ষে টাকার ভাঙ্গানী ও রেজকী বিনিময় করার অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। সরকার যদি বাজারে শুধু নয়া পয়সা চালু করিতেন তাহা হইলে এত অসুবিধা হইত না। সরকারের ধারণা যে পুরাতন মুদ্রা বাজার হইতে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হইতে তিন বৎসর সময় লাগিবে এবং এই সময় পর্যন্ত উভয় মুদ্রাই বাজারে চালু থাকিবে।

সুবিধা—সরকার বলেন ভারত ব্যতীত অন্যান্য বহু দেশে এই দশমিক মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। ভারতে দশমিক মুদ্রা প্রবর্তিত হইলে ঐ সমস্ত দেশের

সহিত আর্থিক আদান-প্রদানে বিনিময়ের হার নির্ধারণ করা সহজ হইবে। অন্য দেশের ১০০ পয়সায় ১৲ টাকা হইলে এবং ভারতে ৬৪ পয়সায় ১৲ টাকা হইলে, ভারতীয় মুদ্রার সহিত অন্যদেশের মুদ্রার বিনিময়ের হার নির্ধারণ করা অসুবিধা-জনক হয় ইহা সত্য; সরকার আরও বলেন যে, এই মুদ্রা প্রচলিত হইলে হিসাবপত্র রাখিবারও সুবিধা হইবে।

কাগজী টাকার প্রকারভেদ—Different forms of Paper Money

সকল দেশেই বর্তমানে কাগজী টাকা-পয়সার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কাগজী টাকা-পয়সাকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা,

(ক) প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাকা—Representative Paper Money

প্রবর্তিত কাগজী টাকার সমপরিমাণ মূল্যের ধাতু যখন গচ্ছিত রাখা হয় তখন এই কাগজী টাকাকে প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাকা বলা হয়। যদি ৫০ লক্ষ মূল্যের কাগজী টাকা বাজারে চালু করা হয় এবং ঐ পরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য তহবিলে রাখা হয়, তাহা হইলে এই ৫০ লক্ষ কাগজী টাকাকে প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাকা বলা যাইতে পারে।

(খ) পরিবর্তনীয় কাগজী টাকা—Convertible Paper Money

যখন কাগজী অর্থ ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তনযোগ্য হয়, তখন তাহাকে পরিবর্তনীয় কাগজী টাকা বলা হয়। এই ব্যবস্থায় কাগজী টাকার অধিকারিগণ তাহাদের ইচ্ছামত কাগজী টাকা ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন করিতে পারে এবং যে কর্তৃপক্ষ এই কাগজী টাকা প্রবর্তন করেন তাঁহারা কাগজী টাকা মুদ্রায় পরিবর্তিত করিতে অংগীকারাবদ্ধ থাকেন। ভারতে প্রচলিত ১০, ৫, ২ টাকা প্রভৃতি মূল্যের কাগজী টাকা পরিবর্তনীয় কাগজী টাকার উদাহরণ।

(গ) অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকা—Inconvertible Paper Money

যখন কাগজী টাকার পরিবর্তে ধাতব টাকা পাওয়া যায় না, তখন এই কাগজী টাকা অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকা বলিয়া অভিহিত হয়। অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকা প্রবর্তিত হইবার সময় হইতেই অপরিবর্তনীয় বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে অর্থাৎ সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক যাহারা এই জাতীয় টাকার চালু করে তাহারা ইহার পরিবর্তে ধাতব মুদ্রা দিতে প্রথম হইতেই কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।

ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ১৲ টাকার নোট, বিলাতের 'পাউণ্ড' স্টার্লিং এই জাতীয় কাগজী টাকা।

অনেক সময় আবার পরিবর্তনীয় কাগজী টাকা কর্তৃপক্ষের ধাতব মুদ্রা দিবার অক্ষমতাহেতু ক্রমশঃ অপরিবর্তনীয় হইতে পারে।

কাগজী টাকার সুবিধা—Advantages of Paper Money

১। সহজ বহনযোগ্যতা, বিভাজ্যতা, সহজে চিনিবার সুবিধা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট টাকার প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই কাগজী টাকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ধাতব মুদ্রা অপেক্ষা কাগজী টাকার আদান-প্রদান করা অধিক সুবিধাজনক বলিয়া বর্তমানে কাগজী টাকার ব্যবহার প্রসার লাভ করিয়াছে।

২। কাগজী টাকা তৈয়ারী করিবার ব্যয়ও অনেক কম। খনি হইতে ধাতু উত্তোলন করিয়া সেই ধাতুকে পরিশ্রুত করিয়া নির্দিষ্ট ওজনের ও বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে নানাজাতীয় মুদ্রার রূপান্তরিত করা বহুল ব্যয়সাপেক্ষ। সে তুলনায় কাগজী টাকা অর্থাৎ নোট ছাপাইবার খরচ অতি নগণ্য। সুতরাং নোট ব্যবহারের ফলে যে অনেক ব্যয়সংকোচ হয় ইহা অনস্বীকার্য।

৩। টাকা-পয়সা প্রতিনিয়তই হস্তান্তরিত হইতেছে। এই হস্তান্তরের ফলে বহুপরিমাণ ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া জাতীয় অপচয় ঘটে। কাগজী টাকা ব্যবহার করিলে এই সকল মূল্যবান ধাতব মুদ্রার ব্যবহার-জনিত ক্ষয়-ক্ষতি নিবারিত হয়।

৪। কাগজী মুদ্রা ব্যবহারের ফলে যে পরিমাণ মূল্যের ধাতব মুদ্রা সঞ্চয় হয় তাহা বিদেশে ধার দিলে সুদ পাওয়া যায় বা অন্য নানা উৎপাদন-কার্যে ব্যবহার করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

৫। নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলি ধাতব মুদ্রার অভাবে কাগজী মুদ্রা চালু করিয়া তাহাদের ব্যয় সংকুলান করিতে পারে।

৬। কাগজী মুদ্রা প্রচলনের ফলে দেশের অর্থপরিমাণকে চাহিদা অনুপাতে পরিবর্তন করা সম্ভবপর হইয়াছে। দেশের অর্থপরিমাণ যদি শুধুমাত্র ধাতব মুদ্রায় পরিচালিত হইত তাহা হইলে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের ফলে দেশে অর্থের চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও প্রয়োজনীয় ধাতুর অভাবে অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইত না। কাগজী মুদ্রা প্রচলনের ফলে অর্থের চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য

বিধান করা সহজসাধ্য হইয়াছে। যদিও কাগজী অর্থের পরিবর্তে ধাতু গচ্ছিত রাখিতে হয় তথাপি এই গচ্ছিত ধাতুর পরিমাণ প্রবর্তিত কাগজী অর্থমূল্য পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়।

অসুবিধা—Disadvantages

১। কাগজী টাকার একটি অসুবিধা হইল যে, ব্যবহারের ফলে ইহার ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা অত্যধিক।

২। কাগজী টাকার প্রধান অসুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে। অল্প খরচে ও অল্প আয়াসে নোট ছাপান যায় বলিয়া আপৎকালে শাসনকর্তৃপক্ষ ব্যয় সংকুলান করিবার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। দেশে যদি ধাতব মুদ্রা প্রচলিত থাকে তাহা হইলে উপযুক্ত পরিমাণ ধাতু না থাকিলে সরকার তাহার খুসীমত মুদ্রা চালু করিতে পারে না। কিন্তু কাগজী টাকার ক্ষেত্রে সরকার উপযুক্ত পরিমাণ ধাতু গচ্ছিত না রাখিয়াও নোট প্রবর্তন করিতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণ নোট প্রবর্তনের ফলে সরকারের পক্ষে নোটগুলি ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। নোটের জন্য যে পরিমাণ ধাতু জমা থাকে তাহা নিঃশেষিত হইলে অবশিষ্ট নোটগুলি অপরিবর্তনীয় হইয়া পড়ে। নোটগুলিকে ধাতব মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার দায়িত্ব না থাকিলে সরকার খুসীমত নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। অত্যধিক পরিমাণ নোট চালু হওয়ার ফলে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়। আর মুদ্রাস্ফীতির চরম পরিণতি হইল মূল্যবৃদ্ধি।

৩। কাগজী টাকার আর একটি অসুবিধা হইল যে, ইহা একমাত্র দেশের মধ্যেই চালু হইতে পারে, বিদেশে এই টাকার লেনদেন সম্ভব নয়। বিদেশিগণ দ্রব্যমূল্য বা ঋণশোধ বাবদ স্বর্ণ লইতে আপত্তি করে না, কিন্তু কাগজী টাকা তাহারা গ্রহণ করে না। সুতরাং কাগজী টাকা প্রচলিত হইলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাহত হয়।

ঐচ্ছিক অর্থ—Optional Money

ঐচ্ছিক অর্থ বলিতে বিনিময়ের সেই সমুদয় মাধ্যমকে বুঝায় যাহা বিহিত অর্থ বলিয়া পরিগণিত না হইলেও সাধারণতঃ ঋণ-পরিশোধ ও অন্যান্য লেনদেন

ব্যাপারে গৃহীত হয়। ঐচ্ছিক অর্থ দ্বারা ব্যাঙ্ক নোট, চেক, হুণ্ডি প্রভৃতি নানা-জাতীয় ঋণপত্র (credit money) বুঝায়।

আদিষ্ট অর্থ—Fiat Money

যে অর্থ সরকারী আদেশের জন্য লোকে গ্রহণ করে তাহাকে আদিষ্ট অর্থ বলা হয়। কাগজী টাকা আদিষ্ট অর্থের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাগজী টাকার নিজস্ব কোন মূল্য নাই, কিন্তু সরকারী আদেশের জন্যই লোকে এইগুলি অর্থরূপে ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। প্রতীক মুদ্রাকেও আদিষ্ট অর্থ বলা যাইতে পারে, কারণ ইহার মুদ্রামূল্য অপেক্ষা ধাতব মূল্য কম হওয়া সত্ত্বেও লোকে সরকারী আদেশের জন্য এইগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

অর্থের প্রকারভেদ—Different Kinds of Money

অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতাকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে :
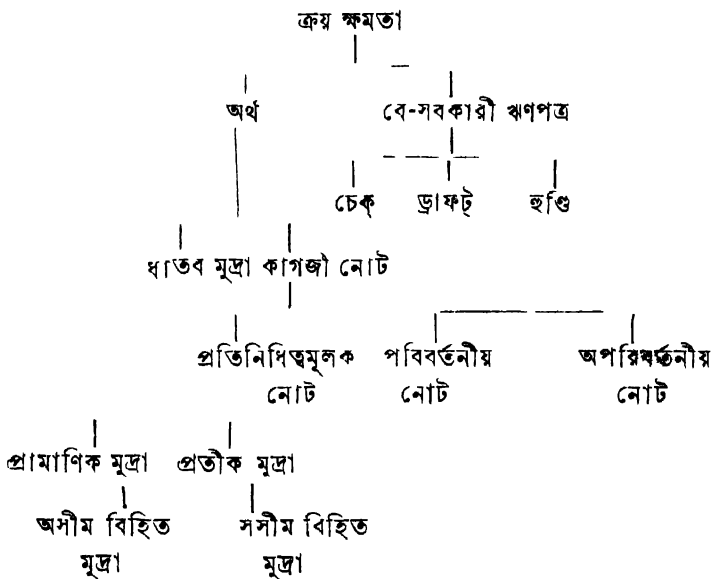
এক-ধাতুমান—Monometallism

দেশের প্রামাণিক অর্থ যখন স্বর্ণ অথবা রৌপ্য একটি ধাতুর দ্বারা নির্মিত হয় এবং এই প্রামাণিক মুদ্রার মূল্য সাধারণতঃ ইহার ধাতব মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত,

হয়, তখন ইহাকে এক-ধাতুমান মুদ্রা-ব্যবস্থা বলা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে বহুদিন পর্যন্ত রৌপ্যমান চালু ছিল এবং ইংলণ্ডে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত স্বর্ণমান চালু ছিল।

স্বর্ণমান—Gold Standard

স্বর্ণমান বলিতে এরূপ একটি মুদ্রা-ব্যবস্থা বুঝায়, যে ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট হারে বিহিত মুদ্রা স্বর্ণে পরিবর্তিত করা যায়। এই ব্যবস্থায় অর্থমূল্য স্বর্ণমূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং স্বর্ণের মূল্য পরিবর্তনের সহিত অর্থের মূল্য পরিবর্তিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে স্বর্ণমান চালু ছিল। স্বর্ণমান মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে বলিয়া ইহাকে স্বর্ণমুদ্রামান (Gold Currency Standard) বলা হইত।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে স্বর্ণমান-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে যে স্বর্ণমান চালু হয় তাহাতে বাজারে কোন স্বর্ণমুদ্রা চালু ছিল না। কাগজী নোট ও প্রতীক মুদ্রা বিহিত অর্থ হিসাবে বাজারে চালু থাকিত এবং এই নোট ও প্রতীক মুদ্রাগুলি একটা নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণপিণ্ডে (ধাতুতে) পরিবর্তিত হইত। এইজন্য এই মুদ্রা ব্যবস্থাকে **স্বর্ণধাতুমান** (**Gold Bullion Standard**) বলা হইত। স্বর্ণমানের আর একটি পরিবর্তিত রূপ হইল **স্বর্ণ বিনিময়মান** (**Gold Exchange Standard**)। স্বর্ণ ধাতুমানে দেশের বিহিত মুদ্রা, নোট ও প্রতীক মুদ্রায় গঠিত হইলেও কর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিত, কিন্তু স্বর্ণ বিনিময়-মানে দেশের বিহিত অর্থ স্বর্ণধাতুতে পরিবর্তিত না করিয়া পূর্বনির্ধারিত হারে বিভিন্ন দেশের স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রায় পরিবর্তিত করা হইত। সুতরাং স্বর্ণ মুদ্রামানে স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকিত, স্বর্ণধাতুমানে স্বর্ণমুদ্রা চালু না থাকিলেও স্বর্ণ ধাতুহিসাবে পাওয়া যাইত, কিন্তু স্বর্ণ বিনিময়মানে আর্থিক লেনদেনে মুদ্রা বা ধাতুহিসাবেও স্বর্ণের ব্যবহার হয় না।

স্বর্ণমানের প্রধান সুবিধা হইল যে, দেশে স্বর্ণপরিমাণ না বাড়িলে অন্য কোন কারণে মুদ্রাস্ফীতি হইয়া মূল্যবৃদ্ধি হইতে পারে না। বিভিন্ন দেশের স্বর্ণমুদ্রাস্থিত ধাতুর মূল্যের অনুপাতে বৈদেশিক বিনিময়ের হার স্থির হয় বলিয়া এই ব্যবস্থায় বিনিময়-হারের বিশেষ পরিবর্তন হইতে পারে না।

কিন্তু এই ব্যবস্থার অসুবিধা হইল যে, ইহা চালু রাখা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

এই ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হারের উপর বেশী জোর দেওয়া হয় বলিয়া আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়।

দ্বি-ধাতুমান—Bi-metallism

দ্বি-ধাতুমান মুদ্রা-ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মুদ্রাই বাজারে প্রামাণিক মুদ্রারূপে চালু থাকে। দ্বিতীয়তঃ, উভয় মুদ্রাই বাজারে অসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হয় ও উভয়ের মুদ্রামূল্য ধাতব মূল্যের সমান হয়। তৃতীয়তঃ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ের একটি নির্দিষ্ট হার স্থির করিয়া দেওয়া হয় ও ইহাদের অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকে।

দ্বি-ধাতুমানের আর একটি প্রকার-ভেদকে অসম্পূর্ণ দ্বি-ধাতুমান (Limping Bi-metallism) বলা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রামাণিক মুদ্রা স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুর তৈয়ারী হয় এবং উভয় মুদ্রাই অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে চালু থাকে, কিন্তু স্বর্ণের অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকিলেও রৌপ্যের মুদ্রাঙ্কন সরকার ইচ্ছামত পরিচালিত করেন অর্থাৎ রৌপ্যের অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা থাকে না।

দ্বি-ধাতুমানের সুবিধা হইল যে, প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে দুইটি ধাতুর ব্যবহার হয় বলিয়া একটি ধাতু দুষ্প্রাপ্য হইলেও অপর ধাতুনির্মিত মুদ্রার পরিমাণ-বৃদ্ধি দ্বারা সমগ্র মুদ্রা-পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া মূল্যস্তর অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে দেশে দ্বি-ধাতুমান প্রচলিত থাকে সে দেশ স্বর্ণমান ও রৌপ্যমান উভয় দেশের সহিত অনায়াসে বাণিজ্য করিতে পারে। আর্থিক আদান-প্রদানের সুবিধার ফলে বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

দ্বি ধাতুমানের প্রধান অসুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মুদ্রা বাজারে চালু থাকে বলিয়া লোকে অধিক মূল্যবান অর্থ সঞ্চয় করে। ফলে, বাজারে শুধু নিকৃষ্ট অর্থ চালু থাকে।

গ্রেসামের নিয়ম—Gresham's Law

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সমসাময়িক টমাস্ গ্রেসাম নামক এক ব্যক্তি টাকা-পয়সা সম্পর্কে এই নিয়মটির ব্যাখ্যা করেন বলিয়া ইহাকে গ্রেসামের নিয়ম বলা হয়। এই নিয়ম অনুসারে বলা হয় যে, বাজারে যদি একই সঙ্গে ভাল টাকা-পয়সা ও খারাপ টাকা-পয়সা চালু থাকে, তাহা হইলে খারাপ টাকা-পয়সা ভাল

টাকা-পয়সাকে বাজার হইতে বিতাড়িত করিবে (Bad money tends to drive good money out of circulation) অর্থাৎ বাজারে শুধু খারাপ টাকা-পয়সাই চলিতে থাকিবে—ভাল টাকা-পয়সা আর বাজারে চালু থাকিবে না।

এখন প্রশ্ন হইল যে, এই ভাল ও খারাপ টাকা-পয়সা কাহাকে বলে? একটা দেশে ধাতবমুদ্রা, পুরাতন ও নূতন মুদ্রা এবং কাগজী টাকা চালু থাকে। যখন বহুদিন পূর্বে নির্মিত ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রা ও নূতন মুদ্রা পাশাপাশি বাজারে চলিতে থাকে তখন নূতন মুদ্রাকে ভাল বলা হয়, কারণ এই মুদ্রার কোন ক্ষয় হয় নাই। ইহাতে পূর্ণ ওজনের ধাতু থাকে। আর পুরাতন মুদ্রাকে খারাপ মুদ্রা বলা হয় তাহার কারণ হইল বহু ব্যবহারের ফলে ইহা ক্ষয় পাইয়া ইহার ধাতুপরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং নূতন মুদ্রার তুলনায় পুরাতন মুদ্রাকে খারাপ বলা হয় এবং গ্রেসামের নিয়ম অনুসারে পুরাতন মুদ্রার দ্বারাই লোকে আদান-প্রদান করে ও নূতন মুদ্রা অন্তর্হিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বাজারে এক সঙ্গে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা চালু থাকিলে স্বর্ণের উচ্চতর মূল্যের জন্য স্বর্ণমুদ্রা ভাল মুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রাকে খারাপ মুদ্রা বলা হয় ও গ্রেসামের নিয়ম অনুসারে বাজারে শুধু রৌপ্যমুদ্রা চালু থাকে। তৃতীয়তঃ, ধাতবমুদ্রা ও কাগজী টাকা একসঙ্গে চলিতে থাকিলে ধাতব মুদ্রার তুলনায় কাগজী নোট খারাপ টাকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং বাজারে শুধু ইহাই প্রচলিত থাকিবে।

ভাল টাকার প্রচলন তিনটি কারণে বাধা পায়। প্রথম কারণ হইল জমানো অভ্যাস (Hoarding)। আমরা প্রত্যেকেই ভাল টাকা কাছে রাখিয়া খারাপ টাকার দ্বারা আদান-প্রদান করি। ট্রামে, বাসে উঠিয়া আমরা পুরাতন ঘসা সিকি, দুয়ানী প্রভৃতি চালাইতে চেষ্টা করি। ইহার ফলে খারাপ টাকা একজনের হাত হইতে অপরের হাতে যায় অর্থাৎ বাজারে চালু থাকে, আর ভাল টাকার ব্যবহার বন্ধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, গলানর জন্য (Melting) অনেক ভাল টাকা বাজার হইতে অন্তর্হিত হয়। নূতন টাকার ওজন বেশী। ইহা গলাইলে পুরাতন টাকা অপেক্ষা বেশী মূল্যের ধাতু পাওয়া যায় বলিয়া স্যাক্‌রাগণ নূতন মুদ্রা গলাইয়া অলংকার প্রস্তুত করে।

তৃতীয়তঃ, বিদেশী পাওনা শোধ করিতেও (Foreign payment) অনেক ভাল মুদ্রা দেশ হইতে বাহিরে যায়। বিদেশিগণ দেশীমুদ্রায় মূল্য গ্রহণ করে না,

কারণ একদেশের টাকা অন্যদেশে চলে না। এইজন্য ভাল মুদ্রা গলাইয়া যে সোনা-রূপা পাওয়া যায় তাহা দ্বারা বিদেশী ঋণ শোধ করিতে হয়। এই তিনটি কারণে ভাল মুদ্রার প্রচলন ক্রমশঃ বন্ধ হয়।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সব অবস্থায় এই নিয়মটি কার্যকরী হয় না। প্রথমতঃ, যদি দেশের লোকে খারাপ টাকা লইতে অস্বীকার করে তাহা হইলে খারাপ টাকার প্রচলন বন্ধ হইয়া শুধু ভাল টাকাই চালু থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি একটি দেশেব ভাল এবং খারাপ মুদ্রা সমেত সমগ্র অর্থপরিমাণ সে দেশের আর্থিক প্রয়োজনের তুলনায় কম বা ঠিক সমান হয়, তাহা হইলেও ভাল এবং খারাপ মুদ্রা উভযেই চালু থাকিবে অর্থাৎ খারাপ মুদ্রা ভাল মুদ্রাকে হটাইতে পারিবে না।

পরিচালিত মুদ্রা-ব্যবস্থা বা কাগজীমান—Managed Money or Paper Standard

এই ব্যবস্থায় দেশের অর্থসম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটি নির্ধারিত পরিকল্পনানুযায়ী দেশের অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের বিহিত অর্থ প্রতীক মুদ্রা ও কাগজী নোট লইয়া গঠিত হয়। স্বর্ণমূল্যেব সহিত এই অর্থের একটি সম্পর্ক সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইলেও এই বিহিত অর্থের মূল্য স্বর্ণমূল্যের উপর নির্ভরশীল নহে; বিহিত অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক আভ্যন্তরীণ মূল্য ঠিক রাখে, ইহার জন্য কোন স্বর্ণ তহবিল রাখিবার প্রয়োজন হয় না। বিদেশী ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিয়া বা বিনিময়-সমতা রক্ষা কবিবার জন্য তহবিল সৃষ্টি করিয়া এই ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হার স্থির রাখিবার চেষ্টা করা হয়।

এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল যে, প্রত্যেক দেশ স্বাধীনভাবে তাহার মুদ্রা ব্যবস্থা নিজ সুবিধামত পরিচালিত কবিতে পারে। ইহা পরিচালনা করিবার জন্য কোনরূপ ব্যয়-বহুল স্বর্ণতহবিল রাখিবারও প্রয়োজন হয় না।

ভারতের বর্তমান মুদ্রা-ব্যবস্থা—Present Monetary System of India

ভারতে বর্তমানে পরিচালিত মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু আছে। ভারতে চালু বিহিত অর্থকে একটি নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক মুদ্রার সহিত বিনিময় করা চলে। ইংলণ্ডের

স্টার্লিং মুদ্রার সহিত ভারতের টাকার বিনিময়ের হার হইল ১ টাকা=১শি. ৬ পে.।

ভারতের টাকা ভারতে প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ইহাতে কোন রৌপ্য নাই। ইহা ছাড়া, ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এক টাকার নোটও অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে বাজারে চালু আছে। ছোটখাট ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের জন্য আধুলি, সিকি, দুয়ানী, আনি, পয়সা ও নয়া পয়সা ব্যবহৃত হয়। এইগুলি হইল প্রতীক মুদ্রা। ভারতে এক টাকার কাগজী নোট ভারত সরকার প্রবর্তন করেন। ইহা অপরিবর্তনীয় অর্থ (Inconvertible Money)। এক টাকার উপরে ২৲, ৫৲, ১০৲, ১০০৲ টাকার নোট রিসার্ভ ব্যাঙ্ক চালু করে। ১৯৫৭ সালের 'রিসার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধন আইন' এর বলে রিসার্ভ ব্যাঙ্কের প্রচলন বিভাগ (Issue Department) ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের সোনা ও ৮৫ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণ-পত্র জমা রাখিয়া যে-কোন মূল্য-পরিমাণ কাগজী নোট প্রচলন করিতে পারে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (International Moneytary Fund) সহিত ভারতের বিনিময় কার্য চলে।

মুদ্রা সৃষ্টি—Creation of Money

সকল দেশেই বিহিত অর্থ সরকার কর্তৃক প্রচলন করা হয়। সরকার যে বিহিত অর্থ চালু করেন তাহা প্রামাণিক মুদ্রা ও প্রতীক মুদ্রা লইয়া গঠিত হয়। এই মুদ্রা সরকারী টাঁকশালে নির্মিত হয় এবং দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরামর্শানুযায়ী ইহার প্রচলন নিয়ন্ত্রিত হয়। কাগজী অর্থ অর্থাৎ নোট প্রচলনের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের প্রয়োজন অনুসারে নানা মূল্যের নোট প্রচলন করে। নোট প্রচলনের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও সরকার এ সম্পর্কে বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া, সরকার প্রত্যক্ষভাবেও নোট ছাপাইয়া বাজারে চালু করিতে পারেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতের ১৲ টাকার নোট সরকার কর্তৃক প্রবর্তন করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—Banks

আধুনিক যুগে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাঙ্কের গুরুত্ব অত্যধিক পরিমাণে

বৃদ্ধি পাইয়াছে। টাকা-পয়সার আদান-প্রদানে, ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে ব্যাঙ্কের কার্যকারিতা সকলেই অনুভব করে। প্রাচীনকালে সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তা রক্ষা করা ব্যতীত এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অন্য কোন উপযোগিতা লোকে অনুভব করিতে পারে নাই। ব্যাঙ্ক কি এবং জাতীয় জীবনে ইহার কতখানি গুরুত্ব তাহা ইহার কার্যের তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে ব্যাঙ্ক হইল এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যাহা টাকা-পয়সার লেনদেন লইয়া কায করে। এ কথাটি একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝা দরকার। যাহার বেশী টাকা-পয়সা আছে সে উদ্বৃত্ত অর্থ নিরাপদে রাখিবার উদ্দেশ্যে ও সুদ পাইবার আশায় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে। ইহার কারণ হইল অর্থের মালিকের বিশ্বাস আছে যে, সে চাহিবামাত্রই ব্যাঙ্ক তাহার গচ্ছিত অর্থ ফেরত দিবে। ব্যাঙ্ক আবার অপরের এই গচ্ছিত অর্থ চাষী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে ধার দেয়, কারণ, ব্যাঙ্কের বিশ্বাস আছে যে, এই দেনাদারগণ ঠিক সময়মত ধার শোধ দিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্যাঙ্কের সমগ্র কারবার বিশ্বাসের (credit) উপর প্রতিষ্ঠিত।

ব্যাঙ্কের কাজ—Functions of Banks

আধুনিক ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল ১। জনসাধারণের টাকা জমা রাখা। যাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ আছে তাহারা ব্যাঙ্কে জমা রাখে। ব্যাঙ্ক টাকা জমা রাখিয়া তাহাদের একখানি পাস বই ও টাকা তুলিবার জন্য চেক বই বা অনুরূপ কিছু দেয়, যাহার সাহায্যে আমানতকারী তাহার প্রয়োজনমত টাকা তুলিতে পারে। ব্যাঙ্কের আমানতগুলিকে (Deposits) তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম হইল স্থায়ী আমানত (Fixed deposits)। আমানতকারিগণ ১, ২ বা ৪ বৎসরের মত একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই টাকা নির্দিষ্ট সময় অন্তে তোলা যায় এবং ইহার জন্য আমানতকারী একটা নির্ধারিত হারে সুদ পান। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক সঞ্চয়ী আমানত (Savings deposit) রাখিতে পারে। এই আমানতের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার একটি নির্দিষ্ট অংশ আমানতকারী প্রতি সপ্তাহে তুলিতে পারে। কিন্তু অবশিষ্টাংশ তুলিতে হইলে পূর্বে ব্যাঙ্ককে জানাইতে হয়। সঞ্চয়ী আমানতের জন্যও ব্যাঙ্ক হইতে অল্প হারে সুদ পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক চল্‌তি আমানতও (Current deposits) রাখে। চল্‌তি আমানতের টাকা যে-কোন সময়ে

তোলা যায় এবং এজন্য আমানতকারী ব্যাঙ্ক হইতে কোন সুদ পায় না। অনেক সময় কোন কোন ব্যাঙ্ক ইহার পরিচিত বিশিষ্ট মক্কেলগণকে ধার দিয়া সেই ধারের টাকায় আমানত (Credit deposit) সৃষ্টি করে।

২। ধার দেওয়া হইল ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় কার্য। আমানতকারিগণের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক যে টাকা জমা রাখে এবং ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রয় দ্বারা লব্ধ অর্থের একটা প্রধান অংশ ব্যাঙ্ক উপযুক্ত বন্ধক রাখিয়া ধার দেয়। স্বর্ণ প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিতে পারে, অথবা ভাল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বন্ধক রাখিয়া ধার দিতে পারে। কিংবা বিশ্বাসী মক্কেলগণকে উপযুক্ত ব্যক্তিগত জামিনে অগ্রিম ধার দিতে পারে। জমা রাখিবার জন্য আমানতকারিগণকে যে হারে ব্যাঙ্ককে সুদ দিতে হয়, ব্যাঙ্ক অপর লোককে ধার দিবার সময় তাহা অপেক্ষা অধিক হারে সুদ ধায করে। ইহাতে ব্যাঙ্কের লাভ হয়।

৩। ব্যাঙ্ক কাগজী নোট বা চেক্ সৃষ্টি করিয়া অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। বর্তমানে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই নোট সৃষ্টি করিয়া থাকে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি চেক প্রবর্তন করিয়া আমানতকারিগণকে দেয় এবং চেকেব সাহায্যে তাহারা দেনা-পাওনা মিটাইতে পারে।

৪। বৈদেশিক বিনিময়েব ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্ক বিভিন্ন দেশেব মধ্যে দেনা-পাওনা মিটাইয়া দেয়। একদেশের অর্থ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অন্যদেশের অর্থে পরিবর্তিত হয়।

৫। ইহা ছাড়া, ব্যাঙ্ক অন্য নানা কাজ করে। মক্কেলগণের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যাঙ্ক তাহাদের জীবন-বীমার টাকা কিস্তিমত দেয়, শেয়ার প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করে এবং মক্কেলের অন্যত্র পাওনা টাকা আদায় করে। ব্যাঙ্ক উইল বা দানপত্রের অছি হিসাবে কাজ করে এবং মক্কেলগণের অলঙ্কার, দলিলপত্র প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য গচ্ছিত রাখে।

ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপযোগিতা—Utility of Banks

ব্যাঙ্কের উপরি-প্রদত্ত কার্য-তালিকা আলোচনা করিলে জাতীয় জীবনে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝা যায়। ব্যাঙ্ক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়া ও সুদ প্রদান করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে। সুতরাং পরোক্ষভাবে ব্যাঙ্ক জনসাধারণকে সঞ্চয় করিতে উৎসাহিত করে। যে দেশে ব্যাঙ্কের অভাব সেখানে সঞ্চয়ের পরিমাণও কম। ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ কৃষি, শিল্প,

ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রযুক্ত হইয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে। এইরূপে ব্যাঙ্ক মূলধনের মালিক ও শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়া সঞ্চিত অর্থের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। ব্যাঙ্ক না থাকিলে মূলধনের মালিক তাহার মূলধন উপযুক্তভাবে বিনিয়োগ করিতে পারিত না, অন্যদিকে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মূলধনের অভাবে তাহাদের কর্মদক্ষতার সু ব্যবহার করিতে পারিত না। ইহা ছাড়া, ব্যাঙ্ক নোট, চেক প্রভৃতি ঋণপত্র সৃষ্টি দ্বারা দেশের অর্থ-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনে সাহায্য করে। উৎপাদন কার্যে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় একমাত্র বিহিত অর্থদ্বারা সে প্রয়োজন সংকুলান হইত না। সুতরাং ব্যাঙ্কসৃষ্ট অর্থের অভাবে উৎপাদন-কার্য প্রসার লাভ করিতে পারিত না। ব্যাঙ্ক চাষী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রভৃতি উৎপাদকগণকে যে পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতে পারে, সরকারের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক বলা যাইতে পারে।

বিভিন্ন ধরণের ব্যাঙ্ক—Different Kinds of Banks

বর্তমান যুগে ব্যাঙ্কের কাজ এত প্রসারলাভ করিয়াছে যে, কোন একটি ব্যাঙ্কের পক্ষে সব রকম কাজ করা সম্ভব নয়। এইজন্য বিশেষ বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক বিনিময় ব্যাঙ্ক, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক—Commercial Banks

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যৌথমূলধনী কারবারের ভিত্তিতে সাধারণতঃ গঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থ জমা রাখিয়া আমানত সৃষ্টি করে এবং শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের চলতি কারবারের জন্য স্বল্প-মেয়াদে ধার দেয়। এই ব্যাঙ্কগুলি নগদ অর্থ জমা রাখিয়াও আমানত সৃষ্টি করিতে পারে অথবা অন্যের জমা টাকা শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীকে ধার দিয়া সেই ধারের টাকা দিয়াও আমানত সৃষ্টি করিতে পারে। ইহারা হুণ্ডির বিনিময়ে অথবা দ্রব্যের বিনিময়ে কিংবা ব্যক্তিগত জামিনে ধার দিয়া থাকে। তবে ২।৩ মাসের অধিক দিনের জন্য টাকা ধার দেয় না। ইহারা এরূপভাবে টাকা ধার দেয় যে, চাহিবামাত্র বা এক সপ্তাহ বা পনের দিন অন্তে টাকা ফেরৎ পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক ইহার অভিজ্ঞতা হইতে

বুঝিতে পারে যে, দৈনন্দিন লেনদেনে ইহার কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ রাখিয়া বাকী টাকা ব্যাঙ্ক স্বর্ণ প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য বা হুণ্ডি বা ভাল ভাল কোম্পানীর শেয়ার বন্ধক রাখিয়া ধার দেয়, যাহাতে প্রয়োজন হইলে ব্যাঙ্ক ধার দেওয়া অর্থ যে-কোন সময়ে ফেরত পাইতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কখনই দীর্ঘমেয়াদের জন্য ধার দেয় না। বাড়ীঘর বা খনি প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি যাহা সহজে বিক্রয়যোগ্য নহে তাহা বন্ধক রাখিয়াও টাকা ধার দেয় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—Central Bank

আধুনিককালে সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই হইল সমগ্র দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল এবং অর্থসম্পর্কিত ব্যাপারের কর্তা। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অংশীদারী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের সমবায়ে গঠিত হইতে পারে। আজকাল প্রায় সব দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে।

কার্য—Functions

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কায হইল বিহিত অর্থপরিমাণ ও বাজারে চালু বিনিময়ের অন্যান্য মাধ্যম নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর ও বৈদেশিক বিনিময়ের হার স্থির রাখা। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং এই ক্ষমতাগুলি হইল :

১। নোট-প্রচলন ক্ষমতা—পূবে নোট-প্রচলন ক্ষমতা প্রায় সকল ব্যাঙ্কেরই ছিল। এই অবস্থায় নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটিত। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই হইল একমাত্র নোট-প্রচলন ক্ষমতার অধিকারী এবং এইজন্য সমগ্র দেশে এক জাতীয় নোট চালু থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রবর্তিত নোট জনসাধারণের মনে আস্থা আনিতে পারে।

২। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ জনসাধারণ-সম্পর্কিত কোন কাজ করে না। এই ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির আমানতী অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয় এবং দরকার হইলে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করিতে পারে।

দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাও বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

৩। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকার-প্রবর্তিত অন্যান্য প্রতীক মুদ্রাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাজারে চালু রাখে।

৪। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। সরকারী সমস্ত আদান-প্রদান এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই হয় এবং সরকারের সমস্ত অর্থ এখানে জমা থাকে। এই ব্যাঙ্ক সরকারী হিসাব-পত্র রাখে এবং সরকারী ঋণ-গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ করে।

৫। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে বিদেশী মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে।

৬। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করা (Credit Control) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কার্য। দেশের সমগ্র অর্থপরিমাণ-নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি ধার দিয়া অতিরিক্ত অর্থসৃষ্টি দ্বারা যাহাতে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইতে না পারে, তজ্জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হারের পরিবর্তন, খোলাবাজার কারবার, নগদ জমার অনুপাতের পরিবর্তন, বাছাই করিয়া ধার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উপায়গুলি অবলম্বন করে।

৭। ইহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিকাশী ঘরের (Clearing House) কার্য করিয়া অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক দেনা-পাওনা সহজেই পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করে।

ব্যাঙ্ক-কর্তৃক সৃষ্ট অর্থ—Bank Money

চেক্ ও ব্যাঙ্ক-কর্তৃক প্রবর্তিত নোট হইল আর একপ্রকার অর্থ।

১। চেক্—Cheque

চেক্ হইল একজাতীয় ঋণ-পত্র। আমানতকারী যাহাতে ব্যাঙ্ক হইতে তাহার জমা টাকা তুলিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে চেক্ দেয়। জমা টাকা তুলিবার জন্য আমানতকারী ব্যাঙ্কে যে আদেশপত্র দেয় তাহাই হইল চেক্। আমানতকারী নিজের জন্য টাকা তুলিতে পারে অথবা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিবার জন্যও আদেশপত্র দিতে পারে। চেক্ ব্যাঙ্কে জমা দিলেই ব্যাঙ্ককে টাকা দিতে হয়, নতুবা ব্যাঙ্কের উপর লোকের বিশ্বাস থাকে

না। সব চেকে নগদ টাকা পাওয়া যায় না।. যে টাকা পায় সে যদি নগদ টাকা না লইয়া ঐ পাওনা টাকা তাহার ব্যাঙ্কস্থিত আমানতে জমা রাখিতে চায় তাহা হইলে যে চেক্ কাটে সে নগদ টাকা দিবার আদেশপত্র না দিয়া ঐ টাকা পাওনাদারের নামে জমা দিবার আদেশ দেয়। এই চেকে দুইটি দাগ কাটিয়া দেওয়া হয় এবং ইহাকে ক্রস্‌ড চেক্ (crossed cheque) বলা হয়। ইহা ব্যাঙ্কের মারফত ব্যতীত ভাঙ্গান যায় না।

চেকের সাহায্যে আদান-প্রদান, ক্রয়-বিক্রয় হইলেও চেক্ বিহিত অর্থ নহে। অর্থের প্রধান লক্ষণ হইল যে, ইহা সকলেই গ্রহণ করে। কিন্তু চেক্ সকলে গ্রহণ না করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বিহিত অর্থ সকলেই গ্রহণ করিতে বাধ্য। কেহ ইহা লইতে অস্বীকার করিলে শাস্তি পায়, কিন্তু চেক্ বিহিত অর্থ নয় বলিয়া কাহাকেও ইহা লইতে বাধ্য করা যায় না। তৃতীয়তঃ, চেক্ দ্বারা যে আদান-প্রদান হয় তাহা অসম্পূর্ণ আদান-প্রদান। চেক্ দিয়া একটি ঘড়ি কেনা হইলে ঘড়ির বিক্রেতা চেক্ ভাঙ্গাইয়া টাকা না পাওয়া পযন্ত ক্রেতার দেনা শোধ হয় না। চেক্ দিলেই দেনা শোধ হয় না। যত সময় চেকের পরিবর্তে টাকা না পাওয়া যায়, তত সময় পর্যন্ত ক্রয-বিক্রয় সম্পূর্ণ হয় না।

২। ড্রাফ্‌ট—Draft

একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবার জন্য যে আদেশপত্র দেয়, তাহাকে ড্রাফ্‌ট বলা হয়।

৩। ব্যাঙ্ক-প্রবর্তিত নোট—Bank note

চাহিবামাত্র বিহিত মুদ্রার নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থপ্রদান করিবার প্রতিশ্রুতিতে ব্যাঙ্ক যে কাগজী টাকা চালু করে, তাহাকে ব্যাঙ্ক নোট বলা হয়। বর্তমানে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাঙ্ক নোট চালু করিতে পারে না।

ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা—Banking System in India

ভারতবর্ষে দেশীয় পদ্ধতিতে ব্যাঙ্কের কায বহুদিন পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে এ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠিগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যাঙ্কের কার্য সম্পর্কে বাংলার জগৎশেঠের নাম ভারত-বিখ্যাত হইয়াছিল। ইংরেজ শাসনকালে উনবিংশ শতাব্দী হইতেই আধুনিক পদ্ধতিতে

ভারতে প্রথম ব্যাঙ্কের কার্য আরম্ভ হয়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভারত ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে অনুন্নত। বর্তমানে ভারতে নিম্নলিখিত ব্যাঙ্কগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

১। রিসার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া—Reserve Bank of India

রিসার্ভ ব্যাঙ্ক হইল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ১৯৩৪ সালের রিসার্ভ ব্যাঙ্ক আইনানুসারে ১৯৩৫ সালে এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ব্যাঙ্কের মূলধন হইল ৫ কোটি টাকা এবং যৌথ-মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে ১০০৲ টাকা মূল্যের প্রত্যেকটি শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়া এই মূলধন সংগ্রহ করা হয়। ১৯৪৮ সালে এই ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করা হয়। এখন ভারত সরকারই হইল সব শেয়ারেরমালিক। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন গভর্ণর, দুইজন ডেপুটি গভর্ণর, দশজন সাধারণ সদস্য ও একজন সরকারী কর্মচারী লইয়া এই ব্যাঙ্কের একটি পরিচালক সমিতি গঠিত হইয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে চারিটি শাখা সমিতি আছে। গভর্ণর ব্যাঙ্কের প্রধান কর্মসচিব হইলেও চারিটি স্থানীয় সমিতির হস্তে কিছু কিছু কার্যভার দেওয়া হইয়াছে।

রিসার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় এবং দেশের সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ও মুদ্রানীতি পরিচালিত করে। রিসার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে ইহার কাজ দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন করিতে পারে সেজন্য ইহাকে কতকগুলি ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

কার্য—Functions

প্রথমতঃ, একমাত্র রিসার্ভ ব্যাঙ্কই ভারতে কাগজী নোট প্রবর্তন করিতে পারে। ১৯৫৬ সালের আইন পাস হইবার পূর্বে মোট চালু নোটের শতকরা অন্ততঃ ৪০ ভাগ স্বর্ণ এবং বাকী অংশ স্টার্লিংএ ও সরকারী ঋণ-পত্র, রৌপ্যমুদ্রা প্রভৃতিতে রাখিতে হইত। ১৯৫৭ সালের সংশোধন আইনের বলে বর্তমানে ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও ৮৫ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা বা ঋণ-পত্র জমা রাখিয়া উহা যে-কোন পরিমাণ কাগজী নোট প্রচলন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। যে সমস্ত ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলে মোট পাঁচলক্ষ টাকা আছে তাহারা এই ব্যাঙ্কের সদস্য হইতে পারে এবং এই ব্যাঙ্কগুলিকে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক (Scheduled Banks) বলা হয়। প্রত্যেক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ইহার

স্থায়ী অমানতের ২ ভাগ ও চল্‌তি আমানতের ৫ ভাগ রিসার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে বাধ্য। প্রয়োজন হইলে রিসার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ ৫ হইতে ২০ ও ২ হইতে ৮ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারে। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের প্রয়োজনের সময় রিসার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ এই ব্যাঙ্কে জমা রাখে এবং সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে রিসার্ভ ব্যাঙ্কই সমস্ত সরকারী আদান-প্রদান করে। রিসার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের জন্য ঋণ তোলে ও ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে। চতুর্থতঃ, এই ব্যাঙ্ক বিদেশী বিনিময়-হারও নিয়ন্ত্রিত করে। টাকা প্রতি ১ শি. ৬ পে. হিসাবে বিলাতি অর্থ স্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয় করে। ডলার ও অন্যান্য দেশের মুদ্রাও নির্দিষ্ট হারে বিনিময় করে। পঞ্চমতঃ, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লী এই চারিটি কেন্দ্রের মধ্যে ইহা চেক্‌ বিনিময় করে। ষষ্ঠতঃ, এই ব্যাঙ্কের একটি কৃষিঋণ বিভাগ (Agricultural Credit Department) আছে। কৃষকদিগকে ঋণ দেওয়া সম্পর্কে এই বিভাগ নীতি নির্ধারণ করে। ইহা ছাড়া রিসার্ভ ব্যাঙ্ক আমানত রাখিতে পারে, কিন্তু কোন সুদ দেয় না। কতকগুলি বিশেষ সর্তে ইহা টাকা ধারও দিতে পারে।

রিসার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ দুইটি বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়, যথা, নোট-প্রচলন বিভাগ (Issue Department) ও ব্যাঙ্কিং বিভাগ (Banking Department)।

২। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক—State Bank of India

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক একত্রিত করিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নামে একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গঠিত হয়, ইহা ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের শীর্ষস্থানীয় ছিল। এই ব্যাঙ্কের আমানত পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি টাকারও বেশী। ইহার বিদেশে অনেকগুলি শাখা ছিল এবং যে সমস্ত জায়গায় রিসার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা ছিল না, সে সমস্ত জায়গায় এই ব্যাঙ্ক সরকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করিত।

১৯৫৪ সালে ভারত সরকার সর্বভারতীয় গ্রাম-ঋণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৫৫ সালে একটি

আইন পাস করিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়; ইহার নূতন নাম হইল স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া।

ব্যাঙ্কের মূলধন-পরিমাণ হইল ২০ কোটি টাকা। সরকার পূর্বের অংশীদারগণের শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করিয়া দিয়া বর্তমানে সমস্ত শেয়ারের মালিক হইয়াছেন। ২০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সমিতির উপর ইহার পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে; গ্রাম-ঋণদান করিবার সু-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যেই এই ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে। টাকা আমানত রাখা, ধার দেওয়া প্রভৃতি সাধারণ ব্যাঙ্ক-সম্পর্কিত কাজ ছাড়াও এই ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য হইল কৃষি-ঋণব্যবস্থার উন্নতি করা। এই উদ্দেশ্যে আগামী পাঁচ বৎসরে এই ব্যাঙ্কের গ্রামাঞ্চলে ৪০০ শাখা স্থাপন করিতে হইবে। ইতিমধ্যে প্রায় ৩০০ শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

৩। ভারতীয় যৌথ-মূলধনী ব্যাঙ্ক—Joint Stock Banks of India

এই ব্যাঙ্কগুলি পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে উনবিংশ শতাব্দী হইতে ভারতে গঠিত হইতে থাকে। বর্তমানে ভারতে এই ব্যাঙ্কের সংখ্যা চারিশতেরও অধিক। এই ব্যাঙ্কগুলি যৌথ মূলধনের ভিত্তিতে শেয়ার বিক্রয় করিয়া গঠিত হইয়াছে। যে সমস্ত যৌথ-মূলধনী ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার অধিক তাহারা রিসার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা মাত্র ৯০টি।

এই ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ আমানত লয় ও ধার দেয়। ইহা ছাড়া, ইহারা ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সম্পর্কিত অন্য নানাবিধ কার্য করিয়া থাকে।

৪। বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক—Foreign Exchange Banks

এই ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী মূলধনে গঠিত এবং ইহাদের কাজ বিদেশীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত হয়। আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থ লেন-দেন করাই হইল ইহাদের প্রধান কাজ। ইহা ছাড়াও, এই ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয়গণের আমানত রাখে ও বৈদেশিক বাণিজ্যরত ব্যবসায়িগণকে ধার দেয় এবং ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত অন্য নানাবিধ কাজ করে। ইহাদের বিপুল মূলধন ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়-সংক্রান্ত উচ্চতর অভিজ্ঞতার সহিত ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। এই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির প্রতিযোগিতা ভারতের ব্যাঙ্কগুলির প্রসারে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। লয়েডস্ ব্যাঙ্ক, টমাস্ কুক, হংকং ব্যাণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্ক প্রভৃতি হইল এই জাতীয় বিদেশী-

ব্যাঙ্ক। ভারতে এইরূপে প্রায় ১৫।১৬টি বিদেশী ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে। এই ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত-পরিমাণ ১৮৫ কোটি টাকারও অধিক। এই ব্যাঙ্কগুলিই ভারতের বৈদেশিক বিনিময়-সংক্রান্ত সমস্ত মুনাফাই পাইয়া থাকে।

৫। শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক—Industrial Banks

ভারত শিল্পে অনগ্রসর দেশ। ইহার প্রধান কারণ হইল শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গঠন ও পরিচালনা-কার্যে দীর্ঘকালের জন্য যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করিতে হয় সে পরিমাণ দীর্ঘ-মেয়াদী ধার ভারতে পাওয়া যায় না। শেয়ার বিক্রয় করিয়া যৌথ-মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে এত অধিক মূলধন সংগ্রহ করা যায় না। আবার দেশে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে তাহারা দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দিতে চায় না। শিল্পের জন্য মূলধন সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে একটি আইন পাস করিয়া **শিল্প-ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Industrial Finance Corporation)** স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত মূলধন হইল ১০ কোটি টাকা। ভারত সরকার, রিসার্ভ ব্যাঙ্ক, তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি, বীমা-কোম্পানী, সমবায় ব্যাঙ্কগুলি, বিনিযোগ ট্রাষ্ট প্রভৃতি ইহার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান নূতন বড বড শিল্পগঠনের জন্য বা পুরাতন শিল্পগুলির সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে (২০ বৎসর পর্যন্ত) ঋণদান করিতে পারে। ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান বস্ত্র, চিনি, কাগজ, সিমেণ্ট মোটর-যান প্রভৃতি শিল্পে প্রায় ১৫ কোটি টাকা ধার দিয়াছে।

ছোট ও কুটিরশিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে রাজ্য ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আইন পাস হয়। এই আইনের ভিত্তিতে পাঞ্জাব, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, প্রভৃতি রাজ্যে **রাজ্য ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (State Finance Corporation)** গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা রাজ্য সরকার-গুলির নিয়ন্ত্রণাধীন। ইহা ছাড়া **শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ-প্রতিষ্ঠান (Industrial Credit and Investment)** এবং **জাতীয় শিল্পোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (National Industrial Development Corporation)** নামে আরও দুইটি ঋণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। প্রথম প্রতিষ্ঠানের অনেক শেয়ার ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বিক্রয় হইয়াছে। ভারত সরকার ও

বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট হইতেও এই প্রতিষ্ঠান অনেক ধার পাইয়াছে। বে-সরকারী ক্ষেত্রে মাঝারি ধরণের শিল্পগুলিকে ধার দিবার জন্য ১২.৫ কোটি টাকা মূলধন লইয়া গঠিত একটি **পুনঃ ঋণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Re-finance Corporation)** স্থাপন করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে অর্থ ও তাহাদের উন্নতির জন্য অন্য নানাবিধ সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে ১০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া গঠিত **জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান (National Small Industries Corporation)** স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে সাহায্য করিয়াছে।

৬। সমবায় ব্যাঙ্ক—Co-operative Credit Bank

ভারতের চাষী ও কুটিরশিল্পিগণকে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এ সম্পর্কে অষ্টম অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

৭। জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক—Land Mortgage Banks

কৃষিকার্যে লাঙ্গল, বলদ, সার প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য যেরূপ চলতি খরচের প্রয়োজন হয়, সেচব্যবস্থা প্রভৃতি জমির স্থায়ী উন্নতিকর কার্যের জন্য তদ্রূপ দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হয়। সমবায় ব্যাঙ্কগুলি স্বল্প-মেয়াদে স্বল্প পরিমাণ ধার দিতে পারে। কৃষিকার্যের স্থায়ী উন্নতির জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

এই ব্যাঙ্কগুলি জমি বন্ধক রাখিয়া কৃষকগণকে দীর্ঘদিনের জন্য ঋণ প্রদান করে। পুরাতন ঋণ পরিশোধ, জমির স্থায়ী উন্নতি এবং নূতন জমি কিনিবার জন্য এই ব্যাঙ্ক বন্ধকী জমির মূল্যের অর্ধেক ধার দিয়া থাকে। প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি সমবায় ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে আবার যৌথ-মূলধনী ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে অথবা এই উভয় পদ্ধতির সহযোগেও গঠিত হইতে পারে। ভারতের প্রাথমিক জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি সমবায় ভিত্তিতে গঠিত হইলেও কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি এই উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে।

ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠিত হইলেও বোম্বাই ও মাদ্রাজ ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যে ইহা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। এদেশের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য অধিক

পরিমাণ ধার দেয়। জমির স্থায়ী উন্নতিকল্পে এখনও পর্যন্ত এই ব্যাঙ্কগুলি বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই।

৮। দেশীয় ব্যাঙ্ক—Indigenous Banks

ভারতের দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি পুরাতন ভারতীয় পদ্ধতিতেই আজ পর্যন্ত তাহাদের লেন-দেনের কারবার পরিচালিত করিতেছে। বিভিন্ন স্থানে এই ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত, যথা, মহাজন, শেঠ, সাহুকর, চেটি প্রভৃতি। এই ব্যাঙ্কগুলি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক মালিকানা ও পরিচালনাধীন হইয়া থাকে এবং অনেক সময় বংশ-পরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে। ইহারা নিজেদের টাকা ধার দেয় এবং অনেক সময় আমানত রাখে, কিন্তু ব্যাঙ্কের মত আমানতকারীকে চেক্ দেয় না। এই ব্যাঙ্কগুলি হুণ্ডি কাটে এবং দেশীয় ব্যাঙ্কের হুণ্ডি সর্বত্র গৃহীত হয়। ইহারা শহরে ও মফঃস্বলে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও ছোট ছোট শিল্পগুলিকে টাকা ধার দেয়। ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে, কারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় সমগ্র অর্থপরিমাণের প্রায় ৮৭ ভাগই ইহারা সরবরাহ করিয়া থাকে।

৯। ভারত সরকারের ব্যাঙ্কিং কার্য—Government of India as a Banker

ভারত সরকার নিজেও ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত অনেক কাজ করে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল 'পোস্ট আফিস সঞ্চয় ব্যাঙ্ক' পরিচালনা করা। ইহা ছাড়া, কৃষকগণকে তাকাবি ঋণদান, ক্ষুদ্রশিল্প সংরক্ষণের জন্য অগ্রিম ঋণদান প্রভৃতি ব্যাঙ্ক-সম্পর্কিত কার্যও করিয়া থাকে।

ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের ত্রুটি—Defects of Indian Banking

আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় অতিক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মফঃস্বলের কথা ছাড়িয়া দিলেও ছোট ছোট এমন অনেক শহর আছে যেখানে আদৌ কোন ব্যাঙ্ক নাই। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, আমাদের দেশের লোকের এখনও পর্যন্ত ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের প্রতি কোন আগ্রহ জন্মে নাই। ইংলণ্ডে মাথাপিছু আমানতি জমার পরিমাণ হইল ৯৭৩্ টাকা, আর ভারতে মাথাপিছু আমানতি জমার পরিমাণ হইল মাত্র ২৩্ টাকা। অবশ্য এজন্য ভারতের লোকের চির-

দারিদ্র্য কিছু পরিমাণে দায়ী। ইংলণ্ডে প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য ২২৯টি ব্যাঙ্ক আর ভারতে প্রতি দশ লক্ষে মাত্র ১৫'৫টি করিয়া ব্যাঙ্ক আছে। আর এই ব্যাঙ্কগুলিও শুধু বড বড শহরগুলিতে অবস্থিত। ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের আর একটি ত্রুটি হইল যে, অন্যান্য দেশে যেরূপ নানা জাতীয় ব্যাঙ্ক, যথা, শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আছে, ভারতে তাহা নাই। ভারতে ব্যাঙ্কের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য এবং ইহাদের মূলধন-পরিমাণ ও সংরক্ষিত তহবিল-পরিমাণও খুব স্বল্প। ব্যাঙ্কগুলির আয়তন ক্ষুদ্র ও নানাস্থানে শাখা-প্রশাখা বিস্তারের প্রথা আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় না। ব্যাঙ্কের পরিচালকগণের অনভিজ্ঞতাও ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের প্রসারের আর একটি অন্তরায়। বর্তমানে রিসাভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরকার ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা ও ব্যাঙ্ক-পরিচালনা সম্পর্কে এত কঠোর বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিয়াছেন যে, তাহার দ্বারা ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের প্রসাব অনেক পবিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তবে সুখের বিষয় সম্প্রতি মফঃস্বল অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের শাখা বিস্তার করিবার ব্যবস্থা করিয়া সরকাব এদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উন্নতির কিছু চেষ্টা কবিতেছেন।

সংক্ষিপ্তসার

অর্থ

বহুপূর্বে মানুষ অর্থের ব্যবহার জানিত না। তখন দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্য-বিনিময় হইত। দ্রব্যবিনিময়-ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা ছিল। এই অসুবিধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে অর্থেব আবিষ্কার হয় এবং সোনা-রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুগুলি অর্থহিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

অর্থের সংজ্ঞা ও কাজ

ধনবিজ্ঞানের অর্থ বলিতে আমরা বিনিময়ের সেই সমস্ত মাধ্যমকে বুঝি যাহা সকলে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ কবে এবং যাহাব দ্বারা দেনা-পাওনা শোধ হয়। অর্থ (১) বিনিময়ের বাহন, (২) মূল্যের পরিমাপক, (৩) সঞ্চয়ের বাহন, (৪) স্থগিত আদান-প্রদানের মান হিসাবে কাজ করে।

মুদ্রামান

মুদ্রা-ব্যবস্থা এক ধাতুমান বা দ্বি মানধাতু হইতে পারে। দেশের প্রামাণিক

অর্থ যদি এক ধাতুতে তৈয়ারী হয় তাহা হইলে এক-ধাতুমান এবং দুই ধাতু দ্বারা তৈয়ারী হইলে তাহাকে দ্বি-ধাতুমান বলা হয়। দ্বি-ধাতুমানে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মুদ্রার অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকে এবং উভয় মুদ্রাই অসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হয়।

প্রামাণিক ও প্রতীক মুদ্রা

বিনিময়ের মান হিসাবে যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলা হয়। ইহার মুদ্রামূল্য ধাতব মূল্যের সমান হয় ও ইহার অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকে। প্রতীক মুদ্রার মুদ্রামূল্য ইহার ধাতব মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়। ইহা সসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকে না।

যে অর্থে পাওনাদারগণ তাহাদের পাওনা লইতে বাধ্য, তাহাকে বিহিত মুদ্রা বলা হয়।

ভারতের টাকা

ভারতের টাকা ভারতের মধ্যে প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে চালু থাকিলেও প্রকৃত-পক্ষে ইহা প্রামাণিক মুদ্রা নহে। ধাতব মূল্য অপেক্ষা ইহার মুদ্রামূল্য বেশী এবং ইহার অবাধ মুদ্রাঙ্কন নাই।

স্বর্ণমান

স্বর্ণমান হইল এক-ধাতুমান। স্বর্ণমানের বৈশিষ্ট্য হইল যে, স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন থাকে এবং স্বর্ণমুদ্রাই দেশের প্রামাণিক মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হয়। পরবর্তী কালে যে স্বর্ণমানের প্রচলন হয় তাহাতে দেশের প্রামাণিক মুদ্রার মূল্য স্বর্ণমূল্যের সহিত সম্পর্কিত থাকিলেও দেশের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল না।

কাগজীমান

আধুনিককালে দেশের বিহিত অর্থ প্রতীক মুদ্রা ও কাগজী নোট লইয়া গঠিত হয়। এই অর্থের মূল্য স্বর্ণের উপর নির্ভর করে না এবং ইহার জন্য কোন স্বর্ণ তহবিল রাখিতে হয় না। এইজন্য ইহাকে কাগজীমান বলে। ভারতে বর্তমানে কাগজীমান প্রচলিত আছে।

হইলে অর্থমূল্য দ্বিগুণ হইবে এবং দ্রব্যমূল্য অর্ধেক হইবে। ধরা যাউক, যদি ৩০টি দ্রব্য বিক্রয়ার্থ থাকে আর ৩০টি মুদ্রা থাকে তাহা হইলে প্রত্যেকটি দ্রব্য এক একক অর্থে বিক্রীত হইবে। দ্রব্যের পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে আর অর্থ পরিমাণ যদি দ্বিগুণ হয় অর্থাৎ ৬০ হয় তাহা হইলে একটি জিনিস কিনিতে এক একক অর্থের পরিবর্তে দুই একক অর্থ ব্যয় হইবে অর্থাৎ অর্থের মূল্য অর্ধেক হইবে কিন্তু দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হইবে। অপর পক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ ঠিক থাকিয়া যদি অর্থের পরিমাণ কমে অর্থাৎ ৩০ এর স্থলে ১৫ হয়, তাহা হইলে অর্থমূল্য দ্বিগুণ হইবে কিন্তু দ্রব্য মূল্য অর্ধেক হইবে।

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব অনুসারে বলা হয় যে, স্বল্প-মেয়াদে বিহিত অর্থের প্রচলন ক্ষিপ্রতা, ঋণগত অর্থ ও ইহার প্রচলন ক্ষিপ্রতা ও দ্রব্যাদির পরিমাণ সাধারণতঃ পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং বিহিত অর্থের পরিমাণের উপরই অর্থমূল্য নির্ভর করে।

ধনবিজ্ঞানী ফিসার এই তত্ত্বটিকে একটি সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন—

$$\text{ম} = \frac{\text{অপ্র} + \text{ঋপ্র}'}{\text{স}} \left(P = \frac{MV + M'V'}{T} \right)$$

উপরের দেওয়া সমীকরণে ব্যবহৃত অক্ষরগুলির তাৎপর্য হইল :

ম = মূল্যস্তর (Price level = P)

অ = বিহিত অর্থ (Legal tender money = M)

প্র = অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা (Velocity of circulation of money = V)

ঋ = ঋণগত অর্থ (Credit money = M′)

প্র = ঋণগত অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা (Velocity of circulation of credit = V′)

স = মোট সামগ্রীর পরিমাণ (Volume of trade = T)

সমালোচনা—Criticism

অন্যান্য অর্থনৈতিক তত্ত্বের ন্যায় অর্থের পরিমাণতত্ত্বও অনুমানসিদ্ধ তত্ত্বমাত্র। এই তত্ত্বটিতে ধরিয়া লওয়া হয় যে, অর্থের পরিমাণ পরিবর্তিত হইলেও বিক্রয়-যোগ্য দ্রব্য, বিহিত ঋণগত অর্থের (T, V, V′) প্রচলন ক্ষিপ্রতায় কোন

পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু এই অনুমান ঠিক নহে। অর্থের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের পরিমাণেও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ইহা ছাড়াও বলা যায় যে, অর্থের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ইহার প্রচলন-ক্ষিপ্রতারও পরিবর্তন ঘটে।

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব আলোচনা করিয়া শুধু বলিতে পারা যায় যে, অন্যান্য দ্রব্যমূল্যের ন্যায় অর্থের মূল্যও ইহার চাহিদা ও যোগান—এই উভয়ের প্রভাবে নির্ধারিত হয়। কিন্তু অর্থের এই চাহিদা ও যোগান এত বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে, অর্থের মূল্য একমাত্র অর্থের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়—এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

মূল্যস্তর পরিমাপ করিবার উপায়—সূচক সংখ্যা—Measurement of changes in the general price level—Simple index numbers

অর্থের মূল্যের পরিবর্তন অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ করিবার জন্য সূচক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন দ্রব্যের গড়পড়তা দামের শতকরা কত পরিবর্তন হইয়াছে তাহা স্থির করাকেই সূচক সংখ্যা বলা হয়। সূচক সংখ্যা প্রস্তুত করিবার জন্য (১) প্রথমতঃ, একটি বিশেষ বৎসর অথবা নির্দিষ্ট কালকে ভিত্তি-বৎসর (Base year) হিসাবে ধরিতে হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং (৩) এই নির্বাচিত দ্রব্যগুলির চল্‌তি দর সংগ্রহ করিতে হয়। (৪) পরবর্তী কালে অর্থাৎ যে সময়ের অর্থ-মূল্যের পরিবর্তন জানিতে চাওয়া হয় তখন ঐ ঐ দ্রব্যের দামের ভিত্তি-বৎসরের দামের সহিত শতকরা কত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার তুলনা করা হয়। (৫) সর্বশেষে এই পরবর্তী কালের দ্রব্যমূল্যের সমষ্টিকে দ্রব্য-সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ঐ সময়ের গড়পড়তা দাম পাওয়া যায়। এই সংখ্যাই হইল সূচক সংখ্যা। ভিত্তি-কালের সূচক সংখ্যা হইতে যদি এই সংখ্যা বেশী হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অর্থমূল্য হ্রাস পাইয়াছে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার, পরবর্তী কালের সূচক সংখ্যা যদি কম হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অর্থমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইয়াছে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটির দ্বারা সূচক সংখ্যার ধারণা স্পষ্টতর করা যাইতে পারে।

দ্রব্য	ভিত্তি-বৎসর (১৯৩৮)		পরবর্তী কাল (১৯৪৫)	
	মূল্য		মূল্য	
চাউল প্রতিমণ	৫৲	১০০	১৫৲	৩০০
ডাইল „	৩৲	১০০	৬৲	২০০
লবণ „	১।০	১০০	৩৵০	২৫০
কাপড় প্রতি জোড়া	৪৲	১০০	৮৲	২০০
মোট দর /		৪০০ ÷ ৪		৯৫০ + ৪
গড় দর		১০০		১৩৭'৫

উপরের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, ১৯৩৮ সালে দ্রব্যগুলির গড়পড়তা দর ছিল ১০০, ১৯৪৫ সালে গড়পড়তা দর হইল ২৩৭'৫। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভিত্তি-বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৫ সালে দ্রব্যমূল্যের গড়-পড়তা দর (২৩৭'৫—১০০) বা ১৩৭'৫ বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ অর্থের মূল্য ঐ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

সূচক সংখ্যার উপযোগিতা—Utility of Index numbers

সূচক সংখ্যার সাহায্যে একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, ইহার সাহায্যে দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা যায়। জীবনযাত্রার ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধিও সূচক সংখ্যার সাহায্যে স্থির করা যায়। ইহা ছাড়া, সূচক সংখ্যার সাহায্যে শ্রমিকের মজুরি, আমদানি-রপ্তানী, কর্মসংস্থান প্রভৃতির পরিবর্তনের পরিমাপ করা যায়। সূচক সংখ্যার সাহায্যে নির্ধারিত মূল্য-পরিবর্তনের ভিত্তিতে শ্রমিকের মজুরির পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি করা যায়। বিভিন্ন সময়ে একই শ্রেণীর লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য এবং ঋণ-দাতা ও ঋণ-গ্রহীতার সম্পর্কও সূচক সংখ্যার সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

মুদ্রাস্ফীতি—Inflation

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলেই সাধারণতঃ তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। কিন্তু ইহা সব সময়ে সত্য নহে। মুদ্রাস্ফীতি ব্যতীতও অন্য নানাকারণে মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া গেলে

বা মজুরির হার বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যমূল্য বাড়িতে পারে, কিন্তু এই জাতীয় মূল্য-বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি-জনিত মূল্যবৃদ্ধি বলা সমীচীন নহে। সরকার যদি বাজারে অধিক পরিমাণে অর্থ চালু করে তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। লোকের কর্ম-সংস্থানের উদ্দেশ্যে উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য সরকার যখন বেশী পরিমাণে অর্থ সৃষ্টি করে তখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে না। কারণ মুদ্রাস্ফীতির ফলে বেকারের সংখ্যা কমিয়া যায় এবং উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া অর্থপরিমাণের সহিত সমতা আনয়ন করে। কিন্তু এই পূর্ণ কর্মসংস্থাপনের পরও যদি সরকার বাজারে আরও অধিক নূতন অর্থ চালু করে, তাহা হইলে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এবং দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। এই অবস্থায় মূল্যবৃদ্ধির কারণ হইল যে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে আর নূতন কর্মসংস্থান দ্বারা উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। মুদ্রাস্ফীতির ফলে লোকের আর্থিক আয় বাড়ে। আর্থিক আয় বাড়িলেই ব্যয়ও বাড়ে। কিন্তু উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বাড়িতে পারে না। কাজেই দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বাড়িয়াই যায়।

আবার যখন মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পায় অথচ দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ সমান থাকে তখন লোকের আর্থিক আয় কমিবার ফলে ব্যয় পরিমাণও হ্রাস পায়। ফলে মূল্য হ্রাস পায়। এই অবস্থাকে মূল্যহ্রাস (মুদ্রা-কুঞ্চন—Deflation) বলে।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ—Causes of Inflation

নানা কারণে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। অর্থের পরিমাণতত্ত্ব আলোচনা কালে দেখা গিয়াছে যে, অর্থের মূল্য অর্থের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। অর্থের চাহিদা মোট বিক্রয়ের জন্য মজুত দ্রব্যসামগ্রীর উপর নির্ভর করে এবং অর্থের পরিমাণ মোট বিহিত অর্থ ও ঋণগত অর্থের পরিমাণ ও এই উভয়ের প্রচলন ক্ষিপ্রতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং অর্থের বিনিময়ে বিক্রয়ার্থ মোট সামগ্রী-পরিমাণ, মোট অর্থপরিমাণ ও উহার প্রচলন-ক্ষিপ্রতার পরিবর্তন ঘটিলেই মূল্যের পরিবর্তন ঘটিবে। বিক্রয়ার্থে মজুত দ্রব্যপরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিয়া যদি অর্থপরিমাণ বা ইহার প্রচলন-ক্ষিপ্রতা অথবা ঋণগত অর্থপরিমাণ বা ইহার প্রচলন-ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, আবার এইগুলি হ্রাস পাইলে মূল্য কমিবে। অপর পক্ষে, অর্থপরিমাণ ও অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত

থাকিলে যদি বিক্রয়ার্থ দ্রব্যপরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে মূল্য হ্রাস পাইবে এবং দ্রব্যপরিমাণ হ্রাস পাইলে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

মুদ্রাস্ফীতির কুফল—Evil effects of Inflation

মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে বিভিন্ন লোকের অবস্থা বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। দাম বাড়িলে কাহারও হয়ত লাভ হয়, আবার কাহারও হয়ত লোকসান হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজের বিভিন্ন লোকের অবস্থা কি হয় তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

১। দেনাদার ও পাওনাদার—মুদ্রাস্ফীতির ফলে মূল্য বৃদ্ধি পাইলে দেনাদারের লাভ হয় এবং পাওনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দেনাদার সমান পরিমাণ অর্থ প্রদান করিলেও মূল্য-বৃদ্ধির ফলে পাওনাদার ঐ টাকায় পূর্বাপেক্ষা কম জিনিষ কিনিতে পারে। মূল্য যখন কমে তখন পাওনাদারের লাভ হয়, কারণ সে একই পরিমাণ অর্থদ্বারা বেশী পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে পারে।

২। মজুর—মূল্য বৃদ্ধি পাইলে মজুর শ্রেণীর সব চেয়ে বেশী কষ্ট হয়। কারণ মূল্য-বৃদ্ধির সহিত তাহাদের মজুরী বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া তাহারা কম পরিমাণ দ্রব্য পায়। তবে মূল্য-বৃদ্ধির সময় সাধারণতঃ শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। ফলে শ্রমিকেরা বেশী কাজ পায়—বেকার হইবার ভয় থাকে না। মূল্য হ্রাস পাইলে শ্রমিকদের সুবিধা হয়। তাহারা একই পরিমাণ অর্থে বেশী পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে পারে। তবে মূল্য হ্রাসের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য কমিয়া যায়, ফলে বেকার হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৩। নির্দিষ্ট আয়ের লোক—শিক্ষক, কেরাণী, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি যাহারা মাসে নির্দিষ্ট হারে বেতন পায়, মূল্য বৃদ্ধির সময় তাহাদের বিশেষ অসুবিধা হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলেও তাহাদের বেতন বৃদ্ধি হয় না। মূল্য হ্রাস হইলে এই সকল শ্রেণীর সুবিধা হয়।

৪। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী—মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সাধারণতঃ লাভবান হয়। কারণ জমি বা বাড়ীর খাজনা, শ্রমিকের মজুরি, যন্ত্রপাতির মূল্য প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায় না, অথচ উৎপাদিত দ্রব্য বেশী দামে তাহারা বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং তাহাদের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মূল্য হ্রাস পাইলে এই শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫। করদাতা—মূল্য বৃদ্ধি পাইলে করদাতার করভার লাঘব হয়। কারণ মূল্য-বৃদ্ধি কালে অর্থের বিনিময়ে কম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। সুতরাং করদাতা যে পরিমাণ কর দেয় তাহাতে তাহার কম ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। যখন ৫৲ টাকা চাউলের মণ তখন ৫৲ টাকা কর দিতে হইলে লোকে ভাবে যে, এই ৫৲ টাকায় একমণ চাউল কেনা যাইত। কিন্তু চাউলের মণ যখন ২০৲ টাকা তখন ৫৲ টাকা কর দেওয়ার সময় সে ভাবে যে এই টাকায় ১০ সের চাউল পাওয়া যাইত। আবার মূল্য হ্রাস পাইলে করভার বেশী হয়।

মুদ্রাস্ফীতি-নিরোধের উপায়—Measures for Combating Inflation

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিক্রয়ার্থ মজুত দ্রব্যের পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে এবং অর্থের সরবরাহ যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মূল্য বাড়ে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিতে হইলে অর্থের সরবরাহ যাহাতে না বাড়ে তাহা করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা হয়।

(ক) সরকার উচ্চহারে কর ধার্য করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া বাজারে প্রচলিত অর্থপরিমাণ কমাইতে পারে।

(খ) সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ-গ্রহণ করিয়াও অর্থপরিমাণ হ্রাস করিতে পারে।

(গ) সরকার জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিয়াও অর্থপরিমাণ হ্রাস করিতে পারে।

(ঘ) অর্থের মালিকগণ যাহাতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ব্যয়বৃদ্ধি না করিতে পারে সেজন্য সরকার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ আটক (Freezing or Blocking liquid assets) রাখিতে পারে। ইহার ফলে বাজারে কম পরিমাণ অর্থ থাকে। এইরূপে ঋণ-গ্রহণ বা কর-ধার্য করিয়া যে অর্থ সরকার পায়, তাহা সরকার যদি নিজে ব্যয় না করে তাহা হইলেই মুদ্রাস্ফীতি কমিতে পারে।

(ঙ) মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ করিয়া (Rationing) মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করা যাইতে পারে। এই উপায়ে লোকের ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া তাহাদের সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে।

(চ) উৎপাদন-পরিমাণ বিশেষ করিয়া ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি

দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির নিরোধ করা যায়। অর্থপরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি বিক্রয়ার্থ দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে অর্থের সরবরাহের সঙ্গে অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ হয়।

(ছ) সরকার নূতন মুদ্রা-প্রচলন স্থগিত রাখিয়া ও পুরাতন মুদ্রার কিয়দংশ নষ্ট করিয়াও অর্থপরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। ইহাতেও মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়।

ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ও ইহার কারণ—Inflation in India and its Causes

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে থাকে এবং এখনও পর্যন্ত এই মুদ্রাস্ফীতি বর্তমান রহিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে বর্তমানে কি পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে তাহা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য চাউলের মূল্য-বৃদ্ধির পরিমাণ হইতে কিছু ধারণা করা যায়। ১৯৩৮-৩৯ সালে একমণ উৎকৃষ্ট চাউলের মূল্য ৪॥০ হইতে ৫৲ টাকা ছিল। এখন সেই চাউলের মূল্য ৪০৲ টাকা। এক জোড়া ডিমের দাম তখন কলিকাতা শহরেই ⁄১৫ পয়সা ছিল। এখন তাহার দাম অন্ততপক্ষে ৩৭ নয়া পয়সা। এক সের সরিষার তৈল্যের মূল্য ছিল ॥⁄০ আনা আর এখন ২ টা. ৬০ নয়া পয়সা। একমণ কয়লা যাহা ঐ সময়ে ॥⁄০ আনায় পাওয়া যাইত এখন তাহার দাম ২ টা. ৫০ নয়া পয়সা। সুতরাং মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ সহজেই অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী ও জাপানের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য ভারতকে একটি প্রধান ঘাঁটি করা হয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য মিত্রশক্তির জন্য ভারতে অতিরিক্ত অর্থ সৃষ্টি করা হয়। মিত্রশক্তিবর্গের যুদ্ধ পরিচালনা-সংক্রান্ত ব্যয়নির্বাহের জন্যই এই মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। যুদ্ধের সময়ে যে হারে মুদ্রাপরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সে হারে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য লোকাভাব ঘটে, বহুজমি চাষের অযোগ্য হয়। ইহার ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি গুরুতর আকার ধারণ করে। যুদ্ধের সময়ে কালোবাজারী ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইয়া অনেকক্ষেত্রে চোরাকারবারিগণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া কৃত্রিমভাবে মূল্য বৃদ্ধি করে। ভারতে মুদ্রাস্ফীতির আর একটি কারণ হইল ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক মুদ্রামূল্য হ্রাস (Devaluation)। ইহার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, যুদ্ধের পর ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির আয় অপেক্ষা ব্যয়াধিক্য ঘটিতে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে সরকার যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহার ব্যয়নির্বাহের জন্য ঘাটতি অর্থসংস্থান নীতি অনুসরণ করা হয়। ইহার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে।

গৃহীত প্রতিকার-ব্যবস্থা—Anti-inflationary measures

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার জন্য ভারত সরকার নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। বাজারে চালু অর্থপরিমাণ কমাইবার জন্য সরকার আয়কর, অতিরিক্ত মুনাফাকর, ও উর্ধ্ব আয়করের হার বৃদ্ধি করিয়াছেন। সরকার অনেক রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া সেই দ্রব্যগুলিকে দেশী বাজারে বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়া জিনিসের সরবরাহ-বৃদ্ধি দ্বারাও মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের প্রয়াস পাইয়াছেন। জনসাধারণের ব্যয় করিবার ক্ষমতা যাহাতে হ্রাস পায় এই উদ্দেশ্যে সরকার জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করেন। পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ও ডিফেন্স সার্টিফিকেটে অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য সরকার জনসাধারণকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করেন। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রিসার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হারও বৃদ্ধি করা হয় এবং ১৯৫৬ সালের রিসার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধনী আইন অনুযায়ী তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে রিসার্ভ ব্যাঙ্কে আমানত পরিমাণ চার গুণ বেশী রাখিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা রিসার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও চাউল, চিনি, সরিষার তৈল প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী ও বস্ত্র প্রভৃতির বরাদ্দ ঠিক করিয়াও সরকার মুদ্রাস্ফীতি-জনিত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করেন। এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হওয়ার ফলে মূল্যস্তর কিছু হ্রাস পায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মূল্যস্তর বোধযোগ্যভাবে হ্রাস পায় নাই।

সংক্ষিপ্তসার

অর্থের মূল্য

অর্থমূল্য বলিলে সাধারণতঃ অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা বুঝায় অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ কিনিতে পারে। অর্থমূল্য ও দ্রব্যমূল্য

2. What are the effects of a continuously rising level of prices ?

ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফল কি ?

3. What is inflation ? How does inflation affect businessmen and wage earners ? H.S. (Hu.), 1960

মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে ? ব্যবসায়ী ও শ্রমিকশ্রেণীর উপর মুদ্রাস্ফীতির ফল আলোচনা কর।

4. How will a period of rising prices affect the following groups in the population :–

(a) Farmers ; (b) Wage-earners ; and (c) Teachers.

H S (Hu), Comp. 1960

মূল্যবৃদ্ধিকালে নিম্নলিখিত শ্রেণীর লোকের অবস্থা কিরূপ হয় :–

(ক) কৃষক ; (খ) শ্রমিক ও (গ) শিক্ষক।

উঃ—অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। অর্থপরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে না। কিন্তু যে হারে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তদপেক্ষা বেশী হারে যদি অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়। সরকার যদি উৎপাদন পরিমাণের তুলনায় ক্রমাগত বেশী পরিমাণ অর্থ সৃষ্টি করিতে থাকেন তাহা হইলে মূল্যস্তর ক্রমাগত বাড়িবে ও ইহার ফলে উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ-ব্যবস্থায় জটিলতা সৃষ্টি হইয়া অর্থ নৈতিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

মূল্যবৃদ্ধির ফল :–

১। দেনাদার লাভবান হয়, পাওনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২। মজুরশ্রেণীর অবস্থা খারাপ হয়, কেননা দ্রব্যমূল্য যে হারে বাড়ে মজুরি সে হারে বাড়ে না। কিন্তু এই সময়ে মূল্যবৃদ্ধির ফলে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হয় ও শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে। ফলে শ্রমিকেরা কাজ পায়।

৩। ব্যবসায়ী লাভবান হয়। সস্তায় উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সে বেশী দামে বিক্রয় করে।

৪। স্থির আয়ের লোকের ক্ষতি হয়, যেমন শিক্ষক শ্রেণী। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি না পাইলে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

৫। করদাতার করভার লাঘব হয়।

৬। কৃষক—মূল্যবৃদ্ধি পাইলে কৃষিজাতদ্রব্যেরও মূল্যবৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে কৃষকদের লাভ হয়।

(একাদশ শ্রেণীর জন্য)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

(International Trade)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলে—What is International Trade

যখন বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্যের বিনিময় হয়, তখন এই বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা একই দেশের অধিবাসী বলিয়া একই আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। ক্রেতা ও বিক্রেতা যে অর্থের মাধ্যমে বিনিময়কার্য নিষ্পন্ন করে তাহাও একই সরকার কর্তৃক প্রচলিত অর্থ। সুতরাং পরিবর্তন করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন ভিন্ন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। ইহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিবার জন্য বিনিময়-কার্যে অসুবিধা হয়।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শ্রমবিভাগই হইল আভ্যন্তরীণ বিনিময়-কার্যের প্রধান কারণ। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষমতার আপেক্ষিক পার্থক্যের জন্যই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। মুচি যেরূপ দক্ষতার সহিত জুতা তৈয়ারী করিতে পারে, কৃষক সেরূপ দক্ষতার সহিত জুতা তৈয়ারী করিতে পারে না। অনুরূপভাবে মুচিও কৃষকের মত দক্ষতার সহিত ধান উৎপাদন করিতে পারে না। কাজেই মুচি জুতা তৈয়ারী করে ও কৃষক ধান উৎপাদন করে এবং পারস্পরিক বিনিময় দ্বারা উভয়ের চাহিদা মিটায়। অনুরূপ-ভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষমতার পার্থক্যের জন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিয়া থাকে।

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ—Territorial Division of Labour

সকল ব্যক্তিই যদি সমান দক্ষতার সহিত তাহাদের প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য

প্রস্তুত করিতে পারিত, তাহা হইলে দ্রব্য বিনিময়ের কোন প্রয়োজন হইত না। অনুরূপভাবে সকল দেশই যদি সমান সুবিধাজনক শর্তে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিত, তাহা হইলে আর দেশগুলির মধ্যে দ্রব্য-বিনিময়ের (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের) কোন প্রয়োজন হইত না। ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক দেশই কতকগুলি দ্রব্য-উৎপাদনে বিশেষ সুবিধার অধিকারী থাকে এবং এই বিশেষ সুবিধাগুলির জন্যই একটি দেশ অপর দেশ হইতে কম খরচায় ঐ দ্রব্যগুলি উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া অন্যান্য দেশ উক্ত দ্রব্যগুলি ঐ দেশ হইতে ক্রয় করে। পাট-উৎপাদনে ভারতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে এবং এই বিশেষ সুবিধাগুলির জন্য ভারতে পাট উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। এই কারণে অন্যান্য দেশগুলি ভারত হইতে কাঁচা পাট ও পাট-জাত দ্রব্য ক্রয় করে।

ইংলণ্ডের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার বিশেষ সুবিধা আছে এবং এই সুবিধাগুলির জন্য ইংলণ্ডে যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। এই কারণে ভারত ও অন্যান্য দেশ ইংলণ্ড হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। সুতরাং মুচি যেরূপ জুতা তৈয়ারী এবং চাষী যেমন ধান উৎপাদন করে, ভারত সেইরূপ পাট উৎপাদন করে এবং ইংলণ্ড যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করে। এইরূপ ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ফলে ইংলণ্ড কম খরচায় ভারত হইতে খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল পায় এবং ভারতও ইংলণ্ড হইতে কম দরে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে পারে। এই নীতিকে 'আপেক্ষিক উৎপাদন খরচানীতি' (Law of Comparative Cost) বলা হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে যে বাণিজ্য চলে তাহা প্রধানতঃ ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের কারণ :

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে যে উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তাহার প্রধান কারণ হইল শ্রম ও মূলধনের দেশান্তরে গতিশীলতার অভাব। শ্রমিকগণ সাধারণতঃ বিদেশের নানা অনিশ্চয়তার জন্য বিদেশে যাইতে চায় না। মূলধনের মালিকও ঐ একই কারণে বিদেশে তাহার পুঁজি খাটাইতে ইচ্ছুক নহেন। শ্রম ও মূলধনের এই গতিশীলতার অভাবের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশে একই দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের পার্থক্য হয়। এই কারণে কোন দেশ কোন

একটি দ্রব্যের উৎপাদনে অধিকতর সুবিধার অধিকারী, আর কোন দেশের তত সুবিধা নাই।

শ্রম ও মূলধনের গতিশীলতার অভাব ব্যতীত নৈসর্গিক কারণেও দেশগুলির আপেক্ষিক উৎপাদন-দক্ষতার পার্থক্য হইতে পারে। কোন কোন দেশ আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত ও ভূমির বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ বিশেষ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে, আবার কোন কোন দেশ খনিজ পদার্থের প্রাচুর্যের কারণে নানা শিল্পজাত দ্রব্য-উৎপাদনে বিশেষ সুবিধার অধিকারী হইতে পারে। এই সমস্ত সুবিধা বা অসুবিধা এক দেশ হইতে অন্য দেশে স্থানান্তর করা যায় না বলিয়া দেশগুলির আপেক্ষিক সুবিধা বা অসুবিধাগুলি সমান থাকে এবং ভৌগোলিক ভিত্তিতে উৎপাদন-ব্যবস্থা চলিতে থাকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা—Advantages of International trade

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা একটি দেশ ইহার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। একটি দেশ নিজে যাহা উৎপাদন করিতে পারে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বারা সেই দ্রব্য বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া নিজের অভাব পূরণ করিতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে অন্যান্য দেশগুলি ভারত ও পাকিস্তান হইতে পাট সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

২। যে দেশে কোন দ্রব্যের উৎপাদন-খরচা অধিক, সে দেশ দেশের মধ্যে উক্তদ্রব্য উৎপাদন না করিয়া স্বল্প ব্যয়ে অন্য দেশ হইতে উক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে।

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে যে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয়, তাহার ফলে প্রত্যেক দেশ সেই সেই দ্রব্যের উৎপাদনে তাহার শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করে, যে যে দ্রব্যের উৎপাদনে তাহার সর্বাধিক সুবিধা আছে। এইরূপ ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক দেশের শ্রম ও মূলধনের সর্বাধিক সু-ব্যবহার হয় এবং ইহার ফলে উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতা চলে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফলে একই দ্রব্যের মূল্য

সর্বত্র সমান হইবার প্রবণতা দেখা যায়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য উৎপাদক সংঘ, যৌথ ব্যবসায় প্রভৃতি একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া মূল্য-বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিত হয়।

৫। দুর্ভিক্ষের সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা যে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য, সেখান হইতে খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশের জনগণের জীবনরক্ষা করা সম্ভব হয়।

৬। অর্থনৈতিক সুবিধা ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরও কতকগুলি সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। এই পারস্পরিক সংস্পর্শের ফলে তাহাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাহাদের মধ্যে দ্রব্যের আদান-প্রদান ব্যতীতও ভাবের আদান-প্রদান হয়। ফলে আন্তজাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইয়া পারস্পরিক বিরোধের সম্ভাবনা দূর করে।

অসুবিধা—Disadvantages

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কতকগুলি সুবিধা থাকিলেও ইহা সম্পূর্ণরূপে দোষবিমুক্ত নহে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কতকগুলি অসুবিধাও দেখিতে পাওয়া যায় :—

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিনষ্ট করে। ইহার ফলে একটি দেশ অপর একটি দেশের উপর এরূপভাবে নির্ভরশীল হয় যে, যুদ্ধ ঘটিলে বা অন্য কোন কারণে ঐ দেশের সহিত সম্পর্ক ছেদ হইলে আমদানী-কৃত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির অভাবে প্রথম দেশটির বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

২। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানীর ফলে দেশীয় শিল্পগুলির প্রসার ঘটিতে পারে না। দেশীয় শিল্পগুলির প্রসার না হইলে স্থানীয় শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় না। ফলে দেশে বেকার সমস্যা দেখা দেয়।

৩। অনেক সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা দেশে মদ্য প্রভৃতি নানা জাতীয় অনিষ্টকর দ্রব্যের আমদানী হয়। এই অনিষ্টকর দ্রব্যগুলি ব্যবহারের জন্য দেশের নৈতিক মানের অবনতি ঘটে।

৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে যে দেশ বিদেশ হইতে আমদানী করে,

সে দেশ শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা নহে, যে দেশ বিদেশে রপ্তানী করে সে দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুনাফার আশায় অত্যধিক পরিমাণে রপ্তানী করিবার ফলে দেশের খনিজ, বনজ, প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত সম্পদগুলি নিঃশেষিত হইয়া দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হইবার সম্ভাবনা থাকে। এতদ্ব্যতীত বিদেশের চাহিদার উপর নির্ভর করিয়াই উৎপাদন-কার্য প্রধানতঃ পরিচালিত হয়। কোন কারণে বিদেশী চাহিদা হ্রাস পাইলে অত্যুৎপাদন (over-production) সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

৫। অর্থনৈতিক অসুবিধা ব্যতীতও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরও কতিপয় অসুবিধা পরিদৃষ্ট হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে ক্রয় ও বিক্রয়-ব্যাপারে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। কাঁচামাল ক্রয় করিবার ও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশগুলি নূতন নূতন বাজার অন্বেষণ করে। বাজার অন্বেষণ করিতে গিয়া বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে তাহার ফলে অনেক সময় যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে।

বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত—Balance of Trade

একটি দেশ হইতে অপর দেশে যে সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী পাঠান হয় তাহাকে রপ্তানী (Export) বলা হয় এবং বিদেশ হইতে স্বদেশে যে সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী আনা হয় তাহাকে আমদানী (Import) বলা হয়। বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত বলিতে এই আমদানী ও রপ্তানীর পার্থক্য বুঝায়। একটি দেশ যদি অধিক পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে ও কম পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করে তাহা হইলে সে দেশের আমদানীর মূল্য অপেক্ষা রপ্তানীর মূল্য বেশী হইয়া সে দেশ পাওনাদার হয়। আমদানী মূল্য অপেক্ষা রপ্তানী মূল্য বেশী হইলে তাহাকে **অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত** (Favourable Balance of Trade) বলা হয়। আর রপ্তানী মূল্য অপেক্ষা আমদানী মূল্য বেশী হইলে তাহাকে **প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত** (Adverse Balance of Trade) বলা হয়। প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হইলে সে দেশ দেনাদার দেশে পরিণত হয়।

লেন-দেনের উদ্বৃত্ত—Balance of Payments

দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য যখন পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীতে সীমাবদ্ধ

থাকে তখন আমদানী ও রপ্তানীর এই তালিকা দৃশ্য বা প্রত্যক্ষ বাণিজ্য তালিকা (Visible Items of Trade) নামে অভিহিত হয়। কিন্তু দুইটি দেশের মধ্যে আদান-প্রদান শুধুমাত্র পণ্যদ্রব্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পণ্যদ্রব্য ব্যতীতও দুইটি দেশের মধ্যে নানা প্রকারের লেন-দেন চলে। এই নানা প্রকারের লেন-দেনগুলি হইল :

১। বিদেশ হইতে গৃহীত মূলধনের আসল ও সুদ প্রদান, ২। বিদেশীয়গণকে দেশের কোন কার্যে নিযুক্ত করিলে তাহাদের বেতন ও পেন্সন প্রদান, ৩। বিদেশী জাহাজ ব্যবহার করিলে তাহার মাশুল প্রদান, ৪। বিদেশী ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কার্য বাবদ অর্থপ্রদান, ৫। ভ্রমণ ও শিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়া যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, ৬। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ অথবা অপর দেশকে সাহায্য বাবদ দেয় অর্থ পরিমাণ।

পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী ব্যতীতও দুইটি দেশের মধ্যে উপরি-উক্ত নানাপ্রকারের লেন-দেন হইয়া থাকে। পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর তালিকা ছাড়াও দুইটি দেশের মধ্যে উপরি-উক্ত দেনা-পাওনার যে হিসাব, তাহাকে অদৃশ্য বা পরোক্ষ বাণিজ্য তালিকা (Invisible Items of Trade) বলা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, পণ্যদ্রব্যের মূল্য ব্যতীতও নানা কারণে দুইটি দেশের মধ্যে দেনা-পাওনা থাকিতে পারে। দেনা-পাওনার এই সমগ্র হিসাবের পার্থক্যকেই লেন-দেনের উদ্বৃত্ত (Balance of Payments) বলা হয়। আর দুইটি দেশের মধ্যে এই সমগ্র পরিমাণ লেন-দেন শেষ পর্যন্ত সমান হইতেই হইবে। রপ্তানী দ্রব্য আমদানী অপেক্ষা যদি বেশী বা কম হয়, তাহা হইলে অন্য বাবদ দেনা-পাওনা দিয়া তাহা মিটান হয়।

আমদানী-রপ্তানীর সমতা—Equality of Imports and Exports

আমদানী-রপ্তানীর সমতা বলিলে এ কথা বুঝায় না যে, সমগ্র রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য সমগ্র আমদানী দ্রব্যের মূল্যের সমান হইবে। আমদানী-রপ্তানীর সমতা বলিলে বুঝায় যে, একটি দেশের বিদেশে দেয় মোট টাকা ও বিদেশ হইতে প্রাপ্য মোট টাকার পরিমাণ শেষ পর্যন্ত সমান হইবে। কারণ একটি দেশ বিদেশের সহিত শুধু মাল কেনা-বেচা করে না। মাল কেনা-বেচা ছাড়াও আরও অনেক কারণে বিদেশের সহিত লেন-দেন চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে,

ভারত স্বাধীন হইবার পূর্বে ইংলণ্ডের সহিত ভারতের যে বাণিজ্য চলিত তাহা বিশ্লেষণ করিলে লেন-দেনের উদ্বৃত্ত সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা হইতে পারে। তখন ভারতে দৃশ্য আমদানী তালিকা হইতে দৃশ্য রপ্তানী তালিকা বেশী হইলেও ভারতে কোন বাণিজ্য উদ্বৃত্ত থাকিত না। কারণ ভারত ইংলণ্ড হইতে যে পরিমাণ অদৃশ্য পণ্য আমদানী করিত তাহার মূল্য ভারত অনেক দৃশ্য রপ্তানীর দ্বারা শোধ করিত। সেই সময় ভারতের দৃশ্য রপ্তানীগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ছিল, যথা, ১। ভারত হইতে ধান, পাট, তৈলবীজ, চামড়া প্রভৃতি কাঁচামাল। অদৃশ্য রপ্তানীর মধ্যে ছিল ইংরাজ ভ্রমণকারীদের ও ইংরাজ মিশনারীদের ভারতে ব্যয়িত অর্থপরিমাণ। অন্যদিকে ভারত ইংলণ্ড হইতে নিম্নলিখিত দৃশ্য ও অদৃশ্য পণ্য আমদানী করিত। দৃশ্য পণ্য : যন্ত্রপাতি, ঔষধ প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য। অদৃশ্য পণ্য : ইংলণ্ড হইতে ভারতের গৃহীত ঋণ ও ঋণের সুদ, ভারতে নিযুক্ত ইংরাজ কর্মচারীদের বেতন, পেন্সন, বিলাতি কোম্পানিগুলির মুনাফা, ভারত-সচিবের ভারত-শাসন খাতে ব্যয়, বিলাতি জাহাজের মাশুল, বিলাতি ব্যাঙ্কের কমিশন, ভারতীয় ছাত্র ও অন্যান্য ভ্রমণকারীর বিলাতে ব্যয়। এইরূপে ভারত এত বেশী মূল্যের অদৃশ্য পণ্য বিলাত হইতে আমদানী করিত যে, প্রতি বৎসর ভারতকে বিপুল পরিমাণ মূল্যের দৃশ্য পণ্য দ্বারা বিলাত হইতে আমদানীকৃত অদৃশ্য পণ্যের মূল্য দিয়া লেন-দেনের সমতা রক্ষা করিতে হইত। বর্তমানে অবশ্য দেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য—Features of Foreign Trade of India

ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ভারত চাউল, গম, চা, তৈলবীজ, কাঁচা চামড়া, অভ্র, মসলা, গালা, পশম প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য ও কাঁচামাল রপ্তানী করে এবং তূলা, কাপড়, কাগজ, রং, মদ, ঔষধ, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য ডাল কাঠ, ও কিছু পরিমাণ খাদ্য আমদানী করে। সুতরাং কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানী ও শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী ইহাই হইল ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে এবং সরকার কর্তৃক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কাযকরী হওয়ার ফলে দেশে শিল্পের প্রসার হইতেছে। দেশে শিল্পোন্নতির ফলে একদিকে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী কিছু কমিয়াছে অন্যদিকে

কাঁচামালের রপ্তানীও কমিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতা লাভ করিবার পর হইতে ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত প্রায়ই প্রতিকূল হইতেছে। এই প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের প্রধান কারণ হইল বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী। দেশে খাদ্যাভাব হওয়ার দরুণ বর্তমানে আমেরিকা, কানাডা, রাশিয়া, বর্মা প্রভৃতি দেশ হইতে বহু পরিমাণ গম ও চাউল আমদানী করিতে হইতেছে। দেশবিভাগের পূর্বে ভারতকে বিদেশ হইতে তূলা ও পাট আমদানী করিতে হইত না। বর্তমানে পাট ও তূলা উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে ভারতকে পাট ও তূলা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। এইজন্যও ভারতে প্রতিকূল বাণিজ্যের অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ছাড়াও দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ার ফলেও বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, ভারতের বহির্বাণিজ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ভারতের বহির্বাণিজ্যের বেশীর ভাগই ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত চলে। বর্তমানে রাশিয়া, জাপান, চীন ও ইয়ুরোপীয় অন্যান্য দেশগুলির সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইলেও এই বাণিজ্য-পরিমাণ নিতান্ত কম। ভারতের বহির্বাণিজ্যে বর্তমানে আমেরিকার প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক—India's trade relation with other countries

বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক রহিয়াছে। ভারতের বহির্বাণিজ্য-সংক্রান্ত স্বার্থরক্ষার জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধি ছাড়াও বাণিজ্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই প্রতিনিধিগণ ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান করেন। বাণিজ্য-সম্পর্কের গুরুত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্যের একটা হিসাব দেওয়া হইল।

ইংলণ্ড—ভারতের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংলণ্ড প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৬১ সালে ভারত হইতে ১৬২.৯১ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য ইংলণ্ডে রপ্তানী হয় এবং ২০০.২৬ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য ইংলণ্ড হইতে ভারতে আমদানী করা হয়। ইংলণ্ড ভারত হইতে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, কাঁচা চামড়া, তৈলবীজ, রেশম, চা, কফি, গালা প্রভৃতি দ্রব্য ক্রয় করে, আর ভারত ইংলণ্ড হইতে বস্ত্র, ঔষধ, নানাজাতীয় যন্ত্রপাতি, রবার দ্রব্য, তামাক, কাগজ প্রভৃতি ক্রয় করে।

আমেরিকা—সম্প্রতি মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সহিতও ভারতের বহির্বাণিজ্য বিশেষভাবে প্রসারলাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডের পরেই মার্কিন দেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। চা, চামড়া, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, গালা, পশমী দ্রব্য ও কিছু পরিমাণ ফল আমেরিকা ভারত হইতে ক্রয় করে। ভারত, আমেরিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল, কেরোসিন, কাগজ, রং, রবার দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও তুলা ক্রয় করে। ১৯৬১ সালে আমেরিকা হইতে ভারত ২৪০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানী করে ও ১১৪ ৪৩ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী করে।

অষ্ট্রেলিয়া—ভারতের সহিত বাণিজ্যে অষ্ট্রেলিয়ার স্থান তৃতীয়। ভারত পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তূলা, চা, আকরিক ধাতু ও কিছু পরিমাণ উদ্ভিজ্জ তৈল অষ্ট্রেলিয়ায় বিক্রয় করে এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে মাখন, পশমজাত দ্রব্য, কিছু পরিমাণ গম, কাগজ ও মনোহারী দ্রব্য আমদানী করে। ১৯৬১ সালে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারত ১৬'৫৭ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানী ও ১৭ ৬০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য অষ্ট্রেলিয়ায় রপ্তানী করে।

পশ্চিম-জার্মানী—ভারতের সহিত বাণিজ্যে পশ্চিম-জার্মানী চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ভারত হইতে পাট, তূলা, চামড়া, তিসি, চা, চীনা বাদাম প্রভৃতি পশ্চিম-জার্মানীতে রপ্তানী হয়, আর ভারত ঐদেশ হইতে যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, রং, ঔষধ, কাগজের বোর্ড, কাচদ্রব্য প্রভৃতি ক্রয় করে। ১৯৬১ সালে ভারত কর্তৃক আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য ছিল ১২২ ৫৩ কোটি টাকা আর রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মূল্য ছিল ২১'২৮ কোটি টাকা।

জাপান—জাপান পঞ্চম স্থান অধিকার করে। জাপান হইতে ভারত কাপড় খেলনা, যন্ত্রপাতি, কাগজ, রেশমী ও পশমী কাপড়, কাচদ্রব্য প্রভৃতি ক্রয় করে। পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, গালা, তূলা, লৌহ প্রভৃতি দ্রব্য জাপান ভারত হইতে ক্রয় করে। ১৯৬১ সালে ভারত জাপানে ৪০'২৭ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী করে ও ৬০'৭০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানী করে।

বর্মাদেশ—বর্মার স্থান ষষ্ঠ। বর্মা হইতে ভারত প্রধানতঃ চাউল, কেরোসিন, পেট্রোল ও কাঠ আমদানী করে এবং পাট ও পাটজাত দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, চা, চিনি প্রভৃতি রপ্তানী করে। ১৯৬১ সালে ভারত ৮'৩৯ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানী করে ও ৫ ৮২ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী করে।

পাকিস্তান—ভারতের সহিত বাণিজ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান সপ্তম স্থান

অধিকার করে। পাকিস্তান, ভারত হইতে পাটজাত দ্রব্য, কয়লা, লৌহ-ইস্পাত, চিনি, সরিষার তৈল প্রভৃতি ক্রয় করে ও ভারত পাকিস্তান হইতে তুলা, চামড়া, কাঁচা পাট, জিপসাম প্রভৃতি ক্রয় করে। ১৯৬১ সালে ভারত ৫'৪৬ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানী করে ও ৯'৮৫ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী করে।

ফরাসী দেশ—ফরাসী দেশ অষ্টম স্থান অধিকার করে। ফরাসী দেশ হইতে ভারতে কাপড়, ঔষধ, মদ, টয়লেট, রং, পশম, ও রেশম কাপড় আসে, আর ভারত হইতে পাট, পাটজাত দ্রব্য, তুলা, চামড়া, কফি, গালা প্রভৃতি ঐদেশে যায়। ১৯৬১ সালে আমদানী ও রপ্তানীর মূল্য যথাক্রমে ১৬'৩৬ কোটি ও ৮'২০ কোটি টাকা ছিল।

সোভিয়েত রাশিয়া—বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়া নবম স্থান অধিকার করিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়া হইতে ভারত যন্ত্রপাতি, কিছু পেট্রোল, গম ও চায়ের বাক্স ক্রয় করে। আর রাশিয়া ভারত হইতে পাট, চা প্রভৃতি ক্রয় করে। ১৯৬১ সালে এই আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য যথাক্রমে ২৫'৪২ কোটি ও ৩১ কোটি টাকা ছিল।

ইহা ছাড়াও ইরাণ, চীন ও সিংহলের সহিতও ভারতের কিছু পরিমাণ বাণিজ্য চলে।

নিম্নে ভারতের বিগত চার বৎসরের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের অর্থ-মূল্যের একটি হিসাব দেওয়া হইল।

সাল	আমদানী মূল্য	রপ্তানী মূল্য	বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (প্রতিকূল)
১৯৫৮-৫৯	৮০৪'৫৪ কোটি টাকা	৫৭০'১৪ কোটি টাকা	২৩৪'৪১ কোটি টাকা
১৯৫৯-৬০	৮৫১'৪২ „	৬৪৫'৭২ „	২০৫ ৭০ „ „
১৯৬০-৬১	১,১২২'৪৮ „	৬৪২'৩২ „	৪৮০'১৬ „ „
১৯৬১-৬২	১,০৯০'০০ „	৬৬০'৫ „	৪২৯'৫ „ „

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ—Free Trade and Protection

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশগুলি সাধারণতঃ দুইটি নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে, যথা, (১) অবাধ বাণিজ্য নীতি ও (২) সংরক্ষণ নীতি।

১। অবাধ বাণিজ্য নীতি ঃ

অবাধ বাণিজ্যের মূলনীতি হইল, একদেশ হইতে অন্য দেশে পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানীর বিশেষ করিয়া আমদানীর কোন বাধা সৃষ্টি করা হয় না। এই নীতি অনুসারে দেশী ও বিদেশী পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। সুতরাং দেশী দ্রব্যগুলিকে বিশেষ সুবিধা দান বা বিদেশী দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করা হয় না। অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করিলেও রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে দেশগুলি বিদেশী দ্রব্যের উপর সময় সময় যে শুল্ক ধার্য করে তাহা অবাধ বাণিজ্য নীতির বিরোধী বলিয়া ধরা হয় না। ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সমর্থক হইলেও বর্তমানে কিছু পরিমাণে এই নীতি পরিত্যাগ করিয়াছে।

২। সংরক্ষণ নীতি ঃ

দেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ সুবিধা দান করিবার উদ্দেশ্যে যখন বিদেশ-জাত আমদানী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয়, তখন এই নীতিকে সংরক্ষণ নীতি বলা হয়। জাতীয় শিল্পগুলির সংরক্ষণ ও উন্নয়নই হইল সংরক্ষণ নীতির মূল উদেশ্য। বিদেশী প্রতিযোগিতা হইল দেশীয় শিল্পের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। সুতরাং একমাত্র সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া এই অন্তরায় দূর করা সম্ভব।

সংরক্ষণ-নীতি প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি—Forms of Protection

দেশী শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ-নীতি নানাভাবে প্রযুক্ত হয়। সংরক্ষণের প্রধান পদ্ধতিগুলি হইল :

১। আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক ধায—Imposition of Tariffs

এই ব্যবস্থানুসারে বিদেশ হইতে (ক) আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয় (Import duties)। বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনা করা প্রয়োজন। শুল্কের পরিমাণ যদি খুব বেশী হয়, তাহা হইলে আমদানী বাণিজ্য হ্রাস বা একেবারে অন্তর্হিত হইতে পারে। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য হইলে এবং দেশে যদি ঐ দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্য না থাকে, তাহা হইলে অধিক হারে শুল্ক ধার্যের ফলে সরকারের আয় বাড়িলেও দেশীয় ক্রেতাগণ অধিক মূল্য দিতে বাধ্য হয়। দেশ হইতে যাহাতে দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনীয়

কাঁচামাল বা শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী না হয় সে উদ্দেশ্যও অনেক সময় (খ) রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয় (Export Duties)। শুল্কের পরিমাণ যখন পণ্যদ্রব্যের ওজনের পরিমাপে ধার্য হয় তখন তাহাকে ওজন অনুসারে শুল্ক (*Specific duty*) বলা হয়। পণ্যদ্রব্যের মূল্য অনুসারে শুল্ক ধার্য করা হইলে তাহাকে মূল্যানুসারে শুল্ক (*Advalorem duty*) বলা হয়।

২। সরকার কর্তৃক অর্থসাহায্য—Bounties and Subsidies

অনেক সময় সরকার বিদেশী দ্রব্যের উপর কর স্থাপন না করিয়া দেশীয় শিল্প-গুলিকে এককালীন অথবা তাহাদের উৎপাদন-পরিমাণের ভিত্তিতে অর্থসাহায্য করে। বিদেশী দ্রব্য যদি অত্যাবশ্যকীয় হয় অথবা দেশের সমগ্র চাহিদা পূরণের পক্ষে দেশে দ্রব্যটির উৎপাদন পরিমাণ যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে বিদেশী দ্রব্যের উপর কর ধার্য করিলে দ্রব্যটির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। এইজন্য বিদেশী দ্রব্যেব উপর কর ধার্য না কবিয়া দেশীশিল্পকে সাহায্য করা হয়। ভারতে শর্করা-শিল্প সরকারী অর্থসাহায্যে প্রসারলাভ করিতে সমর্থ হয়।

৩। ইহা ছাড়া, অনেক সময় বিদেশ হইতে আমদানীকৃত পণ্য-পরিমাণের একটা আনুপাতিক অংশকে বিনা শুল্কে দেশে আসিতে দেওয়া হয়। কিন্তু এই আনুপাতিক অংশের অতিরিক্ত পরিমাণ আমদানীর উপর শুল্ক ধার্য করা হয়।

সংরক্ষণ-নীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে যতগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তন্মধ্যে আমদানী ও রপ্তানী শুল্কই হইল সর্বাধিক প্রচলিত ব্যবস্থা।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি—Arguments in favonr of Free Trade

১। অবাধ বাণিজ্যের ফলে দেশগুলির মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে প্রত্যেক দেশ যে যে শিল্পে তাহার বিশেষ উৎপাদন-দক্ষতা আছে, সেই সেই শিল্পে মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ করে। ইহাতে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

২। উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। প্রত্যেক দেশ অপর দেশ হইতে সস্তাদরে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। নিজদেশে ঐ দ্রব্য উৎপাদন করিতে অধিক ব্যয় হইত।

৩। সংরক্ষণের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ করিয়া দেশে একচেটিয়া কারবার স্থাপিত হইয়া মূল্য-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। অবাধ বাণিজ্য এই সমস্ত অসুবিধা দূর করে।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি—Arguments in favour of Protection

১। জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি—Arguments for national self-sufficiency

একটি দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী নিজের দেশে উৎপন্ন না হইলে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। এই কারণে স্বাবলম্বী হইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করা অনেকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

২। বিভিন্ন প্রকারের শিল্পগঠনের যুক্তি—Diversification of industries argument

একটি দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য দেশের মধ্যে সর্বাধিক শিল্প সংগঠন করা প্রয়োজন। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, খনি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অর্থনৈতিক জীবনের অপরিহার্য বিষয়সমূহে প্রত্যেক দেশের স্বাবলম্বী হওয়া উচিত। সুতরাং নানাজাতীয় শিল্প গঠন করিবার জন্য সংরক্ষণ-নীতি অনুসরণ করা সমর্থনযোগ্য।

৩। জাতীয় নিরাপত্তামূলক শিল্পের যুক্তি—Defence industries argument

জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা অনেক সময় প্রয়োজন হয়। যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য লৌহ, ইস্পাত, বিদ্যুৎ, নানাজাতীয় এ্যাসিড প্রভৃতি শিল্প দেশের মধ্যে থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই শিল্পগুলির প্রসারের জন্যও সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে।

৪। শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি—Infant Industries Argument

সংরক্ষণ-নীতির স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল **শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি।** শিল্পের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই যদি তাহাকে বিদেশের শক্তিশালী শিল্পের অসম প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইলে শিশুশিল্পের প্রসারের সম্ভাবনা থাকে না। ভারত, পাকিস্তান, চীন প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ও অনগ্রসর দেশগুলিকে যদি আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত শিল্পক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে হয়, তাহা হইলে প্রতিযোগিতার অসামর্থ্যে ভারত প্রভৃতি দেশে কোনদিনই শিল্পোন্নতি হইতে পারে না। এজন্য যে সমস্ত

শিল্প স্বল্পকালের মধ্যে উন্নতি লাভ করিতে পারে সেই সমস্ত শিল্পকে অসম প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রথমাবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি প্রয়োগ করা বিশেষ প্রয়োজন। 'শিশুশিল্প সংরক্ষণের' মূলনীতি হইল "নবজাত শিশুকে পরিচর্যা কর, কিশোরকে রক্ষা কর এবং বয়স্ককে মুক্ত কর" "Nurse the baby, protect the child and free the adult")। এই নীতির তাৎপর্য হইল যে, শিল্পের শৈশবাবস্থায় পূর্ণসংরক্ষণের প্রয়োজন, কারণ এই অবস্থায় শিল্পের প্রতিযোগিতা সামর্থ্যের একান্ত অভাব থাকে। শিল্পটি যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া উৎপাদন-সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তখন ইহাকে প্রতিযোগিতার কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য সংরক্ষণের মাত্রা হ্রাস করা প্রয়োজন, নতুবা এই শিল্প কোনদিনই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে না। শেষ পর্যায়ে শিল্পটি যখন অভিজ্ঞতা ও শিল্পকৌশল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয়, তখন ইহাকে সংরক্ষণ-বিমুক্ত করিয়া প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করা হয়।

এইরূপে সংরক্ষণের দ্বারা দেশীয় শিল্পগুলির উন্নতি সম্ভব হয়।

উপরি-উক্ত যুক্তিগুলি ব্যতীতও সংরক্ষণের পক্ষে নিম্নলিখিত আরও কয়েকটি যুক্তি দেখান হয়, কিন্তু এই যুক্তিগুলি খুব জোরালো নহে।

৫। মজুরি-বৃদ্ধির যুক্তি—Wages argument

সংরক্ষণের সাহায্যে দেশে শিল্পের প্রসার ঘটিলে, শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে মজুরির হার বৃদ্ধি পাইবে।

৬। বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের যুক্তি—Balance of trade argument

সংরক্ষণের সাহায্যে আমদানী কমাইয়া রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে পারিলে অনুকূল বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। ফলে দেশে অধিক ধনাগম হয়।

৭। কর্মসংস্থান যুক্তি—Employment argument

সংরক্ষণ দ্বারা আমদানী হ্রাস করিয়া রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে পারিলে সংরক্ষিত শিল্পগুলির প্রসারলাভের ফলে দেশে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি হয়। ইহাতে বেকার সমস্যা সমাধান হয়।

সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি—Argument against Protection

১। সংরক্ষণের প্রধান অসুবিধা হইল যে, ইহার ফলে মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং দেশী ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

২। সংরক্ষিত শিল্পগুলি একবার সুবিধা পাইলে তাহাদের উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে অবহেলা করে। ইহার ফলে শিল্পোন্নতি বাধা পায়।

৩। সংরক্ষণের ফলে অনেক সময় বড বড একচেটিয়া ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয় এবং বিদেশী প্রতিযোগিতা না থাকার জন্য ইহারা সংঘবদ্ধ হইয়া দেশে মূল্যবৃদ্ধি করে। আমেরিকায় এই দোষটি বিশেষভাবে দেখা যায়।

৪। সংরক্ষণের ফলে ধনী ব্যবসায়ীগণ অধিকতর ধনবান হন। ইহার ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়।

৫। সংরক্ষণের ফলে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়। ইহার ফলে বিরোধ ঘটে এবং কালক্রমে এই অর্থনৈতিক সম্পর্ক-জাত বিরোধ প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটায়।

ভারত সরকারের সংরক্ষণ-নীতি—Fiscal policy of the Government of India

ইংরাজ শাসনকালে ভারত সরকারের কোনরূপ নির্দিষ্ট বাণিজ্য নীতি ছিল না। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের স্বার্থ অপেক্ষা ইংলণ্ডের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ভারতের বাণিজ্য-নীতি পরিচালিত হইত। ইংলণ্ডের স্বার্থের অনুকূল হইলেই অন্যান্য দেশগুলি বিশেষ করিয়া বৃটিশ সাধারণতন্ত্রভুক্ত দেশগুলি এদেশে সুবিধাজনক শর্তে বাণিজ্য করিতে পারিত। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারত সরকার ভারতের একটি স্বতন্ত্র বাণিজ্য-নীতির গুরুত্ব প্রথম অনুভব করিলেন। ভারতবাসী দেশের শিল্পোন্নতির জন্য সংরক্ষণেরই পক্ষপাতী ছিল। ১৯২২ সালে এ সম্পর্কে একটা মতামত দিবার জন্য ভারত সরকার একটি শিল্প কমিশন (Fiscal Commission) নিযুক্ত করেন। এই কমিশন ভারত সরকারকে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি অনুসরণ করিবার সুপারিশ করিলেও সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিবার সুপারিশ করে নাই। এইজন্য এই নীতিকে **বিচারমূলক সংরক্ষণ-নীতি (Discriminating protection)** বলা হয়।

কমিশন ভারতে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিবার যুক্তিযুক্ততা অস্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য ও শিশুশিল্প সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণ একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্তন করিলে মূল্যবৃদ্ধি পাইয়া দেশী ক্রেতাগণের উপর শুল্কের ভার

পড়িবে। এইজন্য কমিশন সকল শিল্পকে নির্বিচারে সংরক্ষণের সুবিধা না দিয়া বিশেষ বিশেষ শিল্পে সংরক্ষণ দিবার সুপারিশ করেন। কোন্ কোন্ শিল্পগুলি সংরক্ষণ পাইতে পারে তাহা স্থির করিবার ভার কমিশন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তিনজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি শুল্ক সমিতির (Tariff Board) হস্তে ন্যস্ত করিবার সুপারিশ করেন। কমিশনের মতে, যে যে শিল্প নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করিতে সক্ষম একমাত্র সেই শিল্পগুলিই সংরক্ষণ দাবী করিতে পারিবে।

প্রথম শর্ত হইল যে, সংরক্ষণের জন্য দাবীদার শিল্পটি এরূপ হইবে যে, শিল্পোন্নতির জন্য ইহার যথেষ্ট প্রাকৃতিক সুবিধা আছে, যথা, প্রচুর কাঁচামাল, কর্মদক্ষ শ্রমিক, সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাইবার সম্ভাবনা, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিস্তৃত দেশী বাজার ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, দেশের স্বার্থের দিক দিয়া দেখিতে গেলে যে সমস্ত শিল্পের প্রসার কাম্য অথচ সংরক্ষণ ব্যতীত যাহার উন্নয়নের কোন সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ, শিল্পটি এরূপ হইবে যে, ভবিষ্যতে সংরক্ষণমুক্ত হইলেও বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবে।

কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ভারত সরকার চিনি, লৌহ-ইস্পাত, কাগজ, সিমেণ্ট, দেশলাই ও গুরু রাসায়নিক শিল্পগুলিকে সংরক্ষণের সুবিধা দিয়াছিলেন। ইহার ফলে চিনি শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হয় এবং ভারত শুধু দেশের চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হয় না—বিদেশেও ভারতের কিছু চিনি রপ্তানী হইত। ১৯৫০ সালে এই শিল্পটিকে সংরক্ষণমুক্ত করা হয়। ইহা ছাড়া লৌহ-ইস্পাত, কাগজ ও দেশলাই-শিল্পও সংরক্ষণের সুবিধা পাইয়া বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারিয়াছে। ১৯৪৭ সাল হইতে লৌহ-ইস্পাত ও কাগজ-শিল্প হইতে সংরক্ষণ উঠাইয়া লওয়া হয়।

নূতন সংরক্ষণ নীতি—New Fiscal Policy

বিচারমূলক সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিবার ফলে দেশে কিছু পরিমাণ শিল্পোন্নতি ঘটিলেও মূল শিল্পগুলির ও সহায়ক শিল্পগুলির সম্প্রসারণ হয় নাই। সামগ্রিকভাবে দেশের শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে ভারতের জাতীয় সরকার ১৯৪৯-৫০ সালে আর একটি কমিশন (কৃষ্ণমাচারী কমিশন) নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের সুপারিশমত বর্তমান বাণিজ্য নীতি পরিচালিত হইতেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কমিশন শিল্পগুলিকে তিনভাগে ভাগ করিয়াছে, যথা, ১। প্রতিরক্ষামূলক,

শিল্প (Defence industries), ২। বুনিয়াদী ও মূল শিল্প (Basic and Key industries) ও ৩। অন্যান্য শিল্প (Other industries)।

অস্ত্র, গোলা-বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ নির্মাণ-শিল্পগুলিকে কমিশন প্রথম পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। এই প্রতিরক্ষামূলক শিল্পগুলি সম্পর্কে কমিশনের অভিমত হইল যে, ইহাদিগকে যথোপযুক্ত সংরক্ষণ দিতেই হইবে। লৌহ-ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পগুলি হইল মূলশিল্প। এইগুলি জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত মূলশিল্পকেও প্রয়োজনমত সংরক্ষণ দিতে হইবে এবং সংরক্ষণের মাত্রা ও পদ্ধতি শুল্ক সমিতি স্থির করিবে। অন্যান্য শিল্পগুলি তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত। এই শিল্পগুলিও সংরক্ষণের দাবী করিতে পারে এবং এই শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দিতে হইলে শুল্ক সমিতির নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে। (ক) সংরক্ষণ-প্রার্থী শিল্পটির পক্ষে প্রসারের স্বাভাবিক কি কি সুবিধা আছে, ইহার উৎপাদন ব্যয় কি পরিমাণ হইবে এবং একটি সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ বা অন্য কোনপ্রকার সরকারী সাহায্য ব্যতীত স্বাবলম্বী হইতে পারে কিনা? (খ) কিংবা শিল্পটির উন্নতি জাতীয় স্বার্থবৃদ্ধির সহায়ক কিনা এবং সংরক্ষণের ব্যয়ভার জনসাধারণের উপর অত্যধিক বেশী হয় কি না?

উপরি-উক্ত শর্তগুলি বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে শিল্প সমিতি তৃতীয় পর্যায়ের যে কোন শিল্পকে সংরক্ষণ দিতে পারেন। ইহাই ভারত সরকারের বর্তমান সংরক্ষণ-নীতি।

সংক্ষিপ্তসার

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

দুইটি দেশের মধ্যে যখন বাণিজ্য চলে তখন তাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা বিভিন্ন দেশবাসী হয় এবং বিভিন্ন মুদ্রা-ব্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয়ে অর্থের বিনিময় প্রয়োজন হয়।

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ

বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিক ও মূলধনের গতিশীলতার অভাব এবং নৈসর্গিক সুবিধা-অসুবিধার জন্য ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে উৎপাদন-কার্য

পরিচালিত হয়। এইজন্য দেশগুলির মধ্যে উৎপাদন-ব্যয়ের আপেক্ষিক পার্থক্য হয় এবং ইহার ফলে বাণিজ্য চলে।

বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ও লেন-দেনের উদ্বৃত্ত

আমদানীকৃত ও রপ্তানীকৃত দ্রব্যসমূহের মূল্যের পার্থক্য বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত বলিয়া অভিহিত হয়। আমদানী-মূল্য অপেক্ষা রপ্তানী-মূল্য বেশী হইলে, তাহাকে অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়, আবার রপ্তানী-মূল্য অপেক্ষা আমদানী-মূল্য বেশী হইলে তাহাকে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়। দুইটি দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ছাড়াও আরও অনেক প্রকার আদান-প্রদান হয়, যথা, ঋণ-গ্রহণ ও প্রদান, সুদ-প্রদান, জাহাজের মাশুল, ব্যাঙ্কের কমিশন, ক্ষতিপূরণ বা দান ইত্যাদি। দুইটি দেশের দেনা-পাওনার এই সমগ্র হিসাবকে লেন-দেনের হিসাব বলা হয়।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য

১। কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানী ও শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী। ২। প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত। ৩। ভারতের বহির্বাণিজ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রাধান্য।

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ-নীতি

অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করা হয় না। একমাত্র রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে আমদানী ও রপ্তানীর উপর কোনপ্রকার শুল্ক ধার্য করা হয় না।

সংরক্ষণ-নীতির ক্ষেত্রে রপ্তানী বিশেষ করিয়া আমদানীর উপর শুল্ক ধার্য করা হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল বিদেশী দ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশীয় শিল্পের উন্নতি করা। বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া অথবা দেশী শিল্পকে অর্থসাহায্য করিয়া সংরক্ষণ নীতি বলবৎ করা হয়।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি

১। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফলে ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ সম্ভব হয় এবং প্রত্যেক দেশই এই শ্রমবিভাগের সুবিধা পায়, ২। উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ৩। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি

১। জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি, ২। জাতীয় নিরাপত্তামূলক শিল্পের যুক্তি, ৩। বিভিন্ন প্রকার শিল্প-গঠনের যুক্তি, ৪। শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি।

সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি

১। মূল্যবৃদ্ধি পাইয়া ক্রেতার অসুবিধা হয়, ২। শিল্পোন্নতি বাধা পায়,, ৩। একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি হয়, ৪। আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

ভারত সরকারের সংরক্ষণ-নীতি

১৯২২ সালে পূর্বতন সরকার সংরক্ষণ-নীতি সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন ভারতে বিচারমূলক সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন। এই নীতি অনুসারে সব শিল্পকে নির্বিচারে সংরক্ষণের সুবিধা না দিয়া চিনি, কাগজ, সিমেণ্ট, লৌহ-ইস্পাত প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ শিল্প সংরক্ষিত করা হয়। এই আংশিক সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণের ফলে সন্তোষজনক হয় নাই। বর্তমান ভারত সরকার ১৯৪৯-৫০ সালে আর একটি নূতন কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশে যাহাতে দ্রুত শিল্পোন্নতি হয়, সেজন্য বিশেষ করিয়া নিরাপত্তামূলক শিল্পগুলিকে এবং বুনিয়াদী ও মূল শিল্পগুলিকে সব রকম সাহায্য করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনমত সংরক্ষণ দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারত সরকারের বর্তমান সংরক্ষণ-নীতি গঠিত হইয়াছে।

প্রশ্ন ও উত্তর

1 Discuss the advantages and disadvantages of foreign trade.

H.S. (Hu.), 1961, 1962 Comp.

বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

উঃ—এক দেশের লোকের সহিত অপর দেশের লোকের যে বাণিজ্য চলে তাহাকে আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এইরূপ বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে এবং ইহার কারণ হইল কোন দেশই উৎপাদনে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী নয়। তাই এক দেশের উৎপাদন জাত দ্রব্যের সরবরাহ দ্বারা অপর দেশের চাহিদা পূরণ হয়।

সুবিধা—১। দেশে যাহা উৎপাদন করা যায় না, বিদেশ হইতে তাহা আমদানী করা যায়। এইরূপে ইংলণ্ড ভারত হইতে পাট পায়, ভারত ইংলণ্ড হইতে ঔষধ, যন্ত্রপাতি পায়।

২। বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্যে ভিন্ন দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করা যায়। ভারতে যন্ত্রপাতি নির্মাণে ব্যয় বেশী বলিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে।

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে প্রত্যেক দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদন করে যে যে দ্রব্যের উৎপাদনে তাহার সবচেয়ে বেশী সুবিধা আছে। এই শ্রম-বিভাগ নীতির ভিত্তিতে উৎপাদন কার্য পরিচালিত হয় বলিয়া প্রত্যেক দেশের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪। বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়—ইহার ফলে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা—১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিনষ্ট করিয়া দেশকে পর-মুখাপেক্ষী করে এবং যুদ্ধের সময় সম্পর্কচ্ছেদের ফলে দেশটির অসুবিধা হয়।

২। বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানীর ফলে দেশীয় শিল্পের প্রসার হয় না। ফলে দেশে বেকার সমস্যা দেখা যায়।

৩। বিদেশ হইতে মদ প্রভৃতি অনেক অনিষ্টকর দ্রব্যও আমদানী হয়।

৪। বিদেশে রপ্তানী করিয়া অধিক লাভের আশায় অনেক সময় দেশের খনিজ, বনজ প্রভৃতি সম্পদগুলির অপচয় হয়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়।

৫। বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে অনেক সময় দেশগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। এই প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত বিধ্বংসী যুদ্ধে পরিণত হয়।

2. What is meant by balance of trade Distinguish between balance of trade and balance of payments.

বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত বলিতে কি বুঝ ? বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ও লেন দেনের উদ্বৃত্তের পার্থক্য কি ?

উঃ—স্বদেশ হইতে বিদেশে যত মূল্যের দ্রব্য পাঠান হয় (রপ্তানী-মূল্য) তাহা হইতে বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যের মূল্য (আমদানী মূল্য) বাদ দিয়া যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত বলা হয়। ভারত যদি কোন বৎসরে ১০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে, আর ৭ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য বিদেশ হইতে ভারতে আমদানি করে তাহা হইলে (১০ – ৭) = ৩ কোটি টাকা ভারতের বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত হইবে। রপ্তানী মূল্য অপেক্ষা আমদানী মূল্য কম হইলে তাহাকে অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়, আর আমদানী মূল্য রপ্তানী মূল্য অপেক্ষা বেশী হইলে তাহাকে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়।

দুইটি দেশের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হয় সেই সমস্ত দ্রব্যের তালিকাকে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যের তালিকা বলা হয় কিন্তু দুই দেশের মধ্যে এই প্রত্যক্ষ বাণিজ্য তালিকাভুক্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ছাড়াও আরও অনেক বাবদ লেন-দেন হয়। যেমন, বাণিজ্যের জন্য বিদেশী জাহাজ ব্যবহারের মূল্য, বিদেশী ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানীর লভ্যাংশ, বিদেশী ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ, ইত্যাদি বাবদও দুইটি দেশের মধ্যে লেন-দেন হয়। পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান ছাড়াও,

এই কারণে দুইটি দেশের মধ্যে যে লেন-দেনের হিসাব রাখা হয়, তাহাকে অদৃশ্য বা পরোক্ষ বাণিজ্য তালিকা বলা হয়। দুই দেশের মধ্যে দেনা-পাওনার এই সমগ্র হিসাবের পার্থক্যকেই দৃশ্য ও অদৃশ্য লেন-দেনের উদ্বৃত্ত বলা হয়। আর দুইটি দেশের মধ্যে এই লেন-দেনের উদ্বৃত্ত শেষ পর্যন্ত সমান হইতেই হইবে।

3 State the infant industry argument for protection Is it applicable to Indian conditions ?

শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তির অবতারণা কর। ভারতের ক্ষেত্রে কি এই যুক্তি প্রযোজ্য ?

উঃ—দেশীয় শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করা হয়। বিদেশী দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে কর ধার্য করিয়া অথবা দেশীয় শিল্পগুলিকে অর্থসাহায্য করিয়া সংরক্ষণ নীতি কার্যকরী করা হয়। সংরক্ষণ নীতির স্বপক্ষে অনেক যুক্তির অবতারণা করা হয়, জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি, উচ্চ মজুরির যুক্তি, শিশুশিল্পের যুক্তি, কর্মসংস্থান যুক্তি ইত্যাদি। এই যুক্তিগুলির মধ্যে শিশুশিল্পের যুক্তিটি হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে যদি শিল্পটিকে বিদেশের শক্তিশালী শিল্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইলে শিশুশিল্পের প্রসার হইতে পারে না। এজন্য যে সমস্ত শিল্প স্বল্পকালের মধ্যে উন্নতি লাভ করিতে পারে সেই সমস্ত শিল্পকে অসম প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রথমাবস্থায় সংরক্ষণ দেওয়া আবশ্যক। শিশুশিল্প সংরক্ষণের মূল নীতি হইল 'নবজাত শিশুকে পরিচর্যা কর, কিশোরকে রক্ষা কর এবং বয়স্ককে মুক্ত কর' ('Nurse the baby protect the child and free the adult')। এই নীতির তাৎপর্য হইল যে, শিল্পের শৈশবাবস্থায় পূর্ণ সংরক্ষণের প্রয়োজন, কারণ এই অবস্থায় শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু শিল্পটি যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া উৎপাদন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তখন ইহাকে প্রতিযোগিতার কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য সংরক্ষণের মাত্রা হ্রাস করা প্রয়োজন, নতুবা এই শিল্প কোনদিনই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে না। শেষ পর্যায়ে শিল্পটি যখন অভিজ্ঞত ও শিল্প কৌশল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয়, তখন ইহাকে সংরক্ষণ বিমুক্ত করিয়া প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করা হয়।

ভারত শিল্পের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা পশ্চাদপদ। সুতরাং ভারতে শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। ১৯২২ সালে তদানীন্তন ভারত সরকার এ সম্পর্কে যে কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারতে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিবার যুক্তিযুক্তত স্বীকার করিয়া বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের সুপারিশ করেন। এই নীতি গ্রহণের ফলে ভারতে কিছু পরিমাণ শিল্পোন্নতি ঘটিলেও মূল ও ভারী শিল্পগুলির সম্প্রসারণ হয় নাই। ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতের জাতীয় সরকার এ সম্পর্কে একটি নূতন কমিশন (কৃষ্ণমাচারী কমিশন) নিযুক্ত করেন। দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য কমিশন শিল্পগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া গুরুত্ব অনুসারে প্রত্যেক ভাগের শিল্পগুলির জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করিয়াছেন। উপরি-উক্ত দুইটি সংরক্ষণ নীতি ভারতে বলবৎ হওয়ার ফলে দেশে চিনি, লোহ, ইস্পাত, কাগজ, সিমেণ্ট, দেশলাই, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি প্রসারলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

4. What is a tariff ? In what conditions tariffs on imports are good for a country ? H S (Hu.), 1963

পণ্যশুল্ক বলিতে কি বুঝ ? কি কি অবস্থায় পণ্যশুল্ক একটি দেশের উন্নতির সহায়ক হয় ?

উঃ—বিদেশ হইতে আমদানীকৃত ও স্বদেশ হইতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যসমূহের উপর যে কর বা শুল্ক ধার্য করা হয় তাহার সমষ্টিকে Tariff বলা হয়। ভারত হইতে তুলাজাত দ্রব্য, চামড়া, চা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হয়। আর বিদেশ হইতে ভারতে মেশিন, পেট্রোল, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি আমদানী করা হয়। এই আমদানী ও রপ্তানীকৃত দ্রব্যসমূহের উপর করকে শুল্ক বলা হয়। সরকারের আয় বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ আমদানী-রপ্তানীর উপর যে শুল্ক ধার্য হয় তাহা তত আপত্তিজনক নহে। কিন্তু একটি দেশ যখন উচ্চ মুনাফা লাভের জন্য একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে অথবা অপর দেশের শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে আমদানী-রপ্তানীর উপর শুল্ক ধার্য করে, তখন এই নীতি আপত্তিজনক বলা যায়।

তবে অনুন্নত দেশের পক্ষে শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে যখন বিদেশী অসম প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার জন্য আমদানীর উপর শুল্ক ধার্য করা হয়, তখন এই শুল্ক স্থাপন দেশের শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করে। এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার অনেক বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে যুদ্ধের জন্য লৌহ, ইস্পাত, বিদ্যুৎ, নানাজাতীয় এ্যাসিড প্রভৃতি শিল্পগুলির সংরক্ষণ ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বিদেশী ঐ সমস্ত দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য সমর্থনযোগ্য।

তৃতীয়তঃ, একটি দেশের শিশুশিল্পগুলির সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্যও বিদেশজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন করা দেশের উন্নতিতে সাহায্য করে।

চতুর্দশ অধ্যায়

বাজার

(Markets)

ধনবিজ্ঞানে বাজারের সংজ্ঞা—Definition of an Economic Market

ধনবিজ্ঞানে বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না, কোন দ্রব্যের বাজার বুঝায়, যেমন, পাটের বাজার, শেয়ার বাজার, সোনা-রূপার বাজার। ধনবিজ্ঞানে বাজারের অর্থ হইল এক বা একাধিক দ্রব্য, যাহার ক্রয়-বিক্রয়ে বহু-সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে এবং প্রতিযোগিতার ফলে বাজারে দ্রব্যটি একটিমাত্র দামে বিক্রয় হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক অর্থে বাজারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যথা, (১) দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিবার জন্য একদল ক্রেতা ও বিক্রেতা, (২) ক্রেতা-বিক্রেতাগণের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা, (৩) প্রতিযোগিতার ফলে সমগ্র বাজারে একই দ্রব্যের একই মূল্য বর্তমান থাকে। তবে বাজারটি যদি বহুদূর-বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে হয়ত বাজারের বিভিন্ন কেন্দ্রে মূল্যের পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন কেন্দ্রে মূল্যের এই পার্থক্যের কারণ হইল দ্রব্যটিকে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করিবার অতিরিক্ত ব্যয়। মূল্য কোন ক্ষেত্রেই এই স্থানান্তর করিবার ব্যয় অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না।

বাজারের আয়তন—Extent of the Market

প্রতিযোগিতার ব্যাপকতার উপর বাজারের প্রসার নির্ভর করে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা যদি স্বল্পপরিমিত স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে স্থানীয় বাজার (Local Market) বলা হয়। সাধারণতঃ যে সমস্ত দ্রব্য পচনশীল, যথা, দুগ্ধ, তরিতরকারী প্রভৃতি, সে সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় প্রতিযোগিতা স্থানীয় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। 'মাদ্রাজ বা বোম্বাই হইতে দুগ্ধ বা তরিতরকারী আনিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় সম্ভব হয় না। সুতরাং এই দ্রব্যগুলির ক্রয়-বিক্রয় প্রতিযোগিতা শুধু কলিকাতার ক্রেতা ও

বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিযোগিতা যখন বহুদূর-প্রসারিত হয় অর্থাৎ একটি দেশের সমস্ত অংশের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চলিতে থাকে, তখন তাহাকে জাতীয় বাজার (National Market) বলা হয়। সাধারণতঃ যে সমস্ত দ্রব্য সহজে নষ্ট হয় না বা সহজে স্থানান্তরযোগ্য, যথা, চাউল, ডাইল প্রভৃতি, যে সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতা চলে। তৃতীয়তঃ, এমন অনেক দ্রব্য আছে, যথা, পাট, গম, সোনা, বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রভৃতি, যেগুলির ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে পৃথিবী-ব্যাপী প্রতিযোগিতা চলে সেই দ্রব্যগুলির বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার (International Market) বলা হয়। যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বহু দ্রব্যের সংকীর্ণ বাজার বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিণত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক অর্থে বাজারকে আর একভাবে ভাগ করা হয়। সময়ের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা হয়, স্বল্প-মেয়াদী বাজার (Short-Period Market) ও দীর্ঘ-মেয়াদী বাজার (Long-Period Market)। মাছের বাজারকে স্বল্প-মেয়াদী বাজার বলা হয়, কারণ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। এই বাজারে সরবরাহের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে—অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ পরিবর্তন করা যায় না এবং এইজন্য মূল্যনির্ণয়ে সরবরাহ অপেক্ষা চাহিদার প্রভাব বেশী হয়। আর বাজার যদি দীর্ঘ-মেয়াদী হয় তাহা হইলে সরবরাহ পরিবর্তন করিবার সময় থাকে এবং অতিরিক্ত সরবরাহ করিবার ব্যয় মূল্যের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। বাজারকে আবার চল্‌তি বাজার (Ready Maket) ও ভবিষ্যৎ বাজার (Future Market) বলা হয়। চল্‌তি বাজারে ক্রেতা তাহার ক্রীতদ্রব্য সঙ্গে সঙ্গে পায়, কিন্তু ভবিষ্যৎ বাজারে ক্রেতাকে দ্রব্যের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। ক্রয়ের চুক্তি বর্তমানে সম্পাদিত হইলেও ক্রেতাকে দ্রব্যটি পাইতে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হয়।

বাজারের বিস্তৃতি কত দূর হইবে অর্থাৎ বাজার বড় হইবে কি ছোট হইবে তাহা অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। দ্রব্যটির চাহিদা যত ব্যাপক হয় বাজারের প্রসার তত বড় হয়। সোনা, রূপা, পাট, তুলা প্রভৃতির চাহিদা হইল সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এবং সেইজন্য এই দ্রব্যগুলির বাজার হয় আন্তর্জাতিক। বাজারের বিস্তৃতি দ্রব্যটির স্থানান্তর-যোগ্যতা ও স্থায়িত্বের উপরও নির্ভর করে।

ইহা ছাড়া দ্রব্যটি নমুনাযোগ্য কিনা অর্থাৎ দূরের ক্রেতা দ্রব্যটির নমুনা দেখিয়া যদি দ্রব্যটির গুণাগুণ বিচার করিতে পারে, তাহার উপরও বাজারের বিস্তৃতি নির্ভর করে। সোনা ও রূপার মধ্যে উপরি-উক্ত সব বৈশিষ্ট্যই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা স্থায়ী এবং ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে অধিকতর মূল্য বহন করে। সুতরাং ইহাদের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার ধরা হয়। অপর পক্ষে ইটের আয়তনের তুলনায় ইহার মূল্য অনেক কম। সেইজন্য ইট স্থানান্তরযোগ্য নহে বলিয়া ইহার বাজার সাধারণতঃ স্থানীয় বাজার হয়।

প্রতিযোগিতা—Competition

ধনবিজ্ঞানে প্রতিযোগিতার অর্থ হইল যে, বাজারে একই দ্রব্য কিনিবার জন্য বহু ক্রেতা এবং বিক্রয় করিবার জন্য বহু বিক্রেতা আছে, এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার ইচ্ছামত ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে কোন বাধা নাই। ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতার ফলে একই দ্রব্যের বিভিন্ন মূল্য থাকিতে পারে না। এরূপক্ষেত্রে কোন বিক্রেতাই অপর বিক্রেতা অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না। কারণ তাহা হইলে ক্রেতাগণ যে বিক্রেতার নিকট হইতে অল্পদরে দ্রব্যটি পাইবে তাহার নিকট হইতেই ক্রয় করিবে। এইরূপে প্রতিযোগিতার বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল: (১) বহু ক্রেতা ও বিক্রেতার উপস্থিতি, (২) বিক্রয়ার্থ আনীত দ্রব্যটি সমজাতীয় হইবে, (৩) ক্রেতা ও বিক্রেতা চলতি বাজার-মূল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, সুতরাং প্রতিযোগিতার বাজারে ভেদমূলক দাম থাকিতে পারে না, (৪) ক্রেতা ও বিক্রেতা স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে। এরূপ অবস্থাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতা (Perfect Competition) বলা হয়।

একচেটিয়া—Monopoly

বাজারে যখন বহু ক্রেতা কিন্তু অল্পসংখ্যক বিক্রেতা বা একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে, তখন তাহাকে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলা হয় (Imperfect Competition)। অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রেতাগণের মধ্যে কম প্রতিযোগিতা থাকে এবং বিক্রেতার সংখ্যা কম বলিয়া বিক্রেতাগণের মধ্যে কম প্রতিযোগিতা থাকে এবং একজন মাত্র বিক্রেতা থাকিলে আদৌ কোন প্রতিযোগিতা থাকে না।

বিক্রেতা তাহার মুনাফা বৃদ্ধির জন্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় ক্রেতার ক্রয়-স্বাধীনতা থাকে না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের মত ক্রেতা একজন বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যটি ক্রয় না করিয়া অন্য বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারে না। যখন বাজারে বহু ক্রেতা থাকে কিন্তু বিক্রেতা মাত্র একজন, তখন তাহাকে একচেটিয়া বাজার বলা হয়। কলিকাতায় বিদ্যুৎ-সরবরাহ মাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাং কলিকাতা বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান একটি একচেটিয়া কারবার (Monopoly)। একচেটিয়া ব্যবসায় আবার নানাপ্রকারের হইতে পারে, যথা—

(ক) মূল্য-চুক্তি—Pool. একই দ্রব্যের স্থানীয় বিক্রেতাগণ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া যাহাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিতে পারে, সেইজন্য তাহারা অনেক সময় দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে সাময়িক চুক্তি করে। এই চুক্তির ফলে ক্রেতাগণ কোন বিক্রেতার নিকট হইতেই কমমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না।

(খ) উৎপাদক-সঙ্ঘ—Cartel. অনেক সময় উৎপাদকগণ মিলিতভাবে একটি সংঘ গঠন করিয়া সেই সংঘের মাধ্যমে প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-পরিমাণ, দ্রব্যমূল্য ও বিক্রয়-বাজার স্থির করে। উৎপাদিত দ্রব্যগুলি বিক্রয়-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সংঘের দ্বারা পরিচালিত হয়। জার্মানিতে সর্বপ্রথম এই জাতীয় কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশের শর্করা, চা প্রভৃতি শিল্পগুলি পূর্বে উৎপাদক-সংঘ দ্বারা পরিচালিত হইত। কলিকাতার বাস কোম্পানীগুলিও এইরূপ একটি সংঘের (Bus Syndicate) দ্বারা পরিচালিত হইত।

(গ) যৌথ-ব্যবসায়—Trust একজাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বা ব্যবসায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যখন সম্মিলিত হইয়া একই ব্যবস্থাপনার অধীনে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, তখন তাহাকে যৌথ-ব্যবসায় বলা হয়। যৌথ-ব্যবসায় উৎপাদন-পরিমাণ ও দ্রব্যমূল্য উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করে।

সংক্ষিপ্তসার

বাজার

বাজার বলিতে ধনবিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না। বাজার বলিলে এক বা একাধিক দ্রব্য বুঝায় যাহার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের

মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে এবং প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্যটির একই মূল্য হয়। প্রতিযোগিতা স্থানীয় ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে, তাহাকে স্থানীয় বাজার বলা হয়। প্রতিযোগিতার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইলে তাহাকে জাতীয় বাজার ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র পৃথিবীব্যাপী হইলে তাহাকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয়। সময়ের দিক দিয়া বাজারকে স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী বাজার বলা হয়।

বাজারের বিস্তৃতি দ্রব্যটির (১) চাহিদার ব্যাপকতা, (২) নমুনা-যোগ্যতা, (৩) স্থানান্তর যোগ্যতা ও (৪) স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে।

প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া

বহু ক্রেতা ও বহু বিক্রেতা থাকিলে প্রতিযোগিতার ফলে বাজারে কোন ভেদমূলক দাম থাকিতে পারে না। একই দ্রব্যের একই দাম হয়। ইহা হইল প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য।

বাজারে বহু ক্রেতা কিন্তু অল্পসংখ্যক বা একজন মাত্র বিক্রেতা থাকিলে তাহাকে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলা হয়। যখন মাত্র একজন বিক্রেতা বাজারের সকল ক্রেতার চাহিদা যোগান দেয় তখন এই বিক্রেতাকে একচেটিয়া বিক্রেতা বলা হয়। একচেটিয়া বিক্রেতা সাধারণতঃ কিছু বেশী দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What is meant by markets in Economics? What are the conditions that govern the extent of a market.

   ধনবিজ্ঞানে বাজার বলিতে কি বুঝ? বাজারের বিস্তৃতি কিসের উপর নির্ভর করে?

উঃ—ধনবিজ্ঞানে বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না, কোন দ্রব্যের বাজার বুঝায়, যেমন পাটের বাজার, সোনা-রূপার বাজার। ধনবিজ্ঞানে বাজারের অর্থ হইল এক বা একাধিক দ্রব্য, যাহার ক্রয়-বিক্রয়ে বহু সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে বাজারে দ্রব্যটি একটিমাত্র দামে বিক্রয় হয়। সুতরাং বাজারের বৈশিষ্ট্য হইল— ১। একদল ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকিবে, ২। ক্রেতা-বিক্রেতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিবে, ৩। প্রতিযোগিতার ফলে বাজারের দ্রব্যটি এক দামে বিক্রয় হইবে।

কোন দ্রব্যের বাজারের আয়তন বড় বা ছোট হইতে পারে। বাজারের বিস্তৃতি দ্রব্যটির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভর করে।

১। চাহিদার সংকীর্ণতা বা ব্যাপকতা—যদি দ্রব্যটির চাহিদা দেশব্যাপী বা পৃথিবীব্যাপী হয় তাহা হইলে সে সব দ্রব্যের, যেমন, পাট, সোনা-রূপার, বাজার খুব বড় হয়, আবার তরি-তরকারীর চাহিদা সংকীর্ণ স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহার বাজার খুব ছোট (স্থানীয়) হয়।

২। দ্রব্যটি স্থায়ী বা পচনশীল—দুধের বাজার ছোট কারণ ইহা সহজেই নষ্ট হয়, কিন্তু সোনা-রূপার বাজার বড় কারণ এইগুলি সহজে নষ্ট হয় না।

৩। স্থানান্তরযোগ্যতা—কেবল ব্যাপক চাহিদা ও স্থায়িত্ব থাকিলেই দ্রব্যের বাজার বড় হয় না। ইট স্থানান্তর করা বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া দ্রব্যটির ব্যাপক চাহিদা ও স্থায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও ইহার বাজার নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে।

৪। নমুনা পাঠাইবার সম্ভাবনা—জিনিস কিনিবার পূর্বে ক্রেতা যদি জিনিসটির নমুনা দেখিয়া পছন্দ করিবার সুযোগ পায় তাহা হইলে দূর দেশের দ্রব্যও কেনা যায়। সুতরাং যে সমস্ত দ্রব্যের নমুনা ক্রেতাকে দেখান সম্ভব, সে সমস্ত দ্রব্যের বাজার বড় হয়। পাট, তুলা, গম প্রভৃতির নমুনা দেখিয়া আন্তর্জাতিক ক্রয় বিক্রয় চলে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মূল্য-নির্ধারণ

(Price determination)

বিনিময়-মূল্য—Value

মূল্যতত্ত্ব আলোচনার পূর্বে ধনবিজ্ঞানে 'মূল্য' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করা হয় জানা দরকার। মূল্য শব্দটি সাধারণতঃ দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা, ব্যবহারিক মূল্য (Value-in-use) ও বিনিময়-মূল্য (Value-in-exchange)। ব্যবহারিক মূল্যের অর্থ হইল দ্রব্যের উপযোগিতা। যখন বলা হয় যে, চা অপেক্ষা লবণ অধিকতর মূল্যবান অথবা স্বর্ণ অপেক্ষা লৌহ অধিকতর মূল্যবান, তখন মূল্য শব্দটি উপযোগিতা অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে 'মূল্য' শব্দটি কেবলমাত্র বিনিময়-মূল্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ অর্থে লৌহ স্বর্ণ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান হইলেও অর্থনৈতিক অর্থে লৌহ অপেক্ষা স্বর্ণ অধিকতর মূল্যবান। ধনবিজ্ঞানে মূল্যের অর্থ হইল বিনিময়-মূল্য অর্থাৎ একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্যের যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাহাই হইল সে-ই দ্রব্যের মূল্য। সুতরাং মূল্য বলিলে একটি দ্রব্যের ক্রয়-ক্ষমতা বুঝায়। যদি একটি ঘোড়ার বিনিময়ে দুইটি গরু পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটি ঘোড়ার ক্রয়-ক্ষমতা বা বিনিময় মূল্য হইল দুইটি গরু। একটি ঘোড়ার পরিবর্তে দুইটি গরু বিনিময়ের এই হারকে মূল্য (Value) বলা হয়। সুতরাং মূল্য বলিলে দুইটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাত (Ratio of exchange) বুঝায়।

অর্থমূল্য বা দাম—Price

দ্রব্যমূল্য অর্থাৎ বিনিময়ের অনুপাত যখন অর্থদ্বারা পরিমাপ করা হয়, তখন তাহাকে 'অর্থমূল্য' বা 'দাম' বলা হয়। দ্রব্যের দাম সকল সময়েই অর্থের দ্বারা প্রকাশ করা হয়, কিন্তু বিনিময়-মূল্য অর্থ ব্যতীতও অন্য সমুদয় দ্রব্য দ্বারাই প্রকাশ করা যাইতে পারে। বিনিময়-মূল্য দুইটি দ্রব্যের বিনিময়ে অনুপাত প্রকাশ করে। সুতরাং সকল দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য একসঙ্গে বাড়িতে পারে না, কারণ একটির

বিনিময়ের অনুপাত বাড়িলেই অপরটির অনুপাত হ্রাস্ পায়। কিন্তু সব জিনিসেরই অর্থমূল্য একসঙ্গে বাড়িতে পারে। দাম প্রত্যেকটি জিনিসের স্বতন্ত্র অর্থমূল্য প্রকাশ করে এবং সেইজন্য দেশে অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সমস্ত জিনিসের অর্থমূল্য বৃদ্ধি পায় ও অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাইলে সমস্ত জিনিসের দাম কমিয়া যায়।

চাহিদা—Demand

ধনবিজ্ঞানে চাহিদা বলিতে শুধু দ্রব্যের উপযোগিতা বুঝায় না। 'চাহিদা বলিতে সক্রিয় চাহিদা (Effective demand) বুঝায় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট দামে লোকে যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আছে। দ্রব্যের উপযোগিতা না থাকিলে সে দ্রব্যেব কোন চাহিদা হইতে পারে না। সুতরাং ক্রেতার নিকট দ্রব্যটির উপযোগিতা থাকিবে এবং দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতার ক্রয়-ক্ষমতা থাকা চাই। আবার শুধু ক্রয়-ক্ষমতা থাকিলেই চাহিদার সৃষ্টি হয় না। ক্রেতার দ্রব্যটি পাইবার জন্য ক্রয়-ক্ষমতা অর্থাৎ অর্থব্যয় করিবার ইচ্ছা থাকা চাই। সুতরাং চাহিদা বলিতে আমরা বুঝি, (১) একটি উপযোগিতা-সম্পন্ন দ্রব্য, (২) দ্রব্য ক্রয় করিবার মত অর্থ ও (৩) দ্রব্যটি পাইবার জন্য অর্থব্যয় করিবাব ইচ্ছা। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে দাম ছাড়া কোন চাহিদা নাই। একটি লোক একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের কি পরিমাণ কিনিবে তাহা দ্রব্যটিব সেই সময়কার দামের উপর নির্ভর করে। কমলালেবুর জোড়া দু আনা হইলে একটি লোক একজোড়া কিনিতে পারে, চার আনা হইলে একটি কিনিবে এবং দাম যখন আট আনা হয় তখন সে মোটেই না কিনিতে পারে। সুতরাং কমলালেবুর যে চাহিদা তাহা ইহার মূল্যের উপর নির্ভর করে। মূল্য-নিরপেক্ষভাবে ধনবিজ্ঞানে চাহিদার কোন অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

চাহিদার সূত্র—Law of Demand

উপরে মূল্য-পরিবর্তনের ফলে কমলালেবুর চাহিদার যে পরিবর্তনের কথা বলা হইল তাহা হইতেই স্পষ্টই দেখা যায় যে, কোন একটি দ্রব্যের চাহিদা দ্রব্যটির মূল্যের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ, দেখা যায় যে, মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমিয়া যায়। মূল্য কমিলে অনেকে বেশী

করিয়া কিনিবে এবং যাহারা পূর্বের মূল্যে কিনিত না তাহারা এখন কমমূল্যে কিনিবে। সুতরাং চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। আবার মূল্য বাড়িলে নূতন কোন খরিদ্দার ত কিনিবেই না, অধিকন্তু পুরাতন ক্রেতাগণ মূল্যবৃদ্ধির জন্য কম পরিমাণ কিনিবে। ফলে চাহিদার পরিমাণ কমিবে। মূল্য কমিলে চাহিদার যে বৃদ্ধি এবং মূল্য বাড়িলে চাহিদার যে হ্রাস হয়, ইহাকে চাহিদার সূত্র বলা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, মূল্য ও চাহিদার সম্পর্ক বিপরীতমুখী। মূল্যবৃদ্ধির ফলে চাহিদার হ্রাস হয় এবং মূল্যহ্রাসের ফলে চাহিদার বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এই সূত্রটি কার্যকরী হইতে গেলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, লোকের রুচি, অভ্যাস ও আয়-পরিমাণের কোন পরিবর্তন হয় নাই। কারণ যে লোক পূর্বে চা পান করিত, কিন্তু বর্তমানে চায়ের মূল্য কমিলেও সে চা-পানেব অভ্যাস ত্যাগ করার ফলে তাহার চায়ের চাহিদা বাড়িবে না।

সরবরাহ—Supply

দাম ছাড়া যেরূপ চাহিদা হয় না, দাম ছাড়া সেইরূপ সরবরাহ বা যোগান হয় না। সরবরাহ বলিতে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রেতা বিক্রয় করিতে রাজী থাকে, তাহাকে সরবরাহ বলে। বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতাগণ বহু-পরিমাণ দ্রব্য মজুত রাখিতে পারে, কিন্তু বিক্রয়ের জন্য মজুত সমগ্র দ্রব্য-পরিমাণকে সরবরাহ বলা যায় না। মজুত দ্রব্যের যে অংশ একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় হয়, সেই অংশকে সরবরাহ বলা হয়।

সরবরাহের সূত্র—Law of Supply

দাম বাড়িলে সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং দাম কমিলে সরবরাহ হ্রাস পায়। এই নিয়মকে সরবরাহের সূত্র বলা হয়। দাম যখন বাড়ে তখন বিক্রেতাগণের লাভ বেশী হয় এবং আরও বেশী লাভ করিবার জন্য তাহারা বেশী পরিমাণ সরবরাহ করে। দাম কমিলে লাভ কম হয় এবং দাম বেশী কমিলে লোকসানেরও ভয় আছে। সুতরাং যখন দাম কম হয়, বিক্রেতাগণ বিক্রয়ের জন্য কম দ্রব্য সরবরাহ করে।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার সূত্র—Law of Diminishing Utility

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যদিও

মানুষের অভাবের কোন শেষ নাই, তবুও প্রত্যেকটি অভাব পৃথকভাবে সহজেই মিটান যায়। তৃষ্ণার্ত হইলে একগ্লাস জল খাইলেই এবং অতি-তৃষ্ণার ক্ষেত্রে দুই গ্লাস জল খাইলেই তৃষ্ণা নিবারণ হয়। তৃতীয় গ্লাসের আর প্রয়োজন হয় না। খাদ্য, বস্ত্র, আসবাব-পত্র, আরামপ্রদ দ্রব্য, বিলাস দ্রব্য, সব কিছুই ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ইহাদের একটি,যদি বেশী হয় তাহা হইলে সেই দ্রব্যের উপযোগিতা ক্রমশঃ কমিতে থাকে। প্রথম পেয়ালা চায়ের জন্য হয়ত এক ব্যক্তি চার আনা দিতে প্রস্তুত, কিন্তু প্রথম পেয়ালা চা পান করিবার পর দ্বিতীয় পেয়ালার উপযোগিতা তাহার কাছে প্রথম পেয়ালার উপযোগিতা অপেক্ষা কম এবং উপযোগিতা কম বলিয়া সে এই দ্বিতীয় পেয়ালার জন্য তিন আনা দিতে প্রস্তুত। তৃতীয় পেয়ালার উপযোগিতা আরও কম বলিয়া সে ঐ পেয়ালার জন্য দু আনার বেশী দিবে না। চতুর্থ পেয়ালা চা সে আর ক্রয়ই করিবে না। কারণ, তিন পেয়ালায় তাহার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইয়াছে। একটি দ্রব্যের অধিক মাত্রা হইলে, দ্রব্যটির উপযোগিতা ভোগকারীর নিকট কমিয়া যায—ইহাকেই ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার সূত্র বলা হয়।

প্রান্তিক উপযোগিতা—Marginal Utility

উপরি-প্রদত্ত উদাহরণ হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, একটি দ্রব্য যত অধিক পরিমাণে ভোগ করা যায়, দ্রব্যটি হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতা ততই কমিতে থাকে। পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যটির উপযোগিতা যতই কমিতে থাকে, ক্রেতার ক্রয় করিবার ইচ্ছাও ততই কমিতে থাকে এবং সেইজন্য সে পরবর্তী মাত্রাগুলির জন্য কম দাম দিতে চাহে। এইরূপে ক্রেতা তত সময় পযন্ত দ্রব্যটি কিনিতে পাবে, যত সময় পর্যন্ত দ্রব্যটির মূল্য দ্রব্যটির উপযোগিতা অপেক্ষা কম থাকে। দ্রব্যটি হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতা ও দ্রব্যটির বাজার-মূল্য সমান হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা ক্রয় করে। কিন্তু দ্রব্যটির বাজার-মূল্য দ্রব্যটি হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতা অপেক্ষা বেশী হইলে ক্রেতা আর ক্রয় করে না। বাজারে প্রচলিত দরে ক্রেতা দ্রব্যটির যে পরিমাণ কিনিতে প্রস্তুত, সেই পরিমাণ হইতে যে উপযোগিতা পায়, তাহাকে প্রান্তিক উপযোগিতা (Marginal Utility) বলা হয়। দ্রব্যের মূল্য এই প্রান্তিক উপযোগিতার সমান হয়। মূল্য প্রান্তিক উপযোগিতার বেশী হইলে ক্রেতা ক্রয় করিবে না, আর প্রান্তিক উপযোগিতার কম হইলে বেশী পরিমাণ করিতে পারে।

উপরের উদাহরণে দেখান হইতেছে যে, এক পেয়ালা চায়ের মূল্য যখন দু' আনা তখন এক ব্যক্তি তিন পেয়ালা চা কিনিতে পারে। কারণ, ক্রেতা মনে করে যে, তৃতীয় পেয়ালা হইতে সে যে-পরিমাণ উপযোগিতা পাইতেছে তাহা তৃতীয় পেয়ালার জন্য প্রদত্ত মূল্য অর্থাৎ দু' আনার সমান। তাহা না হইলে সে তৃতীয় পেয়ালা না খাইয়া চলিয়া যাইত। তৃতীয় পেয়ালা চা-ই হইল তাহার চাহিদার প্রান্তিক অংশ এবং এই প্রান্তিক অংশের উপযোগিতাকে প্রান্তিক উপযোগিতা বলা হয়।

সমগ্র উপযোগিতা—Total Utility

একটি লোক যদি একসঙ্গে তিন পেয়ালা চা খায় তাহা হইলে এই তিন পেয়ালা চা হইতে সে মোট যে পরিমাণ উপযোগিতা পায়, তাহাই হইল সমগ্র উপযোগিতা। ক্রেতা যে কয় মাত্রা দ্রব্য ক্রয় করে, সেই প্রত্যেক মাত্রার উপযোগিতা যোগ করিলে দ্রব্যটির সমগ্র উপযোগিতা পাওয়া যায়। ক্রেতার নিকট প্রথম পেয়ালা চায়ের উপযোগিতা হইল চার আনার সমান, দ্বিতীয় পেয়ালার তিন আনার এবং তৃতীয় পেয়ালার দু' আনার সমান। তাহা হইলে তিন পেয়ালা হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতার পরিমাণ হইল ।০+৶০+৵০=৷৷৴০ সমগ্র উপযোগিতা।

ভোগোদ্বৃত্ত—Consumer's Surplus

সমগ্র উপযোগিতা ও প্রান্তিক উপযোগিতার ধারণা হইতে ভোগোদ্বৃত্তের ধারণা করা হয়। একটি লোক একসঙ্গে তিন পেয়ালা চা খাইলে সে এই তিন পেয়ালা হইতে ।০+৶০+৵০=৷৷৴০ মত সমগ্র উপযোগিতা পায়। কিন্তু প্রতি পেয়ালার জন্য তাহাকে প্রান্তিক উপযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত মূল্য অর্থাৎ ৵০ দিতে হয়। তিন কাপের জন্য তাহাকে ৵০×৩=।৵০ আনা দিতে হয়। সমগ্র উপযোগিতা (৷৷৴০) হইতে প্রদত্ত মূল্য (।৵০) আনা বাদ দিলে ৶০ থাকে। সুতরাং চা খাইয়া সে অতিরিক্ত তিন আনা মূল্যের তৃপ্তি পাইয়াছে। ক্রীত দ্রব্যের সংখ্যাকে প্রান্তিক উপযোগিতার দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে সমগ্র উপযোগিতা হইতে বিয়োগ করিলে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ করা যায়। ব্যক্তি একটি দ্রব্য ক্রয় করিতে যে পরিমাণ মূল্য দিতে প্রস্তুত এবং কার্যতঃ যে-পরিমাণ

মূল্য দিয়া সে ঐ দ্রব্যটি পায়—এই উভয়ের পার্থক্যই হইল ভোগোদ্বৃত্ত। কিম্বা ব্যক্তিগত চাহিদা মূল্য (Individual demand price) হইতে বাজার মূল্য (Market price) বিয়োগ করিলে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ জানা যায়। উপরের উদাহরণে তিন পেয়ালা চায়ের ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য অর্থাৎ যে মূল্য ক্রেতা চায়ের উপযোগিতার ভিত্তিতে দিতে প্রস্তুত ছিল তাহা হইল ।০+ଏ/+ ৵০=৷৵০। কিন্তু ক্রেতা কার্যতঃ বাজার-মূল্যে অর্থাৎ প্রতি পেয়ালা ৵০ আনা করিয়া তিন পেয়ালা ।৵০ আনায় পাইতেছে। ব্যক্তিগত চাহিদা মূল্য ৷৵০ আনা হইতে বাজার-মূল্য ।৵০ আনা বিয়োগ করিয়া (ଏ০) ভোগোদ্বৃত্ত পাওয়া গেল।

• বিভিন্ন লোকের রুচি ও আয়ের পার্থক্যের জন্য সব সময়ে ভোগোদ্বৃত্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্য-নির্ধারণ—Price determination under Competition

কোন দ্রব্যের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাবের দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয়। ক্রেতার নিকট দ্রব্যটির উপযোগিতা আছে বলিয়া ক্রেতা দ্রব্যটির জন্য একটা মূল্য দিতে রাজী থাকে এবং দ্রব্যটি ক্রয় করিবার পূর্বে সে মনে মনে দ্রব্যটির উপযোগিতার ভিত্তিতে দ্রব্যটির একটি সর্বোচ্চ মূল্য ঠিক করে। এই সর্বোচ্চ মূল্যের উপর সে কখনও মূল্য দিবে না। কিন্তু দ্রব্য ক্রয়কালে সে সর্বোচ্চ অপেক্ষা কমমূল্য দিবার জন্য বিক্রেতার সহিত দর কষাকষি করে।

দ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য দ্রব্যের সরবরাহ হয়। উৎপাদক বা বিক্রেতাগণ দ্রব্য সরবরাহ করে। ক্রেতার ন্যায় বিক্রেতাগণও দ্রব্য বিক্রয় করিবার পূর্বে মনে মনে দ্রব্যটির একটি সর্বনিম্ন মূল্য ঠিক করে, যে মূল্যের কমে তাহারা দ্রব্যটি বিক্রয় করিবে না। অবশ্য বিক্রেতাগণও চেষ্টা করে যে, ক্রেতার সহিত দর কষাকষি করিয়া যাহাতে সর্বনিম্ন মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে পারে। বিক্রেতার এই সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারিত হয় তাহার দ্রব্যটি উৎপাদন করিবার ব্যয়ের দ্বারা।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, চাহিদার অর্থাৎ ক্রেতার দিক দিয়া প্রত্যেকটি দ্রব্যের একটি সর্বোচ্চ ক্রয়মূল্য এবং সরবরাহ অর্থাৎ বিক্রেতার দিক দিয়া একটি সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্য থাকে। যে মূল্যে দ্রব্যটির ক্রয়-বিক্রয় চলে, তাহা এই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে থাকে এবং চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা স্থির হয়। বাজার দর অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় মূল্য এই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে ওঠা-নামা করে, কিন্তু ইহার বাহিরে যাইতে পারে না। বিক্রেতাগণ বিক্রয় করিবার জন্য যতটা উদ্‌গ্রীব হয়, ক্রেতাগণ ক্রয় করিবার জন্য যদি তাহা অপেক্ষা বেশী উদ্‌গ্রীব হয়, তাহা হইলে বাজার দর ক্রেতার সর্বোচ্চ চাহিদা-মূল্যের সমান অথবা ইহার কাছাকাছি হয়। আবার, ক্রেতার ক্রয় করিবার ইচ্ছা অপেক্ষা বিক্রেতার বিক্রয় করিবার ইচ্ছা যদি বেশী হয়, তাহা হইলে বাজার দর বিক্রেতার সর্বনিম্ন মূল্যের সমান বা ইহার কাছাকাছি হয়। এইরূপে ক্রেতা ও বিক্রেতার দর কষাকষির মধ্য দিয়া অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাবে মূল্য স্থিরীকৃত হয়।

সাধারণতঃ, মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতাগণ কম পরিমাণ ক্রয় করে ও বিক্রেতাগণ অধিক পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়। আবার, মূল্য কমিলে ক্রেতাগণ অধিক পরিমাণে ক্রয় করে ও বিক্রেতাগণ কম পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়। সুতরাং চাহিদা ও সরবরাহ উভয়েই মূল্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত। চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তন ঘটিলে মূল্যের যেরূপ পরিবর্তন ঘটে, মূল্যের পরিবর্তন ঘটিলেও তদ্রূপ চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তন ঘটে। একটি উদাহরণ সাহায্যে মূল্য, চাহিদা ও সরবরাহের এই পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝান যাইতে পারে।

চাহিদার পরিমাণ	দ্রব্য প্রতি মূল্য	সরবরাহের পরিমাণ
৫০০ টি	১০৲ টাকা	১,০০০ টি
৬০০ ,,	৯ ,,	৮০০ ,,
৭০০ ,,	৮ ,,	৭০০ ,,
৯০০ ,,	৭ ,,	৫০০ ,,
১২,০০ ,,	৬ ,,	৪০০ ,,

উপরে চাহিদা ও সরবরাহের যে তালিকা দেওয়া হইল তাহাতে দেখা যায় যে, প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য ১০৲ টাকা হইতে ৯, ৮, ৭, ৬৲ টাকায় যতই কমিতেছে, চাহিদার পরিমাণ ততই বাড়িতেছে, কিন্তু সরবরাহের পরিমাণ ১,০০০

হইতে কমিতেছে। আবার, ঐ উদাহরণে যদি নীচুর দিক হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য যখন ৬৲ টাকা হইতে ৭, ৮, ৯, ১০৲ টাকায় বাড়িয়া যাইতেছে তখন দাম বাড়িবার ফলে চাহিদার পরিমাণ কমিতেছে, কিন্তু সরবরাহের পরিমাণ বাড়িতেছে।

উপরের উদাহরণে আরও দেখা যাইতেছে যে, প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য যখন ৮৲ টাকা তখন বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের সমতা হয় অর্থাৎ ৮৲ টাকা মূল্য হইলে ক্রেতাগণ যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আর বিক্রেতাগণ যে পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহা সমান হয়। মূল্য ৮৲ টাকা বেশী বা কম হইলে ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ সমান হয় না। সুতরাং দ্রব্যের বাজার-মূল্য হইল ৮৲ টাকা, কারণ ঐ মূল্যে ক্রেতাগণ যে পরিমাণ কিনিতে চায় বিক্রেতাগণও সেই পরিমাণ বিক্রয় করিতে চায়। ক্রেতার দিক দিয়া ৮৲ টাকা হইল তাহার সর্বোচ্চ ক্রয়মূল্য এবং বিক্রেতার দিক দিয়া ৮৲ টাকা হইল তাহার সর্বনিম্ন বিক্রয়-মূল্য। এইজন্য এই মূল্যকে **স্থিতাবস্থা মূল্য** (**Equilibrium Price**) বলা হয়।
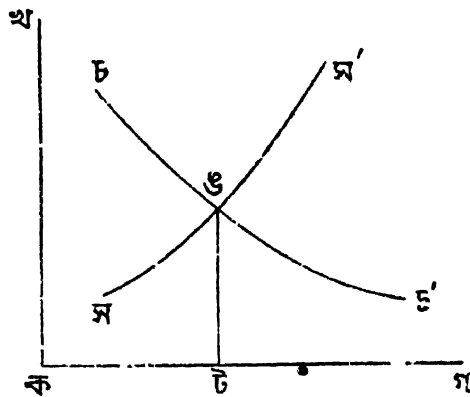
মূল্য-নির্ধারণতত্ত্বে মনে রাখিতে হইবে যে, চাহিদা ও সরবরাহের প্রতিক্রিয়ায় মূল্য স্থির হয়। কিন্তু চাহিদা ও সরবরাহ মূল্যনিরপেক্ষ নহে। মূল্যের পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদা ও সরবরাহেরও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং চাহিদা, সরবরাহ ও মূল্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

উপরে যে রেখাচিত্র দেওয়া হইল তাহার **কখ** রেখা দ্বারা দ্রব্যমূল্য দেখান হইয়াছে ও **কগ** রেখা দ্বারা দ্রব্যের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। **চচ'** হইল চাহিদার

রেখা এবং **সস´** হইল সরবরাহের রেখা। **চচ ও সস´** রেখা দুইটি **ঙ** বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে, দেখা যায় যে, মূল্য যখন **ঙট**, বিক্রেতাগণ তখন **কট** পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং ক্রেতাগণ ঐ মূল্যে ঐ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য যখন **ঙট** তখন সরবরাহ ও চাহিদা সমান হয় এবং যে মূল্যে চাহিদা ও সরবরাহ সমান হয়, তাহাকে স্থিতাবস্থা মূল্য বলা হয়।

বাজার দর ও স্বাভাবিক দর—Market price and Normal price

বাজার দরের অর্থ হইল কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্য বাজারে যে মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যটির সরবরাহ সাধারণতঃ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না। সুতরাং সরবরাহ অপরিবর্তিত থাকিলে বাজার-দর চাহিদার দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়। ধরা যাউক যদি কোন কারণে একদিন বাজারে মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মাছের দাম বৃদ্ধি পাইবে, কারণ সেইদিনের মত মাছের সরবরাহ আর বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। আবার মাছের চাহিদা কমিলে সেইদিন মাছের দাম কমিবে, কারণ, সেইদিন কম মূল্যে মাছ বিক্রয় না করিয়া বিক্রেতাগণ ভবিষ্যতে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার আশায় মাছ মজুত রাখিতে পারে না। মাছ ধরিবার ব্যয় যাহাই হউক না কেন, বিক্রেতাগণকে বাজারে চলতি দামে সমগ্র পরিমাণ মাছ বিক্রয় করিতে হইবে। সেদিনকার মত চাহিদা ও সরবরাহের একটা স্থিতাবস্থায় সমস্ত সরবরাহ বিক্রীত হইবে। সুতরাং স্বল্প-মেয়াদী বাজারে সরবরাহ অপেক্ষা চাহিদাই মূল্য-নির্ধারণে বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

একটি দ্রব্যের মূল্য যদি দীর্ঘকাল যাবৎ স্থির থাকে, তাহাকে স্বাভাবিক দর বলা হয়। (যে মূল্যে চাহিদা ও সরবরাহের দীর্ঘ-মেয়াদী সমন্বয় হয়, তাহাকে স্বাভাবিক দর বলে।) বাজার-দর যেরূপ ক্রেতার উপযোগিতার দ্বারা স্থির হয়, স্বাভাবিক দর সেইরূপ বিক্রেতার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। দীর্ঘ-মেয়াদে সরবরাহের পরিমাণ পরিবর্তন দ্বারা চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য করা সম্ভব বলিয়া স্বাভাবিক দর সাধারণতঃ উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। বাজার-দর চাহিদা ও সরবরাহের সাময়িক স্থিতাবস্থার দ্বারা স্থির হয়, আর স্বাভাবিক দর চাহিদা ও সরবরাহের স্থায়ী স্থিতাবস্থার দ্বারা স্থির হয়। সুতরাং বাজার দর হইল বাস্তব মূল্য আর স্বাভাবিক দর হইল অভিপ্রেত মূল্য অর্থাৎ যে মূল্য নির্দিষ্ট কালে

চাহিদা ও সরবরাহের স্থায়ী স্থিতাবস্থায় হওয়া উচিত। কিন্তু বাজার দর সাধারণতঃ এই অভিপ্রেত মূল্যের কাছাকাছি ওঠানামা করে; কদাচিৎ এই অভিপ্রেত মূল্যের সমান হয়।

একচেটিয়া মূল্য-নির্ধারণ—Price determination under Monopoly

প্রতিযোগিতার বাজারে বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। কিন্তু একচেটিয়া ক্ষেত্রে বহু ক্রেতা থাকিলেও বিক্রেতার সংখ্যা অতি সীমাবদ্ধ। একচেটিয়া ব্যবসায়ে বাজারে একটি দ্রব্যের সমগ্র সরবরাহের পরিমাণ একজন বিক্রেতা বা কয়েকজন বিক্রেতা নিয়ন্ত্রণ করে। সরকারের নিকট হইতে বিশেষ অনুমতিপত্র লইয়া একজন বিক্রেতা একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপন করিতে পারে, আবার অনেক সময় কয়েকজন বিক্রেতা মিলিত হইয়া বাজারের সমগ্র সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রধান উদ্দেশ্য হইল উচ্চমূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সবচেয়ে বেশী লাভ করা। এ বিষয়ে তাহার প্রধান সুবিধা হইল যে, বাজারে তাহার আর কোন প্রতিযোগী বিক্রেতা নাই। সে একাই সমস্ত সরবরাহের কর্তা। সুতরাং প্রতিযোগিতার বাজারে একজন বিক্রেতা যেরূপ অপর আর একজন বিক্রেতা অপেক্ষা বেশী মূল্যে একই দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে উচ্চমূল্য-নির্ধারণ করিয়া সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা অর্জন করিবার সেরূপ কোন বাধা নাই। একচেটিয়া ব্যবসায়ী তাহার ইচ্ছামত সরবরাহ হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে। মূল্য ধার্যের ব্যাপারেও তাহার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যত সময় পর্যন্ত ক্রেতাগণ ক্রয় করিতে অস্বীকার না করে, তত সময় পর্যন্ত একচেটিয়া ব্যবসায়ী সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভের উদ্দেশ্যে মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারে। এখন প্রশ্ন হইল একচেটিয়া ব্যবসায়ী কি পদ্ধতিতে তাহার উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য স্থির করে।

একচেটিয়া ব্যবসায়ী সরবরাহ-পরিমাণ-হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কিন্তু সে যদি বাজারে বিক্রয়ের জন্য বেশী জিনিস যোগান দেয়, তাহা হইলে মূল্য কমিতে পারে আবার যোগান কম করিলে বেশী মূল্য পাইতে পারে। মূল্য বেশী করিলে বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া লাভ কম হইতে পারে

আবার মূল্য কমিলে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মোট লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু সব জিনিসের ক্ষেত্রেই দাম কমাইলে যে বিক্রয় পরিমাণ বেশী হইয়া লাভ বেশী হইবে এবং দাম বাড়াইলে বিক্রয়-পরিমাণ কমিয়া লাভ কম হইবে ইহা সত্য নহে। একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য হইল সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভ করা। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে সে এরূপ দাম স্থির করিবে যাহাতে তাহার সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভ হয়। এই উদ্দেশ্যে সে কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে অল্পপরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিয়া প্রতি দ্রব্য উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া তাহার মোট মুনাফা বৃদ্ধি করিবে। আবার কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রতি দ্রব্যের জন্য কমমূল্য ধার্য করিয়া অধিক পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা তাহার মোট মুনাফা বৃদ্ধি করিবে। মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হইলে যে সমস্ত দ্রব্যের চাহিদার সাধারণতঃ পরিবর্তন হয় না, সে সমস্ত ক্ষেত্রে সে অল্পপরিমাণ দ্রব্য প্রত্যেকটি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া তাহার লাভের অঙ্ক বেশী করিবে। আর যে সমস্ত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা কমে ও মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে সে কমমূল্য ধার্য করিয়া অধিক পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা তাহার মোট মুনাফা স্ফীত করিবে।

সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে একচেটিয়া ব্যবসায়ী এরূপভাবে তাহার উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবে যে, নিয়ন্ত্রণের ফলে সে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে পারে। একচেটিয়া ব্যবসায়ী ঠিক সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে, যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় (Marginal cost of production) ও প্রান্তিক আয় (Marginal revenue) সমান হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন একচেটিয়া ব্যবসায়ী দ্রব্যের প্রতিটি ২৲ টাকা হিসাবে ১৫টি দ্রব্য বিক্রয় করে তাহা হইলে তাহার মোট বিক্রয় লব্ধ আয় ৩০৲ টাকা হয়। যদি সে ১৬টি দ্রব্য প্রতিটি ১৸৴০ হিসাবে বিক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে তাহার মোট বিক্রয় লব্ধ আয় হইবে ৩১৲ টাকা। এ স্থলে তাহার প্রান্তিক আয় হইল (৩১-৩০) বা ১৲ টাকা। প্রান্তিক অর্থাৎ ষোড়শ দ্রবাটির উৎপাদন ব্যয় যদি প্রান্তিক আয় অর্থাৎ ১৲ টাকা হইতে কম হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই ষোড়শ দ্রব্যটি উৎপাদন করা লাভ-জনক হয়। কিন্তু ষোড়শ দ্রব্যটির উৎপাদন ব্যয় যদি প্রান্তিক আয় অপেক্ষা

অধিক হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই অতিরিক্ত মাত্রা উৎপাদন লাভজনক নহে। সেইজন্য সে ১৫টির অধিক দ্রব্য উৎপাদন করিবে না। কারণ ১৫টি উৎপাদন করিলেই তাহার সর্বাধিক মুনাফা হয়। সুতরাং দেখা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রান্তিক আয় প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে, কারণ এই উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা তাহার মোট মুনাফা বৃদ্ধি পায়। যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে তাহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় সমান থাকে, সে সেই পরিমাণের অধিক বা কম উৎপাদন করে না। কারণ এই উভয় ক্ষেত্রেই তাহার মোট আয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মূল্য-নির্ধারণ নীতি বুঝান যাইতে পারে। একজন ব্যবসায়ীর নূতন এক ধরণের ফাউনটেন কলম বাজারে বাহির করিল। প্রতিটি কলম তৈরী করিবার খরচ হইল ৫৲ টাকা। এখন ব্যবসায়ী কোন্ মূল্যে কলম বিক্রয় করিলে তাহার সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভ হইবে দেখা যাউক।

প্রতি কলমের মূল্য	মোট বিক্রয় পরিমাণ	মোট বিক্রয় লব্ধ অর্থ	মোট ব্যয়	নীট মুনাফা
৮ টাকা	১০০	৮০০ টাকা	৫০০ টাকা	৩০০ টাকা
৭ ,,	২০০	১৪০০ ,,	১০০০ ,,	৪০০ ,,
৬ ,,	২৭৫	১৬৫০ ,,	১৩৭৫ ,,	২৭৫ ,,

উপরের উদাহরণে দেখা যায় যে, কলম-ব্যবসায়ী যদি প্রতি কলমে দাম ৮ টাকা ধার্য করে তাহা হইলে তাহার ১০০টি কলম বিক্রয় হইয়া খরচ বাদ দিলে ৩০০ টাকা নীট মুনাফা থাকে, ৭ টাকা ধার্য করিলে ৪০০ টাকা এবং ৬ টাকা ধার্য করিলে ২৭৫ টাকা নীট মুনাফা থাকে। একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য হইল সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা লাভ করা। সুতরাং সে সর্বোচ্চ মূল্য অর্থাৎ ৮ টাকা অথবা সর্বনিম্ন মূল্য অর্থাৎ ৬ টাকা ধার্য না করিয়া ৭ টাকা দাম ধার্য করিবে। কারণ একমাত্র এই মূল্যে কলম বিক্রয় করিলেই তাহার মুনাফার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী হইবে।

অনেক সময় আবার একচেটিয়া ব্যবসায়ী তাহার দ্রব্যের জন্য এক দাম ধার্য না করিয়া বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন মূল্য আদায় করিয়া মুনাফা-

পরিমাণ বৃদ্ধি করে। অবশ্য এজন্য তাহাকে দ্রব্যটির বহিরাবরণের একটু পরিবর্তন করিতে হয়। রেল কোম্পানী ভ্রমণের সুবিধার একটু তারতম্য করিয়া যাত্রী সাধারণকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর নিকট হইতে বিভিন্ন মাশুল আদায় করে। পুস্তক-ব্যবসায়িগণও অনেক সময় পুস্তকের সাধারণ সংস্করণ ও রাজ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন দাম ধার্য করে। ইহাকে **ভেদমূলক মূল্য (Discriminating price)** বলা হয়। অনেক সময় একই দ্রব্যের বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই ভেদমূলক মূল্য ধার্য করা হয়। আলো ও হাওয়ার জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহের মূল্য যে হারে ধার্য হয়, বেতার-যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে তদপেক্ষা কমহারে বিদ্যুৎপ্রবাহের মূল্য ধার্য করা হয়। আবার অনেক সময় স্থানভেদেও ভেদমূলক মূল্য ধার্য করা হইয়া থাকে।

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মূল্য ধার্য করিবার ক্ষমতার সীমা—Limits to the price-fixing power of a Monopolist

তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর বাজারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকিলেও সে খুসীমত উচ্চমূল্যে ধার্য করিয়া অত্যধিক লাভ করিতে পারে না। তাহার উচ্চমূল্য ধার্য করিবার ক্ষমতারও কয়েকটি সীমা আছে। প্রথমতঃ, সে যদি খুব বেশী মূল্য ধার্য করে তাহা হইলে বাজারে বিকল্প দ্রব্য (Substitutes) আমদানী হইয়া তাহার বিক্রয়-পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। ফলে, তাহার লাভের পরিমাণও কম হইবে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা না থাকিলেও তাহাকে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, খুব বেশী উচ্চমূল্য ধার্য করিয়া অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিতে থাকিলে সরকার কর ধার্য করিয়া অথবা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া মুনাফার পরিমাণ হ্রাস করিতে পারেন। এই সমস্ত কারণে একচেটিয়া ব্যবসায়ী খুব বেশী মূল্য ধার্য করিয়া অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিতে ইতস্ততঃ করে।

চাহিদা কিসের উপর নির্ভর করে—Factors governing demand

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, চাহিদা মূল্যনিরপেক্ষ নহে। কোন লোকের কোন দ্রব্যবিশেষের চাহিদা বলিলে বুঝা যায় যে, লোকটি বিশেষ নির্দিষ্ট মূল্যে ঐ দ্রব্যটির কি পরিমাণ ক্রয় করিবে। দ্রব্যটির মূল্য বাড়িলে সে হয়ত দ্রব্যটির কম পরিমাণ

কিনিবে এবং মূল্য কমিলে অধিক পরিমাণ কিনিবে। দ্বিতীয়তঃ, চাহিদা দ্রব্যটির উপযোগিতার উপর নির্ভর করে। দ্রব্যটি হইতে ক্রেতা যে পরিমাণ উপযোগিতা পাইতে পারে, সে মনে মনে সেই উপযোগিতার পরিমাণ স্থির করিয়া দ্রব্যটি হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতা অনুসারে মূল্য দিতে ইচ্ছুক হয়। দ্রব্যটির মূল্য যদি দ্রব্যটির সম্ভাব্য উপযোগিতা অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে দ্রব্যটির চাহিদা থাকে না। তৃতীয়তঃ, চাহিদা আয়-পরিমাণের উপর নির্ভর করে। লোকের আর্থিক আয়-পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহাদের ক্রয়ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ফলে দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায় আবার, আর্থিক আয়ের পরিমাণ কমিলে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে চাহিদার পরিমাণ কমিয়া যায়। চতুর্থতঃ, মানুষের রুচি, অভ্যাস ও জীবনধারণের মানের উপর চাহিদা নির্ভর করে। নূতন রুচি বা অভ্যাস গঠনের ফলে পুরাতন দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে। নূতন রুচি বা অভ্যাস গঠনের ফলে পুরাতন দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাইয়া নূতন দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারে। বর্তমানে যুবকগণের মধ্যে ধুতির ব্যবহার হ্রাস পাইয়া প্যাণ্টালুনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। পঞ্চমতঃ, যদি কোন দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ বিকল্প সামগ্রী থাকে, তাহা হইলে একটির মূল্য পরিবর্তিত হইলে অপরটির চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। মাছের দাম বেশী হইলে ডিমের চাহিদা সাধারণতঃ বৃদ্ধি পায়।

মূল্য-পরিবর্তন ও আয়-পরিবর্তন—Price Changes and Income Variation

মূল্যের পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদার পরিমাণ কমিয়া যায়, কারণ যাহারা পূর্বে কম মূল্যে বেশী পরিমাণ কিনিত তাহারা বর্তমান বেশী মূল্যে কম পরিমাণ কিনিবে এবং যাহারা পূর্বের মূল্যেই সামান্য কিনিত, বর্তমানে মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা আদৌ কিনিবে না। সুতরাং গড়ে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়। আবার মূল্য কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, কারণ যাহারা পূর্বে মূল্য বেশী বলিয়া আদৌ কিনিত না, বর্তমানে কম মূল্যে তাহারা কিছু পরিমাণ কিনিবে এবং পূর্বের মূল্যে যাহারা কম কিনিত বর্তমানে মূল্য কম হওয়ার জন্য তাহারা বেশী পরিমাণ কিনিবে। সুতরাং মূল্য হ্রাস পাইলে মোট চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

কমলা লেবুর দাম দুই আনা জোড়া হইতে চার আনা হইলে পূর্বে যাহারা দুই জোড়া কিনিত এখন তাহারা একজোড়া মাত্র কিনিবে, যাহারা পূর্বে একজোড়া কিনিত তাহারা একটিমাত্র কিনিবে এবং যাহারা একটি কিনিত তাহারা মোটেই কিনিবে না। আবার, দাম চারি আনা হইতে দুই আনায় কমিলে যাহারা এক-জোড়া কিনিত তাহারা দু' জোড়া কিনিবে, যাহারা একটা কিনিত তাহারা এক-জোড়া কিনিবে এবং যাহারা মোটেই কিনিত না, তাহারাও কিছু কিছু কিনিবে।

আয়-পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। আয় বাড়িলে লোকের ব্যয় করিবার শক্তি বাড়ে। ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই চাহিদা-বৃদ্ধি সর্বক্ষেত্রে সমান হয় না। ধনিগণের আয় বাড়িলে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা খুব বেশী বাড়ে না, কারণ এই দ্রব্যগুলির উপর ব্যয় বৃদ্ধি করিয়াও তাহারা আর কোন নূতন উপযোগিতা পায় না। ধনিগণের আয় বৃদ্ধি পাইলে তাহারা সাধারণতঃ বিলাস দ্রব্য ও আরামপ্রদ দ্রব্যের উপর বেশী ব্যয় করে এবং এই দ্রব্যগুলির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অবশিষ্টাংশ ধনিগণ সঞ্চয় করে। দরিদ্রের আয় বৃদ্ধি পাইলে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর তাহারা বেশী ব্যয় করে, কারণ এই দ্রব্যগুলির উপর ব্যয় করিয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকিবার মত জীবন-ধারণের মান বজায় রাখিতে পারে। সুতরাং দরিদ্রের আয় বৃদ্ধি পাইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং আয় কমিলে তাহার জীবন-ধারণের জন্য ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—Elasticity of demand

চাহিদার সূত্র আলোচনা কালে দেখা গিয়াছে যে, চাহিদা ও মূল্যের সম্পর্ক বিপরীতমুখী অর্থাৎ মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে এবং মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে। অনেক জিনিসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মূল্যের সামান্য পরিবর্তন অর্থাৎ সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধিতে চাহিদা বেশী পরিমাণে বাড়িয়া অথবা কমিয়া যায়। বেতার-যন্ত্র, ঘড়ি প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য একটু কমিয়া গেলে ঐ দ্রব্যগুলির চাহিদা বেশী পরিমাণে বাড়ে, আবার মূল্য একটু বাড়িলে চাহিদা বেশী পরিমাণে কমে। কিন্তু চাউল, চিনি, লবণ প্রভৃতি এমন অনেক নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য আছে, যেগুলির ক্ষেত্রে মূল্যের সামান্য পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। এই

দ্রব্যগুলির দাম একটু কমিলে বা বাড়িলে চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। লবণের দাম কমিলে লোকে হয়ত একটু বেশী পরিমাণ লবণ কিনিতে পারে, কিন্তু মূল্যহ্রাসের তুলনায় ক্রয়পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। চাউলের দাম বাড়িলে লোকে হয়ত পূর্বাপেক্ষা কিছু কম চাউল কিনিবে, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় ক্রয়হ্রাস কমই হইবে। সুতরাং মূল্যের পরিবর্তন ঘটিলে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। মূল্য পরিবর্তনের সহিত চাহিদা পরিবর্তনের যে সম্বন্ধ, তাহাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।

কোন দ্রব্যের দাম সামান্য কমিলে চাহিদা অত্যধিক পরিমাণে বাড়ে বা দাম সামান্য বাড়িলে চাহিদা অত্যধিক পরিমাণে কমে, তাহা হইলে এই চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Elastic demand) বলা হয়।

অনেক দ্রব্য আছে যাহাদের মূল্য একটু বাড়িলে বা কমিলে চাহিদার বিশেষ কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এই সমস্ত দ্রব্যের চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Inelastic demand) বলা হয়।

বাস্তব জীবনে কোন দ্রব্যের চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বা সম্পূর্ণ অস্থিতি-স্থাপক হয় না। মূল্যের পরিবর্তনে বিভিন্ন লোকের চাহিদা বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয় এবং এই পরিবর্তনের কারণ হইল বিভিন্ন লোকের রুচিবোধ ও আয়ের পার্থক্য। মাছ-মাংসের দাম অত্যধিক পরিমাণ কমিলেও নিরামিষাশী ব্যক্তির মাছ ও মাংসের চাহিদা আদৌ বাড়ে না বা দাম বৃদ্ধি পাইলেও চাহিদা কমে না। এক্ষেত্রে চাহিদা সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিস্থাপক বলা যাইতে পারে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কিসের উপর নির্ভর করে—Factors governing elasticity of demand

প্রথমতঃ, অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীগুলির, যথা, লবণ, চাউল, চিনি, কাপড় প্রভৃতির চাহিদা স্থিতিস্থাপক নহে। কারণ, এই দ্রব্যগুলির মূল্য সামান্য বাড়িলে বা কমিলে ইহাদের চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি সত্ত্বেও লোকে প্রায় পূর্বপরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে। দ্বিতীয়তঃ, বিলাস দ্রব্যগুলির চাহিদা সাধারণতঃ স্থিতিস্থাপক হয়। সুগন্ধযুক্ত তৈল, সূক্ষ্মবস্ত্র প্রভৃতি লোকের জীবনধারণ বা কর্মক্ষমতা অটুট রাখিবার জন্য অত্যাবশ্যকীয় নহে। সুতরাং

এই দ্রব্যগুলির মূল্য কমিলে লোকে অধিক পরিমাণ ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু মূল্য বাড়িলে এই দ্রব্যগুলির চাহিদা কমে। কারণ, এই দ্রব্যগুলি না হইলেও লোকের কিছু অসুবিধা হয় না। তৃতীয়তঃ, চা-পান, ধূম-পান প্রভৃতি এমন কতকগুলি অভ্যাসগত দ্রব্য আছে, যেগুলির চাহিদা স্থিতিস্থাপক নহে। কারণ দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে এই দ্রব্যগুলির ব্যবহার প্রায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মত অপরিহার্য হইয়া উঠে এবং এই কারণে মূল্যের সামান্য পরিবর্তনে এই দ্রব্যগুলির চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। চতুর্থতঃ, যে সমস্ত দ্রব্যের বিকল্প সামগ্রী (Substitute) থাকে, তাহাদের চাহিদা সাধারণতঃ স্থিতিস্থাপক হয়। ট্রামের ভাড়া বাড়িলে লোকে বাসে চড়িবে। কাজেই বাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে ও ট্রামের চাহিদা কমিবে। পঞ্চমতঃ, যে-সমস্ত দ্রব্যের মূল্য খুব বেশী বা খুব কম, সে সমস্ত দ্রব্যের মূল্যের ঈষৎ পরিবর্তনে চাহিদার বিশেষ তারতম্য হয় না। মোটর গাড়ীর দাম খুবই বেশী। গাড়ীর দাম পাঁচ হাজার হইতে ছয় হাজারে বৃদ্ধি পাইলেও বা পাঁচ হাজার হইতে চার হাজারে কমিলেও ধনীলোকের মোটর গাড়ীর চাহিদার পরিবর্তন হয় না। সাধারণ লোকের নিকটও মোটর গাড়ীর মূল্য এত অধিক যে মোটর গাড়ীর মূল্যের এই সামান্য পরিবর্তনে তাহাদের চাহিদারও আদৌ কোন পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং মোটর গাড়ীর চাহিদা ধনী ও দরিদ্র উভয়ের নিকটই অস্থিতিস্থাপক। দুই-এক পয়সা দামের খেলনা বা অন্যান্য মনোহারী দ্রব্য যাহার দাম খুব কম, তাহাদের মূল্যের সামান্য পরিবর্তনে চাহিদার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। এক পয়সার বেলুন ও ঘুড়ির মূল্য যদি দু'পয়সা হয়, তাহা হইলেও লোকে মূল্যের এই পার্থক্য গ্রাহ্য করে না। তাহারা পূর্বের মতই দ্রব্যটি ক্রয় করে। সুতরাং যে সমস্ত দ্রব্যের দাম খুব বেশী বা যে সমস্ত দ্রব্যের দাম খুব কম, তাহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক নহে।

মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার যে বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটে, তাহাকে চাহিদার মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা (Price elasticity of demand) বলে। লোকের আয়-পরিবর্তনের ফলে যখন চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, তখন চাহিদার এই পরিবর্তনকে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা (Income elasticity) বলা হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, লোকের আয় বাড়িলে অনেক জিনিসই একটু বেশী পরিমাণে কিনে আবার আয় কমিলে কম পরিমাণে কিনে।

স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের উপায়—How to measure elasticity of demand

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একাধিক উপায়ে পরিমাপ করা যায়। প্রথমতঃ, বলা হয় যে, মূল্য পরিবর্তিত হইলেও দ্রব্যটির উপর সমগ্র ব্যয়-পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে একক স্থিতিস্থাপকতা (unit elasticity) বলা হয়। মূল্য যখন ৬ টাকা তখন নয়টি দ্রব্য ক্রয় করা হয় এবং মোট ব্যয়পরিমাণ হয় ৯×৬=৫৪ টাকা। আবার, মূল্য যখন ৪॥০ টাকা তখন বারটি দ্রব্য ক্রয় করা হয়, কিন্তু মোট ব্যয়পরিমাণ ৫৪ টাকাই থাকে। মূল্য-পতনের ফলে যখন সমগ্র ব্যয়পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন এই চাহিদাকে একক অপেক্ষা অধিক স্থিতিস্থাপক (Greater than unity) বলা হয়। মূল্য যখন ৪॥০ হইতে ৪ টাকায় কমিতেছে তখন চাহিদার পরিমাণ ১২ হইতে ১৪ বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র ব্যয়পরিমাণ ১৪×৪=৫৬ টাকায় বৃদ্ধি পাইতেছে। আবার, মূল্য যখন ৪ হইতে ৩ টাকায় নামে তখন চাহিদার পরিমাণ ১৪ হইতে ১৫ বৃদ্ধি পাইলেও সমগ্র ব্যয়পরিমাণ ৫৬ হইতে ১৫×৩=৪৫ টাকায় হ্রাস পায়। এই চাহিদাকে একক অপেক্ষা কম স্থিতিস্থাপক (Less than unity) বলা হয়।

স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল যে, মূল্য-পরিবর্তনের হারের সহিত চাহিদা-পরিবর্তনের হারের তুলনা করিতে হইবে। মূল্য যদি এক-চতুর্থাংশ হারে বৃদ্ধি পায় আর চাহিদাও যদি এক-চতুর্থাংশ হারে হ্রাস পায়, তাহা হইলে এই চাহিদাকে একক স্থিতিস্থাপকতা বলা হয় কিন্তু মূল্য যদি এক-চতুর্থাংশ হারে বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা যদি এক-চতুর্থাংশ হারেরও অধিক হ্রাস পায়, তাহা হইলে এই চাহিদাকে একক অপেক্ষা অধিক স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়, আর চাহিদা যদি এক-চতুর্থাংশ হারের কম হ্রাস পায়, তাহা হইলে চাহিদাকে একক অপেক্ষা কম স্থিতিস্থাপক বলা হয়।

স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব—Importance of the concept

মূল্য-পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া, দৈনন্দিন জীবনে এই ধারণাটির গুরুত্ব কম নহে। একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে তাহার দ্রব্যের-মূল্য-নির্ধারণকালে এই স্থিতিস্থাপকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মূল্য-

নির্ধারণ করিতে হইবে। দ্রব্যের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে কম মূল্য ধার্য করিয়া অধিক দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা সে বেশী লাভ করিতে পারে, কিন্তু অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে সে প্রতি দ্রব্যের উচ্চমূল্য ধার্য করিয়া অল্প দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বেশী লাভ করিবে। কর-ধার্যের কালেও সরকারকে এ বিষয়ে চিন্তা করিতে হয়। শ্রমিকের মজুরি-নির্ধারণেও ইহার গুরুত্ব কম নহে। যদি কোন জাতীয় শ্রমিকের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে মজুরি বৃদ্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

সরবরাহ ও সরবরাহ-ব্যয় কিসের উপর নির্ভর করে—Factors governing supply price

একটি দ্রব্যের সরবরাহ এবং ইহার সরবরাহ-ব্যয় অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, একটি দ্রব্যের সরবরাহ-পরিমাণ দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ খরচ হয়, তাহার উপর নির্ভর করে। উৎপাদন-ব্যয় যদি বেশী হয়, তাহা হইলে সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পায়, আবার উৎপাদন খরচ কম হইলে সরবরাহ বেশী হয়। কাঁচামাল, উৎপাদনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যগুলির মূল্য, শ্রমিকের মজুরি প্রভৃতি যদি বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে উৎপাদন-ব্যয়ও বৃদ্ধি হয়। ফলে বাজারে যোগান-পরিমাণ হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ, নূতন আবিষ্কারের ফলে যদি উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি হয়, তাহা হইলে নানাদিক দিয়া উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া যায়। উৎপাদন-ব্যয় কমিলে সরবরাহ বেশী হয়। তৃতীয়তঃ, একটি দ্রব্যের সরবরাহ যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতি হইলে দূর অঞ্চল হইতে অল্পব্যয়ে দ্রব্য-সামগ্রী আমদানী করা সহজ হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা বিদেশ হইতেও যথেষ্ট পরিমাণে দ্রব্য আমদানী করিয়া সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায়। চতুর্থতঃ, সরবরাহের পরিমাণ এবং সরবরাহ-মূল্য ব্যবসায়িগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ব্যবসায়িগণ মূল্য বৃদ্ধি করিয়া অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য প্রয়োজন হইলে তাহারা উৎপাদিত দ্রব্যের এক অংশ নষ্ট করিতেও দ্বিধা করে না। এইরূপে কৃত্রিম উপায়ে সরবরাহ-পরিমাণ হ্রাস করিয়া ব্যবসায়িগণ অধিক মুনাফা অর্জন করে। পঞ্চমতঃ, সরকার নানাকারণে কোন দ্রব্যের উৎপাদন-পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

অনেক সময় উৎপন্ন দ্রব্যের উপর কর ধার্য করিবার ফলে সরবরাহ-পরিমাণ হ্রাস পায় এবং উৎপাদকগণ সরকার কর্তৃক ধার্য কর উৎপাদন-খরচার অঙ্গীভূত করিয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে। এই উপায়ে সরকার বিদেশী দ্রব্যের সরবরাহও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। পরিশেষে বলা যায় যে, দেশে যদি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়ের পার্থক্য হ্রাস পায়, তাহা হইলে দরিদ্রের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের চাহিদা বৃদ্ধি করে। চাহিদা বাড়িলে স্বভাবতঃই যোগান বাড়ে। সুতরাং চাহিদা ও সরবরাহ দেশের ধনবণ্টন-ব্যবস্থার উপরও অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। (ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি ও ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-বিধি যথাক্রমে চতুর্থ ও অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।)

সংক্ষিপ্তসার

বিনিময়-মূল্য ও অর্থ-মূল্য

ব্যবহারিক মূল্য অর্থাৎ উপযোগিতা এবং বিনিময়-মূল্য এই দুইটি অর্থে 'মূল্য' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধনবিজ্ঞানে মূল্য শব্দটি বিনিময-মূল্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। দুইটি দ্রব্যের বিনিময়ের অনুপাত যখন অর্থদ্বারা পরিমাপ করা হয়, তখন তাহাকে অর্থ-মূল্য বা দাম বলা হয়।

চাহিদা ও চাহিদার সূত্র

ধনবিজ্ঞানের দাম ছাডা চাহিদা হয় না। চাহিদার অর্থ হইল একটা নির্দিষ্ট মূল্যে লোকে যে পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে ইচ্ছুক থাকে। দ্রব্য-মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। সাধারণতঃ মূল্য কমিলে লোকের চাহিদা বাডে এবং মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে। ইহাকে চাহিদার নিয়ম বলা হয়।

সরবরাহ ও সরবরাহের সূত্র

সরবরাহ বলিতে একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে সরবরাহ বলে। সুতরাং দাম ছাডা সরবরাহ হয় না। দাম বাড়িলে সাধারণতঃ সরবরাহ-পরিমাণ বাডে এবং দাম কমিলে সরবরাহ-পরিমাণ কমে।

পরিবর্তনে চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে, তাহা সবক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণকে সমানভাবে প্রভাবিত করে না।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও ইহা কিসের উপর নির্ভর করে

মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মূল্য পরিবর্তনের সহিত চাহিদার এই পরিবর্তনের সম্বন্ধকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। মূল্যের সামান্য পরিবর্তনে চাহিদার যদি বেশী পরিবর্তন হয় তাহা হইলে এই চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হয়। মূল্য একটু বাড়িলে বা কমিলে চাহিদার যদি বিশেষ কোন পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে এই চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হয়। সাধারণতঃ বিলাস দ্রব্য, বিকল্প দ্রব্য একাধিকভাবে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যগুলির চাহিদা হইল স্থিতিস্থাপক। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, অভ্যাসগত দ্রব্য প্রভৃতির চাহিদা হইল অস্থিতিস্থাপক। একচেটিয়া ব্যবসায়ী দাম ঠিক করিবার সময় ও সরকার কর বসাইবার সময় দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক তাহা বিবেচনা করেন।

সরবরাহ কিসের উপর নির্ভর করে

সরবরাহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নিভর করে।

১। উৎপাদন-ব্যয়, ২। উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তন, ৩। যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Explain how price is determined in a market under perfect competition, H.S (Hu.), 1960, 1963 Comp.

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্য কিভাবে স্থির হয় তাহা আলোচনা কর।

উঃ—পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য কিভাবে স্থির হয়—ইহাই হইল আলোচ্য বিষয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলিতে আমরা বুঝি বাজারে বহু ক্রেতা ও বহু বিক্রেতা একই দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে বাজারে দ্রব্যটির একই মূল্য বর্তমান রহিয়াছে। বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তাহা হইলে চাহিদা ও যোগানের দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয়—শুধুমাত্র চাহিদা বা শুধুমাত্র যোগানের দ্বারা মূল্য স্থির হইতে পারে না। ক্রেতার দিক দিয়া তাহার চাহিদা-মূল্য নির্ভর করে ক্রেতার নিকট দ্রব্যটির উপযোগিতার দ্বারা। ক্রেতার নিকট দ্রব্যটির উপযোগিতা

যত বেশী হইবে, ক্রেতা তত বেশী পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে উৎসুক হইবে। কিন্তু দ্রব্যটির যোগান যদি বৃদ্ধি না হয় তাহা হইলে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে—আবার যোগান যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মূল্য কমিবে এবং এইরূপে মূল্য দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগিতার সমান হইবে। অপর পক্ষে দ্রব্যটির যোগান দ্রব্যটির উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে। চলতি দর যদি উৎপাদন খরচের অধিক হয় তাহা হইলে উৎপাদক বেশী লাভের আশায় বেশী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে। কিন্তু বেশী উৎপাদনের ফলে মূল্য কমিবে ও শেষ পর্যন্ত মূল্য উৎপাদন খরচের সমান হইবে।

এইরূপে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে মূল্য নির্ধারিত হয়। যে মূল্যে বাজারের সমগ্র চাহিদা মিটিবে ও সমগ্র যোগান বিক্রীত হইবে, সেই মূল্যকে স্থিতাবস্থামূল্য (Equilibrium price) বলা হয়। এই মূল্যে ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগিতা ও বিক্রেতার প্রান্তিক উৎপাদন খরচ সমান হয়।

দ্রব্যমূল্য চাহিদা ও যোগান—এই উভয়ের যুগ্ম প্রভাবে নির্ণীত হয়। তবে মূল্যের উপর চাহিদা ও যোগানের প্রভাব সব সময়ে সমান হয় না। যদি অল্প সময় ধরা যায়, অর্থাৎ যদি চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ হ্রাস-বৃদ্ধি করা না যায় তবে মূল্য-নির্ধারণে চাহিদার প্রভাব বেশী হয়। কিন্তু সময় দীর্ঘ হইলে জিনিসের যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় এবং জিনিসের দাম জিনিসের সরবরাহ (উৎপাদন) ব্যয়ের সমান হয়। সুতরাং দীর্ঘ সময়ে মূল্যের উপর সরবরাহের প্রভাব বেশী হয়।

2. Distinguish between market value and normal value. Show how market value is determined. H S. (Hu.), 1961

বাজার দর ও স্বাভাবিক দরের পার্থক্য কর। বাজার দর কিভাবে স্থির হয় আলোচনা কর।

উঃ—বাজারে নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি দ্রব্য যে মূল্যে বিক্রীত হয় তাহাকে বাজার-দর বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে যোগান সাধারণতঃ অপরিবর্তিত থাকে এবং যোগান অপরিবর্তিত থাকিলে চাহিদার প্রভাবে দ্রব্যটির যে মূল্য হয় তাহাই বাজার-দর। বাজার-দর দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগিতার সমান হয়।

যে মূল্যে চাহিদা ও যোগানের দীর্ঘকালীন সমন্বয় হয়, তাহাকে স্বাভাবিক দর বলা হয়। স্বাভাবিক মূল্য সাধারণতঃ উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। সুতরাং বাজার-দর হইল বাস্তবমূল্য আর স্বাভাবিক দর হইল অভিপ্রেত মূল্য অর্থাৎ যে মূল্য নির্দিষ্টকালে চাহিদা ও সরবরাহের স্থায়ী সমন্বয়ে নির্ধারিত হয়। বাজার-দর এই স্বাভাবিক দরের কাছাকাছি ওঠা-নামা করে, কদাচিৎ এই স্বাভাবিক মূল্যের সমান হয়।

3. What is a monopoly ? How is monopoly price determined ?
H.S. (Hu.) Comp. 1961, 1962 Comp., 1963

একচেটিয়া ব্যবসায় কাহাকে বলে ? একচেটিয়ার ক্ষেত্রে মূল্য কিভাবে স্থির হয় ?

উঃ—যখন একটি লোক বা একটি প্রতিষ্ঠান কোন একটি দ্রব্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তাহাকে একচেটিয়া কারবার বলা হয়। কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হইল

একচেটিয়া কারবারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একচেটিয়া কারবারী যে মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করে তাহাকে একচেটিয়া মূল্য বলা হয়। একচেটিয়া কারবারী যোগান পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল সর্বোচ্চ লাভ করা। এইজন্য সে এরূপভাবে তাহার একচেটিয়া দ্রব্যটির মূল্য ধার্য করিবে যাহাতে তাহার সবচেয়ে বেশী লাভ হয়।

একচেটিয়া ব্যবসায়ী অধিক মূল্য ধার্য করিলে তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া লাভের পরিমাণ কমিতে পারে, আবার অল্পমূল্য ধার্য করিলে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িলেও লাভের পরিমাণ নাও বাড়িতে পারে। সুতরাং সে সর্বোচ্চ মূল্য ধার্য করিতে পারে না, আবার সর্বনিম্ন মূল্যও ধার্য করিতে পারে না। সে এরূপ মূল্য ধার্য করিবে যাহাতে তাহার লাভের অঙ্ক সবচেয়ে বেশী হয়—ক্রেতাসাধারণের সে দামে সুবিধা হউক আর অসুবিধা হউক।

4 State and illustrate the law of demand.

চাহিদার সূত্র উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

উঃ—সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে। মূল্য কমিলে অনেকে বেশী করিয়া কিনিবে ও যাহারা পূর্বের উচ্চমূল্যে কিনিত না তাহারাও এখন কমমূল্যে কিনিবে। সুতরাং চাহিদার পরিমাণ বাড়িবে। আবার মূল্য বাড়িলে নূতন কোন ক্রেতা কিনিবে না, অধিকন্তু উচ্চ মূল্যের জন্য পুরাতন ক্রেতাগণ কম পরিমাণ কিনিবে। সুতরাং চাহিদার পরিমাণ কমিবে। মূল্য কমিলে চাহিদার যে বৃদ্ধি হয় ও মূল্য বাড়িলে চাহিদার যে হ্রাস হয়, তাহাকেই চাহিদার সূত্র বলা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, চাহিদা ও মূল্যের সম্পর্ক বিপরীতমুখী। কিন্তু এই নিয়মটি কার্যকরী হইতে গেলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, লোকের রুচি, অভ্যাস ও আয়ের কোন পরিবর্তন হয় নাই। কমলালেবুর জোড়া দুই আনা হইলে একটি লোক একজোড়া কিনিতে পারে, মূল্য চার আনা হইলে মাত্র একটি কিনিবে, আর আট আনা হইলে মোটে নাও কিনিতে পারে। আবার এক জোড়ার দাম চার আনা হইতে দুই আনা হইলে এবং দুই আনা হইতে এক আনা হইলে, সে বেশী কিনিতে পারে।

5 What is meant by 'elasticity of demand'? Explain why the demand for luxuries is elastic, while the demand for necessaries inelastic. H.S (Comp) 1961

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝ? বিলাসদ্রব্যের চাহিদাই বা কেন স্থিতিস্থাপক, আর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদাই বা কেন অস্থিতিস্থাপক তাহা বুঝাইয়া দাও।

উঃ—দ্রব্যের চাহিদা দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হয়। মূল্যের সামান্য পরিবর্তনে (ওঠা-নামায) যদি চাহিদার লক্ষণীয় পরিবর্তন (হ্রাস-বৃদ্ধি) হয় তাহা হইলে তাহাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা (elastic demand) বলা হয়। এরূপ অবস্থায় দাম একটু বাড়িলেই চাহিদার পরিমাণ বেশ কমিয়া যায়, আর দাম একটু কমিলেই চাহিদার পরিমাণ বেশ বাড়িয়া যায়। কিন্তু কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দামের ঈষৎ পরিবর্তনে চাহিদার বিশেষ

কোন পরিবর্তন ঘটে না। দাম একটু বাড়িলে বা কমিলে চাহিদার বিশেষ তারতম্য হয় না এবং মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে বিক্রয়ের পরিমাণও খুব সামান্য কমে। এইরূপ চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (inelastic demand) বলা হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, চাউল, চিনি, লবণ প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক ও ঘড়ি, গন্ধদ্রব্য, আসবাবপত্র প্রভৃতি সৌখীন দ্রব্যের চাহিদা হইল স্থিতিস্থাপক। ইহার কারণ হইল যে, চাউল, চিনি, লবণ প্রভৃতির দাম সামান্য বাড়িলে বা কমিলে লোকে প্রায় একই পরিমাণ জিনিস কিনিবে। মূল্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদার বিশেষ তারতম্য ঘটে না। কিন্তু বিলাসদ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই দ্রব্যগুলির মূল্য বাড়িলে বা কমিলে চাহিদাও কমে বা বাড়ে, কারণ এই দ্রব্যগুলি না হইলেও লোকের জীবন-ধারণের বা কর্মদক্ষতার কোন অসুবিধা হয় না।

———

ষোড়শ অধ্যায়

উপাদানগুলির বিভিন্ন ধরণের আয়

(Different Types of Factor-Incomes)

উপাদানের আয়—Factor Income

ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা এই চারিটি হইল উৎপাদনের প্রধান উপাদান। এই চারিটি উপাদানের সাহায্যে একটি দেশের সমগ্র ধন উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদিত ধন পারিশ্রমিক হিসাবে এই চারিটি উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হয়। ভূমির আয়কে খাজনা বলা হয়, শ্রমিক মজুরি পায়, মূলধনের মালিক সুদ পায় এবং ব্যবস্থাপক স্বয়ংই মুনাফা গ্রহণ করেন। সুতরাং খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হইল এই উপাদানগুলির আয়। কি নীতি অনুসারে দেশের সমগ্র উৎপন্ন ধন এই চারিটি উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হয়, তাহা প্রথম অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি উপাদান উৎপাদন-কার্যে সাহায্য করে বলিয়া একটি পারিশ্রমিক পায়। এই পারিশ্রমিকই হইল উপাদানটির আয়। খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হইল এই আয়। উৎপাদনে সাহায্য করিবার পারিশ্রমিক হইলেও প্রত্যেক আয়ের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য প্রত্যেকটি আয় অপর আয় হইতে পৃথক এবং সেই কারণে প্রত্যেকটি আয়ের পৃথক আলোচনা হওয়া দরকার।

মজুরি—Wages

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমিককে তাহার কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তাহাকে মজুরি বলা হয়। ধনবিজ্ঞানে 'মজুরি' শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত শ্রমিক তাহাদের শারীরিক বা মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া উৎপাদনকার্যে সাহায্য করে, তাহারাই সমগ্র জাতীয় আয়ের একটা অংশ মজুরি হিসাবে পাইয়া থাকে। মজুরি জাতীয় আয়ের একটা অংশ। জাতীয় আয়ের একটা অংশ হইলেও খাজনা, সুদ প্রভৃতি জাতীয় আয়ের অন্যান্য অংশগুলির সহিত মজুরির কিছু পার্থক্য দেখা যায়। বিভিন্ন জমির

খাজনার মধ্যে যেরূপ পার্থক্য দেখা যায়, সাধারণতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরির মধ্যে সে পরিমাণ পার্থক্য দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, খাজনার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া অতি সামান্য হইতে পারে, কিন্তু মজুরির পরিমাণ হ্রাস পাইলেও শ্রমিকের জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা কম হইতে পারে না। সুদের সহিত তুলনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুদের একটি স্বাভাবিক হার আছে এবং প্রতিযোগিতা থাকিলে একই বাজারে সাধারণতঃ সুদের হার সমান হয়, কিন্তু একই বাজারে মজুরির হারের পার্থক্য দেখা যায়। ব্যবস্থাপকের মুনাফা অনিশ্চিত কিন্তু মজুরি হ্রাস পাইলেও ইহা নিশ্চিত আয়।

কাজ হিসাবে মজুরি ও সময় হিসাবে মজুরি—Piece-Wage and Time-Wage

দুইটি হিসাবে সাধারণতঃ মজুরি দেওয়া হয়। যখন কাজের মাত্রা ঠিক করিয়া প্রত্যেক মাত্রার জন্য কি পরিমাণ মজুরি দেওয়া হইবে তাহা স্থির হয়, তখন ইহাকে কাজের হিসাবে মজুরি বলা হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ দর্জির মজুরি কাজের মাপে স্থির হয়। প্রত্যেকটি জামা কাটা ও সেলাইয়ের জন্য দর্জির একটা মজুরি নির্ধারিত হয় এবং এই নির্ধারিত মজুরির ভিত্তিতে সে যতগুলি জামা তৈয়ারী করে সে সেইমত মজুরি পায়। অনেক সময় কয়লার খনি ও চা-বাগানের কাজেও এই হিসাবে মজুরি দেওয়া হয়।

সময়ের মাপে মজুরি দেওয়ার অর্থ হইল একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে (প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহ অথবা প্রতি মাস কাজ করিয়া) মজুরি দেওয়া হয়। দৈহিক শ্রমের জন্য সাধারণ শ্রমিকগণ সময়ের মাপে অর্থাৎ রোজ প্রতি বা হপ্তা প্রতি মজুরি পায়। উচ্চস্তরের সুদক্ষ কর্মিগণ মাস প্রতি বেতন পায়। শ্রমিকেরা সাধারণতঃ সময়ের হিসাবে মজুরি পাইতে চায়, অপরপক্ষে মালিকগণ কাজের হিসাবে মজুরি দিতে পছন্দ করে।

আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত বা সামগ্রিক মজুরি—Nominal or Money Wage and Real Wage

শ্রমিকগণ তাহাদের কাজের প্রতিদান হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাহাকে আর্থিক মজুরি বলা হয়। আর্থিক মজুরি, শ্রমিককে যে পরিমাণ অর্থ

দেওয়া হয়, তাহা দ্বারা মাপ করা হয়। যদি কোন শ্রমিক দৈনিক ছয় ঘণ্টা কাজ করিয়া তাহার কাজের মূল্য হিসাবে দুই টাকা পায়, তাহা হইলে এই দুই টাকা হইল তাহার আর্থিক মজুরি। কিন্তু অর্থের দ্বারা শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না। সেইজন্য প্রকৃত বা সামগ্রিক মজুরির কল্পনা করা হয়। শ্রমিক তাহার আয়ের বিনিময়ে যে সমস্ত দ্রব্য কিনিতে পারে এবং কাজ করিয়া আনুষঙ্গিক অন্যান্য যে সমস্ত সুখ-সুবিধা পাইয়া থাকে, তাহাদের সমষ্টিকেই প্রকৃত বা সামগ্রিক মজুরি বলা হয়। শ্রমিকগণের আসল অবস্থা জানিতে হইলে তাহাদের সামগ্রিক মজুরির পরিমাণ জানিতে হইবে। শ্রমিকগণও শুধুমাত্র আর্থিক মজুরির পরিমাণ দ্বারা কাজে আকৃষ্ট হয় না। কাজে নিযুক্ত হইবার পূর্বে তাহারা কাজের অন্যান্য সুবিধা ও অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করে।

শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা তাহার প্রকৃত মজুরির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি-পরিমাণ অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কত তাহা জানিতে হইলে তাহাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য কত তাহা জানিতে হইবে। শ্রমিকের আর্থিক মজুরি বেশী হইলেও চাউল, ডাইল, লবণ, কাপড় প্রভৃতি অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের আর্থিক মজুরি দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে পারে। জিনিসের দাম কমিলে তাহারা বেশী পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে পারে। বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাইলেও দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির তুলনায় মজুরি-বৃদ্ধি অতি সামান্যই হইয়াছে। সুতরাং আর্থিক মজুরি বাড়িলেও সে হিসাবে তাহাদের প্রকৃত মজুরি বাড়ে ত' নাই-ই বরঞ্চ কমিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত মজুরির পরিমাণ কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কাজটি যদি কঠিন হয় যাহাতে জীবনশক্তি নষ্ট হয় অথবা কাজটি যদি অরুচিকর হয় বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিষ্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে আর্থিক মজুরির পরিমাণ বেশী হইলেও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ কম হয়। রেলের ইঞ্জিনচালকের বেতন সমজাতীয় শ্রমিকের বেতন অপেক্ষা অনেক বেশী হইলেও তাহার কাজ বেশী কষ্টসাধ্য এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। ইঞ্জিনচালক একাদিক্রমে ১০।১৫ বৎসরের অধিক কাজ করিতে পারে না, তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। কিন্তু সাধারণ মোটর-গাড়ীর চালক ইঞ্জিনচালক অপেক্ষা কম বেতন পাইলেও তাহার কাজ অপেক্ষাকৃত

কম কষ্টসাধ্য এবং কম পীড়াদায়ক। সে ইঞ্জিনচালক অপেক্ষা বেশী দীর্ঘজীবী হয় এবং তাহার বেতন কম হইলেও সে বেশীদিন যাবৎ কাজ করিয়া গড়ে বেশী আয় করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, কাজের দায়িত্ব ও ধারাবাহিকতার উপরও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ নির্ভর করে। সাময়িক কালের জন্য যে সব কাজ পাওয়া যায় তাহার বেতন বেশী হইলেও দীর্ঘদিন বেকার থাকিতে হয়। সুতরাং আর্থিক মজুরির পরিমাণ অধিক হইলেও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ কম। চতুর্থতঃ, অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা থাকিলে, সে কাজের আর্থিক মজুরি কম হইলেও প্রকৃত মজুরি বেশী। কাজের সময়ের দীর্ঘতা যদি কম হয়, তাহা হইলে শ্রমিকগণ প্রচুর অবসর পায় এবং এই অবসর সময়ে তাহারা অন্য নানা উপায়ে আয় বৃদ্ধি করিতে পারে। সাধারণতঃ, স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণের কাজের সময়ের দীর্ঘতা অপেক্ষাকৃত অনেক কম বলিয়া তাঁহারা গৃহ-শিক্ষকতা করিয়া, পুস্তক-প্রণয়ন প্রভৃতি কায করিয়া তাঁহাদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন। সুতরাং আর্থিক মজুরির পরিমাণ সম-পর্যায়ের অন্যান্য বৃত্তি হইতে কম হইলেও তাঁহাদের প্রকৃত মজুরির পরিমাণ বেশী।

ইহা ছাড়া, কাজ শিখিবার খরচা, কাজের ঝুঁকি ও দায়িত্ব, কাজের সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতির দ্বারাও প্রকৃত মজুরি নির্ধারিত হয়। ব্যারিস্টার হইতে গেলে শিক্ষার ব্যয় অনেক বেশী পড়ে। সুতরাং সাধারণ উকিল অপেক্ষা ব্যারিস্টারের আয় বেশী হইলেও তাঁহার প্রকৃত মজুরি বেশী বলা চলে না। ব্যারিস্টারি পেশা চালাইবার আনুষঙ্গিক ব্যয়ও উকিলের ব্যয় অপেক্ষা অধিক। মোটর গাড়ীর চালক অপেক্ষা এরোপ্লেন-চালকের আর্থিক মজুরি বেশী হইলেও এরোপ্লেন-চালকের ঝুঁকির তুলনায় তাহার সামগ্রিক মজুরি বেশী বলা যায় না। পরিশেষে কাজের আনুসঙ্গিক সুখ-সুবিধার ভিত্তিতেই প্রকৃত মজুরির পরিমাপ হয়। রেলের কাজে বিনা ভাড়ায় বাসগৃহ, বিনামূল্যে পোষাক, বিনাখরচায় রেলভ্রমণ প্রভৃতি সুবিধাগুলি পাওয়া যায়, যাহা অন্য কাজে পাওয়া যায় না। সুতরাং রেলকর্মীদের আর্থিক মজুরির পরিমাণ কম হইলেও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ বেশী।

সুতরাং শ্রমিকগণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে অথবা বিভিন্ন দেশের বা বিভিন্ন কালের শ্রমিকগণের জীবনযাত্রার মানের তুলনা করিতে হইলে, তাহা আর্থিক মজুরির পরিমাণ দ্বারা সম্ভব

হয় না। একমাত্র প্রকৃত মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিকগণের আসল অবস্থা জানা সম্ভব হয়।

মজুরি-নির্ধারণ নীতি—Principles determining Wages

শ্রমিকের মজুরি কি নীতিতে স্থির হয় এ সম্পর্কে পূর্বে মতভেদ ছিল। অনেক ধনবিজ্ঞানী মনে করিতেন যে, শ্রমিকের খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে খরচ হয় তাহা দ্বারাই মজুরির পরিমাণ স্থির হয়। এই নীতি অনুসারে মজুরি নির্ধারিত হইলে, তাহাকে জীবন-ধারণোপযোগী মজুরি বলা হয়।

জীবন ধারণোপযোগী মজুরি—Subsistence Theory of Wages

এই নীতি অনুসারে শ্রমিকেব শ্রমকে একটি সাধাবণ দ্রব্যের সহিত তুলনা কবিয়া বলা হয় যে, একটি দ্রব্যের মূল্য যেরূপ দ্রব্যটিব প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয়, শ্রমের মূল্যও অর্থাৎ মজুরিও সেইরূপ ইহার প্রান্তিক উৎপাদন খরচার দ্বারা স্থির হয়। শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইল পবিবার-সহ শ্রমিকের জীবনযাত্রা নিবাহ করিবার ন্যূনতম ব্যয়। মজুবি যদি জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার খরচ অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে শ্রমিকগণ বিবাহ করিয়া সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। ফলে শ্রমিক সংখ্যা বেশী হইবে এবং ইহার ফলে মজুরির পরিমাণ কমিবে। মজুরির পরিমাণ কমিলে শ্রমিকের অবস্থা খারাপ হইবে। অনেক শ্রমিক খাদ্যাভাবে মারা যাইবে এবং বিবাহ না করিবার ফলে শ্রমিক-সংখ্যা হ্রাস পাইবে। শ্রমিক-সংখ্যা হ্রাস পাইলে পুনরায় মজুরি বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে মজুরির পরিমাণ, জীবনের সর্বনিম্ন মান বজায় রাখিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা কম হইতে পারে না।

বর্তমানে এই মতটি অসার বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, কারণ শ্রমিকগণ এখন আর জীবনধারণের সর্বনিম্ন মানের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরি পাইলে সন্তুষ্ট হয় না। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে শ্রমিকগণের জীবনযাত্রার মানের অনেক উন্নতি হওয়ার ফলে মজুরির হারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া বলা যায়, মজুরি বৃদ্ধি পাইলে যে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। জীবনযাত্রার মান উচ্চ রাখিবার জন্য অনেক সময় শ্রমিকগণ মজুরি বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও পোষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।

জীবনযাত্রার মান ও মজুরি—Standard of Living and Wages

অনেকে বলেন যে, শ্রমিকের মজুরি তাহার জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য যে পরিমাণ মজুরির প্রয়োজন, তাহা দ্বারা স্থির হয়। জীবনযাত্রার মান বলিতে শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা বুঝায় না। খাদ্য, বস্ত্র, ও বাসগৃহ ব্যতীত কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, উত্তম বস্ত্র ও বাসগৃহ, শিক্ষালাভের সুবিধা, চিত্তবিনোদনের জন্য অবসর ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। শ্রমিকগণ এই জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক না পাইলে কাজে নিযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, জীবনযাত্রার মান শুধু উচ্চ হইলেই মজুরি বেশী হইতে পারে না। জীবনযাত্রার মান উচ্চ হওয়ার ফলে শ্রমিকের কর্ম-ক্ষমতা যদি বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে কর্মক্ষমতা-বৃদ্ধির ফলে তাহার উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়ে। একমাত্র কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইলেই শ্রমিক অধিক পরিমাণ মজুরি পাইতে পারে। সুতরাং জীবনযাত্রার মান পরোক্ষভাবে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া তাহার মজুরি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি না পাইয়া শুধু জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি করিলেই মজুরি বৃদ্ধি হইতে পারে না। জীবনযাত্রার মান অন্যভাবেও মজুরি-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইলে সাধারণতঃ শ্রমিকগণ জীবনযাত্রার এই উচ্চমান বজায় রাখিবার জন্য পরিবার-সংখ্যা বৃদ্ধি করে না। জন্মের হার কমিলে শ্রমিক-সংখ্যা হ্রাস পায়, ফলে মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা নীতি—Marginal Productivity Theory of Wage

আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, অন্য দ্রব্যমূল্য যেভাবে স্থির হয়, শ্রমের মূল্যও অর্থাৎ মজুরিও ঠিক সেইভাবে স্থির হয়। অন্যান্য দ্রব্যমূল্যের ন্যায় মজুরিও শ্রমিকের চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত হয়। অন্যান্য দ্রব্যের যেরূপ ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে, শ্রমের তদ্রূপ ক্রেতা ও বিক্রেতা আছে। শ্রমের ক্রেতা হইল ব্যবস্থাপক, আর বিক্রেতা হইল স্বয়ংই শ্রমিক। একটি দ্রব্যের উপযোগিতা আছে বলিয়াই ক্রেতা যেরূপ দ্রব্যটি ক্রয় করে, উৎপাদনে শ্রমেরও উপযোগিতা আছে বলিয়া তদ্রূপ ব্যবস্থাপক শ্রমিক নিয়োগ

করে; দ্রব্যমূল্য যেরূপ দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগিতার সমান হয়, শ্রমের মূল্য অর্থাৎ মজুরিও তদ্রূপ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। একজন শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সেই পরিমাণ হইল শেষ নিযুক্ত শ্রমিকের উৎপাদন। ধর, কোন কারখানায় ৫০ জন শ্রমিক নিযুক্ত করিলে ২৫০৲ টাকা মূল্যের দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ইহার পর যদি আর একজন অতিরিক্ত শ্রমিক অর্থাৎ সর্বসমেত ৫১ জন শ্রমিক নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে উৎপাদন-পরিমাণ হয় ২৬০ টাকা মূল্যের দ্রব্য। তাহা হইলে একজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত করিবার ফলে উৎপাদন-পরিমাণ (২৬০—২৫০) ১০ টাকা বৃদ্ধি পাইল। ইহাই হইল শেষ নিযুক্ত শ্রমিকের অর্থাৎ একপঞ্চাশৎ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-পরিমাণ। শ্রমিকেব মজুরি এই প্রান্তিক উৎপাদন-পরিমাণের (১০ টাকার) সমান হইবে। মজুরির হার যদি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-পরিমাণের অর্থাৎ ১০ টাকার কম হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক অধিক-সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিবে, কারণ শ্রমিক যে পরিমাণ উৎপাদন করিবে, তাহাকে তাহার বাজার মূল্যের সমান পরিমাণ মজুরি হিসাবে দিতে হইবে। এইরূপে শ্রমিকের মজুরি যত সময় পর্যন্ত তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-পরিমাণের সমান না হয়, তত সময় পর্যন্ত ব্যবস্থাপক শ্রমিক নিয়োগ করিবে, ফলে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে, এবং মজুরির পরিমাণও বাড়িবে। কিন্তু মজুরি যদি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয় অর্থাৎ ১০ টাকার বেশী হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক আর শ্রমিক নিযুক্ত করিবে না। কারণ ইহাতে তাহার লোকসান হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক শ্রমিক-নিয়োগ বন্ধ রাখিবে। ফলে, শ্রমিকের চাহিদা কমিবে ও মজুরির হারও কমিবে। সুতরাং মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-পরিমাণের সমান হইবে—ইহার বেশী বা কম হইতে পারে না।

চাহিদার দিক দিয়া শ্রমিকের মজুরি তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু সরবরাহের দিক দিয়া কি পরিমাণ মজুরি হইলে শ্রমিকগণ কাজ করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহার উপরও মজুরির হার কিছু পরিমাণে নির্ভর করে। শ্রমিক এককভাবে মালিকের সহিত দর কষাকষি করিতে না পারিলেও সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে কাজের শর্ত লইয়া ব্যবস্থাপকের সহিত দর কষাকষি করে। কাজটির গুরুত্ব ও দায়িত্বের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপকের সহিত তাহাদের মজুরির পরিমাণ সম্পর্কে দর কষাকষি হইয়া উভয় পক্ষ যে পরিমাণ মজুরি দিতে এবং লইতে

রাজী হয়, তাহা হইল মজুরির চল্‌তি হার। সুতরাং দেখা যায় যে, দ্রব্যমূল্যের ন্যায় মজুরির একটা সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হার আছে এবং শ্রমের চাহিদা ও সরবরাহ অনুসারে এই হার কখনও বেশী কখনও কম হয়। শ্রমিকের চাহিদা বাড়িলে বা সরবরাহ কমিলে মজুরির হার বেশী হইয়া এই সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি হইবে, আবার চাহিদা কমিলে বা সরবরাহ বাড়িলে মজুরির হার কমিয়া এই সর্বনিম্ন সীমার কাছাকাছি হইবে। সুতরাং শ্রমিকের চাহিদা ও সরবরাহের দ্বারা মজুরি স্থির হয়।

মজুরির হারের পার্থক্যের কারণ—Causes of the difference in Wage-rates

বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক বিভিন্ন হারে মজুরি পায়। সকল কাজে একই হারে মজুরি হয় না। মজুরির এই পার্থক্যের কারণ কি? একই বাজারে একই দ্রব্যের বিভিন্ন মূল্য হইতে পারে না। ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্যমূল্য সমান হয়। কিন্তু মজুরির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন কাজে ভিন্ন ভিন্ন মজুরি। রিক্সা-চালক ও মোটর-চালক, রাজ-মিস্ত্রী ও সাধারণ-মিস্ত্রী, বাড়ীর চাকর ও মেথর ইহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন হারে মজুরি পায়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যদি কোন কাজে অন্য কাজ অপেক্ষা বেশী মজুরি হয়, তাহা হইলে অল্প মজুরির কাজ হইতে বেশী মজুরির কাজে লোক চলিয়া আসে এবং ইহার ফলে চাহিদা ও সরবরাহের প্রভাবে মজুরির হার সমান হইতে থাকে। কিন্তু কোন কারণে যদি এক কাজ হইতে অন্য কাজে যোগদান করিবার বাধা থাকে, তাহা হইলে অবশ্য মজুরির পার্থক্য থাকিবেই। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রতিযোগিতার অভাবেই অর্থাৎ শ্রমিকের গতিশীলতার বাধাই হইল মজুরির পার্থক্যের প্রধান কারণ। এইজন্য উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি রিক্স-ওয়ালা অপেক্ষা অধিক মজুরি পায়। কারণ রিক্স-ওয়ালা ইচ্ছা করিলেই উচ্চ মজুরির কাজে যোগদান করিতে পারে না। কিন্তু সমান প্রতিযোগিতা থাকিলেও অর্থাৎ রিক্স-ওয়ালা শিক্ষক হইতে পারিলেও মজুরির পার্থক্য থাকিবে; সমান সুযোগ-সুবিধা থাকিলেও পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য মজুরির পার্থক্য থাকিবে।

১। বিভিন্ন ধরণের কাজ সমান রুচিকর বা আনন্দদায়ক নহে বলিয়া

(Agreeableness or disagreeableness) কোন কোন কাজে বেশী লোক আকৃষ্ট হয়, আবার কোন কোন কাজে কম লোক আকৃষ্ট হয়। যে কাজগুলি কষ্টসাধ্য ও সামাজিক দৃষ্টিতে হীন বলিয়া মনে হয়, সে বৃত্তিগুলিতে শ্রমিক আকর্ষণ করিতে হইলে সাধারণতঃ উচ্চহারে মজুরি দিতে হয়। এজন্য কসাইয়ের মজুরি অন্যান্য সমজাতীয় কাজের মজুরি অপেক্ষা বেশী।

২। *বৃত্তিশিক্ষার ব্যয়ের পার্থক্যের জন্য* (Expenses of training) মজুরির পার্থক্য হয়। ব্যারিস্টার হইতে গেলে বিলাত যাইতে হয় এবং সেজন্য অনেক সময়ক্ষেপ ও ব্যয় করিতে হয়। কাজেই ব্যারিস্টারের সংখ্যা কম। চাহিদার তুলনায় যোগান কম হইলে মজুরি বেশী হয়।

৩। কাজটির স্থায়িত্বের উপরও (Constancy or inconstancy of the occupation) মজুরির পরিমাণ নির্ভর করে। যে কাজ বৎসরে বারমাস করা যায়, কোন সময়ে বেকার হইবার সম্ভাবনা থাকে না, সে সকল কাজের জন্য অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে লোক পাওয়া সম্ভব। আবার ঋতুগত কাজের জন্য শ্রমিককে বেশী মজুরি দিতে হয়, কারণ শ্রমিক সারা বৎসর ধরিয়া উপার্জন করিতে পারে না। কাজেই এই সকল ঋতুগত পেশায় কম লোক যোগদান করে।

৪। যে কাজে ঝুঁকি ও দায়িত্ব (Risk and responsibility) যত বেশী, সে কাজে তত কম লোক আকৃষ্ট হয়। সুতরাং বেশী মজুরি না হইলে লোক পাওয়া যায় না। এরোপ্লেন-চালকের মাহিনা বেশী, কারণ গুরুতর ঝুঁকির জন্য অল্প লোকই এদিকে আকৃষ্ট হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বহন করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাবহেতু বেশী মাহিনা না হইলে একাজে উপযুক্ত লোক পাওয়া দুষ্কর।

৫। যে সমস্ত কাজে ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা (Future Prospect) আছে, সে সমস্ত কাজে অধিক লোক যোগদান করিতে ইচ্ছুক হয়। বেতন-বৃদ্ধির সম্ভাবনা, অবসর গ্রহণ করিবার পরে পেন্সন পাইবার আশা, চাকুরির স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার জন্য বেশী লোক সরকারী চাকুরিতে আকৃষ্ট হয় ও কম বেতন কাজ করিতে ইচ্ছুক হয়।

৬। ইহা ছাড়াও, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার পার্থক্যের কারণেও মজুরির পার্থক্য হইতে পারে। কিন্তু কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার পার্থক্যের উপর বেশী জোর দেওয়া ঠিক নয়। সমান সুযোগ-সুবিধা পাইলে এই পার্থক্য অনেক পরিমাণে

দূর করা সম্ভব হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতিভেদ, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি কতকগুলি মনুষ্য-সৃষ্ট উপায়ে মানুষে মানুষে এই পার্থক্য স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এমন অনেক পেশা আছে, যাহাতে দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোক প্রবেশ করিবার কল্পনাও করিতে পারে না। বৃটিশ শাসনকালে উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী ও দেশীয় কর্মচারীর মধ্যে বেতনের পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য ভারতীয়গণের কম যোগ্যতার পরিচায়ক ছিল না, পরন্তু ইহা শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার পরিচায়ক ছিল। গরীবের ছেলের পক্ষে বড় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা সেনা-বিভাগে উচ্চ পদে নিযুক্ত হওয়া দুরাশামাত্র, কারণ এই পেশাগুলির শিক্ষা-ব্যয় এত অধিক যে, দরিদ্রের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং সমান সুযোগ-সুবিধা পাইলে প্রধানতঃ উপরি-উক্ত-কারণগুলির জন্যই মজুরির পার্থক্য থাকিবে।

ভারতে মজুরির হার—Rate of wage in India

ভারতে প্রচলিত মজুরির হার অন্যান্য অনেক দেশের মজুরির হার অপেক্ষা অনেক কম। ভারতে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় এত বেশী যে, তাহারা অনেক সময় নামমাত্র মজুরিতে কাজ করিতে বাধ্য হয়। সংখ্যাধিক্য ছাড়াও কৃষি শ্রমিকের কম মজুরির আর একটি কারণ হইল যে, ইহারা কৃষিকার্যের সময় কাজ পায়, অন্য সময় বেকার থাকে। কাজেই ইহাদের বাৎসরিক গড় আয় অতি কম। অধিকাংশ কৃষি-শ্রমিকই অজ্ঞ এবং দক্ষতাহীন। শিল্প শ্রমিকদের ন্যায় ইহাদের কোন সঙ্ঘ নাই, কাজেই জমির মালিকগণ ইহাদের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন।

ভারতের শিল্প শ্রমিকগণ অপেক্ষাকৃত অধিক হারে মজুরি পাইয়া থাকে। ইদানীং শিল্প শ্রমিকগণ মালিকগণের সহিত দর কষাকষি করিয়া তাহাদের স্বার্থ-রক্ষা করিবার জন্য শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করিয়াছে এবং সেই সঙ্ঘগুলি সরকারী অনুমোদন লাভ করিয়াছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে মালিকের সহিত মজুরির হার ও কাজের অন্যান্য শর্তসম্পর্কে আপোষ না হইলে তাহারা মালিককে সময়মত জানাইয়া ধর্মঘট করিতে পারে। এইরূপে শ্রমিক সঙ্ঘের মাধ্যমে সমবেতভাবে তাহারা মজুরির হার বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

দেশের সরকারও শ্রমিকগণের স্বার্থরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার শ্রমিক-কল্যাণ আইন প্রবর্তন করিয়াছেন। সরকার আইন পাশ করিয়া শ্রমিকগণ যাহাতে

ন্যায্য মজুরি ও সর্বনিম্ন মজুরি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রমিকগণের মধ্যে মুনাফাভাগের ব্যবস্থাও প্রবর্তন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ভারতের শ্রমিকের প্রধান ত্রুটি হইল তাহার দক্ষতার অভাব। শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া তাহার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি না করিতে পারিলে স্থায়িভাবে মজুরি-বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

ভারতে মজুরির হারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হারে মজুরি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমিকের স্থানান্তর গমনের অনিচ্ছা, গৃহকাতর প্রকৃতি, বিভিন্নস্থলে দ্রব্যমূল্যের পার্থক্য, সঙ্ঘবদ্ধতাব অভাব প্রভৃতি কারণের জন্যই মজুরির পার্থক্য হয়।

সুদ—Interest

সুদের সংজ্ঞা—Definition of Interest

দেনাদার পাওনাদারের নিকট হইতে টাকা কর্জ করিয়া পাওনাদাবকে মাসে মাসে বা বৎসরে আসল টাকা ছাড়াও যে অতিরিক্ত টাকা দেয়, তাহাকে সুদ বলে। প্রাচীনকালে সুদ গ্রহণ কবা গর্হিত কার্য বলিয়া পরিগণিত হইত। বর্তমানে সুদ লওয়া আর দোষের কাজ বলিয়া গণ্য হয় না। কারণ, পাওনাদার কষ্ট করিয়া অর্থ সঞ্চয় কবে এবং সঞ্চিত অর্থের অধিকার সে সাময়িকভাবে দেনাদাবকে দেয়। পাওনাদার যে সময়ের জন্য দেনাদারকে টাকা ধার দেয়, সে সময়ের জন্য পাওনা-দার আর সে অর্থ নিজে খরচ করিতে পারে না। সুতবাং নগদ অর্থ কাছছাড়া করিবার জন্য সে একটা প্রতিদান আশা করে এবং এরূপ প্রতিদান না পাইলে সে সঞ্চয় করিতে উৎসাহী না হইতে পারে। বর্তমানে দেনাদাবও এই ধার করা অর্থ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি উৎপাদন-কার্যে নিযুক্ত করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করে। সুতরাং দেনাদারের পক্ষেও এই অতিরিক্ত উৎপাদন হইতে একটা অংশ সুদ হিসাবে পাওনাদারকে দিতে কষ্ট হয় না। সুতরাং অপরের সঞ্চিত অর্থ ধার করিলে ধার করা টাকার জন্য পাওনাদারকে যে অতিরিক্ত আর্থিক মূল্য দিতে হয়, তাহাই হইল সুদ।

মোট সুদ ও নীট্ সুদ—Gross and Net Interest

টাকা ধার করিলে পাওনাদারকে দেনাদার শতকরা মাসিক বা বার্ষিক হারে যে

অতিরিক্ত অর্থ দেয়, সাধারণতঃ তাহাকে সুদ বলে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে 'সুদ' কথাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং এইজন্য অনেক ক্ষেত্রেই দেনাদার পাওনাদারকে যে অতিরিক্ত অর্থ দেয় তাহাকে ধনবিজ্ঞানের অর্থে নিছক সুদ বলা যায় না। কারণ, অনেক সময় টাকা ধার দিলে টাকা ফেরৎ না-পাইবার আশঙ্কা থাকে, আবার টাকা আদায় করিবার জন্য অনেক হাঙ্গামা করিতে হয়। ধার যদি দীর্ঘদিনের জন্য দেওয়া হয়, তাহা হইলে পাওনাদারকে টাকা ফেরৎ পাইতে বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধার দেওয়ার ঝুঁকি বেশী, টাকা ফেরৎ পাইবার জন্য হাঙ্গামার সম্ভাবনা থাকে বা দীর্ঘ-মেয়াদী ধার হয় সে সমস্ত ক্ষেত্রে পাওনাদার তাহার টাকা হাতছাড়া করিবার ক্ষতিপূরণ অর্থাৎ সুদ ছাড়াও দেনাদারের নিকট ঝুঁকি ও হাঙ্গামার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবী করে এবং এই অতিরিক্ত পরিমাণ প্রতিদান না পাইলে সে টাকা ধার দেয় না উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ব্যাঙ্ক যে ধার দেয়, সেজন্য ব্যাঙ্ক কোন ঝুঁকি গ্রহণ করে না। উপযুক্ত জামিন রাখিয়াই ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য টাকা ধার দেয়। সুতরাং টাকা আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কের কোন ঝুঁকি বা হাঙ্গামা সহ্য করিতে হয় না। সুতরাং যে সমস্ত ধারে কোন ঝুঁকি বা হাঙ্গামা নাই সেই সমস্ত ধারের জন্য দেনাদার পাওনাদারকে নির্দিষ্ট হারে যে প্রতিদান দেয় তাহাকে নীট্ সুদ বা খাঁটি সুদ বলা হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধার দিলে ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও হাঙ্গামা বেশী সে সমস্ত ক্ষেত্রে পাওনাদার খাঁটি সুদ ছাড়াও এই ঝুঁকি ও হাঙ্গামা সহ্য করিবার ক্ষতিপূরণ বাবদ একটা অতিরিক্ত পরিমাণ দাবী করে। নীট্ সুদ ও ক্ষতিপূরণ বাবদ এই অতিরিক্ত অর্থ পরিমাণ লইয়া মোট সুদ গঠিত হয়। মোট সুদের হার নীট্ সুদের হার অপেক্ষা বেশী হয়। আমাদের দেশে মহাজন ও কাবুলিওয়ালার সুদের হার ব্যাঙ্কের হার অপেক্ষা বেশী, কারণ মহাজন ও কাবুলি-ওয়ালা মোট সুদ আদায় করে, ব্যাঙ্ক নীট্ সুদ আদায় করে।

সুদের হারের তারতম্য – Difference in the rates of Interest

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, কি কারণে একই জায়গায় বিভিন্ন হারে সুদ হয়। ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার লইলে শতকরা ৪-৫ টাকা সুদের হারে ধার পাওয়া যায় অথচ কাবুলিওয়ালা এই ঋণের জন্য শতকরা ২৫-৩০ টাকা সুদ দাবী করে। সুদের হারের এই পার্থক্যের প্রধান কারণ হইল ঋণ-

সম্পর্কিত ঝুঁকি ও হাঙ্গামা। কাবুলিওয়ালা বিনাবন্ধকে অপরিচিত লোকজনকে টাকা ধার দেয়। যাহারা কাবুলিওয়ালার নিকট হইতে টাকা ধার লয় তাহারা নিতান্ত অভাবগ্রস্ত এবং ধার শোধ করিবার ক্ষমতাও অনেক ক্ষেত্রে থাকে না। অনেকের কাবুলিওয়ালাকে ফাঁকি দিবার মতলবও থাকে। টাকা আদায় করিতেও কাবুলিওয়ালার অনেক হাঙ্গামা করিতে হয়। সে দশজনকে ধার দিলে তাহার মধ্যে হয়ত দুই-একজনে তাহাকে ফাঁকি দেয়। এক কথায় কাবুলিওয়ালা টাকা ধার দিয়া যে পরিমাণ ঝুঁকি, হাঙ্গামা ও অনিশ্চয়তা বহন করে, ব্যাঙ্ক তাঁহার শতাংশের এক অংশও গ্রহণ করে না। সুতরাং অত্যধিক ঝুঁকি ও হাঙ্গামার জন্য ব্যাঙ্কের সুদ অপেক্ষা কাবুলিওয়ালা ও মহাজনদের সুদের হার বেশী হয়।

আবার দেখা যায় ভারত সরকার যে কম হারে সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে পারে, গ্রাম্য চাষীরা তত কম সুদে কাহারও নিকট হইতে টাকা ধার পায় না। সরকার শতকরা ৩-৪ টাকা হারে সুদের অঙ্গীকারে বহু কোটি টাকা ধার পাইতে পারে, কিন্তু চাষী শতকরা ২০ টাকা হারে সুদ দিতে অঙ্গীকার করিলেও তাহার পক্ষে কর্জ পাওয়া কষ্টসাধ্য।

একই কারণে এক্ষেত্রেও সুদের হারের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সরকার টাকা ধার লইলে আসল টাকা মারা যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা সকলেই জানে। সরকারের নিকট হইতে নিয়মিতভাবে সুদ পাওয়া যায়। সুতরাং সরকারকে ধার দিলে আদৌ কোন ঝুঁকি বা হাঙ্গামা নাই বলিয়া সকলেই ধার দিতে প্রস্তুত। আর চাষীর অবস্থা খারাপ। তাহার আয় শুধু কম নয়—ইহা অনিশ্চিতও বটে। মামলা-মোকদ্দমা করিয়া সম্পত্তি ক্রোক না দিয়া এ টাকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদায় হয় না। কাজেই চাষীকে ধার দিলে এই ধারের ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও হাঙ্গামা অত্যধিক বলিয়া লোকে অত্যধিক হারে সুদ দাবী করে। চাষী যদি উপযুক্ত জামিন রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে চড়া সুদ দিতে হইত না।

সুদের হার কিভাবে স্থির হয়?—How is the rate of Interest determined?

সুদ হইল অন্যের সঞ্চিত মূলধন ব্যবহার করিবার মূল্য এবং দ্রব্যমূল্যের ন্যায় সুদও মূলধনের চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে স্থির হয়।

মূলধনের এই উৎপাদিকা-শক্তির জন্য মূলধনের চাহিদা হয়। আবার কিছু পরিমাণ ঋণ লোকে ভোগ-ব্যবহারের জন্য বা অন্য অনুৎপাদক কার্যের জন্য গ্রহণ করে। দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ যেরূপ দ্রব্যটির মূল্যের উপর নির্ভর করে, যে-কোন উদ্দেশ্যে ধার করা হউক না কেন, মূলধনের চাহিদাও সেইরূপ সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সুদের হার বেশী হইলে মূলধনের চাহিদা কম হয়, সুদের হার কম হইলে চাহিদাও বেশী হয়।

ঋণ-দাতাগণ মূলধন সরবরাহ করে। সরবরাহ-পরিমাণ সঞ্চয়-পরিমাণের উপর নির্ভর করে। দেশের সমগ্র সঞ্চয়-পরিমাণ লোকের সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা ও সঞ্চয় করিবার ক্ষমতার উপর নিভর করে। সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা আবার লোকের দূরদর্শিতা, পারিবারিক স্নেহ, সঞ্চয়ের সুযোগ, সঞ্চয়ের নিরাপত্তা প্রভৃতি অবস্থার উপর নির্ভর করে। সঞ্চয়-পরিমাণ আবার সুদের হারের উপর নিভর করে। সুদের হার বেশী হইলে সাধারণতঃ সঞ্চয়-পরিমাণ বাড়ে, সুদের হার কমিলে সঞ্চয়-পরিমাণ কমে। সুতরাং মূলধনের চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্যের বিন্দুতে সুদের হার স্থির হয়। একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় যে হারে সুদ হইলে মূলধনের মোট সরবরাহ মোট চাহিদার সমান হয়, সেই হারকে সেই অবস্থার নির্ধারিত সুদের হার বলা হয়। একটি উদাহরণ দ্বারা সুদের হার চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় কিভাবে ঠিক হয় তাহা বুঝান হইল:

মূলধনের চাহিদা-পরিমাণ	সুদের হার	মূলধনের সরবরাহ-পরিমাণ
১ লক্ষ টাকা	৫ টাকা হার	২ লক্ষ টাকা
১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	৪ ,,	১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
২ লক্ষ টাকা	৩ ,,	১ লক্ষ টাকা

উপরে যে উদাহরণ দেওয়া হইল তাহাতে দেখা যায় যে, সুদের হার যখন ৫ টাকা, তখন চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ বেশী। আবার, সুদের হার যখন ৩৲ টাকা তখন চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ কম। কিন্তু সুদের হার যখন ৪৲ টাকা, তখন মোট মূলধন সরবরাহের পরিমাণ মোট চাহিদার পরিমাণের সমান। সুতরাং সুদের হার ৪ টাকা হইবে।

কেইন্সের মতে সুদ সঞ্চয় পরিমাণ বা মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নিভর করে না। তাঁহার মতে লোকে কত টাকা ধার দিতে ও লইতে চায় তাহার উপর সুদের হার নির্ভর করে। লোকের নগদ টাকার প্রতি একটা আসক্তি থাকে।

কারণ নগদ টাকা হাতে থাকিলে নগদ টাকার মালিক নানা দিক দিয়া অনেক সুবিধা পায়। এই সুবিধাগুলির জন্য সে নগদ টাকা হাত ছাড়া করিতে চায় না। টাকা ধার দিলে টাকা হাত ছাড়া হয় এবং ধার দেওয়া টাকা নিজের হাতে থাকিলে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যাইত তাহা আর পাওয়া যায় না। সুতরাং যাহার হাতে টাকা আছে তাহাকে ধার দিবার উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধ করিবার জন্য দেনাদারকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। এই অতিরিক্ত টাকাই হইল সুদ।

ভারতে সুদের হার—Rate of Interest in India

ভারতে সঞ্চয়-পরিমাণ খুব কম বলিয়া এখানে মূলধনের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। মূলধনের স্বল্পতার জন্য আমাদের দেশে সুদের হার যে বেশী হইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। মূলধনের অভাব-হেতুই আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিদেশী মূলধনের সাহায্যে গঠিত হইয়াছে।

ভারতে প্রচলিত সুদের হারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এখানে বিভিন্ন ঋণদাতা বিভিন্ন হারে সুদ আদায় করে এবং বিভিন্ন ঋণগ্রহীতা বিভিন্ন হারে সুদ দিতে বাধ্য হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতের পল্লী অঞ্চলে ধার পাইবার সুবিধার একান্ত অভাব। একমাত্র গ্রাম্য মহাজনই প্রায় সমগ্র পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করে—তাহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিলেও চলে। চাষী ও ছোট ছোট ব্যবসায়ী যাহারা ধার লয়, তাহাদের ধার সময়মত পরিশোধ করিবার সামর্থ্যও নাই। এই সমস্ত লোকজনকে ধার দিলে আদায় করিতে অনেক ঝুঁকি ও হাঙ্গামা বহন করিতে হয়। এই কারণে মহাজনেরা বেশী হারে সুদ আদায় করে। সরকারকে ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে সুদের হার কম হয়। কারণ সকলেই সরকারকে ধার দিতে উৎসুক। কাজেই ঋণদাতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। বিনা কষ্টে নির্ধারিত হারে নিয়মিত সুদ এবং সময়মত আসল টাকা ফেরত পাইবার জন্য সকলেই অল্প সুদে সরকারকে টাকা ধার দেয়। কাজেই সরকার অল্প সুদে টাকা ধার পায় যাহা কৃষকের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নহে।

খাজনা—Rent

খাজনার সংজ্ঞা—Definition of Rent

সাধারণতঃ 'খাজনা' শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাড়ী, গাড়ী,

যন্ত্রপাতি, জমি-জায়গা প্রভৃতি সাময়িকভাবে ব্যবহার করিবার জন্য ইহাদের মালিককে যে মূল্য দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাকেই সাধারণতঃ খাজনা বলা হয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে 'খাজনা' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা হইতে যে আয় হয়, তাহাকে খাজনা বলা হয়। গাড়ী, বাড়ী, কল-কারখানা হইতে যে আয় হয় সাধারণ-ভাষায় সেই আয়গুলিকে খাজনা বলা হইলেও সে আয়গুলি প্রকৃত খাজনা নহে। কারণ, খাজনার উৎস হইল জমি, খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পত্তি, আর বাড়ী, গাড়ী, প্রভৃতি হইল মনুষ্য-সৃষ্ট দ্রব্য। খাজনা শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার হইতে পাওয়া যায়। সাধারণ ভাষায় যাহাকে খাজনা বলা হয়, তাহা নিছক খাজনা নহে। ভাড়াটিয়া বাড়ীর মালিককে খাজনা বাবদ যে পরিমাণ অর্থ দেয় তাহা শুধু খাঁটি খাজনা নহে। খাঁটি খাজনা ছাড়াও এই প্রদত্ত অর্থের একটি অংশ জমির মালিক জমিতে গৃহনির্মাণ করিবার জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহার সুদ বাবদ ধরিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, জমির উন্নতির জন্য মালিক যে পরিমাণ ব্যয় করিয়াছেন এবং ঝুঁকি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মুনাফাও মোট খাজনার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মোট খাজনা হইতে জমিতে মালিক কর্তৃক নিযুক্ত মূলধনের সুদ ও মালিকের জমি সম্পর্কিত পরিশ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণের মূল্য বাদ দিলে নীট্ বা খাঁটি খাজনা পাওয়া যায়।

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব—Ricardian Theory of Rent

ইংরাজ ধনবিজ্ঞানী ডেভিড রিকার্ডো খাজনা-তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করেন। তাঁহার মতে খাজনা হইল জমির উৎপন্ন পরিমাণের সেই অংশ, যে অংশ জমির আদিম ও অবিনশ্বর ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়। ("Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil.")

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণ পশ্চিমবঙ্গে স্থানাভাবের কারণে আন্দামান দ্বীপে বসতি স্থাপন আরম্ভ করিল। প্রথম দলে ৫০০ শত উদ্বাস্তু আন্দামান দ্বীপ বসতি স্থাপন করিল এবং চাহিদার তুলনায় আন্দামানে জমি এত বেশী পরিমাণ

আছে যে, উদ্বাস্তুগণ নিজেরা যে যাহার খুশীমত বাছিয়া সবচেয়ে ভাল জমি দখল করিয়া চাষবাস আরম্ভ করিল। চাহিদার তুলনায় জমি অফুরন্ত বলিয়া জমি ব্যবহারের জন্য কাহাকেও কোন মূল্য (খাজনা) দিতে হইল না। আন্দামান উদ্বাস্তুগণ ভালভাবে আছে জানিতে পারিয়া আরও বহু উদ্বাস্তু দলে দলে সেখানে বসতি স্থাপন করিবার ফলে কিছুদিন পরে সেখানকার প্রথম শ্রেণীর সব জমি দখল হইয়া গেল। ইহার পর যে সমস্ত উদ্বাস্তু আন্দামানে গেল তাহারা প্রথম শ্রেণীর জমি না পাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষবাস আরম্ভ করিল। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কম উর্বর বলিয়া একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হইতে প্রথম শ্রেণীর জমি অপেক্ষা কম পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইতে লাগিল। জনসংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে ফসলের দাম বাড়িয়া গেল। ফসলের দাম বাড়িয়া যাওয়ার ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিবার জন্য অধিক ব্যয় সংকুলানও হইতে লাগিল এই-রূপে যখন জনসংখ্যা আরও বাড়িল, খাদ্যদ্রব্যের চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িল। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি ফুরাইয়া গেলে তৃতীয় শ্রেণীর জমির চাষ আরম্ভ হইল। তৃতীয় শ্রেণীর জমি কম উর্বর বলিয়া একই পরিমাণ মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা কম ফসল পাওয়া গেল। কিন্তু ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ফসলের মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিবার খরচও সংকুলান হইল।

এখন ধরা যাউক, প্রথম শ্রেণীর জমিতে ১০ টাকা ব্যয় করিয়া ২০ মণ ফসল পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কম উর্বর বলিয়া ১০ টাকা ব্যয়ে ১৫ মণ পাওয়া যায়। তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীর মণ প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হইল আট আনা, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মণ প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হইল ।৵১০। বাজারে উৎপন্ন ফসলের মূল্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উৎপাদন-খরচ দ্বারা স্থির হইবে, নতুবা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ হইবে না। সুতরাং একই পরিমাণ ব্যয় করিয়া প্রথম শ্রেণীর জমিতে ৫৲ মণ পরিমাণ উদ্বৃত্ত ফসল পাওয়া গেল। এই উদ্বৃত্ত ফসল হইল খরচার অতিরিক্ত আয়। এই অতিরিক্ত আয়কে (Surplus over cost of production) খাজনা বলা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া শুধু উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হয়, কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। এইজন্য এই জমিকে প্রান্তিক জমি বলা হয় এবং এই প্রান্তিক জমির কোন খাজনা থাকে না। জনসংখ্যা বাড়িয়া

গেলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা আরও বেশী হয়। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি ফুরাইয়া গেলে লোকে বাধ্য হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর জমি এবং তৃতীয় শ্রেণীর জমি শেষ হইলে চতুর্থ শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া খাদ্যদ্রব্যের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করে। যখন তৃতীয় শ্রেণীর জমি একই খরচায় চাষ হয়, তখন তৃতীয় শ্রেণীর উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিতীয় অপেক্ষা কম হয়। তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে ১০ টাকা ব্যয় করিলে ১০/ মণ ফসল পাওয়া যায় এবং মণ প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হয় ১ টাকা। এরূপ ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীর তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি উৎকৃষ্টতর বলিয়া পরিগণিত হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উদ্বৃত্ত হয় ৫/ মণ এবং এই উদ্বৃত্তই হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর খাজনা এবং তৃতীয় শ্রেণীর তুলনায় প্রথম শ্রেণীর উদ্বৃত্ত হয় ১০/ মণ। এরূপে যখন তিন শ্রেণীর জমি চাষ করা হয়, তখন তৃতীয় শ্রেণীর জমিকে প্রান্তিক জমি বলা হয় এবং প্রান্তিক জমির উৎপাদন-ব্যয়ের যে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে পাওয়া যায়, ধনবিজ্ঞানে সেই উদ্বৃত্তকেই খাজনা বলা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, যতই নিকৃষ্ট শ্রেণীর জমি চাষ হইতে থাকে, উৎকৃষ্ট জমির উদ্বৃত্ত পরিমাণ ততই বাড়িতে থাকে এবং উৎকৃষ্টগুলির খাজনার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্বের সমালোচনা—Criticism of the Ricardian Theory of Rent

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রথমতঃ বলা যায় যে, তিনি খাজনার কারণ সম্পর্কে জমির যে আদিম ও অবিনশ্বর শক্তির কথা বলিয়াছেন তাহা সত্য নহে। কারণ দীর্ঘদিন ধরিয়া একই জমি চাষ করিলে ইহার উর্বরতা-শক্তি নষ্ট হয়। মানুষ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষবাসের উন্নতি করিয়া জমির উৎপাদিকা-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে। সুতরাং জমির নিজস্ব উৎপাদন-ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। কিন্তু এই বিরুদ্ধ সমালোচনাসত্ত্বেও বলা যায় যে, জমির অবস্থানের সুবিধা, রাসায়নিক উপাদান, আবহাওয়া প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত বৈশিষ্ট্য-গুলি ইহার অবিনশ্বর ক্ষমতা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, রিকার্ডো যে পদ্ধতিতে জমি চাষের কথা বলিয়াছেন, তাহা সর্বত্র ঠিক নহে। তাঁহার মতে ভাল জমি আগে চাষ হয় এবং ভাল জমি না পাওয়া গেলে পরে খারাপ জমি চাষ হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভাল জমি চাষ হওয়ার আগেই খারাপ জমি চাষ হয়। দূরত্বের জন্য অনেক সময় লোকে

বাড়ীর নিকটে অবস্থিত খারাপ জমি চাষ করে। সুতরাং রিকার্ডোর মতবাদ ভ্রান্ত। এই সমালোচনার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, ভাল জমি বলিতে রিকার্ডো শুধু উর্বর জমির কথা বলেন নাই, ভাল জমি বলিতে তিনি উর্বর ও অবস্থানের দিক দিয়া সুবিধাজনক জমির কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং খাজনা-নির্ধারণে জমির উর্বরতা ও অবস্থানের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন।

খাজনার কারণ—Causes of Rent

জমি প্রকৃতির দান। মানুষ ইহা সৃষ্টি করে নাই। তবে কেন জমির ব্যবহারের মূল্য বাবদ খাজনা দিতে হয় এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগিতে পারে। খাজনা দিবার প্রধান কারণ হইল যে, জমির সরবরাহ নিতান্ত সীমাবদ্ধ এবং সব জমির উর্বরতা-শক্তি ও অবস্থানের সুবিধা সমান নহে। কাজেই চাহিদার তুলনায় ভাল জমির সরবরাহ একান্তরূপে অপ্রচুর। এইজন্যই ফসল উৎপাদন করিবার বা গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে বহুলোক যখন জমি চায়, তখন জমির মালিক তাহাদের নিকট হইতে একটা মূল্য আদায় করিয়া থাকে। এই মূল্যই খাজনা নামে অভিহিত হয়। চাহিদার তুলনায় জমি যদি অফুরন্ত হইত, তাহা হইলে খাজনা দিতে হইত না।

দ্বিতীয়তঃ, আরও একটি কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। একই জমি অধিক ব্যয় চাষবাস করিলে যদি ক্রমাগত অধিক পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইত, তাহা হইলে লোকে শুধু ভাল জমি অধিক ব্যয়ে চাষ করিয়া তাহাদের ফসলের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করিতে পারিত। কিন্তু জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি কার্যকরী হওয়ার ফলে একখণ্ড জমি অধিক ব্যয়ে চাষ করিলেও উৎপন্ন ফসল-বৃদ্ধির হার ক্রমশঃই কমিতে থাকে। ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া যায়। সুতরাং উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য বাধ্য হইয়াই অন্য জমি চাষ করিতে হয়। নূতন জমি চাষ করিতে গেলে জমির মালিককে জমি ব্যবহারের মূল্য অর্থাৎ খাজনা দিতে হয়, কারণ জমির পরিমাণ চাহিদা অনুযায়ী বৃদ্ধি করা যায় না।

অর্থনৈতিক খাজনা ও চুক্তিদ্বারা নির্ধারিত খাজনা—Economic Rent and Contract Rent

জমির মালিক তাহার নিজের জমি নিজে চাষ করিয়া খরচ-খরচা বাদ দিয়া যে অতিরিক্ত আয় পায়, তাহাকে অর্থ নৈতিক খাজনা বলা হয়। এই খাজনা হইল উৎপাদকের খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত (producer's surplus)। দুই খণ্ড

জমির প্রতি খণ্ড ১০ টাকা ব্যয়ে চাষ করিলে প্রথম জমিতে ২০/ মণ ও দ্বিতীয় জমিতে ১৫/ ফসল পাওয়া গেলে, প্রথম জমির উদ্বৃত্ত ফসলের পরিমাণ হইল ৫/ মণ। এই ৫/ মণ বা ইহার বাজার মূল্যকে অর্থনৈতিক খাজনা বলা হয়। কিন্তু জমির মালিক যদি নিজে জমি চাষ না করিয়া প্রজাকে ঐ জমি বিলি করে, তাহা হইলে প্রজা ও জমির মালিকের মধ্যে দর কষাকষি হইয়া প্রজা কর্তৃক যে পরিমাণ মূল্য জমির মালিককে প্রদত্ত হয়, তাহাকে চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত খাজনা বলা হয়। দ্রব্যমূল্যের ন্যায় জমি-ব্যবহারের এই মূল্য ও চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাব দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত খাজনা-পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থনৈতিক খাজনা-পরিমাণের বেশী হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে প্রজাকে জমির খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত অর্থাৎ অর্থনৈতিক খাজনা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণ জমির মালিককে চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত খাজনা হিসাবে দিতে হইবে। উপরের উদাহরণ অনুসারে প্রথম শ্রেণীর জমিতে ৫/ মণ উদ্বৃত্ত থাকে। সুতরাং প্রজা কখনই এই ৫/ মণের অধিক খাজনা হিসাবে দিতে পারে না। জমির মালিক চেষ্টা করে যাহাতে সে এই উদ্বৃত্তের সবটাই খাজনা হিসাবে পায় এবং প্রজা চেষ্টা করে যাহাতে সে এই উদ্বৃত্তের বেশী পরিমাণ নিজে উপভোগ করিতে পারে। যদি বেশী-সংখ্যক প্রজা কমসংখ্যক জমির মালিকের নিকট হইতে জমি লইবার জন্য প্রতি-যোগিতা করে, তাহা হইলে জমির মালিক উদ্বৃত্তের সর্বোচ্চ পরিমাণ খাজনা হিসাবে পাইতে পারে। আবার প্রজা অপেক্ষা জমির মালিক যদি জমি বিলি করিতে অধিক উদ্গ্রীব হয়, তাহা হইলে জমির উদ্বৃত্ত আয়ের অধিকাংশ প্রজা পাইতে পারে এবং মালিক কম পরিমাণ পায়।

খাজনার সহিত মূল্যের সম্পর্ক—Rent in relation to Price

রিকার্ডোর মতে খাজনা ফসলের দামের উপর নির্ভর করে, ফসলের দাম খাজনা-পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। তাঁহার মতে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যকে প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার সমান হইতে হয়। বাজার মূল্য যদি প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার সমান না হয়, তাহা হইলে প্রান্তিক জমির চাষ বন্ধ হয়। ফলে, চাহিদার তুলনায় যোগান হ্রাস পায় এবং দ্রব্যমূল্যও বাড়ে। দ্রব্যমূল্য বাড়িলে পুনরায় প্রান্তিক জমির চাষ সম্ভব হয়। সুতরাং দ্রব্যমূল্য সাধারণতঃ প্রান্তিক জমির উৎপাদন-ব্যয়ের কম হইতে পারে না। প্রান্তিক জমি চাষ করিয়া কোন উদ্বৃত্ত থাকে না, শুধু উৎপাদন-খরচা সংকুলান হয়। উদ্বৃত্ত না থাকার ফলে

প্রান্তিক জমির কোন খাজনা হয় না। প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার দ্বারা মূল্য স্থির হয়। প্রান্তিক জমির কোন উদ্বৃত্ত নাই, সুতরাং খাজনা নাই। যেহেতু খাজনা (উদ্বৃত্ত) উৎপাদন-খরচার অংশ নহে, সেইহেতু মূল্যেরও অংশ হইতে পারে না। 'খাজনা উৎকৃষ্ট জমির উদ্বৃত্ত উৎপন্ন হইতে দেওয়া হয়। সুতরাং খাজনা দেওয়া হয় বলিয়া মূল্য বেশী হইতে পারে না। মূল্য বেশী হইলে খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত বেশী হয়।' ফলে খাজনাও বাড়ে।

শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণের জমির খাজনা—Urban Site Rent

শহরাঞ্চলে বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য যে জমির প্রয়োজন হয়, তাহার খাজনা জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে না। গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে জমির অবস্থানের সুবিধা-অসুবিধার ভিত্তিতেই খাজনা স্থির হয়। জমি যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় সেই উদ্দেশ্যের সহায়ক সুবিধাগুলি বর্তমান থাকিলে সে জমির খাজনা তত বেশী হয়। বাসগৃহের জন্য জমির খাজনা আবাস-স্থলের সুবিধার (যথা, প্রশস্ত রাজপথ, প্রচুর আলো-হাওয়া পাওয়ার সম্ভাবনা, বিদ্যালয়, বাজার, পোস্ট অফিস ও যানবাহন কেন্দ্রের নৈকট্য) উপর নির্ভর করে। এই সুবিধাগুলি যত বেশী হয়, খাজনাও তত বেশী হয়। শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরের নিকট এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হইতে পছন্দ করে। সুতরাং শিল্প ও ব্যবসায়-অঞ্চলে ব্যবসায়ী বেশী ভাড়া দিতে প্রস্তুত থাকে।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধি ও কৃষির উন্নতির সহিত খাজনার সম্পর্ক—Rent in relation to Increase of population and Improvement in agriculture

জনসংখ্যা বাড়িলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা অবশ্যই বাড়ে। খাদ্যদ্রব্যের এই বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রথম শ্রেণীর জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির চাষ করিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিলে এই জমির তুলনায় প্রথম শ্রেণীর জমিতে খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত থাকে। ফলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে খাজনা হয়। এইরূপে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা যতই বৃদ্ধি পায়, খাদ্যদ্রব্যের বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য ততই তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে হয়। নিকৃষ্ট জমি চাষ করা হইলে উৎকৃষ্ট জমিগুলির উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া খাজনার পরিমাণ বাড়ে। অতএব দেখা যায়,

জনসংখ্যা বাড়িলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য বাড়ে। মূল্য বাড়িলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেশী হইয়া খাজনা বাড়ে।

যদি কৃষিকার্যের উন্নতি হয়, অর্থাৎ জমিতে যদি সেচ-ব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট সার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে বিঘা প্রতি জমিতে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ফসলের মূল্য হ্রাস পাইবে এবং ইহার ফলে খারাপ জমি (প্রান্তিক জমি) আর চাষ হইবে না, কারণ এই জমির উৎপাদন-ব্যয় পরিবর্তিত অবস্থায় বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশী হইবে। সুতরাং প্রান্তিক জমির চাষ না হইলে খাজনার পরিমাণ কমিবে।

অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি—Unearned Increment

সামাজিক অগ্রগতির ফলে শহরাঞ্চলের উপকণ্ঠে জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। রাস্তা-ঘাট, পার্ক, বৈদ্যুতিক আলো, যানবাহন প্রভৃতি জীবনের নানা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে শহরের উপকণ্ঠে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া মূল্য বৃদ্ধি পায়। কলিকাতার দক্ষিণে বালিগঞ্জ অঞ্চলে এইরূপ জমির মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জমির মূল্যবৃদ্ধির জন্য জমির মালিককে কোনপ্রকার পরিশ্রম বা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতির জন্যই জমির মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং এই বর্ধিত মূল্যের সমগ্র পরিমাণ জমির মালিক বিনা আয়াসে পান বলিয়া এই আয়কে অনুপার্জিত আয় বলা হয়। অনেকে বলেন যে, এই আয় জমির মালিকের ভোগ করিবার কোন অধিকার নাই। সামাজিক কারণেই যখন জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে সামাজিক হিতের জন্য রাষ্ট্রই হইল এই আয়ের প্রকৃত অধিকারী। সুতরাং রাষ্ট্র কর্তৃক জমির মালিকগণের নিকট হইতে কর ধার্য করিয়া অনুপার্জিত আয় আদায় করা উচিত।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্র কর্তৃক অনুপার্জিত আয় আদায় করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কারণ, প্রথম অসুবিধা হইল রাষ্ট্র কাহার নিকট হইতে এই কর আদায় করিবে। রাষ্ট্র যদি জমির বর্তমান মালিকের উপর কর স্থাপন করে তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান মালিককে পরোক্ষভাবে দুইবার কর দিতে বাধ্য করা হয়। বর্তমান মালিক জমির পূবমালিকের নিকট হইতে একবার বেশী দামে জমি কিনিয়াছেন। তাঁহাকে যদি আবার কর দিতে হয়, তাহা হইলে একই জমির জন্য তাঁহাকে দুইবার বেশী দাম দিতে হয়। ইহা যুক্তিসঙ্গত নয়। দ্বিতীয়তঃ, জমির মালিক যে জমির উন্নতিতে কোনপ্রকার সাহায্য করেন নাই,

একথা বলাও সত্য নয়। কারণ জমির মালিক জমিতে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া কিছু ঝুঁকি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মালিক জমি না কিনিলে জমির চাহিদা বাড়িয়া দাম বাড়িতে পারিত না। সুতরাং জমির বর্ধিত মূল্যের একটা অংশ মালিকের ন্যায্য প্রাপ্য। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র যদি সামাজিক অগ্রগতির যুক্তি-বলে শহরাঞ্চলে জমির বর্ধিত মূল্য জমির মালিকগণের নিকট হইতে আদায় করে, তাহা হইলে পল্লী-অঞ্চলে সামাজিক অধঃপতনের ফলে জমির মূল্য হ্রাস পাইয়া জমির মালিকগণ যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, রাষ্ট্রের পক্ষে সে ক্ষতিপূরণ করা অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

ভারতে জমির খাজনা—Rent in India

রিকার্ডোর মত অনুসারে জমির খাজনা জমির চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে অর্থাৎ প্রজা ও জমির মালিকের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভারতে খাজনা নির্ধারণে এই নীতি প্রযোজ্য হইলেও ভারতে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য এই নীতির কিছু পরিবর্তন করা আবশ্যক। রিকার্ডোর মতে জনসংখ্যা বাড়িলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। আর খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে জমির চাহিদা বাড়ে। ফলে খাজনা বৃদ্ধি হয়। ভারতেও এই নীতি প্রযোজ্য। এদেশের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু চাষের জমি সে তুলনায় বাড়ে নাই। কাজেই প্রজাগণের মধ্যে জমির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে খাজনার পরিমাণও ক্রমশঃই বাড়িতেছে।

কিন্তু ভারতে প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হইতে পারে নাই। একমাত্র প্রতিযোগিতার দ্বারা ভারতে খাজনা নির্ধারিত হইবার প্রধান বাধা হইল দেশের অতি প্রাচীন-প্রথা ও সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন। প্রথমতঃ, ভারতে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকাল হইতেই জমির খাজনা প্রথাসম্মতভাবে ধার্য করা হইত। ফলে, পরবর্তী কালেও জমির মালিক এই অতি প্রাচীন প্রথা লঙ্ঘন করিয়া নূতন হারে খাজনা দাবী করিতে দ্বিধাবোধ করে। প্রজাও প্রথাসম্মত খাজনার বেশী দিতে আপত্তি জানায়। ইংরাজ শাসনকালে আইন প্রণয়ন করিয়া শুধু জমির খাজনা নহে, প্রজার স্বত্বও আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এইজন্য বলা হয় যে, ভারতে জমির খাজনা-পরিমাণ প্রথা (Custom), প্রতিযোগিতা (Competition) ও আইন (Legislation) দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতে ফসলের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি

পাওয়ার ফলে খাজনার হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়া জমির চাহিদা বর্তমানে ভারতে এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সরকারকে আইন প্রণয়ন করিয়াও জমির খাজনা নিয়ন্ত্রণ করিতে বেগ পাইতে হইয়াছে। জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে।

মুনাফা—Profit

আধুনিককালে উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদান হইল ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপনার অর্থ হইল জমি, শ্রম ও মূলধন যথাযথ পরিমাণে একত্রিত করিয়া ব্যবস্থাপক তাঁহার যোগ্যতা অনুসারে দ্রব্য উৎপাদন করেন। জমির খাজনা, মূলধনের সুদ ও শ্রমিকের মজুরি দিয়া উৎপাদনের যে উদ্বৃত্ত মূল্য ব্যবস্থাপকের থাকে, তাহাকে সাধারণতঃ মুনাফা বলা হয়। উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে পরিমাণ অর্থ হয় তাহা হইতে সমগ্র উৎপাদন-ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই হইল মুনাফা। এই মুনাফাকে মোটা মুনাফা (Gross Profit) বলা হয়।

মোট মুনাফা ও খাঁটি মুনাফা—Gross Profit and Net Profit

মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিয়া সাধারণতঃ মুনাফা হিসাব করা হয়। কিন্তু আয় ও ব্যয়ের এই পার্থক্য খাঁটি বা নীট মুনাফা বলিয়া গণ্য করা যায় না। কারণ, ব্যবস্থাপক যদি অন্যের জমি বা বাড়ী ভাড়া করিতেন এবং নিজস্ব মূলধনের পরিবর্তে ধার-করা মূলধন ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জমির খাজনা ও মূলধনের সুদ দিতে হইত এবং সমগ্র আয় হইতে খাজনা ও সুদ উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ হিসাবে বাদ দিতে হইত। ইহা ছাড়া, ব্যবস্থাপকের নিজ পরিচালনা-কার্যের যে পারিশ্রমিক তাহাও উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ, কারণ ব্যবস্থাপক অন্য লোকের অধীনে পরিচালক হিসাবে কার্য করিলে যে বেতন পাইতেন তাহাও উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ বলিয়া গণ্য হইত। সুতরাং সমগ্র আয় হইতে (ক) খাজনা, (খ) সুদ ও (গ) ব্যবস্থাপকের সাধারণ পরিচালনা-কার্যের পারিশ্রমিক বাদ দিলে নীট বা খাঁটি মুনাফা পাওয়া যায়। যৌথ মূলধনী কারবারের পরিচালনা কার্যে নিযুক্ত ব্যবস্থাপকের বেতন বাদ দিয়াই যৌথ-মূলধনী কারবারের নীট মুনাফা হিসাব করা হয় এবং এই নীট মুনাফাই অংশীদারগণের মধ্যে লভ্যাংশ (Dividend) হিসাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

উৎপাদনের আয় হিসাবে মুনাফার সহিত অন্যান্য আয়ের পার্থক্য—Difference between Profit and other Factor-incomes

খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হইল যথাক্রমে জমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানগুলির আয়। উৎপাদনের একটি উপাদানের আয় হইলেও মুনাফার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই মুনাফা ও অন্যান্য আয়গুলির মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য দেখা যায়।

(ক) প্রথমতঃ, মুনাফা হইল জাতীয় আয়ের অবশিষ্টাংশ ((Residual income)। জমি, শ্রম ও মূলধন প্রভৃতি উপাদানগুলির পারিশ্রমিক দিয়া যে অবশিষ্টাংশ থাকে, ব্যবস্থাপককে তাহাই লইতে হয়। অন্যান্য আয়গুলি, যথা, খাজনা, মজুরি ও সুদ পূর্বচুক্তি অনুযায়ী দিতে হব—ইহাদেব পরিমাণের পরিবর্তন হয় না।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, মুনাফার পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই। সচরাচর ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য আয়ের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না।

(গ) সুদ বা মজুরির হার হ্রাস পাইতে পারে, কিন্তু এই আয়গুলি কখনও একেবারে অন্তর্হিত হয় না। কিন্তু মুনাফার পরিবর্তে অনেকক্ষেত্রে লোকসানও হইতে পারে।

(ঘ) ব্যবস্থাপকের কাজের সঙ্গে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিবার ক্ষমতার উপরই ব্যবস্থাপকের মুনাফার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু শ্রমিকেব মজুরির মধ্যে এতটা পার্থক্য দেখা যায় না।

নীট বা খাঁটি মুনাফার উপাদান—Elements of Net Profit

ব্যবস্থাপককে বহু রকম কাজ করিতে হয়। উৎপাদনের প্রথম হইতে শেষ অবধি তিনিই সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন। এজন্য তাঁহাকে কঠোর কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। এই সাধারণ পরিচালনা-কার্যের জন্য তিনি (১) পারিশ্রমিক (Earnings of management) পাইয়া থাকেন। ব্যবস্থাপক উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করেন এবং এই ঝুঁকি বহন করিবার জন্য যে (২) পুরস্কার (Reward for risk-taking) পাইয়া থাকেন, তাহাও নীট মুনাফার একটি উপাদান। একচেটিয়া ব্যবসায়ের মালিক হওয়ার ফলে অথবা অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার সুবিধা গ্রহণ করিয়া যে (৩) অতিরিক্ত লাভ (Monopoly gains)

হয়, তাহাও ব্যবস্থাপকের নীট মুনাফার অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেক সময় আবার কোন অদৃষ্টপূর্ব ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থাপক যে (৪) অতিরিক্ত লাভ (Profit due to unforeseen circumstances) করেন, তাহাও তাঁহার নীট মুনাফার পরিমাণ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে ব্যবসায়ীর এই জাতীয় লাভের পরিমাণ বেশী হয়। (৫) নূতন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের ফলে যে অতিরিক্ত মুনাফা (Profit due to Innovation) হয়, তাহাও মুনাফার একটি উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়। পরিচালন-কার্যের ও ঝুঁকি বহনের জন্য ব্যবস্থাপক যে মুনাফা অর্জন করেন, সাধারণতঃ তাহাকেই স্বাভাবিক লাভ (Normal Profit) বলা হয়। দীর্ঘ-মেয়াদে সকল ব্যবস্থাপকই এই স্বাভাবিক লাভ অর্জন করেন নতুবা তাঁহারা ব্যবস্থাপনা করিতে পারেন না। সুতরাং স্বাভাবিক লাভকে উৎপাদন ব্যয়ের একটি অপরিহার্য অংশ বলা যাইতে পারে।

ভারতের ব্যবস্থাপকের মুনাফা—Profit of businessman in India

ভারতের বড বড শিল্প ও ব্যবসায় নিতান্ত নগণ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি বহরে শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। কাজেই লাভের পরিমাণ কম। ভারতের ব্যবস্থাপকগণ সাধারণতঃ বেশী ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে দ্বিধাবোধ করেন। বিদেশী প্রতিযোগিতার জন্য নূতন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রও খুব কম। যুদ্ধ প্রভৃতি অদৃষ্টপূর্ব কারণেও প্রতিযোগিতার অভাবে অনেক সময় ভারতের ব্যবস্থাপকগণ অতিরিক্ত মুনাফা আয় করিবার সুযোগ পান। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, ভারতের ব্যবস্থাপকগণের মুনাফা-পরিমাণ সাধারণতঃ পরিচালনা কাযের পারিশ্রমিক ও ব্যবসায়েব স্বাভাবিক ঝুঁকি-গ্রহণের পুরস্কার লইয়া গঠিত হয়। তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের লোক ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইযা অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লিপ্ত হইতেছে। তাহাদের ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্য বৃদ্ধি পাইতেছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ভারতেও প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাপকের আবির্ভাব হইবে।

যৌথ প্রতিযোগিতা ও শ্রমিক সঙ্ঘ—Collective Bargaining and Trade Union

যৌথ প্রতিযোগিতা—Collective Bargaining

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই

বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য শ্রমিক মালিকের সহিত সমান প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ। শ্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা শ্রমিক হইতে অবিচ্ছেদ্য (inseparable from labour)। শ্রমিক নিজে ছাড়া অন্য কেহ ইহা দিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিককে নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহার শ্রম বিক্রয় করিতে হইবে (must personally deliver his goods)। সুতরাং অসুস্থ হইলে বা অন্য কাজে নিযুক্ত থাকিলে সে পরিশ্রম করিতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য নিজে বিক্রয় করিতে না পারিলেও অন্যের সাহায্যে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ মূল্য পাওয়া যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, শ্রম একটি অতি পচনশীল দ্রব্য (an extremely perishable commodity)। শ্রমিক যদি একদিন কোন কারণে কাজ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার সেদিনকার শ্রম নষ্ট হইয়া যায়। অন্য কোন দিন কাজ করিয়া সে আর গতদিনের শ্রমের মজুরি পাইতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য একদিন বিক্রয় না করিয়াও অন্যদিন বিক্রয় করিয়া দ্রব্যের মূল্য পাওয়া যাইতে পারে। চতুর্থতঃ, শ্রমিক কাজ করে কিন্তু কাজ করিলে তাহার কর্মশক্তি নষ্ট হয় না। পুনরায় কাজ করিবার ক্ষমতা তাহার আয়ত্তে থাকে (sells his labour but retains the property in himself)। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় একবার বিক্রয় করিলেও তাহার শ্রম বিক্রয় করিবার ক্ষমতা একেবারে নিঃশেষিত হয় না। পঞ্চমতঃ, শ্রমিকের কোন মজুত তহবিল নাই (has no reserve fund)। সুতরাং কাজ না করিলে সে খাইতে পায় না। মজুত তহবিলের অভাবে অনেক সময় বাধ্য হইয়া তাহাকে কম মজুরিতে কাজ করিতে হয়। মালিকের মজুত তহবিল আছে, কাজেই শ্রমিক নিয়োগ না করিয়া সে কিছুদিন উৎপাদন-কার্য বন্ধ রাখিয়া শ্রমিকের সহিত দর কষাকষি করিতে পারে ; কিন্তু শ্রমিকের সে সুবিধা নাই। কাজ বন্ধ হইলে তাহার শ্রম নষ্ট হইবে। সে মজুরি পাইবে না এবং তাহার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কোন মজুত অর্থ নাই বলিয়া পরিবারসহ তাহাকে অনশনে দিন কাটাইতে হইবে। এই কারণে এককভাবে শ্রমিক মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না এবং শ্রমিকের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ লইয়া মালিক তাহাকে তাহার প্রাপ্য ন্যায্য মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি দিয়া থাকে।

শ্রমিকের এককভাবে এই প্রতিযোগিতা করিবার অসামর্থ্য দূর করিবার জন্য শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করে।

শ্রমিক সঙ্ঘ—Trade Union

কার্যের পূর্বস্থিত অবস্থা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে অথবা পূর্বস্থিত অবস্থার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে গঠিত শ্রমিকগণের অবিচ্ছিন্ন সমিতিকে শ্রমিক সঙ্ঘ বলা হয়। "A trade union is a continuous collection of wage-earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of employment."—(Henry and Beatrice Webb)

ব্যক্তিগতভাবে কোন শ্রমিকই মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। তাই তাহারা সমবেতভাবে মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা করে। সুতরাং শ্রমিক সঙ্ঘের মূলনীতি হইল "একতাই বল"। শ্রমিক সঙ্ঘের একজন কর্মকর্তা থাকে এবং এই কর্মকর্তা শ্রমিকগণের প্রতিনিধি হিসাবে মালিকের সহিত শ্রমিক সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা পরিচালনা করিয়া কাজের শর্তাদি স্থির করে।

শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য—Aims and objects of Trade Unions

(ক) কোন নির্দিষ্ট শিল্প বা ব্যবসায় সবচেয়ে বেশী যে পরিমাণ মজুরি দিতে সমর্থ, শ্রমিকগণের জন্য সেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ মজুরি স্থির করা ;

(খ) শ্রমিকগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অবসর-যাপনের জন্য কার্যের সময়ের দীর্ঘতা হ্রাস করা ;

(গ) কর্মস্থলের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর, চিত্তাকর্ষক ও মনোরম করা ;

(ঘ) মালিক যাহাতে ব্যক্তি-বিশেষ শ্রমিকের উপর অন্যায় না করিতে পারে অথবা তাহার খুশীমত শ্রমিককে বরখাস্ত করিতে না পারে, শ্রমিক সঙ্ঘের সে বিষয়ে অত্যধিক সচেতন থাকা ;

(ঙ) কার্যের স্থায়িত্ব বলবৎ করা।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, শ্রমিক সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য হইল তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করিয়া জীবনযাত্রার মান উন্নয়নপূর্বক যাহাতে তাহারা মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে পারে তজ্জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা।

শ্রমিক সঙ্ঘের কার্যক্রম—Trade Union activities

শ্রমিক সঙ্ঘ ইহার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিন প্রকারের কাজ করিয়া থাকে

১। শ্রমিক-কল্যাণমূলক কার্য—Ministrant or Fraternal activities

প্রথমতঃ, শ্রমিক সঙ্ঘ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে

তাহাদের সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়। বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থ বা বেকার অবস্থায় অথবা আকস্মিক বিপদকালে যাহাতে তাহাদের দুর্দশা না হয়, সেজন্য তাহারা সমবেতভাবে বিভিন্ন শ্রমিককে সাহায্য করে। এই উদ্দেশ্যে চাঁদা তুলিয়া তাহারা তহবিল সৃষ্টি করে। এই ব্যবস্থা তাহাদের আত্মনির্ভরশীলতা ও একাত্মবোধের পরিচায়ক। মালিকের সহিত তাহারা সম্ভবমত শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহাদের কাজের শর্তাদি আলোচনা করে। ইহা ছাড়া, যাহাতে শ্রমিকগণ কর্তব্যপরায়ণ ও নিয়মানুবর্তী হইয়া দক্ষতা অর্জন করিতে পারে, সেজন্য শ্রমিক সঙ্ঘ সভাসমিতি ও পুস্তিকা-প্রকাশের মাধ্যমে শ্রমিকগণকে ঠিকপথে চালিত করে।

২। বিবাদমূলক কার্য—Militant activities

শান্তিপূর্ণ উপায়ে যদি তাহাদের উদ্দেশ্যসাধন না হয়, তাহা হইলে শ্রমিক সঙ্ঘ সংগ্রামের মনোভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। মালিককে তাহাদের সর্তে স্বীকৃত হইতে বাধ্য করিবার জন্য তাহারা কর্মে বিরতি বা ধর্মঘট (Strike) করে। শ্রমিকগণের ধর্মঘট করিবার অধিকার থাকিলেও পরিবহন, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানক্ষেত্রে এই অধিকাব অবাধভাবে প্রযোগ করা সমীচীন নহে।

৩। রাজনৈতিক কার্য—Political activities

শ্রমিক সঙ্ঘকে ইহাব সমস্যাগুলি চূড়ান্তভাবে সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে হয। শ্রমিক সঙ্ঘ রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করে। উদ্দেশ্য হইল যে, যদি তাহারা নির্বাচনে জয়ী হইতে পারে, তাহা হইলে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া শ্রমিক-সম্পর্কিত সকল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইবে। ইংলণ্ডের শ্রমিকদলের, রুশিয়ার সাম্যবাদীদলের অভ্যুত্থানের গোড়া পত্তনের ইতিহাসে শ্রমিক সঙ্ঘের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়।

মজুরির উপর শ্রমিক সঙ্ঘের প্রভাব—Influence of Trade Union on Wages

প্রশ্ন হইল শ্রমিক সঙ্ঘ কি মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে? সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মালিকগণ শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সব সময়ে তাহাদের ন্যায্য মজুরি দেয় না। ১। শ্রমিকের মজুরি যদি প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাণের কম হয়, তাহা হইলে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি, শ্রমিকের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া মালিককে

শ্রমিকের প্রান্তিক দানের সমান মজুরি দিতে বাধ্য করিতে পারে। ২। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়া শ্রমিক সঙ্ঘগুলি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারে। শ্রমিকের কর্মদক্ষতা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উৎপাদনে তাহার প্রান্তিক দান বৃদ্ধি পায় এবং ফলে তাহার মজুরি বৃদ্ধি পায়। ৩। যে শ্রেণীর শ্রমিকের কাজ উৎপাদনে অপরিহার্য, সে শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরি বেশী দিতেই হইবে। ৪। শ্রমিকের মজুরি যদি কোন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের সামান্য অংশ হয়, তাহা হইলে মজুরি বেশী হইতে পারে। কারণ মজুরি একটু বাড়িলে উৎপাদন ব্যয়ের বিশেষ তারতম্য হয় না। সুতরাং মালিক শ্রমিকদের সহিত অসদ্ভাব এড়াইবার উদ্দেশ্যে কিছু মজুরি বেশী দিতে পারে।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলন—Trade Union movement in India

ভারতের পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে বিরাট বড়বের শিল্পপ্রতিষ্ঠান অতি আধুনিক-কালেই গঠিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস প্রাচীন নহে। ১৮৯০ সালে বোম্বাই প্রদেশে সর্বপ্রথম শিল্পশ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হইলেও প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ সাল হইতেই ভারতে প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলন সুরু হয় বলা যাইতে পারে। এই সময় দ্রব্যমূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রমিকগণের চরম দুদশা হয় এবং তাহাদের এই অবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকে। এই সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে অসংবদ্ধভাবে কয়েকটি শ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হয়। কিন্তু এই সঙ্ঘগুলি ধর্মঘট করা ব্যতীত অন্য কোন শ্রমিক কল্যাণমূলক কার্যে অগ্রণী হয় নাই। এই সময়ে অবশ্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মহাসভা শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে সুসংবদ্ধ হইতে সাহায্য করে এবং কংগ্রেসের অনুপ্রেরণায় শ্রমিক সঙ্ঘগুলি শক্তিশালী হইয়া উঠে। ১৯২৬ সালে তদানীন্তন ভারত সরকার একটি নূতন আইন পাস করিয়া শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে আইনানুমোদিত প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৭ সালে পূর্বের আইনটি সংশোধন করিয়া শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে সরকারী অনুমোদন লাভ করিবার জন্য বাধ্য করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ভারতে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি শক্তিশালী হইয়া তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে ভারত সরকার যে শিল্প বিরোধ সংশোধন আইন পাস করিয়াছেন, তাহাতে শ্রমিক-মালিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের ব্যবস্থা হইয়াছে। শিল্প-বিরোধ মিটাইবার উদ্দেশ্যে আপোষ-কর্মচারী (Conciliation officer) নিযুক্ত

হইয়াছে। শ্রমিকগণের ধর্মঘট করিবার অধিকারও সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিকগণকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছাটাই করিয়া দিলে ক্ষতিপূরণ দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ত্রুটি—Defects of the Trade Union movement in India

নানাকারণে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক অনগ্রসর রহিয়াছে। বাহিরের বাধা অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান অন্তরায়।

প্রথমতঃ, ভারতে শিল্পশ্রমিক বলিয়া কোন স্থায়ী শ্রমিকশ্রেণী নাই বলিলেও চলে। অধিকাংশ শিল্পশ্রমিকই কৃষিকার্যের অবসরে গ্রাম হইতে সাময়িক কাজের জন্য শহরে আসে এবং কিছু আয় করিতে পারিলেই আবার গ্রামে ফিরিয়া যায়। তাহাদের শ্রমজীবী বৃত্তিতে প্রায়ই কোন আসক্তি দেখা যায় না। কাজেই স্থায়ী পেশাগত শ্রমিকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। এই কারণে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকগণ নিরক্ষর ও অদৃষ্টবাদী। এজন্য তাহাদের মধ্যে স্বাবলম্বী হইয়া নিজেদের চেষ্টায় অবস্থার উন্নতি করিবার অনুপ্রেরণার একান্ত অভাব। আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবে তাহারা ভীরু ও অলস প্রকৃতির হয়।

তৃতীয়তঃ, জাতিগত, ধর্মগত ও ভাষাগত বিভেদের জন্য ভারতীয় শ্রমিকগণ একতাবদ্ধ হইতে পারে না। বোম্বাই রাজ্যের শ্রমিক ও পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকের মধ্যে ভাষার পার্থক্য একমাত্র ব্যবধান নহে, খাদ্য, বস্ত্র ও আচার-ব্যবহারেও তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ নহে।

চতুর্থতঃ, ভারতের শ্রমিকগণের মজুরি এত স্বল্প যে, তাহাদের পক্ষে সঙ্ঘে দেয় চাঁদা নিয়মিতভাবে দেওয়া কষ্টকর। তাহারা রোগ, শোক ও আর্থিক কষ্টে এত জর্জরিত থাকে যে, সঙ্ঘের কাজে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহী হইতে পারে না।

পঞ্চমতঃ, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের আর একটি প্রধান দুর্বলতা হইল যে, শ্রমিক সঙ্ঘের নেতৃত্বে সাধারণতঃ শ্রমিকশ্রেণী-বহির্ভূত পেশাদার রাজনৈতিক কর্মীর হাতে থাকে। শ্রমিকগণের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ লইয়া এই সমস্ত নেতা অনেক সময় শ্রমিকের স্বার্থ-সংরক্ষণে অবহেলা করেন।

প্রতিকার—Remedies

ভারতের শ্রমিক আন্দোলন সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে প্রথম ও প্রধান কাজ হইল শ্রমিকগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার। শিক্ষা পাইলে শ্রমিকগণ তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আত্মসচেতন হইয়া অধিকতর স্বাবলম্বী হইতে পারিবে। শ্রমিক সঙ্ঘ পরিচালনা করিবার জন্য বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। শ্রমিক সঙ্ঘগুলির নেতৃগণ যাহাতে শ্রমিকগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন তাহার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। এইজন্যই সাধারণ শিক্ষা ও শ্রমিক সঙ্ঘ-সংক্রান্ত শিক্ষা দ্রুত বিস্তার করা দরকার। শ্রমিকগণের যাহাতে তাহাদের কর্তব্যে আসক্তি জন্মে, সেজন্য মালিকেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। শ্রমিকগণের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক, অবসর-বিনোদনের জন্য স্বাস্থ্য-সহায়ক আমোদ-প্রমোদ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যবস্থা করিতে পারিলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ ঘটিবার কারণ দূর হইবে। শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে এই ধারণা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে দেশের সরকার অনেক সাহায্য করিতে পারেন। শ্রমিক ও মালিকের উপর সরকারী বিধি-নিষেধগুলি শিথিল করাও আবশ্যক।

সংক্ষিপ্তসার

উপাদানের আয়

ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা এই চারিটি হইল উৎপাদনের উপাদান এবং খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হইল যথাক্রমে ইহাদের আয়। প্রত্যেকটি উপাদানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রত্যেকটি আয় অপরাপর আয় হইতে পৃথক।

মজুরি

মজুরি জাতীয় আয়ের একটি অংশ। শ্রমিকের কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তাহাকে মজুরি বলা হয়। মজুরি কাজের পরিমাপে দেওয়া যাইতে পারে, আবার সময়ের পরিমাপেও দেওয়া যাইতে পারে।

আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি

কাজের প্রতিদান হিসাবে শ্রমিক যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাহাকে আর্থিক মজুরি

বলা হয়। আর্থিক মজুরি ছাড়াও শ্রমিক মালিকের নিকট হইতে যে সুখ-সুবিধাগুলি পায় তাহাকে প্রকৃত মজুরি বলা হয়। প্রকৃত মজুরি অর্থপরিমাণ ছাড়া আরও অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যথা, দ্রব্যমূল্য, কাজের সুবিধা-অসুবিধা, বাড়তি আয়ের সম্ভাবনা, কাজের স্থায়িত্ব প্রভৃতি। প্রকৃত মজুরির পরিমাণ দ্বারাই শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিমাপ করা যায়।

প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা নীতি

মজুরি-নির্ধারণ নীতি সম্পর্কে নানা মত আছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণ নীতির চাহিদা ও যোগানের সূত্রটি প্রয়োগ করিয়া মজুরি-নির্ধারণ নীতির ব্যাখ্যা করেন। চাহিদার দিক দিয়া উৎপাদনে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ও যোগানের দিক দিয়া শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয়ের দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয়।

মজুরির হারের পার্থক্যের কারণ

কর্মদক্ষতার পার্থক্য ও প্রতিযোগিতার অভাবই হইল মজুরি পার্থক্যের প্রধান কারণ। সকলে সমান কর্মদক্ষ হইলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য মজুরির পার্থক্য দেখা যায়: ১। বৃত্তিগুলি সমান রুচিকর নহে, ২। বৃত্তিগুলির ঝুঁকি ও দায়িত্বের পার্থক্য, ৩। কাজের স্থায়িত্ব, ৪। বৃত্তিশিক্ষার ব্যয়, ৫। ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা ইত্যাদি।

ভারতে মজুরির হার

ভারতের শ্রমিক অন্যান্য দেশের শ্রমিক অপেক্ষা কম মজুরি পায়। শিল্প শ্রমিকগণ বর্তমানে শ্রমিক সঙ্ঘের সাহায্যে তাহাদের মজুরি হার কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। দেশের সরকারও এ বিষয়ে অবহিত হইয়া অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য-মজুরি স্থির করিয়া দিয়াছেন।

সুদ

উৎপাদনে মূলধনের কার্যকারিতার জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তাহাকে সুদ বলে। দেনাদার পাওনাদারকে মূলধনের ব্যবহার-মূল্য হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ দেয়, তাহা হইল মোট সুদ। মূলধন ধার দিয়া পাওনাদারকে পাওনা টাকা আদায় করিবার জন্য যে ঝুঁকি ও হাঙ্গামা সহ্য করিতে হয়, মোট সুদ হইতে ঐ ঝুঁকি ও হাঙ্গামার খরচ বাদ দিলে নীট বা খাঁটি সুদ পাওয়া যায়।

সুদের হারের তারতম্য

ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও ধার-দেওয়া অর্থের নিরাপত্তার পার্থক্যের জন্যই সুদের হারের পার্থক্য হয়। যেখানে ঝুঁকি বেশী, সেখানে সুদের হারও বেশী। ভারত সরকার অল্প সুদে টাকা ধার পায়। তাহার কারণ হইল ভারত সরকারের আর্থিক সামর্থ্য ও সুনাম। কৃষকের বেশী সুদ দিতে হয়। তাহার কারণ তাহার আর্থিক সঙ্গতি বা সুনাম নাই।

সুদের হার কি ভাবে স্থির হয়

দ্রব্যমূল্যের ন্যায় চাহিদা ও যোগানের সূত্র দ্বারা সুদ-নির্ধারণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হয়। চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় যে হারে সুদ হইলে মূলধনের মোট সরবরাহ মোট চাহিদার সমান হয়, সেই হারেই একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় সুদের হার নির্ধারিত হয়।

ভারতে সুদের হার

ভারতে সুদের হার বেশী। ইহার কারণ হইল সঞ্চয়ের অভাবে মূলধনের সরবরাহ-পরিমাণ খুব কম। পল্লীঅঞ্চলে সুদের হার অত্যন্ত অধিক, কারণ এক মহাজন ব্যতীত ধার পাইবার আর অন্য কোন উপায় নাই। পল্লীবাসীর ধার শোধ করিবার সামর্থ্যের অভাবও বেশী সুদের আর একটি কারণ।

খাজনা

ভূমি ও অন্যান্য প্রকৃতি-দত্ত উপাদানগুলি ব্যবহারের জন্য যে মূল্য দেওয়া হয়, তাহাকে খাজনা বলে। মোট প্রদত্ত খাজনা-পরিমাণ হইতে জমির মালিকের জমিতে নিযুক্ত নিজস্ব মূলধনের সুদ, ও নিজস্ব পরিশ্রমের মজুরি বাদ দিলে নীট খাজনা পাওয়া যায়।

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব

রিকার্ডোর মতে জমির উৎপন্ন পরিমাণের যে অংশ জমির আদিম ও অবিনশ্বর ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়, তাহাই হইল খাজনা। নূতন দেশে লোকে প্রথমতঃ ভাল জমি চাষ করে। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে ভাল জমির অভাবে লোকে খারাপ জমি চাষ করিতে আরম্ভ করে। সমান পরিমাণ খরচ করিয়া খারাপ জমি অপেক্ষা ভাল জমিতে যে পরিমাণ

অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বা খাজনা নামে অভিহিত হয়। খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা যতই বৃদ্ধি পায়, অপেক্ষাকৃত খারাপ জমি ততই বেশী চাষ করা হয় এবং এইরূপে তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর জমি চাষের ফলে উৎকৃষ্ট জমির উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইযা খাজনা বৃদ্ধি হয়।

খাজনার কারণ

(১) চাহিদার তুলনায় জমিব সববরাহ সীমাবদ্ধ বলিয়া জমির ব্যবহারের জন্য খাজনা দিতে হয়। (২) খাজনার আব একটি কারণ হইল ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধির কার্যকারিতা। এই কাবণে ভাল জমি হইতে বেশী শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়াও অধিক পবিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয় না। সুতবাং খারাপ জমি চাষ কবিতে হয় এবং খারাপ জমি চাষ করিলেই তাহার তুলনায় ভাল জমিতে উদ্বৃত্ত হয় এবং এই উদ্বৃত্তই হইল খাজনা। রিকার্ডো আরোও বলেন যে, জমির এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ জমির উর্বরতা ও অবস্থানের সুবিধা—এই উভয়েব উপর নিভব করে।

অর্থনৈতিক খাজনা ও চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত খাজনা

জমিব মালিক নিজে জমি চাষ করিয়া খরচ বাদ দিয়া যে উদ্বৃত্ত আয় পায় তাহাই হইল অর্থনৈতিক খাজনা। জমির মালিক ও প্রজার মধ্যে দর-কষাকষি হইয়া প্রজা জমির মালিককে জমি ব্যবহার করিবাব জন্য যে পরিমাণ মূল্য দিতে স্বীকার করে, তাহাই হইল চুক্তিগত খাজনা। ইহা সাধারণতঃ অর্থনৈতিক খাজনার বেশী হইতে পারে না

খাজনার সহিত মূল্যের সম্পর্ক

ফসলের মূল্য নিকৃষ্ট (প্রান্তিক) জমির উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। নিকৃষ্ট জমি চাষ করিলে মূল্য দ্বারা উৎপাদন-ব্যয় পোষায়, কিন্তু কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। কাজেই এ জমির কোন খাজনা হয় না। যেহেতু খাজনা নিকৃষ্ট জমির উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ নহে, সেইহেতু খাজনা মূল্যেরও অংশ হইতে পাবে না। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়িলে উদ্বৃত্ত বেশী হইয়া খাজনা বেশী হয়, কিন্তু খাজনা বেশী বলিয়া মূল্য বেশী হইতে পাবে না।

শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণের জমির খাজনা

গৃহনির্মাণের জন্য শহবাঞ্চলের জমির খাজনা-নির্ধারণে জমির উর্বরতার কোন

কার্যকারিতা নাই। জমির অবস্থানের সুবিধা-অসুবিধার ভিত্তিতেই উহার খাজনা নির্ধারিত হয়।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধি ও কৃষির উন্নতির সহিত খাজনার সম্পর্ক—

(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে হয়। নিকৃষ্ট জমি চাষ করিবার ফলে উৎকৃষ্ট জমির উদ্বৃত্ত-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া খাজনা বৃদ্ধি পায়।

(২) কৃষিকার্যের উন্নতি হইলে যদি এই উন্নত ধরণের কৃষিপদ্ধতি সকল জমিতেই প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে নিম্নস্তরের জমির চাষ বন্ধ হয় ও খাজনা কমে।

অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি

শহরের উপকণ্ঠে সরকারী বা বে-সরকারী প্রচেষ্টায় যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি হয়, তাহা হইলে জমির দাম বাড়িয়া যায়। সামাজিক অগ্রগতির ফলে জমির এই মূল্যবৃদ্ধিকে অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি বলা হয়, কারণ ভূ-স্বামীকে জমির উন্নতির জন্য কিছুই করিতে হয় না, অথচ তিনি এই বর্ধিত আয় ভোগ করেন।

ভারতে জমির খাজনা

ভারতে জমির খাজনা প্রধানতঃ প্রথার দ্বারা নির্ধারিত হইত। ইংরাজ শাসন-কালে আইন দ্বারা খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে খাজনা অনেক পরিমাণে প্রতিযোগিতার দ্বারা স্থির হইতেছে। জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদের ফলে ভারতে বর্তমানে চিরাচরিত পদ্ধতিতে খাজনা প্রদান প্রায় রহিত হইয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে।

মুনাফা

বিক্রয়লব্ধ মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাকে ব্যবস্থাপকের মোট মুনাফা বলা হয়। মোট মুনাফা হইতে ব্যবস্থাপকের নিজের জমির খাজনা, মূলধনের সুদ ও নিজের পারিশ্রমিক বাদ দিলে নীট মুনাফা পাওয়া যায়।

মুনাফার বৈশিষ্ট্য

(১) মুনাফা হইল অবশিষ্ট আয় অর্থাৎ খাজনা, সুদ ও মজুরি দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই হইল মুনাফা। (২) খাজনা, মজুরি, সুদ প্রভৃতি অন্যান্য

আয়ের পরিমাণের মত মুনাফা পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই। (৩) মুনাফা একেবারেই নাও হইতে পারে। (৪) মুনাফার প্রধান কারণ হইল ঝুঁকি-বহন, এবং ঝুঁকি-বহন-ক্ষমতার পার্থক্যের জন্য ব্যবস্থাপকগণের মুনাফা-পরিমাণের পার্থক্য হয়।

নীট মুনাফার উপাদান

(১) পরিচালনা-কার্যের পারিশ্রমিক, (২) ঝুঁকি-বহনের পুরস্কার, (৩) একচেটিয়া লাভ, (৪) অদৃষ্টপূর্ব অবস্থা-জনিত অতিরিক্ত লাভ, (৫) নূতন উদ্ভাবন-জনিত অতিরিক্ত লাভ। প্রথম দুইটি উপাদান লইয়া গঠিত মুনাফাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলা হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদে সকল ব্যবস্থাপকই এই মুনাফা অর্জন করেন।

ভারতে ব্যবস্থাপকের মুনাফা

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের ব্যবস্থাপকগণ কম ঝুঁকি গ্রহণ করেন। তাঁহাদের উদ্ভাবন শক্তিও কম। সুতরাং মুনাফা-পরিমাণও কম। তবে বর্তমান ভারতেও প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাপকের আবির্ভাবের সম্ভাবনা হইয়াছে।

যৌথ প্রতিযোগিতা

শ্রমিকগণ প্রায় সবদিক দিয়াই মালিকগণের সহিত এককভাবে প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ। তাই তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা করে।

শ্রমিক সঙ্ঘ

শ্রমিকগণ মালিকগণের নিকট হইতে তাহাদের কাজের মজুরি-বৃদ্ধি ও অন্য নানা সুখ-সুবিধা পাইবার জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করে। এইজন্য তাহারা শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করিয়া যুক্তভাবে মালিকের সহিত দর কষাকষি করে।

শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য

(১) মজুরি বৃদ্ধি করা, (২) কাজের সময় হ্রাস করা, (৩) মালিকের অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধ করা, (৪) শ্রমিক ছাঁটাই প্রতিরোধ করা, (৫) কাজের স্থায়িত্ব বলবৎ করা।

শ্রমিক সঙ্ঘের কার্য

(১) শ্রমিক-কল্যাণমূলক কার্য—যাহাতে তাহারা স্বাবলম্বী হইয়া নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের উন্নতি করিতে পারে।

(২) বিবাদমূলক কার্য—ধর্মঘট করিয়া ও নানাভাবে মালিকের সহিত অসহযোগিতার দ্বারা মালিককে তাহাদের শর্ত গ্রহণে বাধ্য করিতে চেষ্টা করা।

(৩) রাজনৈতিক কার্য—রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। নির্বাচনে জয়ী হইলে সরকার গঠন করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন অতি আধুনিক কালের ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কার্যতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে ভারতে শ্রমিক-আন্দোলন সুরু হয় এবং ১৯২৬ সালে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি সরকার কর্তৃক প্রথম স্বীকৃত হয়। তাহার পর ১৯৪৭ ও ১৯৫৩ সালে ভারতের জাতীয় সরকার শ্রমিক-সম্পর্কিত আইন পাস করিয়া এই সঙ্ঘগুলির কার্যক্রমের উপর কতকগুলি বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়াছেন। বর্তমানে ভারতে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি অনেক পরিমাণে সুসংবদ্ধ হইয়াছে।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ত্রুটি

(১) শ্রমিকগণের মধ্যে পেশাগত স্থায়ী শ্রমিকের অভাব, (২) জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বিভেদ, (৩) শ্রমিকগণের অজ্ঞতা ও কু-সংস্কার (৪) স্বল্প হারে মজুরি, (৫) পেশাদার রাজনৈতিক কর্মীর নেতৃত্ব।

প্রতিকার

(১) শিক্ষার প্রসার, (২) শ্রমিক সঙ্ঘ পরিচালনা-সম্পর্কিত শিক্ষা, (৩) মালিকের সহানুভূতি, (৪) শ্রমিকের সততা ও দক্ষতা, (৫) সরকারী সাহায্য।

প্রশ্ন ও উত্তর

1 Explain why wage rates vary in different occupations within a Country H.S (Hu). 1961

একটি দেশের মধ্যে মজুরির হার কেন বিভিন্ন হয় আলোচনা কর।

উঃ—সকল কাজের একই হারে মজুরি হয় না। ভিন্ন ভিন্ন পেশার মজুরির হারের পার্থক্য

দেখা যায়। এখন প্রশ্ন হইল সব কাজে কেন মজুরি সমান হয় না। মজুরির পার্থক্যের প্রধান কারণ হইল কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অভাব। সকলেই নিজের খুসীমত কাজ, বাছিয়া লইতে পারে না—তাহা হইলে সকলেই হাইকোর্টের জজ হইতে পারিত। কাজেই দেখা যায় যে, কোন কোন বৃত্তিতে বেশী সংখ্যক লোক আবার কোন কোন বৃত্তিতে লোকাভাব। যে বৃত্তিতে বেশী লোক যায়, সেখানে মজুরির হার কম, আর যেখানে কম লোক সেখানে মজুরির হার বেশী। কিন্তু যদি ধরা যায় যে, সব লোকই সব কাজ করিতে পারে এবং খুসীমত যে কোন কাজে যোগ দিতে পারে তাহা হইলেও নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য মজুরির পার্থক্য থাকিবে—

১। কাজটি প্রীতিকর কি অপ্রীতিকর—প্রীতিকর কাজে বেশী লোক আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য শ্রমিকের সংখ্যা বেশী হয় ও মজুরি কম হয়। কাজটি অপ্রীতিকর হইলে কম লোক যায় ও মজুরির হার বাড়ে।

২। কাজের স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্ব—স্থায়ী কাজে বেশী লোক যোগদান করিতে ইচ্ছুক হয় আর অস্থায়ী কাজে কম লোক যায়। কাজেই মজুরির পার্থক্য হয়।

৩। বৃত্তি শিক্ষার ব্যয়—চাকুরি পাইতে হইলে যদি অনেক ব্যয় করিয়া বৃত্তি শিক্ষা করিতে হয়, তবে সেই সব বৃত্তিতে উচ্চহারে মজুরি না হইলে লোকে সে বৃত্তির জন্য অযথা খরচ করিবে না। এইজন্য বিশেষজ্ঞদের, চিকিৎসক ও আইনজীবীদের দর্শনী বেশী হয়।

৪। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা বা নির্দিষ্ট বেতন ছাড়া অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও লোকে সেই সব বৃত্তিতে আকৃষ্ট হয়।

৫। কাজের আনুষঙ্গিক সুবিধা—বিনাভাড়ায় বাসগৃহ, অল্পমূল্যে খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রভৃতি থাকিলেও লোকে অল্প বেতনে কাজ করিতে ইচ্ছুক হয়।

2 What determines wages ? Is it the standard of living or the marginal productivity of labour ? H S (Hu), 1962

মজুরি কিভাবে স্থির হয় ? প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা অথবা জীবনযাত্রার মান—কোনটির দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয় ?

উঃ—মজুরি হইল শ্রমিকের কাজের মূল্য এবং মূল্য হিসাবে ইহা অনেকটা অন্যান্য দ্রব্যমূল্যের ন্যায় চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে নির্ধারিত হয়।

দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় কালে ক্রেতার যেরূপ একটি সর্বোচ্চ মূল্য থাকে ও বিক্রেতার একটি সর্বনিম্ন মূল্য থাকে এবং এই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের মাঝামাঝি বাজার মূল্য হয় তদ্রূপ শ্রমের ক্রেতা (মালিক) ও শ্রমের বিক্রেতার (শ্রমিক নিজে) একটি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য থাকে যাহার উপরে মালিক মজুরি দিতে পারে না ও শ্রমিক মজুরি গ্রহণ করিতে পারে না। শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার (Marginal productivity) উপর ভিত্তি করিয়া মালিক উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার মূল্যের অনুপাতে মজুরীর হার নির্ধারণ করে। অপর পক্ষে বর্তমানে শ্রমিকগণ শ্রমিক-সঙ্ঘের সাহায্যে মালিকের সহিত দর-কষাকষি করিয়া যে হারে মজুরি লইতে স্বীকৃত হয়, যোগানের দিক দিয়া তাহাই হইল মজুরির সর্বনিম্ন হার এবং এই হার শ্রমিকগণের জীবনযাত্রার মান (standard of living), কাজটি আরামদায়ক কি কষ্টকর প্রভৃতি শ্রমের প্রকৃতির উপর

নির্ভর করে। এই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমার মধ্যে মজুরির হার পরিবর্তিত হইবে। শ্রমিকের চাহিদা বাড়িলে মজুরির হার সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি যাইবে, আবার চাহিদার অনুপাতে শ্রমিকের যোগান বাড়িলে সর্বনিম্ন সীমার সমান হইবে। সুতরাং শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মান—এই উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে মজুরি নির্ধারিত হয়। তবে মালিকের সহিত শ্রমিকের পূর্ণ প্রতিযোগিতার অক্ষমতাহেতু মজুরি নির্ধারণে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের প্রভাব সব সময় সমান কার্যকরী হয় না।

3. Explain how interest is determined. H S (Hu.), 1961, 1962 Comp
Why does the lender charge different rates of interest for different types of loans ?

সুদ কিভাবে স্থির হয় ? পাওনাদার বিভিন্ন ধারের জন্য বিভিন্ন হারে সুদ আদায় করে কেন ?

উঃ—ঋণদাতা ঋণ-গ্রহীতার নিকট কেন সুদ দাবী করে ইহাই আলোচ্য বিষয়। মার্শাল প্রভৃতি কয়েকজন ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, ঋণদাতার ধার দিবার ক্ষমতা নির্ভর করে তাহার মূলধন পরিমাণের উপর—আবার মূলধন নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর। সঞ্চয় করিতে গেলে লোকের বর্তমান খরচ কমাইতে হয় অর্থাৎ বর্তমান প্রয়োজন না মিটাইয়া তাহাকে জমাইতে হয়। লোকে যাহা আয় করে বর্তমানে সেই আয়ের সমস্তটাই নিজের ভোগের জন্য ব্যয় না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিতে হয়। সঞ্চয় করিতে গেলেই বর্তমানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ অন্ততঃ কিছুটা কমাইয়া ভোগ নিবৃত্তি করিতে হয়। সুতরাং লোককে ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে সঞ্চিত মূলধনের জন্য একটা মূল্য দিতে হয়। এই মূল্যই হইল সুদ।

মার্শাল প্রমুখ ধনবিজ্ঞানিগণ সুদকে সঞ্চয়ের পুরস্কার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু কেইনস প্রভৃতি ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, সুদ সঞ্চয় পরিমাণ বা মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। তাঁহাদের মতে সুদ পরিমাণ নির্ভর করে লোকে কত টাকা ধার দিতে ও নিতে চায় তাহার উপর। লোকের নগদ টাকার প্রতি একটা আসক্তি থাকে। কারণ, নগদ টাকা হাতে থাকিলে নগদ টাকার মালিক নানাদিক দিয়া অনেক সুবিধা পায়—এবং এই সুবিধাগুলির জন্য সে নগদ টাকা হাতছাড়া করিতে চায় না। টাকা ধার দিলে টাকা হাতছাড়া হয় ও ঐ ধার দেওয়া টাকা নিজের হাতে থাকিলে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যাইত তাহা আর পাওয়া যায় না। সুতরাং যাহার হাতে টাকা আছে তাহাকে ধার দিবার উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধ করিবার জন্য দেনাদারকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। এই অতিরিক্ত টাকাই হইল সুদ।

[চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য]

4. Explain why rates of interest vary.

সুদের হার কেন বিভিন্ন হয় আলোচনা কর।

উঃ—মজুরির হারের ন্যায় সুদের হারেরও পার্থক্য দেখা যায়। ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা ৪।৫ টাকা হারে ধার পাওয়া যায়, অথচ মহাজন শতকরা, ২০।২৫ টাকা সুদ আদায় করে। সুদের হারের এই পার্থক্যের কারণ কি ? ধার দেওয়া টাকা ফেরৎ পাইবার অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি যত বেশী হয়, ঋণদাতা তত বেশী হারে সুদ দাবী করে। দেনাদারের ধার শোধ দিবার ক্ষমতা যদি

কম হয় তাহা হইলেও পাওনাদার বেশী সুদ দাবী করে। এইজন্যই আমাদের দেশে কৃষকদের অধিক হারে সুদ দিতে হয়, অথচ ভারত সরকার ধার করিতে চাহিলেই অল্প সুদে বহু টাকা পায়, কারণ সরকারকে ধার দিলে সে ধারের অর্থ মারা যাইবার ভয় নাই।

5 Discuss the origin and significance of rent.

খাজনার উৎপত্তি ও তাৎপর্য আলোচনা কর।

or,

Why is it necessary to pay rent on lands although land is a gift of nature. H S (Hu.), 1963

ভূমি প্রকৃতির দান হইলেও খাজনা কেন দিতে হয়?

উঃ—জমির দুষ্প্রাপ্যতাই হইল খাজনার কারণ। চাহিদার তুলনায় যদি কোন দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে দ্রব্যের জন্য একটা মূল্য দিতে হয়। জমির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। চাহিদার তুলনায় জমির যোগান সীমাবদ্ধ সেইজন্য জমি ব্যবহার করিতে হইলে জমির মালিককে একটা মূল্য দিতে হয় এবং এই মূল্যই হইল খাজনা। জমির দুষ্প্রাপ্যতা ছাড়াও খাজনা উৎপত্তির আরও দুই-একটি গৌণ কারণ আছে; যথা, জমির উর্বরতা, বাজারের নৈকট্য ইত্যাদি। যে জমিতে বেশী ফসল হয়, যোগানের তুলনায় সে জমির চাহিদা অনেক বেশী, সুতরাং ভাল জমির খাজনা বেশী হয়।

খাদ্যশস্য ও পণ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে নিকৃষ্ট জমির চাষ হয়, এবং যতই নিকৃষ্ট জমির চাষ হয়, উৎকৃষ্ট জমির খাজনা ততই বৃদ্ধি পায়। উৎকৃষ্ট জমির মালিকগণ বিনা পরিশ্রমে এই বর্ধিত আয় ভোগ করেন। এইজন্য খাজনাকে অনুপার্জিত আয় বলা হয়। যেহেতু খাজনা অনুপার্জিত আয়, সেইহেতু সরকার কর্তৃক কর ধার্যের ইহা একটি উপযুক্ত উৎস। খাজনা জমির মালিকের অনায়াসলভ্য আয়। ইহার উপর কর স্থাপন করিলে জমির যোগান বা উৎপাদন ক্ষমতা কোনরূপ ব্যাহত হয় না, অধিকন্তু সমাজে খাজনা ভোগকারী শ্রমবিমুখ যে এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বিলুপ্তি ঘটিবে এবং বর্তমানে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা দূর হইবে।

6 Explain Ricardo's theory of rent

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

উঃ—রিকার্ডোর মতে খাজনা হইল জমি হইতে প্রাপ্ত খরচাতিরিক্ত আয় এবং এই আয়ের মূল কারণ হইল জমির দুষ্প্রাপ্যতা। লোকে আগে ভাল জমি চাষ করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, ফলে ভাল জমির অভাবে লোকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি চাষ করে। নিকৃষ্ট জমি একই খরচায় চাষ করিলে উৎকৃষ্ট জমির ফসল পরিমাণ অপেক্ষা কম পরিমাণ ফসল পাওয়া যায়। একই খরচা করিয়া উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমিতে ফসল পরিমাণের যে পার্থক্য হয় তাহাই হইল উৎকৃষ্ট জমির খরচাতিরিক্ত আয় বা খাজনা। এই অতিরিক্ত আয়ের কারণ হইল একখণ্ড জমি অন্য খণ্ড হইতে বেশী উর্বর কিম্বা বেশী সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। এইরূপে

খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যতই নিম্নস্তরের জমি চাষ হইবে, উচ্চস্তরের জমির খাজনা ততই বৃদ্ধি পাইবে।

7. Examine the connection between rent and price

H S (Hu), Comp. 1961

খাজনা ও মূল্যের সম্পর্ক বিচার কর।

উঃ—ফসল উৎপাদনের খরচ বাদ দিয়া জমি হইতে যে উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যায়, তাহা হইল খাজনা। ফসলের বাজার দাম নিকৃষ্ট (প্রান্তিক) জমির উৎপাদন খরচার দ্বারা স্থির হয়। প্রান্তিক জমি চাষ করিয়া কোন উদ্বৃত্ত থাকে না—শুধু খরচ পোষায়। সুতরাং প্রান্তিক জমির জন্য কোন খাজনা দিতে হয় না। কাজেই জমির খাজনা চাষবাসের খরচের বা ফসলের মূল্যের অংশ বলিয়া ধরা যায় না। খাজনা বেশী বলিয়া ফসলের মূল্য বেশী হইতে পারে না—ফসলের মূল্য বেশী হইলে উদ্বৃত্ত বেশী হয় ও অধিক খাজনা ধার্য হয়। খাজনা মূল্যের ফল, মূল্যের কারণ নহে। (Rent is the result of price and not its cause)

8. Define profit and enumerate the different elements in profit

মুনাফার সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক ইহার বিভিন্ন উপাদানগুলির বর্ণনা কর।

উঃ—ব্যবস্থাপক পরিচালনা কার্যের জন্য যে পুরস্কার পান তাহাকে মুনাফা বলা হয়। মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিয়া সাধারণতঃ খাজনা হিসাব করা হয়। কিন্তু আয় ও ব্যয়ের এই পার্থক্য হইল মোট মুনাফা (Gross profit)। মোট আয় হইতে জমির খাজনা, মূলধনের সুদ ও ব্যবস্থাপকের সাধারণ পরিচালনা কার্যের পারিশ্রমিক বাদ দিলে নীট বা খাঁটি মুনাফা পাওয়া যায়।

নীট মুনাফার অংশ হইল :

১। পরিচালনা কার্যের পারিশ্রমিক, ২। ঝুঁকি বহনের পুরস্কার, ৩। একচেটিয়া লাভ, ৪। নূতন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের পুরস্কার। সুতরাং ব্যবস্থাপকের মুনাফা পরিমাণ তাহার কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে এবং এই কর্মদক্ষতার পার্থক্যের জন্য সকল ব্যবস্থাপকের মুনাফা সমান হয় না।

9 Distinguish between money and real wages ? What are the factors that attract labourers to a particular occupation ? H S. (Hu.), 1963

অর্থ মজুরি ও প্রকৃত মজুরীর পার্থক্য কর। কি কি কারণে শ্রমিকেরা কোন বিশেষ কাজে আকৃষ্ট হয় ?

উঃ—শ্রমিকগণ তাহাদের কাজের প্রতিদানস্বরূপে যে পরিমাণ মজুরি পায়, তাহাকে অর্থ মজুরি বলা হয়। অর্থ মজুরি প্রদত্ত অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা হয়। অর্থ মজুরি ছাড়াও শ্রমিকেরা কাজ করিয়া আনুষঙ্গিক অন্যান্য যে সমস্ত সুখ-সুবিধা পায়, তাহাকে প্রকৃত মজুরি বলা হয়। শ্রমিকগণ শুধুমাত্র প্রদত্ত অর্থ মজুরির পরিমাণ দ্বারা কার্যে আকৃষ্ট হয় না, কার্যে নিযুক্ত হইবার পূর্বে কাজের আনুষঙ্গিক সুবিধা ও অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করে।

প্রকৃত মজুরি যত বেশী হইবে অর্থ মজুরি কম হইলেও শ্রমিকেরা সেই কাজে তত বেশী আকৃষ্ট হইবে। যে সমস্ত কাজ কম কষ্টসাধ্য, যে কাজের পরিবেশ ভাল, যে কাজে অতিরিক্ত আয়ের

সম্ভাবনা আছে, যে কাজে স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা আছে, শ্রমিকগণ সাধারণতঃ সেই সমস্ত কাজে বেশী আকৃষ্ট হয়। দ্রব্যমূল্য কম হইলে অর্থ মজুরির পরিমাণ বেশী না হইলেও শ্রমিকগণের প্রকৃত মজুরি বেশী হয়।

10 State what you understand by the 'marginal product' of a factor. Explain the relation between the marginal product of labour and wages H S. (Hu.), 1963 Comp

কোন উৎপাদনের উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন বলিতে কি বুঝ? শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সহিত মজুরির সম্পর্ক বুঝাইয়া দাও।

উঃ—মালিক উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রমিক নিযুক্ত করে। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা দিয়াই মালিক শ্রমিকের উপযোগ স্থির করে। বাজারে ক্রেতা যেরূপ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা দ্রব্যটির মূল্য স্থির করে, সেইরূপে মালিকও শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের দ্বারা তাহার কাজের মূল্য অর্থাৎ মজুরি স্থির করে। একজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত করিলে সমগ্র উৎপাদনের পরিমাণ যতটা বাড়ে তাহাই হইল শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন শিল্পপতি ৫০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ৪০,০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারেন। শিল্পের মালিক যদি আরও একজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত করেন তাহা হইলে তিনি ৪০,০১০ টাকা মূল্যের দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারেন। সুতরাং একজন অতিরিক্ত অর্থাৎ ৫০১তম শ্রমিক নিযুক্ত করিবার ফলে তাহার সমগ্র উৎপাদনের মূল্য ১০ টাকা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শেষ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হইল ১০ টাকা। শ্রমিকের মজুরী এই প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে। মজুরী যদি ১০ টাকার অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদনের কম হয়, তাহা হইলে মালিক অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করিবে—ইহাতে শ্রমিকের চাহিদা বাড়িবে এবং মজুরীর হারও বাড়িবে। অপরপক্ষে মজুরীর হার যদি প্রান্তিক উৎপাদন (১০ টাকা) অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে মালিক অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত করিবে না। ইহাতে শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পাইবে। ফলে মজুরির হারও কমিবে। এইরূপে মজুরী শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে।

ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান

দ্বিতীয় খণ্ড

অবতারণা

(Introduction)

পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা—Definition of Civics

পৌরবিজ্ঞানের ইংরাজী প্রতিশব্দ হইল সিভিক্স (Civics)। সিভিক্স শব্দটি আবার যথাক্রমে লাতিন 'সিভিটাস' (Civitas) ও 'সিভিস' (Civis) হইতে গৃহীত। 'সিভিটাস' শব্দের অর্থ হইল নগর-রাষ্ট্র আর 'সিভিস' শব্দের অর্থ হইল নাগরিক।

প্রাচীন গ্রীস ও রোম নগরকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। এথেন্স, স্পার্টা, সাইরাকিউস্ প্রভৃতি ছিল এই জাতীয় রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের আয়তন নগরেই সীমাবদ্ধ থাকিত বলিয়া এই জাতীয় রাষ্ট্রকে নগর-রাষ্ট্র (City-State) বলা হইত। গ্রীক ও রোম দেশের সভ্যতা এই নগর-রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। এই নগর-রাষ্ট্রের যে সমস্ত অধিবাসীর প্রচুর অবসর ছিল, এবং যাহারা রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতার অধিকারী ছিল, তাহাদিগকেই **নাগরিক** বলা হইত। রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্যে অংশ গ্রহণ করিবার অযোগ্যতা হেতু ক্রীতদাস, দিন-মজুর ও স্ত্রীলোকগণ নাগরিক বলিয়া গণ্য হইত না।

শব্দগত অর্থের দিক দিয়া দেখিলে বলা যায় যে, পৌরবিজ্ঞান হইল সেই শাস্ত্র, যে শাস্ত্র পুর অর্থাৎ নগর এবং পৌরজন অর্থাৎ নাগরিক লইয়া আলোচনা করে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে রাষ্ট্র ও সমাজ ছিল অভিন্ন, রাষ্ট্রই ছিল সমাজের একমাত্র প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকগণের সর্ববিধ কার্যকলাপই একমাত্র রাষ্ট্রের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং অতীত যুগে পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু নাগরিক অধিকার-ভোগ ও নাগরিক কর্তব্য-পালনেই সীমাবদ্ধ ছিল। নগর-রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকগণের সম্পর্ক এবং এই পারস্পরিক সম্পর্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা পৌরবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইত।

পৌরবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু—Modern Definition of Civics and its Scope

বর্তমান যুগে নগর-রাষ্ট্রের পরিবর্তে দেশজোড়া বৃহৎ রাষ্ট্রের আবির্ভাব হইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি একদিকে যেরূপ আয়তনে ও জনসংখ্যায় বিশাল,

অপরদিকে তদ্রূপ নানাবিধ জটিল সমস্যা-সংকুল। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে আধুনিক অতিকায় রাষ্ট্রের সহিত অতীত যুগের ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষ্ট্রের তুলনাই হয় না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী এখনও পর্যন্ত নাগরিক বলিয়া অভিহিত হয়। নাগরিক বলিয়া অভিহিত হইলেও অতীত যুগের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং বর্তমান যুগের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পৌরবিজ্ঞান সম্পর্কেও এই ধারণার রূপান্তর ঘটিয়াছে। বর্তমান যুগে মানুষ মুখ্যতঃ রাষ্ট্রের নাগরিক হইলেও নাগরিকতা তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। মানুষের সামাজিক জীবনের পূর্ণপ্রকাশ একমাত্র রাষ্ট্রেই নয় ; তাই সামাজিক মানুষের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সমাজ-জীবনে নানাবিধ সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সঙ্ঘগুলি মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক বলিয়া এই সঙ্ঘগুলির সদস্য হিসাবে প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মানুষ যেস্থানে বাস করে তাহার সহিত তাহার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং বাসস্থানের সমস্যাগুলির সহিত তাহার জীবনের সুখ-শান্তি নিবিড়ভাবে জড়িত থাকে। এই জন্যই গ্রামপঞ্চায়েৎ, য়ুনিয়ন বোর্ড, পৌরসভা প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবেও মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে এবং এই অধিকার-ভোগ ও কর্তব্য-পালন তাহার নাগরিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্তমান ব্যাপকতর নাগরিক জীবনের এই অংশকে **স্থানীয় নাগরিকতা** (**Local or Municipal Citizenship**) বলা হয়।

মানুষ যে গ্রাম বা শহরে বাস করে তাহা তাহার প্রধান কর্মকেন্দ্র হইলেও মানুষের আনুগত্য একমাত্র সেই গ্রাম বা শহরে সীমাবদ্ধ থাকে না। কোন গ্রাম বা শহর দেশের একটি অঞ্চলমাত্র এবং এই অঞ্চলের সুখ-শান্তি অনেক পরিমাণে সমগ্র দেশের শাসনব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং মানুষের প্রথম ও প্রধান আনুগত্য হইল দেশের প্রতি—রাষ্ট্রের প্রতি। মানুষের সমস্ত অধিকারের উৎস হইল রাষ্ট্র এবং একমাত্র রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবেই তাহার অধিকারগুলি সমাজে স্বীকৃতি-লাভ করে। কোন একটি রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে মানুষ যে অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রসম্পর্কিত কর্তব্য পালন করে, তাহাকে **জাতীয় নাগরিকতা** (**National Citizenship**) বলা হয়।

বর্তমানে জাতীয় নাগরিকতাই মানব-জীবনের শেষ অধ্যায় বলিয়া পরিগণিত হয় না। মানুষ যে গ্রামে বা নগরে বাস করে, সে সেখানকার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য। দ্বিতীয়তঃ, সে যে রাষ্ট্রে বাস করে সে রাষ্ট্রেরও সে সদস্য, কিন্তু বর্তমানে মানুষের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যবোধ তাহার গ্রাম, শহর এমন কি দেশের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। মানুষ আজ তাহার সংকীর্ণ ব্যক্তিগত ও দেশগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া বিশ্ববাসীকে 'ভ্রাতৃ'-সম্বোধন করিতেছে। মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে যে-দেশে বসবাস করে সে-দেশের রাষ্ট্রের সভ্য হইলেও সে সমগ্র মানব-গোষ্ঠীরও একজন সভ্য এবং তাই সমগ্র মানব-গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা তাহার পবিত্র কর্তব্য বলিয়া সে মনে করে। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে হইলেও কৃষ্টিগত ও ধর্মীয় কারণেও মানুষ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র পৃথিবীকে নিজের কর্মক্ষেত্র করিয়া লইতেছে। মানুষের জীবন আজ বহু সমস্যা-সংকুল, তাই তাহার চিন্তা ও কর্মের পরিধিও সুদূর বিস্তৃত। এই জন্যই আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক নানা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ এক বৃহত্তর মানব-সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) আজ মহামানবের মহামিলনক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাই পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আর স্থানীয় নাগরিকতা বা জাতীয় নাগরিকতায় সীমাবদ্ধ নহে। মানব-গোষ্ঠীর একজন হিসাবে—আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সদস্য হিসাবে ব্যক্তির সম্পর্ক, দায়িত্ব, অধিকার ও কর্তব্য আজ পৌর-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তি-মানুষের এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে যে অধিকার ও দায়িত্ব আছে, তাহাকে **আন্তর্জাতিক নাগরিকতা** **(International Citizenship)** বলা হয়।

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত মানুষে মানুষে সম্পর্ক রহিয়াছে। এই পারস্পরিক সম্পর্ক যতই বন্ধুত্বপূর্ণ ও দৃঢ়তর হইবে, মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে ততই ঐক্য, সাম্য ও মৈত্রীভাব স্থাপিত হইয়া সমগ্র মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হইবে। সুতরাং কি উপায়ে আদর্শ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া মানুষের মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপন করা যায়, তাহাই হইল পৌরবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

পৌরবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ—Relation of Civics with other Social Science

পৌরবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষেরই আচার ও রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচনা করে। সুতরাং ইহা একটি সমাজ-বিজ্ঞান। সমাজ-বিজ্ঞান হিসাবে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিতও পৌরবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। এখন দেখা যাউক, অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ।

পৌরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান—Civics and Politics

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রসম্পর্কিত সকল তথ্যেরই আলোচনা হয়। আর পৌরবিজ্ঞানে আলোচনা হয় নাগরিকগণের সহিত সরকারের সম্পর্কের বিষয়। সুতরাং পৌর-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু রাষ্ট্রসম্পর্কে নাগরিক অধিকাব ও নাগরিক কর্তব্যে সীমাবদ্ধ। নাগরিক জীবনের সমস্যা ব্যতীত পৌববিজ্ঞানে রাষ্ট্রসম্পর্কিত অন্য কোন সমস্যার আলোচনা হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র আরও ব্যাপক ও বহুদূর বিস্তৃত। রাষ্ট্রকে নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা ব্যতীত আরও বহু জটিল সমস্যার সমাধান করিতে হয়। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা হইল আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া পবরাষ্ট্রের সহিত সহ-অবস্থান (Co-existence) নীতিব ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা। নতুবা কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া দেশের উন্নতির জন্য গঠনমূলক কার্য পরিচালনা করা সম্ভব নহে। নাগরিক জীবনের অভাব-অভিযোগ দূর করিয়া তাহাদের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে হইলে বাষ্ট্রেব আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা ও বৈদেশিক নীতি সুপরিচালিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং রাষ্ট্রসম্পর্কে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসননীতি ও বৈদেশিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। কাজেই পৌববিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। নাগরিক জীবনের বহুমুখী সমস্যা লইয়া আলোচনা করা হইল উভয় বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য।

পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান—Civics and Economics

দারিদ্র্য হইল মানুষের সামাজিক জীবনের প্রধান অভিশাপ। দারিদ্র্য দূর করিয়া মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে না পারিলে নাগরিক জীবনের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। দারিদ্র্যই হইল সু-নাগরিকতার প্রধান অন্তরায়।

ধনবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধান করিয়া মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর হইলে সু-নাগরিকতার প্রধান বাধা অপসারিত হয়। সুতরাং ধনবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত পৌরবিজ্ঞান আলোচনার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। ধনবিজ্ঞান হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া পৌরবিজ্ঞান আলোচনার উদ্দেশ্য অর্থাৎ নাগরিক জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি দ্বারা আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করা সম্ভব। অপরপক্ষে পৌরনীতির দ্বারা সমর্থিত না হইলে ধনবিজ্ঞানের কোন সুপরিকল্পনা কার্যকরী করা যায় না। সুতরাং পৌরনীতি ও ধনবিজ্ঞান পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

পৌরবিজ্ঞান ও ইতিহাস—Civics and History

পৌরবিজ্ঞান নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করে, আর ইতিহাস অতীতের আলোচনা করে। বর্তমান যুগের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইলে ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত সে ধারণা নির্ভুল হইতে পারে না; কারণ বর্তমান নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং আধুনিক চিন্তাধারা ও পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলি অতীতযুগের ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছে। পৌর-প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমপরিণতির মূলকথা ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতির ধারা বুঝিতে হইলে ইতিহাসের সাহায্য অপরিহার্য। অতীতের পরিণতি হইল বর্তমান এবং বর্তমানের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ গঠিত হয়। ইতিহাসে নাগরিক জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ আছে। তাই ইতিহাস পাঠ করিয়া অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমান সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইবে এবং বর্তমান সম্পর্কে ঠিক পথে পরিচালিত হইলে ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ সুগম হয়। সুতরাং ইতিহাসের সহিত সম্পর্কহীন পৌরবিজ্ঞান কোনরূপ সুফল দিতে পারে না।

পৌরবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র—Civics and Ethics

পৌরবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নীতিশাস্ত্র মানুষের সমগ্র জীবনের—তাহার চিন্তাধারা, কাজের উদ্দেশ্য ও বাহ্যিক আচরণ সব লইয়া আলোচনা করে এবং কোন্‌টি ভাল ও কোন্‌টি মন্দ, তাহার নির্দেশ দেয়। পৌর-বিজ্ঞানে নাগরিক জীবনের শুধমাত্র বাহ্যিক আচরণগুলির আলোচনা করা হয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু অপেক্ষা

সংকীর্ণতর, কিন্তু উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যায় যে, উভয়শাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইল আদর্শ মানুষ সৃষ্টি করা, আর পৌরবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইল আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করা। কিন্তু মানুষ হিসাবে আদর্শস্থানীয় না হইলে আদর্শ নাগরিক হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং আদর্শ নাগরিক হইতে হইলে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারেই নাগরিক জীবনের অধিকার রক্ষা ও কর্তব্য পালন করা প্রয়োজন। যে কাজ নীতিশাস্ত্র সমর্থন করে না, সেরূপ কাজ করিয়া কেহ আদর্শ নাগরিক হইতে পারে না। নাগরিক হিসাবে মানুষের আচরণের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, একমাত্র নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে তাহা জানা যায়। সুতরাং নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মানুষের কার্যকলাপ পরিচালিত না হইলে নাগরিক জীবনের মঙ্গলময় পরিণতি হইতে পারে না।

পৌরবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা—Utility of the study of Civics

ইংরেজীতে একটি উক্তি আছে যাহার সারমর্ম হইল যে, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য দেশে শিক্ষিত ও সচেতন জনমত একান্ত অপরিহার্য। ("An alert and intelligent public opinion is the first essential of democracy.") উক্তিটি সম্পূর্ণরূপে সত্য। নাগরিকগণ যদি শিক্ষিত ও সচেতন না হয় তাহা হইলে তাহারা যথাযথভাবে তাহাদের নাগরিক অধিকার-ভোগ ও কর্তব্যপালন করিতে পারে না। শাসকগোষ্ঠী ক্রমশঃ তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে ও কালক্রমে তাহারা ক্রীতদাসে পরিণত হইবে। কর্তব্যপালনে অবহেলার ফলে শাসনব্যবস্থাও দুর্বল হইয়া তাহাদের অধিকার রক্ষা করিতে অসমর্থ হইবে। এই জন্যই নাগরিকগণের তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা প্রয়োজন। আর পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা হইতেই নাগরিকগণ তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করিতে পারে। রাষ্ট্র আইন-প্রণয়ন করিয়া কিভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা দ্বারা নাগরিকগণকে তাহাদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুবিধা দান করে, পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া, পৌরবিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা মানুষ আত্ম-সচেতন হইয়া তাহার নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে। পৌরবিজ্ঞান পাঠ করিয়া মানুষ নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া

ছাড়া তাহার মধ্যে সমাজ-চেতনা জন্মে না। ইহার ফলে সে অপরের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হয়। পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া মানুষ যদি তাহার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, তাহা হইলে সমাজ-জীবনের বহু সমস্যারই সহজে সমাধান হয়। মানুষের মনে সমাজ-চেতনা জাগরিত হইলে, মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক সামাজিক নানা সমস্যার সমাধান করিয়া কিভাবে উন্নততর জীবন যাপন করিতে পারে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মত গঠন করিতে শিক্ষা-লাভ করে।

স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এই শাস্ত্রের আলোচনা ভারতের নাগরিকগণের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে নাগরিকগণের দায়িত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে তাহাদের পক্ষে সংবিধান-প্রদত্ত অধিকার ও কর্তব্যগুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইলে পৌরবিজ্ঞানের মূলনীতিগুলির সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নতুবা স্বাধীনতালাভ বিফল হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ নগর-রাষ্ট্রে বাস করিত। নগর-রাষ্ট্রের যে সমস্ত অধিবাসীর রাষ্ট্রের কাজে যোগদান করিবার অবসর ও যোগ্যতা ছিল, তাহাদিগকে নাগরিক বলা হইত এবং এই নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হইল পৌরবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু।

আধুনিক সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

নগর-রাষ্ট্রের পরিবর্তে বর্তমানে দেশজোড়া বৃহৎ রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। এই বৃহৎ রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসীমাত্রই নাগরিক বলিয়া পরিচিত। বর্তমান যুগের নাগরিকগণ এখন আর শুধুমাত্র রাষ্ট্রের সদস্য নহে। নাগরিকগণের ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের জন্য সমাজে বহু সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক নাগরিক এইরূপ একাধিক সঙ্ঘের সদস্য। মানুষ যে গ্রামে বা শহরে বাস করে, সেই গ্রাম বা শহরের সহিত তাহার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্ক পঞ্চায়েৎ সভা,

পৌরসভা প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্কে মানুষ যে অধিকার ভোগ করে ও কর্তব্যপালন করে, তাহাকে স্থানীয় নাগরিকতা বলা হয়।

কোন গ্রাম বা শহরের স্বার্থ সমগ্র দেশের স্বার্থের সহিত জড়িত। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবেই মানুষ স্থানীয় অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারে, সুতরাং রাষ্ট্র-সম্পর্কিত প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে। মানুষের জীবনের এই রাষ্ট্র-সম্পর্কিত অধিকাব-ভোগ ও কর্তব্যপালন জাতীয় নাগরিকতা বলিয়া কথিত হয়।

বর্তমানে জাতীয় নাগরিকতা মানবজীবনেব চরম উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। মানুষ ক্রমশঃই দেশ ও রাষ্ট্রের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া নিজেকে সমগ্র মানবজাতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া ভাবিতে শিখিতেছে। তাই সে মনে করে যে, বিশ্বমানবের প্রতি তাহার একটা কর্তব্য আছে এবং এই বিশ্বমানবের একজন হিসাবে সেও মানব-অধিকার দাবী করিতে পারে। সুতরাং মানুষেব অধিকার ও কর্তব্যবোধ আজ তাহার ক্ষুদ্র গ্রাম বা শহর ও রাষ্ট্রেব সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিশ্বমানব-সম্পর্কে মানুষের এই অধিকার ও কর্তব্যবোধ হইল আন্তর্জাতিক নাগরিকতা।

পৌরবিজ্ঞান ও অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞান

পৌরবিজ্ঞান একটি সমাজ-বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানে রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের অধিকার ও কর্তব্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সমাজ-বিজ্ঞান হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সহিত এই শাস্ত্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। ইতিহাস হইতেই মানুষেব অধিকার ও কর্তব্যের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষেব অধিকাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অর্থনৈতিক জীবনেব মান উন্নত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আবার, অর্থনৈতিক দুর্গতি হইল সু-নাগরিকতাব প্রধান অন্তরায়। আদর্শ নাগরিক হইতে হইলে নীতিশাস্ত্রেব নির্দেশ অনুসারেই নাগরিক অধিকাররক্ষা ও কর্তব্য-পালন করা প্রয়োজন

পৌরবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা

সু-নাগরিক হইতে গেলে অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা একান্ত

আবশ্যক। পৌরবিজ্ঞান পাঠ করিয়া এই জ্ঞান লাভ করা যায়। পৌরবিজ্ঞান-আলোচনার ফলে মানুষের সমাজচেতনা বৃদ্ধি পায় এবং সে সহযোগিতার ভিত্তিতে সামাজিক নানা সমস্যার সমাধান করিবার শিক্ষা পায়। স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণের পক্ষে তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিবার জন্য পৌরবিজ্ঞান আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. **Describe the scope and value of studying Civics.**

[H. S. (Com.) 1961 (Comp.)]

পৌরবিজ্ঞান আলোচনার পরিধি এবং ইহার চর্চার সার্থকতা বর্ণনা কর।

উঃ—শব্দগত অর্থের দিক দিয়া দেখিলে বলা যায় যে, পৌরবিজ্ঞান হইল সেই শাস্ত্র, যে শাস্ত্র পুর অর্থাৎ নগর এবং পৌরজন অর্থাৎ নাগরিক লইয়া আলোচনা করে। বর্তমানে নগর-রাষ্ট্রের পরিবর্তে দেশজোড়া বৃহদায়তন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হওয়ার ফলে পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তুর পরিধি ব্যাপকতর হইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী মাত্রই নাগরিক বলিয়া অভিহিত হয়। আর এই নাগরিক জীবনও নানা দিক দিয়া বহু সমস্যা-সঙ্কুল হইয়াছে। তাই বর্তমান যুগের নাগরিক অধিকার ও নাগরিক কর্তব্য সম্পর্কে মানুষের ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে মানুষ মুখ্যতঃ রাষ্ট্রের নাগরিক হইলেও নাগরিকতা তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। মানুষের সামাজিক জীবনের পূর্ণ প্রকাশ একমাত্র রাষ্ট্রই নহে। তাই সামাজিক মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানাবিধ সংঘ বা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য হিসাবে প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মানুষ যে গ্রামে বা শহরে বাস করে, সেই গ্রাম বা শহরের সমস্যাগুলির সহিত তাহার জীবনের সুখ-শান্তি একান্তভাবে জড়িত থাকে। এই স্থানীয় সমস্যাগুলি সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড, পৌরসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে এবং এই অধিকার ভোগ ও কর্তব্যপালন তাহার নাগরিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্তমান ব্যাপকতর নাগরিক জীবনের এই অংশকে স্থানীয় নাগরিকতা (Local or Municipal citizenship) বলা হয়।

মানুষ যে গ্রাম বা শহরে বাস করে তাহা তাহার প্রধান কর্মকেন্দ্র হইলেও মানুষের কর্মক্ষেত্র ও আনুগত্য একমাত্র সেই গ্রাম বা শহরে সীমাবদ্ধ থাকে না। গ্রাম বা শহর হইল দেশের একটি অংশমাত্র এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি দেশের শাসনব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের প্রথম ও প্রধান আনুগত্য হইল দেশের প্রতি—জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি। কারণ

মানুষের সব অধিকারের উৎস হইল রাষ্ট্র। সুতরাং স্থানীয় নাগরিকতা ছাড়াও রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে এবং এই অধিকার ভোগ ও কর্তব্য-পালনকে জাতীয় নাগরিকতা (National citizenship) বলা হয়। পৌরবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে এই জাতীয় নাগরিকতার উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মানুষ যে দেশে বাস করে, সে দেশের রাষ্ট্রের সদস্য হইলেও সে সমগ্র মানবগোষ্ঠীরও একজন। বর্তমানে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক নানা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ এক বৃহত্তর মানব-সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। মানুষের চিন্তাধারা ও কর্মের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার ফলে আজ সমগ্র পৃথিবীকে সে তাহার কর্মক্ষেত্র করিয়া লইতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) আজ মহা-মানবের মহা-মিলনক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাহা পৌরবিজ্ঞানের পরিধি আর স্থানীয় নাগরিকতা বা জাতীয় নাগরিকতায় সীমাবদ্ধ নহে। মানবগোষ্ঠীর একজন হিসাবে—আন্তর্জাতিক সংঘের সদস্য হিসাবে ব্যক্তির সম্পর্ক, দায়িত্ব, অধিকার ও কর্তব্য আজ পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পৌরবিজ্ঞান আলোচনার পরিধি স্থানীয় ও জাতীয় নাগরিকতার ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আন্তর্জাতিক নাগরিকতার অধিকার ও কর্তব্য পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে।

সু-নাগরিক ব্যতীত কল্যাণ-রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। আর সু-নাগরিকতার প্রধান ভিত্তি হইল অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। পৌরবিজ্ঞান পাঠ করিয়াই এই জ্ঞান লাভ করা যায়। পৌরবিজ্ঞান আলোচনার ফলে মানুষের সমাজচেতনা বৃদ্ধি পায় এবং সে সহযোগিতার ভিত্তিতে সামাজিক নানা সমস্যার সমাধান করিবার শিক্ষা পায়। স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণের পক্ষে তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিবার জন্য পৌরবিজ্ঞান আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা স্বাধীনতালাভ বিফল হইবে।

নবম শ্রেণীর জন্য

প্রথম অধ্যায়

মানব সমাজের বিবর্তন

(The Evolution of Human Society)

সমাজ কাহাকে বলে—What is a Society

সাধারণতঃ বলা হয় যে, মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীব অর্থে কি বুঝা যায় তাহার আলোচনা প্রয়োজন। বহু জনসমষ্টি সভ্যজীবন যাপনের উদ্দেশ্য একসঙ্গে বাস করে। তাহারা সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে মনুষ্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জনসমষ্টি যখন তাহাদের সভ্যজীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নানাসূত্রে একতাবদ্ধ হয়, তখনই সমাজ-জীবনের সূত্রপাত হয়। এই সমাজ মানব-জীবনকে আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন লিখিত আইন-কানুনের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে নানাবিধ প্রথা, আচার ও রীতিনীতি আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। মানুষের জীবন বহুমুখী। বহুমুখী জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মানুষ সমাজদেহের মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে। তাই সমাজের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই ধর্মসংগঠন, শিক্ষাকেন্দ্র, শ্রমিক-সঙ্ঘ প্রভৃতি। এইরূপ বিভিন্ন সংগঠনের সমাবেশে সমাজদেহ গঠিত। রাষ্ট্রও সমাজদেহের মধ্যে এইরূপ একটি সঙ্ঘ।

সুতরাং জনসমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং এই জনসমষ্টি সাধারণ স্বার্থে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নিঃসঙ্গভাবে বাস করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। তাহার সহজাত প্রকৃতির তাড়নায় সে অপর মানুষের সঙ্গ কামনা করে। একদিকে এই সহজাত প্রবৃত্তির ও অন্যদিকে সমাজবদ্ধ জীবনের সুখ-সুবিধাগুলি, এই উভয়ে মিলিয়া মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমাজ সৃষ্টি করিয়া বাস করিতে শিক্ষা দিয়াছে।

সমাজের ক্রমবিবর্তন—Evolution of society

সমাজ একদিনে বা একজন লোকের প্রচেষ্টায় গঠিত হয় নাই। আমরা বর্তমানে যে সমাজে বাস করি, তাহা গঠিত হইতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। বর্তমান সমাজ মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফল। যত দূর কল্পনা করা যায় তাহাতে অনুমান করা হয় যে, **পরিবার (Family)** হইতেই মানবসমাজের শুরু হয়। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে কোন সমাজই স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং শিশুপালনের জন্যই মাতাপিতার বিশেষ করিয়া মাতার স্নেহ ও যত্ন প্রয়োজন। এই স্নেহ ও যত্ন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ ছাড়া অন্যান্য ইতর প্রাণীর মধ্যেও সন্তান পালনের এই সহজাত প্রবৃত্তি দেখা যায় : সুতরাং মাতৃস্নেহের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়াই মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের সূত্রপাত হয়। সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও মাতার সঙ্গে বাস করিতে থাকে এবং এইরূপে একমাতা ও পিতার সন্তানগণ এক একটি পরিবার সৃষ্টি করে। এইরূপে পরিবারের প্রত্যেকটি লোক রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। পারিবারিক-জীবনের নানাবিধ সমস্যা-সমাধানের ভার থাকে পরিবারের প্রাচীনতম নারী বা পুরুষের উপরে।

পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া যখন মানুষের সমাজ গঠিত হইতে থাকে, তখন পরিবার-পরিচালনা করিবার ভার পরিবারের প্রাচীনতম পুরুষ বা প্রাচীনতমা নারীর হাতে ছিল—এবিষয়ে মনীষিগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, প্রাচীনকালে মাতাই ছিলেন পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী, আবার কেহ কেহ বলেন পিতাই ছিলেন পরিবারের সর্বময় কর্তা। প্রাচীনকালে যখন মানব-সমাজে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয় নাই, তখন সন্তান পালনের দায়িত্ব যে মাতার উপর ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং মাতাকে কেন্দ্র করিয়া যে পরিবার গঠিত হইত, তাহাকে **মাতৃতান্ত্রিক পরিবার (Matriarchal family)** বলা হয়। এই পরিবার-প্রথায় প্রাচীনতমা নারী মাতৃ-শ্রেষ্ঠা (Matriarch) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রাচীনকালে জার্মাণ জাতির মধ্যে ও ভারতে মালাবারের নাইর জাতির মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের নিদর্শন পাওয়া যায়। যে সমস্ত সমাজে পরিবারের সর্বময় কর্তা প্রাচীনতম পুরুষ ছিলেন, সেই পরিবারগুলি **পিতৃতান্ত্রিক পরিবার (Patriarchal family)** বলিয়া অভিহিত হয়। পিতৃ-শ্রেষ্ঠই (Patriarch) ছিলেন এই সমস্ত পরিবারের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং পরিবারে রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত থাকিত।

পরিবার পিতৃ-প্রধান হউক ,আর মাতৃ-প্রধান হউক, পরিবার হইতেই যে মানবসমাজের সূত্রপাত হয়, এ সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত। কালক্রমে যখন বিবাহ-প্রথার প্রবর্তন হইল, তখন এই বিবাহ-বন্ধনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ কতকগুলি পরিবার মিলিত হইয়া কালক্রমে একটি গোষ্ঠী (Clan) সৃষ্টি করিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন গোষ্ঠীপতি থাকিত এবং আপদে-বিপদে এই গোষ্ঠীপতির নির্দেশেই এই সঙ্ঘবদ্ধ পরিবারগুলি পরিচালিত হইত। কতকগুলি প্রতিবেশী গোষ্ঠী তাহাদের সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে যখন একজন বিশিষ্ট দলপতির অধীনে মিলিত হইত, তখন এই সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীগুলি কুল (Tribe) নামে অভিহিত হইত। বিভিন্ন কুলগুলি আবার নানাকারণে মিলিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করিবার ফলে তাহাদের মধ্যে একই ধরণের আচার-ব্যবহার, ভাব-ভাষা, ধর্ম-বিশ্বাস প্রভৃতি জন্মিতে লাগিল। কালক্রমে বিভিন্ন কুলগুলির মধ্যে পার্থক্য দূরীভূত হইয়া একাত্মবোধ সৃষ্টি করিল এবং এই একাত্মবোধ হইতেই বর্তমান-যুগের জাতীয়তাবোধের জন্ম হইল। সুতরাং গঠনের প্রথম স্তরে হয়ত পরিবারের মতন সহজ ও সংকীর্ণ সংগঠনের মধ্য দিয়া মানবসমাজের শুরু হয়, তারপর মানুষের সমাজচেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে বিভিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া মানব সমাজ আজ বৃহত্তর ও জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। যে প্রীতি-বন্ধন এক সময়ে শুধু পরিবারের সভ্যগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেই প্রীতি-বন্ধন আজ পরিব্যাপ্ত হইয়া সমগ্র মানব-গোষ্ঠীকে এক সমাজভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, কুল, জাতি আজ মহামানবের এক মহামিলনক্ষেত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

সমাজের উদ্দেশ্য— Aims of Society

মানুষ একাকী বাঁচিতে পারে না। এইজন্য পরস্পরের সাহায্য প্রয়োজন। সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যে মানুষকে শুধু তাহার জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্তা দেয় তাহা নহে, মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। সহযোগিতার সাহায্যেই মানুষের সমস্ত অভাব দূর হয় এবং এই সহযোগিতাই হইল মানবসমাজের মূলভিত্তি।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে, বাঁচিয়া থাকাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, ভালভাবে বাঁচিয়া থাকাই হইল জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য

(Life is not merely living but it is living well)। উন্নততর জীবন-যাপনের জন্যই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। সমাজে বিভিন্ন মানুষের চিন্তাধারা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় এবং মানুষের এই চিত্তবিকাশের ফলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, চারু ও কারুশিল্প এবং গীতবাদ্য প্রভৃতি জন্মলাভ করে। এইগুলি হইল সভ্য জীবনযাপনের অপরিহার্য উপাদান। মানুষ সমাজে বাস করে, কারণ সমাজে বাস করিয়াই সমাজের সাহায্যে সে তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে পারে।

বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিয়াছে। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে হইলেও কৃষ্টিগত ও ধর্মীয় কারণেও বর্তমানে মানুষ আর নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র পৃথিবীকে নিজের কর্মক্ষেত্র করিয়া লইতেছে। মানুষের চিন্তা ও কর্মের পরিধিও সুদূর-বিস্তৃত। এইজন্যই আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক নানা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ এক বৃহত্তর মানব-সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইতেছে।

ভারতের যৌথ পরিবার—The Indian Joint Family

যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রী ও নাবালক পুত্র-কন্যা লইয়া পরিবার গঠিত হয়, কিন্তু ভারতে পিতামহ-পিতামহী, মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয় লইয়া পরিবার গঠিত হয়। ভারতে এমন বহু যৌথ পরিবার দেখা যায়, যেখানে একসঙ্গে শতাধিক লোক একই অন্নে প্রতিপালিত হয়। সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের কর্তৃত্বেই এই পরিবার পরিচালিত হয়। ইনিই হইলেন পরিবারের শ্রেষ্ঠ-পুরুষ বা কর্তা এবং ইঁহার নির্দেশ অনুসারেই পারিবারিক সমস্ত ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। পরিবারের অন্দর মহলের কর্তৃত্বের জন্য সাধারণতঃ একজন কর্তা-মা বা গিন্নী-মা থাকেন। পরিবারের খাওয়া-পরা, পূজা-পার্বণ, সম্পত্তি-ভোগ প্রভৃতি যৌথভাবে পরিচালিত হয়। পরিবারের যে যাহা সামর্থ্যানুসারে আয় করে, তাহা কর্তার নিকট পারিবারিক একটি সাধারণ তহবিলে জমা হয় ও পরিবারের সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কর্তা ঐ তহবিল হইতে ব্যয় করেন। পরিবারের সকলে সমান আয় না করিলেও ভোগের ক্ষেত্রে সকলেই সমান সুবিধার অধিকারী। আধুনিক সাম্যবাদের মূলনীতি

হইল প্রত্যেকে তাহার সাধ্যমত কাজ করিবে এবং প্রয়োজন-মত পাইবে। (Each will work according to his ability but will get back according to his need.)। সুতরাং দেখা যায় যে, সাম্যবাদী আদর্শ প্রচারিত হইবার বহুপূর্বে আমাদের এই ভারতে যৌথ পরিবার-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া আদর্শটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

যৌথ পরিবারের সুবিধা

১। যৌথ পরিবার-ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় সকলেই নিঃস্বার্থভাবে সাধারণ হিতের জন্য কাজ করিতে শিখে এবং কেহই একেবারে নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হয় না। যৌথ পরিবারের সাহায্যে সকলের বাঁচিয়া থাকিবার মতন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সম্ভব হয়।

২। নিঃসহায় বিধবা, পিতৃ-মাতৃহীন নাবালক শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও অক্ষম সকলেই যৌথ পরিবারে আশ্রয় পায়। এইরূপে যৌথ পরিবার নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করিয়া একদিকে যেরূপ দেশের জনবলের অপচয় নিরোধ করে, অন্যদিকে সেইরূপ রাষ্ট্রকে বৃদ্ধ, অক্ষম ও দরিদ্রগণকে সাহায্য দান করিবার দায় হইতে মুক্ত করে।

৩। যৌথ পরিবার-ব্যবস্থার দ্বারা শ্রম-বিভাগ নীতির সকল সুবিধাগুলি পাওয়া যায়। একটি বৃহৎ পরিবার-পরিচালনার ক্ষেত্রে নানারূপ জটিল ও সহজ কাজ দেখা যায়। পরিবারের এই বিভিন্ন কাজ পরিবারের বিভিন্ন লোকের মধ্যে বয়স, গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে ভাগ হইয়া শৃঙ্খলার সহিত নিষ্পন্ন হইতে পারে।

৪। ব্যয়সংকোচের দিক দিয়াও যৌথ পরিবার প্রথার বহু সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। একসঙ্গে বহুলোক বাস করিলে খাওয়া-পরা, তৈজস ও আসবাবপত্র প্রভৃতি সবদিক দিয়া ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়। যৌথ পরিবার-ব্যবস্থা জমির অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছিত খণ্ডীকরণ ও বিচ্ছিন্নতা রোধ করিতে পারে।

৫। ইহা ছাড়া, যৌথ পরিবারভুক্ত হওয়ার ফলে মানুষের আত্মসংযম, ত্যাগ-স্বীকার, বশ্যতা, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা

১। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা-পরিবর্তনের ফলে যৌথ পরিবার-প্রথার কতকগুলি ত্রুটি দেখা যায়। যৌথ পরিবারে সকলে সমান কাজ না করিয়াও সমান সুবিধা

ভোগ করিতে পারে। কাজ করিয়া কাজের ফল সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে না পারিলে লোকের কাজের ইচ্ছা হ্রাস পায়। কাজ না করিলেও খাওয়া-পরা চলে —এজন্যও যৌথ পরিবার-প্রথা আলস্য ও কর্মবিমুখতার প্রশ্রয় দেয়।

২। যৌথ পরিবার-প্রথার গৃহকর্তার ক্ষমতা সব বিষয়ে এত বেশী হয় যে, পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অনুপ্রেরণা নষ্ট হয়। পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির কর্তার হুকুম পালন করা ছাড়া করণীয় আর কিছু থাকে না। কর্তার উপর সমগ্র পরিবার-পরিচালনা করিবার গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত থাকার ফলে কর্তাও সাংসারিক উন্নতির জন্য কোনপ্রকার ঝুঁকি লইতে দ্বিধাবোধ করেন।

৩। পরিবারের সকলের অসমান আয় সমানভাবে সকলের জন্য ব্যয় হয় বলিয়া কোন ব্যক্তিগত সঞ্চয় সম্ভব হয় না। যে কম আয় করে তাহার পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব নহে, আর যে বেশী আয় করে তাহার উদ্বৃত্ত থাকিলেও এই আয় পারিবারিক আয়ভুক্ত হইয়া সকলের জন্য ব্যয় করা হয় বলিয়া কোনই উদ্বৃত্ত থাকে না। সুতরাং যৌথ পরিবার-প্রথায় সঞ্চয় সম্ভব হয় না। সঞ্চয়ের অভাবে মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া দেশে বড় বড় শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে পারে না।

৪। এই ব্যবস্থায় স্বজন-প্রীতি ও আত্মীয় বাৎসল্য বৃদ্ধি পাইলেও লোকে অতিমাত্রায় অলস ও গৃহকাতর প্রকৃতির হয়। ফলে, তাহারা পরিবার-পরিবেশ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে চায় না। এইজন্যই ভারতে শ্রমিকগণের মধ্যে গতিশীলতার বিশেষ অভাব দেখা যায়।

বর্তমানে নানাকারণে ভারতের এই সুপ্রাচীন পরিবার-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। মানুষের জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা যতই বাড়িতেছে, যৌথ পরিবার-প্রথার ত্রুটিগুলি লোকে ততই বুঝিতে পারিতেছে। শুধু পারিবারিক বৃত্তির সাহায্যে লোকের আর এখন সম্পূর্ণ জীবিকানির্বাহ সম্ভব নয়, তাই এই বৃত্তিগুলি পরিত্যাগ করিয়া লোকের অন্য নানা উপায়ে জীবিকা সংস্থান করিতে হয়। সুতরাং পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হওয়ার ফলে লোকের বাধ্য হইয়াই আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মনির্ভরশীল হইতে হইয়াছে। যৌথ পরিবারের পক্ষে এখন আর নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নহে। ইহা ছাড়াও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রসারের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মনোভাব সৃষ্টি হইয়া স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিবার ইচ্ছা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। যোগাযোগ-ব্যবস্থার

উন্নতির ফলে স্থানান্তর-গমনের সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকে জীবিকা অর্জনের জন্য আজ গৃহ ছাড়িয়া বহুদূর দেশে যাইতে বাধ্য হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা এবং স্বাধীন ও স্বাবলম্বী মনোভাব এই উভয়ে মিলিয়া আজ গৃহকাতর ও পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ ভারতবাসীকে ঘরছাড়া করিতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

সমাজ কাহাকে বলে

বহু জনসমষ্টি সভ্য জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে বাস করে। তাহারা নানাবিষয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জনসমষ্টি যখন তাহাদের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তখনই সমাজ-জীবনের সূত্রপাত হয়। সমাজ ছাড়া মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব নহে।

সমাজের ক্রমবিকাশ

সমাজ একদিনে বা একটি উপাদানে গঠিত হয় না। নানা উপাদানের সাহায্যে দীর্ঘদিন ধরিয়া সমাজ ধীরে ধীরে গঠিত হইয়াছে। পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি প্রভৃতি হইল সমাজ-গঠনের বিভিন্ন উপাদান।

ভারতের যৌথ পরিবার

ভারতে সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, একই সঙ্গে, আত্মীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ বহুলোক একই অন্নে প্রতিপালিত হয়। পরিবারের একজন কর্তা থাকেন এবং তাঁহার নির্দেশেই পারিবারিক সমস্ত কার্য পরিচালিত হয়। খাওয়া-পরা, আয়-ব্যয়, পূজা-পার্বন প্রভৃতি যৌথভাবে সম্পাদিত হয়।

সুবিধা—যৌথ পরিবার-প্রথার সুবিধা হইল যে, ১। পরিবারের সকলেরই জীবিকার সংস্থান হয়। ২। শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, বিধবা সকলেই আশ্রয় পায়। ৩। প্রত্যেকে তাহার সামর্থ্যমত কাজ করে কিন্তু সমান সুবিধা পায়। ৪। একসঙ্গে বহুলোক বাস করে বলিয়া নানাবিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ সম্ভব হয়।

অসুবিধা—যৌথ পরিবারের অসুবিধা হইল যে, ১। এই ব্যবস্থায় পরিবারের যে বেশী কাজ করে সে কাজের সম্পূর্ণ ফল পায় না বলিয়া নিরুৎসাহ হয়।

২। সঞ্চয় হ্রাস পায়। ৩। লোকের গৃহকাতুর প্রকৃতি ও আলস্য বৃদ্ধি পায়। ৪। ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা-বৃদ্ধি, স্থানান্তর-গমনের সুবিধা প্রভৃতি কারণে যৌথ পরিবার-প্রথা ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইতেছে।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What do you mean by the term 'Society'? Discuss the purpose of society.

সমাজ বলিতে কি বুঝ? সমাজের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

উঃ—মানুষ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতে পারে না। তাই বহু জনসমষ্টি একসঙ্গে বাস করে। তাহারা সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতেই মনুষ্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জনসমষ্টি যখন তাহাদের সভ্যজীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নানাসূত্রে একতাবদ্ধ হয় তখনই মানব-সমাজের সূত্রপাত হয়। সুতরাং জনসমষ্টি লইয়া সমাজ গঠিত হয় এবং জনসমষ্টি সাধারণ স্বার্থে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একদিকে সংঘবদ্ধ জীবনের সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্যদিকে সমাজবদ্ধ জীবনের সুখ-সুবিধাগুলি, এই উভয়ে মিলিয়া সমাজ গঠন করিয়াছে।

সমাজ একদিনে বা একজন লোকের প্রচেষ্টায় গঠিত হয় নাই। আমরা বর্তমানে যে সমাজে বাস করি, তাহা গঠিত হইতে দীর্ঘদিন অতীত হইয়াছে। পরিবার, গোষ্ঠী, কুল, জাতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাশের মধ্য দিয়া মানব সমাজের ক্রম-বিবর্তন ঘটিয়াছে।

উন্নততর জীবন যাপনের জন্যই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। সহযোগিতার সাহায্যেই মানুষের সমস্ত অভাব দূর হয় এবং সহযোগিতার সাহায্যেই সে তাহার জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্তা ভোগ করে। সমাজে বিভিন্ন মানুষের চিন্তাধারা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। মানুষ সমাজে বাস করে, কারণ সমাজে বাস করিয়াই সমাজের সাহায্যে সে তাহার অর্থনৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে। সুতরাং সমাজের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির মঙ্গলসাধন করিয়া সামগ্রিক মঙ্গলসাধন করা।

2. What do you mean by a joint family? Discuss its merits and demerits.

যৌথ-পরিবার বলিতে কি বুঝ? ইহার সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

উঃ—যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার প্রথা হইল ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একান্নবর্তী পরিবারের অর্থ হইল যে, আত্মীয়তাবন্ধনে আবদ্ধ বহুলোক একই সংসারে একই অন্নে প্রতিপালিত হয়। খাওয়া-পরা, আয়-ব্যয়, পূজা-পার্বন প্রভৃতি একই ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়।

পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির (কর্তা) নির্দেশেই পরিবারের সমস্ত কাজ নিষ্পন্ন হয়। পরিবারের সকলে সমান আয় না করিলেও ভোগের ক্ষেত্রে সকলেই সমান সুবিধার অধিকারী। সুতরাং দেখা যায় যে, বর্তমান সাম্যবাদ নীতির জন্মের বহু পূর্বেই আমাদের এই ভারতে যৌথ-পরিবার-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া সাম্যবাদী আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

সুবিধা—প্রথমতঃ, যৌথ-পরিবারের সকলেরই জীবিকার সংস্থান হয়, যৌথ-পরিবারে বাস করে বলিয়া কেহই একেবারে নিঃসহায় হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, বিধবা সকলেই আশ্রয় পায়।

তৃতীয়তঃ, যৌথ-পরিবারের সকলেই সাধ্যমত পরিবারের কাজ করে। ইহাতে শ্রম বিভাগ নীতির সকল সুবিধাই পাওয়া যায়।

চতুর্থতঃ, এক সঙ্গে বহুলোক বাস করে বলিয়া পরিবারের নানা বিষয়ে ব্যয় সংকোচ হয়।

অসুবিধা—এই ব্যবস্থায় প্রথম অসুবিধা হইল যে, পরিবারের যে ব্যক্তি বেশী কাজ করে বা বেশী আয় করে, সে তাহার কাজের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে পারে না, কারণ যৌথ-পরিবারের সকলেই কাজ ও আয় নিরপেক্ষভাবে সমান সুবিধা পায়।

দ্বিতীয়তঃ, যে যাহাই আয় করুক না কেন, সকলের আয় একত্রিত হইয়া সকলের জন্য ব্যয় হয় বলিয়া সঞ্চয় পরিমাণ কম হয়।

তৃতীয়তঃ, যৌথ-পরিবারে খাওয়া-পরার কোন চিন্তা নাই বলিয়া লোক আলস্যপরায়ণ, কর্ম-বিমুখ ও গৃহ-কাতর হয়। তাহাদের মধ্যে কোন উৎসাহ বা কর্মপ্রেরণা থাকে না।

চতুর্থতঃ, এই ব্যবস্থায় পরিবারের কর্তার নির্দেশমত সকলকেই কাজ করিতে হয় বলিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাব, জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি, স্থানান্তর গমনের সুবিধা প্রভৃতি কারণে এই প্রাচীন ব্যবস্থা লোপ পাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

(The State)

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা—Definition of the State

সমাজবদ্ধ মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের উদ্দেশ্যে সমাজমধ্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে, তন্মধ্যে রাষ্ট্রই হইল সর্বপ্রধান। রাষ্ট্র ছাড়া সভ্য মানুষ বাস করিতে পারে না এবং রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবেই মানুষের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের পূর্ণ-বিকাশ সম্ভব। এই জন্যই প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে, যে মানুষ রাষ্ট্রের বাহিরে বাস করে, সে হয় অতি-মানব না হয় পশু। এখন দেখা যাউক, রাষ্ট্র বলিতে আমবা কি বুঝি।

রাষ্ট্র অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হইলেও বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্র সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল বিভিন্ন। গ্রীক ও রোমকগণ রাষ্ট্র বলিতে ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষ্ট্র বুঝিত। বর্তমান বৃহদায়তন রাষ্ট্র সম্পর্কে তাহাদেব বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। জনসমষ্টি লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। যখন একদল লোক সংঘবদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থার অধীনে একটি নির্দিষ্ট ভূ-ভাগে বাস করে, তখন সেই সংঘবদ্ধ জন-সমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয়। অধ্যাপক গার্ণাব নিম্নলিখিতভাবে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানও শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্র অল্প-বিস্তর বহুসংখ্যক জনসমষ্টি যাহাবা স্থায়িভাবে একটা ভূ-খণ্ডে বাস করে ও যাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক শাসন-পাশ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি সুনিয়ন্ত্রিত শাসন-প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সবকার আছে, যে শাসন-প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ ঐ স্থানের অধিবাসিগণ প্রতিনিয়ত পালন করিতে অভ্যস্ত।

("The state as a concept of Political science and Constitutional law, is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised Government to which the great body of inhabitants render habitual obedience.")

রাষ্ট্রের উপাদান—Characteristics of the State

অধ্যাপক গার্ণারের এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত, যথা,

(ক) জনসমষ্টি—Population

বহু জনসমষ্টি না হইলে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে প্রাচীনকালের গ্রীক-রোমক রাষ্ট্রগুলির মত তাহার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই, তবে প্রত্যেক রাষ্ট্র এমন সংখ্যক জনসমষ্টি লইয়া গঠিত হইবে যাহার দ্বারা সরকারের সবকাজই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে। বর্তমানে সুইজ্জারল্যাণ্ডের ন্যায় অল্পসংখ্যক লোক লইয়া গঠিত রাষ্ট্র ও মহাচীনের ন্যায় জনবহুল রাষ্ট্র পাশাপাশি দেখা যায়।

(খ) নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ—Definite territory

নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না, কারণ প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কার্যকলাপ এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে। ভ্রাম্যমাণ যাযাবর জাতি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। যখন একদল লোক স্থায়িভাবে এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাস আরম্ভ করে, তখনই তাহাদের লইয়া রাষ্ট্র গঠনের সূত্রপাত হয়। কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে ইহার যেমন কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই, সেইরূপ রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের আয়তনের কোন নির্দিষ্ট সীমা স্থির করা যায় না। তবে ছোট ও বড় উভয় ধরণের রাষ্ট্রেরই নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ থাকা চাই। বর্তমান যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বৃহদায়তন রাষ্ট্রের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।

(গ) শাসনযন্ত্র বা সরকার—Government

একদল লোক কোন নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাস করিলেই তাহাকে রাষ্ট্র বলা যায় না। নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে সুসংবদ্ধ করিয়া একটা সুদৃঢ় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিলে রাষ্ট্রের সূচনা হয়। সুসংবদ্ধ জনসমষ্টির এই ঐক্যবদ্ধতা শাসনযন্ত্রের সাহায্যে সম্ভব হয় এবং এই শাসনযন্ত্রই হইল রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি। এই শাসনযন্ত্রের সাহায্যেই রাষ্ট্র তাহার ইচ্ছাকে কার্যে বলবৎ করিতে পারে। মানুষ যেমন তাহার বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, রাষ্ট্রও সেইরূপ শাসনযন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই শাসনযন্ত্রকে লোকে রাষ্ট্র বলিয়া ভুল করে। শাসনযন্ত্রের সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ থাকে, যথা, আইনসভা,

শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ। এই তিন বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারিসমষ্টিকে লইয়া শাসনযন্ত্র বা সরকার গঠিত হয়।

(ঘ) সার্বভৌম শক্তি—Sovereignty

রাষ্ট্রগঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হইল সার্বভৌম শক্তি। এই শক্তি রাষ্ট্রের প্রাণ-স্বরূপ। এ-শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সার্বভৌম শক্তির অর্থ হইল যে, দেশের মধ্যে সকল লোক ও সকল প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে এবং বিদেশের সম্পর্কেও সেই রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে। যদি একটি দেশ কোন কারণে পররাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে, তাহা হইলে সে দেশকে আর স্বাধীন রাষ্ট্র বলা চলে না। ভারত যতদিন পর্যন্ত ইংরাজ শাসনের অধীন ছিল অথবা বর্তমান রুশ এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকা-অধিকৃত জার্মান দেশকে রাষ্ট্র বলা যায় না। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে পূর্ণ স্বাধীনতাই রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা হয়।

ইহা ছাড়াও রাষ্ট্রের আরও দুইটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা, (১) **স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা (Permanence and continuity)** এবং (২) **রাষ্ট্রের সমানাধিকার (Equality of States)**।

প্রথম বিশেষত্বের অর্থ হইল যে, রাষ্ট্র একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান—ইহার বিনাশ নাই। শাসনযন্ত্র বা সরকারের পরিবর্তনে রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় না।

সমানাধিকারের অর্থ হইল আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সকল রাষ্ট্রই সমান যেমন একটি রাষ্ট্রের মধ্যে সকল নাগরিকই আইনের চক্ষে সমান। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংগঠনে এই নীতির অভাব দেখা যায়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, সরকার ও সার্বভৌম শক্তি ব্যতীতও একটি রাষ্ট্রের পক্ষে অপরাপর রাষ্ট্র কর্তৃক 'রাষ্ট্র' বলিয়া স্বীকৃতিলাভ করা প্রয়োজন। এই স্বীকৃতি লাভ করিলে একটি রাষ্ট্র অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্য নানাবিধ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুবিধা পায়। আধুনিককালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) সদস্য হইতে পারিলেই আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে রাষ্ট্রমর্যাদা পাওয়া যায়। মহাচীন এখনও পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হইতে পারে নাই বলিয়া পূর্ণ রাষ্ট্রমর্যাদার অধিকারী নহে।

সার্বভৌমের বৈশিষ্ট্য—Characteristics of Sovereignty

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আদি বা মৌলিক। দ্বিতীয়তঃ, এই ক্ষমতা কোন উচ্চতর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে পারে না। ইহা রাষ্ট্রের স্বৈর-ক্ষমতা। তৃতীয়তঃ, এই ক্ষমতা অসীম। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে অবাধভাবে প্রয়োগ করা হয়। চতুর্থতঃ, এই ক্ষমতা অবিভাজ্য। একটিমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হইল এই ক্ষমতার অধিকারী। একাধিক প্রতিষ্ঠান একযোগে আংশিকভাবে এই ক্ষমতার পরিচালনা করিতে পারে না। পঞ্চমতঃ, এই ক্ষমতা স্থায়ী। রাষ্ট্র ব্যতীত এই ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, আবার এই ক্ষমতা ব্যতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে না। ষষ্ঠতঃ, এই ক্ষমতা হস্তান্তরযোগ্য নহে। কোন মানুষ যেমন নিজের জীবন অপরকে দান করিয়া নিজে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তদ্রূপ সার্বভৌমত্ব ব্যতীত রাষ্ট্রও বাঁচিতে পারে না। সার্বভৌমত্বের অবসানের সঙ্গে রাষ্ট্রেরও বিলুপ্তি ঘটে।

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অসীম বা অবাধ নহে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সামাজিক, অন্যান্য সংঘ, জনমত ও শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর বৈদেশিক ব্যাপারে এই ক্ষমতা আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য হয়ত রাষ্ট্র জনমত-বিরোধী অথবা নীতিজ্ঞান-বিরোধী কার্য করিতে না পারে, কিন্তু আইনতঃ রাষ্ট্র সব কিছুই করিতে পারে। পারস্পরিক স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য সাধারণতঃ রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিলেও আন্তর্জাতিক আইন বাধ্যতামূলকভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা বলিয়া ধরা যায় না। সুতরাং দেখা যায় যে, নিজ ইচ্ছা অনুসারে রাষ্ট্র অনেক সময় অবাধ ও চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগে বিরত থাকে, কিন্তু আইনতঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কোন সীমা নাই—এই ক্ষমতা অসীম ও চূড়ান্ত।

রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যান্য সঙ্ঘ—The State and other Associations

সমাজের মধ্যে যে নানাবিধ সঙ্ঘ আছে, রাষ্ট্র তাহাদের মধ্যে অন্যতম। সামাজিক সঙ্ঘ হিসাবে রাষ্ট্রের সহিত শ্রমিক সঙ্ঘ, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মসংগঠন প্রভৃতি অন্যান্য সঙ্ঘগুলির নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায়—

(ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা আছে এবং এক সীমার

মধ্যেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পরিচালিত হয়, কিন্তু অন্যান্য সঙ্ঘগুলির কার্যকলাপ কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে সীমাবদ্ধ না থাকিতে পারে। ভারতের রামকৃষ্ণ মিশন এইরূপ একটি সামাজিক সঙ্ঘ। ভারতের বাহিরের অন্য দেশের নাগরিকগণ এই সঙ্ঘের সদস্য হইতে পারেন এবং এই সঙ্ঘের কাজ ভারতের বাহিরের অন্যান্য দেশেও পরিচালিত হয়।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, মানুষমাত্রকেই কোন-না-কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইবে। কিন্তু সামাজিক অন্যান্য সঙ্ঘের সদস্য হওয়া বা না-হওয়া সম্পূর্ণ তাহার ইচ্ছাধীন। যে-কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে তাহার বিদ্যালয় বা ক্রীড়াসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিতে পারে, নাগরিকগণও এক রাষ্ট্রের সদস্য পদ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে অন্য রাষ্ট্রের সদস্য হইতেই হইবে। রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া মানুষের পক্ষে বাধ্যতামূলক, অন্যান্য সঙ্ঘের সদস্য হওয়া সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

(গ) একজন লোক একই সময়ে একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে না, কিন্তু একই সময় বহু সঙ্ঘের সদস্য হইতে পারে।

(ঘ) অন্যান্য সঙ্ঘগুলি দীর্ঘস্থায়ী না হইতেও পারে। সঙ্ঘগুলির উদ্দেশ্য সফল হইলে বা অন্য কোন কারণে লোপ পাইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র হইল চিরন্তন প্রতিষ্ঠান —ইহার বিনাশ নাই।

(ঙ) রাষ্ট্র স্বাধীন ও সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। অন্যান্য সঙ্ঘগুলির সার্বভৌম শক্তি নাই। সকল সঙ্ঘই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে তাহাদের কার্যকলাপ বন্ধ করিতে পারে।

(চ) উদ্দেশ্যের দিক দিয়াও রাষ্ট্রের সহিত সমাজের অন্যান্য সঙ্ঘগুলির বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। অন্যান্য সঙ্ঘগুলি মানুষের কোন বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গঠিত হয়, যথা, বিশ্ববিদ্যালয় বা শ্রমিক সঙ্ঘ। কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এইরূপ এক বা একাধিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ নহে। মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে পারে।

সুতরাং দেখা যায় যে, সমাজের মধ্যে যে বহুবিধ সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে রাষ্ট্রই হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সঙ্ঘ। ব্যাপকতা, ক্ষমতা, স্থায়িত্ব ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্র হইল অসীম—অন্যান্য সঙ্ঘগুলি সসীম।

রাষ্ট্র ও সরকার—State and Government

সাধারণতঃ রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্র-

বিজ্ঞানে এই দুইটি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। যে চারিটি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়, তাহার মধ্যে সরকার একটি মাত্র। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখা যায়—

১। দেশের সমস্ত অধিবাসীকে লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়, কিন্তু সরকার অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক লোক লইয়া গঠিত হয়। রাষ্ট্রের শাসন-পরিচালনাকার্যে যাহারা নিযুক্ত থাকে অর্থাৎ আইনসভাগুলির সদস্য, শাসন বিভাগীয় কর্মচারী ও বিচার-বিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দকে লইয়া সরকার গঠিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্র সরকার অপেক্ষা ব্যাপকতর।

২। প্রত্যেক রাষ্ট্রই একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের কথা ভাবিতে গেলে একটা ভৌগোলিক সীমার কথা মনে পড়ে। কিন্তু সরকার বলিতে কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের কল্পনার প্রয়োজন হয় না। সরকার শাসনকার্যেরত অল্পসংখ্যক লোককে বুঝায়।

৩। রাষ্ট্র একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান—ইহার বিনাশ নাই। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধার হইলেও সরকার পরিবর্তনশীল। সরকারের পরিবর্তনে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের কোন হানি হয় না।

৪। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকার রাষ্ট্র হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতা পরিচালনা করে। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নূতন সরকার গঠন করিতে পারে।

৫। সকল রাষ্ট্রই একই উপাদান লইয়া গঠিত, যথা জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে সকল রাষ্ট্রই সমান। কিন্তু দেশভেদে সরকারের বিভিন্ন রূপ হইতে পারে। রাষ্ট্র হিসাবে গ্রেটবৃটেন ও ভারত একই প্রকার। কিন্তু দুইটি দেশের শাসন-ব্যবস্থা পৃথক।

৬। পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্র একটি মনঃকল্পিত ধারণামাত্র। ইহার কোন বাস্তব রূপ নাই। কিন্তু সরকারের একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে। তাই সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকগণের অভিযোগ থাকিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রই হইল সকল অধিকারের উৎস।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি—Origin of the State

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। এই মতবাদগুলির বিশেষ কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই এই

মতগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। এখন এই মতগুলির আলোচনা করিয়া ইহাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যাউক।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি বা রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি-মতবাদ—Divine Origin of the State

এই মতবাদটি অতি প্রাচীন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বহুদেশে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি এবং রাজা হইলেন স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধি। অনেক ক্ষেত্রে এই মতবাদকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে রাজাকে কোন দেবতার বংশোদ্ভব বলিয়া কল্পনা করা হইত। আইন বলিতে রাজার ইচ্ছাকে বুঝাইত। লোকের ধারণা ছিল ভগবানের ইচ্ছাই রাজার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইত।

এই মতবাদ অনুসারে একমাত্র রাজতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থাই হইল ঈশ্বরানুমোদিত শাসন-ব্যবস্থা। রাজার অবর্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হইবে। রাজা শাসনকার্যের জন্য একমাত্র ভগবানের নিকট দায়ী ও প্রজাসাধারণের পবিত্র কর্তব্য হইল রাজ-আজ্ঞা নির্বিচারে পালন করা।

এই মতবাদটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যুক্তি অপেক্ষা লোকের ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই মতবাদটি গঠিত হয়। এই মতবাদ শাসক-সম্প্রদায়কে যথেচ্ছাচারী করিয়া তুলে এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে। বর্তমান যুগে এই মতবাদ অবিশ্বাস্য হইলেও যে যুগে এই মতবাদটি প্রচলিত ছিল, সে যুগে ইহার উপযোগিতা ছিল। রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি ও রাজা ভগবানের নির্বাচিত প্রতিনিধি—এই মতবাদ প্রচার করিয়া রাজনৈতিক চেতনাবিহীন প্রাচীন সমাজ অন্ধবিশ্বাসের মধ্য দিয়া জনসাধারণকে আইন-শৃঙ্খলা মান্য করিতে শিক্ষা দেয়। আইন-শৃঙ্খলা না মানিলে কোন রাষ্ট্র বা কোন সংগঠনই কাজ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, এই মতবাদের সাহায্যে রাজশক্তি মধ্যযুগের শক্তিশালী ধর্মীয় সংগঠনের প্রভাব-মুক্ত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হয়। ইহার ফলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) গঠনের সূত্রপাত হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, এই মতবাদটি রাষ্ট্রের নৈতিক উদ্দেশ্যের প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। শাসকগণ যদি শাসন ব্যাপারে নৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হন, তাহা হইলে শাসন-ব্যবস্থা উন্নততর হয়। আইনের কাছে দায়িত্ব ছাড়াও শাসকগণের একটা অতিরিক্ত নৈতিক দায়িত্ব আছে—এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে শাসক-শাসিত সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ হয়।

পরিবারের ক্রম-সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ—The Patriarchal and Matriarchal Theories

এই মতবাদে বলা হয় যে, পরিবার বড় হইয়াই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কতকগুলি পরিবার লইয়া গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, কয়েকটি গোষ্ঠী লইয়া জাতি এবং অবশেষে কয়েকটি জাতি লইয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। পারিবারিক সংগঠনের ক্রমিক পরিণতির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি—এই মতবাদের মূলকথা হইলেও পরিবারের কর্তৃত্ব লইয়া লেখকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, প্রাচীন পরিবারগুলি ছিল পিতৃ-তান্ত্রিক অর্থাৎ পরিবারের কর্তা ছিলেন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ, আবার কেহ বলেন যে, প্রাচীন পরিবারগুলি ছিল মাতৃ-তান্ত্রিক অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠা নারী ছিলেন পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী।

এই মতের প্রধান সমর্থক হইলেন ইংরাজ লেখক স্যর হেনরি মেন। কিন্তু তাঁহার বহু পূর্বে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল পরিবার হইতে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে এই মতবাদ প্রচার করেন।

রাষ্ট্রগঠনের প্রথমদিকে পরিবারের মধ্যে বর্তমান রাষ্ট্রের অঙ্কুর নিহিত ছিল একথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও একমাত্র পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে, একথা মানিয়া লওয়া যায় না। রক্তসম্পর্ক হইল পারিবারিক ঐক্যের ভিত্তি। কিন্তু রাষ্ট্রের ঐক্য শুধুমাত্র রক্তসম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হয়।

বলপ্রয়োগ মতবাদ—The Theory of Force

অনেকে বলেন রাষ্ট্র পশুবলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শক্তিশালী লোক বা শক্তিশালী জাতি দুর্বল লোক বা দুর্বল জাতিকে শারীরিক শক্তি দ্বারা জয় করিয়া নিজ কর্তৃত্বের অধীনে আনিয়া রাষ্ট্রগঠনের গোড়া পত্তন করে। প্রাচীন মানবসমাজ নানা গোষ্ঠী, দল ও উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। গোষ্ঠীপতি বা দলপতি নিজের অনুচরদের সাহায্যে অন্য দলকে পরাস্ত করিয়া বিজিত দলের উপর আপন আধিপত্য স্থাপন করিত। এইরূপে যখন কোন দলপতি তাহার অনুচরদের সাহায্যে যথেষ্ট আয়তনের কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাসনকার্য আরম্ভ করে, তখন রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। সুতরাং যুদ্ধ রাষ্ট্রগঠনের একটি প্রধান উপায়।

'জোর যার মুল্লুক তার' ('Might is right'), 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'

('None but the brave deserves the fair') প্রভৃতি প্রবাদ-বচনগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, উৎপত্তির প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্র নিশ্চিতরূপে বলপ্রয়োগনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই মতবাদে আরও বলা হয় যে, বলপ্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্র শুধু গঠিত হয় না। গঠিত রাষ্ট্র স্থায়ী করিতে হইলেও বলপ্রয়োগ আবশ্যক। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে হইলেও সব বিজেতাকেই পশুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়।

এই মতবাদের প্রধান ক্রটি হইল যে, ইহা বলপ্রয়োগ-নীতিকে রাষ্ট্র গঠনের একমাত্র উপাদান বলিয়া মনে করে। কিন্তু রাষ্ট্র কেবল শারীরিক শক্তির ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে না। শাসকের অধিকার শুধু পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ যে অধিকার শুধু পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের অবসান ঘটে। ইতিহাসও এই সাক্ষ্য প্রদান করে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করাই যদি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্রেই এই মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, এই মতবাদ গণতন্ত্র-বিরোধী। এই মতবাদ কার্যকরী হইলে স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি গণতান্ত্রিক নীতিগুলি বিনষ্ট হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা লোপ পাইবে। একমাত্র যুদ্ধ দ্বারাই আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা হইবে।

এই মতবাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য পশুবলের প্রয়োজন। কিন্তু সকলের রক্ষক ও পালক হিসাবে রাষ্ট্র শুধু শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনের জন্য এই পশুবল প্রয়োগ করিবে এবং এই বলপ্রয়োগ জনগণ দ্বারা সমর্থিত হইবে। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এই সত্য মানিয়া লইতে হইবে যে, জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া কোন রাষ্ট্রই স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং পশুবল রাষ্ট্রের ভিত্তি নহে। জনগণের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি। "Will, not force, is the basis of the State.")

সামাজিক চুক্তি মতবাদ—The Social Contract Theory

এই মতবাদে বলা হয় যে, মানুষ ইচ্ছা করিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষ পূর্বে রাষ্ট্রের বাহিরে ছিল। রাষ্ট্রের অবর্তমানে মানুষের জীবনযাত্রার যে অসুবিধা

হইত, তাহা দূর করিবার জন্য সকলে মিলিয়া একটা চুক্তি করে এবং এই চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

এই মতবাদটি অতি প্রাচীন। ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য ও গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর লেখার মধ্যে চুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্তী কালে আরও কয়েকজন লেখক চুক্তিবিষয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু রাষ্ট্রগঠনে চুক্তির কার্যকারিতা সম্পর্কে ইংরাজ লেখক হব্‌স ও লক্‌ এবং ফরাসী লেখক রুশো সবিস্তারে আলোচনা করেন। সুতরাং সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে, এই তিনজন লেখকের মত সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

হব্‌স ঃ হব্‌স বলেন যে, রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বে মানুষ এক বন্য পরিবেশে বাস করিত। এই অবস্থায় মানুষের তৈয়ারী কোন আইন ছিল না। যে যার খুসীমত বাস করিত। গায়ের জোরেই প্রত্যেকে তাহার অধিকার রক্ষা করিত। কাজেই এই অবস্থায় দুর্বলের কোন অধিকার ছিল না। নিজস্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য পরস্পরের সহিত কলহ-বিবাদ করিয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকিত। এই অবস্থাকে হবস্‌ প্রকৃতির রাজত্ব (State of Nature) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতির রাজত্বের এই অরাজকতা এবং জীবন, ধন ও মানের অনিশ্চয়তা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে মানুষ অবশেষে নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি করিল। চুক্তি দ্বারা মানুষ প্রকৃতির রাজত্বে যে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী ছিল তাহা নিঃশেষে, বিনা শর্তে ও পুনঃপ্রাপ্তির দাবী না রাখিয়া এক ব্যক্তি বা একটি সংসদের হস্তে ন্যস্ত করিল। এই ব্যক্তি হইলেন রাজা। সুতরাং হব্‌সের মতে জনগণ নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা করিল এবং তাহার হস্তে বিনা শর্তে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণ করিল। কাজেই যিনি রাজা হইলেন তিনি এই চুক্তির কোন পক্ষ নহেন এবং চুক্তির শর্তদ্বারা বাধ্য নহেন। তিনি তাঁহার খুসীমত শাসন করিবেন এবং এজন্য কাহারও নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব থাকিবে না। এইরূপে হব্‌স্‌ তাঁহার মতবাদ সাহায্যে রাজাকে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী করিলেন। ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইল।

লক্‌ ঃ

হব্‌সের মত লক্‌ও বলেন যে, রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে মানুষ এক প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ হবস্‌ বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের

মত অসহনীয় ছিল না। এখানে মানুষ মোটামুটি শান্তিতে ও স্বাধীনভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে জীবন পরিচালিত করিত। কিন্তু প্রকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ ও বলবৎ করিবার মত কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছিল না। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মানুষ নিজেদের মধ্যে প্রথমে একটা পারস্পরিক চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন কবিল। বাষ্ট্র গঠিত হইলে তাহারা দ্বিতীয় আব একটি চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা করিল। এই দ্বিতীয় চুক্তি রাজার সহিত হইল। চুক্তির শর্ত হইল যে, রাজা যতদিন পর্যন্ত তাহাদেব জীবন, ধন ও মান রক্ষা করিতে পারিবেন ততদিন প্রজাগণ তাঁহাব আনুগত্য স্বীকাব করিবে ও তাঁহার আদেশ পালন করিবে। বাজা যদি চুক্তিব শর্ত ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে প্রজাগণও তাঁহাকে মান্য কবিবাব দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। সুতবাং দেখা যাইতেছে যে, হবস্ শুধু একটি একপক্ষীয় চুক্তি দ্বারা অবাধ বাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কবেন, লক্ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি দ্বাবা সীমাবদ্ধ বাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ বাখিবাব চেষ্টা কবেন।

রুশো ঃ

ফরাসী লেখক রুশোও প্রকৃতিব বাজত্ব হইতেই বাষ্ট্রেব উৎপত্তির ব্যাখ্যা করেন। রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে মানুষ প্রাকৃতিক পবিবেশে বাস কবিত। কিন্তু রুশোর মতে এই প্রাকৃতিক পবিবেশ ছিল মর্ত্যের স্বর্গ। এখানে সব মানুষই ছিল স্বাধীন ও সমান। কিন্তু কালক্রমে জনসংখ্যা ও সভ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষের জীবন কৃত্রিম ও জটিল হইয়া উঠিল। এই জটিল জীবনযাত্রা পবিচালনা করিবাব জন্য তাহাদেব নানাবিধ সঙ্ঘ গঠন করিতে হইল। অবশেষে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আবিষ্কারেব ফলে কেহ প্রভু ও কেহ দাস হইল। এইরূপে মানুষ প্রকৃতির রাজত্বের সরল ও সহজ জীবনযাত্রা-পথ হইতে ক্রমে ক্রমে যখন তথা-কথিত সভ্যতার উচ্চস্তরে পৌঁছিল, তখন তাহাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ-জ্ঞান জন্মিল। ইহার ফলে তাহাদের আদিম স্বাধীনতা ও সাম্যভাব দূব হইয়া তাহাবা হবস্-বর্ণিত এক অসহনীয় পরিবেশে উপনীত হইল। এই অসহনীয় পরিবেশ হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা নিজেদেব মধ্যে একটা চুক্তি করিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন সংসদের হাতে তাহাদের ক্ষমতা হস্তান্তব না করিয়া সমগ্র সমাজের হাতে অর্থাৎ তাহাদের সাধারণ ইচ্ছার (General will) হাতে ক্ষমতা

সমর্পণ করিল। রুশোর মতে চুক্তিদ্বারা গঠিত এই সাধারণ ইচ্ছাই হইল সমাজের সর্বশক্তির অধিকারী। রুশোর এই সাধারণ ইচ্ছা হইল সমষ্টিগত ইচ্ছা। একমাত্র সমষ্টিই এই ইচ্ছা প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করিতে পারে। রাষ্ট্রের মধ্যে সমষ্টির এই ইচ্ছা হইল চূড়ান্ত ও নির্ভুল। এই চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত ইচ্ছার উদ্দেশ্য হইল সমষ্টির মঙ্গলসাধন করা। যদি ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত সাধারণের বা সমষ্টিগত ইচ্ছার বিরোধ হয়, তাহা হইলে সাধারণের ইচ্ছাই বলবৎ হইবে। রুশোর মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্যক্তি যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাহা চুক্তি দ্বারা সাধারণ ইচ্ছায় সমর্পণ করিলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা সাম্য নষ্ট হইল না। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যক্তিগতভাবে যাহা সমষ্টিতে সমর্পণ করিয়াছিল, চুক্তিদ্বারা গঠিত রাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই আবার তাহা ফিরিয়া পাইল। রুশোর মতে সরকারের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। সরকার সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং সাধারণ ইচ্ছার অধীন শাসনযন্ত্র মাত্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই তিনজন লেখকই চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিলেও তাঁহাদের মতবাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল। প্রকৃতির রাজত্বের বিশেষত্ব, চুক্তির প্রকৃতি, পক্ষ ও বিষয়বস্তু এবং রাজা ও প্রজার সম্পর্ক এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে তিনজন লেখকই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনজন লেখক একই মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন।

হব্‌স্ তাঁহার মতবাদ দ্বারা গণশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তির উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। ফলে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হয়। লক্ রাজশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া গণশক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ফলে, শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল ও অস্থায়ী হয় এবং জনসাধারণের খামখেয়ালের দ্বারা পরিচালিত হয়। রুশো তাঁহার মতবাদ দ্বারা স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

সমালোচনা—Criticism

এই মতবাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত বহু সমালোচনা হইয়াছে। প্রধানতঃ বলা যায় যে, এই মতবাদের পিছনে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে

কোন রাষ্ট্রই চুক্তিদ্বারা গঠিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের যে অধিকারের কথা বলা হয় তাহা যুক্তিসম্মত নহে। কারণ, প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করিবার মত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছিল না। যেখানে অধিকারগুলি বলবৎ করিবার কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নাই, সেখানে অধিকার থাকিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত রাজনৈতিক চেতনা-বিহীন মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিত, তাহারা যে রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিল ইহা সম্পূর্ণ ভুল। চতুর্থতঃ, সভ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষ চুক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক চুক্তিদ্বারা স্থির করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের মানুষের মধ্যে এই চুক্তির ধারণা থাকা অসম্ভব। চুক্তি সামাজিক অগ্রগতির নিদর্শন, ইহার প্রারম্ভের নিদর্শন হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ, এই মতবাদে জনমতকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। জনমত যে সব-সময়ে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে, যুক্তিহীন উত্তেজনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া জনমত অত্যাচারী শাসক অপেক্ষাও দেশের ও দশের অনেক অনিষ্ট সাধন করে। সুতরাং এদিক দিয়া এই মতটি বিপজ্জনক।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে এই মতবাদটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব না হইলেও এই মতবাদটির উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর স্থাপিত—এই সত্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মতবাদটি আধুনিক গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করে। কোন রাজশক্তি যে ঐশ্বরিক বিধান বা পশুবলের উপর স্থায়ী হইতে পারে না, এই মতবাদ তাহাই প্রচার করিল। মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করিয়া এই মতবাদ ব্যক্তিকে তাহার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে শিক্ষা দিয়াছে।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ—Historical or Evolutionary Theory

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বা কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। কোন একটি বিশেষ উপাদান দ্বারাও রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্র মানবসমাজের

ক্রম-অগ্রগতির ফল। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত এক বিরামহীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ধীরে ধীরে ইহার বর্তমান রূপ পাইয়াছে। উৎপত্তির প্রথম যুগে রাষ্ট্র অতি সরল ও সাধারণ সংগঠন ছিল, কিন্তু তারপর সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমশঃই জটিলতর হইতে লাগিল।

প্রথমতঃ, মানুষ সামাজিক জীব, তাই দলবদ্ধভাবে বাস করিতে চায়। মানুষের এই সমষ্টিগতভাবে বাস করিবার স্বভাবের মধ্যে রাষ্ট্রগঠনের বীজ উপ্ত আছে। রাষ্ট্রগঠনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিবারের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে এবং রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত ক্ষুদ্র পরিবার হইতে গোষ্ঠী ও গোষ্ঠী হইতে বৃহত্তর ও জটিলতর জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনকালে ধর্মের বন্ধনও রাষ্ট্রগঠনের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। প্রাচীনকালের রাজারা ধর্মগুরু বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। মানুষের রাজনৈতিক চেতনা জন্মিবার পূর্বে ধর্মই মানুষের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত করিয়া মানুষকে রাষ্ট্রের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রগঠনের কোন এক সময়ে পশুবলের কার্যকারিতার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষা ও বহিরাক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সমাজেই একজন দলপতির অধীনে যুদ্ধের ব্যবস্থা করিতে হইত। এইরূপে সামরিক প্রয়োজনে মানুষ নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে ক্রমশঃ ঐক্যবদ্ধ হইয়া সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাসে 'শাসিতের ইচ্ছা ও সহযোগিতা' বোধহয় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রাষ্ট্র যে জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে, সমাজের চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই মত প্রচার করিয়া জনসাধারণকে তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই রাজনৈতিক চেতনা জনসমাজে ক্রমশঃ সঞ্চারিত হওয়ার ফলে শক্তির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র জনমতের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

ইহা ছাড়াও আরও অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। জন সমাজে জাতীয়তাবোধ যতই শক্তিশালী হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার দাবী স্বীকৃত হইয়া বিশাল সাম্রাজ্যের স্থলে ছোট ছোট জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। বর্তমান যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার আশাতীত উন্নতি হওয়ার ফলে বিভিন্ন দেশের জনসমাজের মধ্যে নানাজাতীয়

সহযোগিতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, জগতের সকল জাতিই আজ রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করিয়া এক বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্রই আজ তার সার্বভৌম শক্তি আংশিকভাবে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। আধুনিককালে অর্থনৈতিক কারণেও রাষ্ট্রগুলির পরিবর্তন ঘটিতেছে। সকলকে সমান সুবিধা দান করিবার জন্য পূর্বের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্র আজ সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, রাষ্ট্র একদিনে বা একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই। মানুষের মনে রাষ্ট্রের ধারণা জন্মিতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। পরিবারের মতন সরল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া গঠিত হইলেও পরবর্তী কালে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা-বিকাশের ফলে রাষ্ট্র বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। মানব-জীবনে বর্তমানে রাষ্ট্রের প্রভাব যে শুধু সুদূর-প্রসারী তাহা নয়, মানুষ আজ রাষ্ট্রকে সমাজ-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করে।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্র ও ইহার উপাদান

যখন একদল লোক কোন নির্দিষ্ট ভূ-ভাগে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শাসনযন্ত্র গঠন করে এবং স্বাধীনভাবে তাহাদের সামাজিক জীবন যাপন করে, তখন তাহাকে রাষ্ট্র বলা হয়।

প্রত্যেক রাষ্ট্রই চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত ; যথা, ১। জনসমষ্টি, ২। নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, ৩। সরকার, ও ৪। সার্বভৌম শক্তি। উপাদানগুলির মধ্যে সার্বভৌম শক্তি রাষ্ট্র গঠনের প্রধান উপাদান।

অন্য রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-মর্যাদা লাভ করা যায়।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সঙ্ঘ

(ক) রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড থাকা চাই, অন্যান্য সঙ্ঘের নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড না হইলেও চলে।

(খ) রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সঙ্ঘ, অন্যান্য সঙ্ঘগুলি সাধারণতঃ অস্থায়ী।

(গ) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা, অন্যান্য সঙ্ঘগুলি দুই একটি বিষয়ে মানুষের উন্নতির সাহায্য করে।

(ঘ) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, অন্যান্য সঙ্ঘগুলির এরূপ অবাধ ক্ষমতা নাই।

(ঙ) মানুষের কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য হইতেই হইবে, কিন্তু সে কোন সঙ্ঘের সদস্য নাও হইতে পারে।

রাষ্ট্র ও সরকার

১। রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের সদস্য, কিন্তু সকলেই সরকারের সদস্য নহে।

২। রাষ্ট্র স্থায়ী, সরকার পরিবর্তনশীল।

৩। রাষ্ট্র বলিতে একটা নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ বুঝায়, কিন্তু শাসনযন্ত্র বলিতে সরকারী কার্যে রত অল্পসংখ্যক লোক বুঝায়—কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড বুঝায় না।

৪। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকার রাষ্ট্রপ্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনা করে।

৫। সকল রাষ্ট্রের একই বৈশিষ্ট্য, কিন্তু দেশভেদে সরকারেব পার্থক্য দেখা যায়।

৬। রাষ্ট্রের কোন বাস্তব রূপ নাই। সরকার হইল রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি। তাই সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ থাকিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। রাষ্ট্র হইল সকল অধিকারের উৎস।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সঠিক ইতিহাস নাই। অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া এ সম্পর্কে পাঁচটি বিভিন্ন মতবাদ গঠিত হইয়াছে, যথা, ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ, পরিবারের ক্রম-সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও ঐতিহাসিক মতবাদ। প্রথম মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি। দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হইল পরিবার-সম্প্রসারণের ফলে সৃষ্ট। তৃতীয় মতবাদ রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগে বিজয় দ্বারা গঠিত বলিয়া মনে করে। চতুর্থ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রকে একটি মনুষ্য-সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করা হয় এবং রাষ্ট্রগঠনে জনমতের উপরই প্রাধান্য আরোপ করা হয়।

উপরি-উক্ত কোন একটি মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। প্রত্যেকটি মতবাদ আংশিকভাবে সত্য হইলেও রাষ্ট্রের উৎপত্তির সম্পূর্ণ

বিবরণ কোন একটিমাত্র মতবাদ হইতে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক মতবাদ এই সমস্ত মতবাদের সারমর্ম গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তির একটি যুক্তিসম্মত বিবরণ দিবার চেষ্টা করে। ঐতিহাসিক মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র একদিনে বা একটি উপাদানের সাহায্যে গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্র নানা উপাদানের সাহায্যে বিভিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া ইহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রাষ্ট্রগঠনের বিভিন্ন উপাদান হইল : রক্ত-সম্পর্ক, ধর্মীয় বন্ধন, পশুবল, রাজনৈতিক চেতনা প্রভৃতি।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. **Define state and point out its characteristics. Is the "state" of West Bengal a state ?** **H. S. (Hu) 1961**

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখাও। পশ্চিমবঙ্গ কি রাষ্ট্র?

উঃ—সমাজবদ্ধ মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের উদ্দেশ্যে সমাজ মধ্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে তন্মধ্যে রাষ্ট্রই হইল সর্বপ্রধান। যখন একদল লোক সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীনভাবে নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থার অধীনে একটি নির্দিষ্ট ভূ-ভাগে বসবাস করে, তখন সেই সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয়। অধ্যাপক উড্রো উইলসন্ রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন : নির্দিষ্ট ভূ-ভাগের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলার সহিত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয়—("A state is a people organised for law within a definite territory").

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, চারিটি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত—যথা, জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, শাসনযন্ত্র বা সরকার ও সার্বভৌমিকতা। জনসমষ্টি ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু কতলোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে, তাহার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্রই এমন সংখ্যক লোক লইয়া গঠিত হইবে যাহার দ্বারা সরকারের বিভিন্ন কাজ ভালভাবে করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের কার্যকলাপ ও আধিপত্য একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পরিচালিত হয়। তাই নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। জনসমষ্টি স্থায়িভাবে কোথাও বসবাস না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইতে পারে না। জনসমষ্টির ন্যায় রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা স্থির করা সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র গঠনে শাসনযন্ত্র বা সরকার হইল একটি প্রধান উপাদান। শুধু একদল লোক একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বাস করিলেই রাষ্ট্র গঠিত হয় না। জনসমষ্টিকে সুসংবদ্ধ করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন। জনসমষ্টির এই ঐক্যবদ্ধতা শাসনযন্ত্রের সাহায্যে সম্ভব হয় এবং এই শাসনযন্ত্রই হইল রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি। শাসনযন্ত্রের সাহায্যেই রাষ্ট্র তাহার ইচ্ছাকে বলবৎ করিতে পারে।

রাষ্ট্র গঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হইল সার্বভৌমিকতা। এই সার্বভৌম শক্তি হইল রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ। সার্বভৌম শক্তির অর্থ হইল যে রাষ্ট্রের মধ্যে সকল লোক ও প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে এবং বৈদেশিক ব্যাপারেও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে। এই শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র নহে, কারণ ইহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি প্রদেশ মাত্র। যে সমস্ত উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয় তন্মধ্যে একমাত্র শাসনযন্ত্র ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র গঠনের অন্য কোন উপাদান নাই। পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টি হইল ভারতীয় নাগরিক—পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব খাস কোন নাগরিক নাই। পশ্চিমবঙ্গের ভূ-ভাগও ভারতরাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। পশ্চিমবঙ্গের একটি নিজস্ব শাসনব্যবস্থা থাকিলেও সে শাসনব্যবস্থা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্র গঠনের সর্বপ্রধান উপাদান সার্বভৌম শক্তি নাই। অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি পশ্চিমবঙ্গকে রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করে না। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র নহে—যে সমুদয় রাজ্য লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ তন্মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য মাত্র—রাষ্ট্র নহে।

2. **Write a note on the theory of evolution as an explanation of the origin of the state.**

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে বিবরণ লিখ।

উঃ—রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এই মতবাদটি সবচেয়ে বেশী যুক্তিসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত অন্যান্য মতবাদগুলির সারমর্মের ভিত্তিতে এই মতবাদটি গঠিত হইযাছে। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র একদিনে বা সামাজিক বিশেষ কোন একটি শক্তির প্রভাবে গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্র মানব-সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফল। আদিমযুগ হইতে আরম্ভ হইয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত এক বিরামহীন বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ধীরে ধীরে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিযাছে। গঠনের প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রের সূত্রপাত হইয়াছিল অতি সাধারণভাবে, কিন্তু তারপর সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমশঃ জটিলতর রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

রাষ্ট্র গঠনে রক্ত সম্পর্কের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, পশুবল ও শাসিতের ইচ্ছা—প্রত্যেকটির প্রভাব একক বা সম্মিলিতভাবে এক এক সময়ে কার্যকরী হইয়াছিল। কিন্তু উপরি-উক্ত কোন একটি প্রভাব একক রাষ্ট্র গঠন করে নাই। ইহা ছাড়াও, আরও অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে। জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিকতা ও বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক কারণগুলিও রাষ্ট্রের বিবর্তনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে, রাষ্ট্র একদিনে বা একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্র মানবজীবনের দীর্ঘদিনব্যাপী বিবর্তনের ফল।

3. **Explain and criticise the social contract theory about the origin of the state.**
(H. S. Comp, 1960, 1962 Comp)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা কর।

উঃ—রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ধারণ সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি একটি প্রধান মতবাদ বলিয়া গণ্য হয়। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে মানুষ আইন-শৃঙ্খলাবিহীন এক প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত। প্রাকৃতিক পরিবেশের অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র-বহির্ভূত মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিল। সুতরাং রাষ্ট্র হইল চুক্তির ফল।

প্রাচীন যুগের ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য ও গ্রীক দার্শনিক প্লেটো প্রভৃতির চুক্তি সম্পর্কে ধারণা থাকিলেও রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে চুক্তির গুরুত্ব ইংরাজ দার্শনিক হব্‌স্ ও লক্ এবং ফরাসী দার্শনিক রুশো বিশদভাবে আলোচনা করেন।

হবসের মতে রাষ্ট্র জন্মের পূর্বে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত। প্রাকৃতিক পরিবেশ 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতিতে পরিচালিত হইত। সুতরাং জীবন, ধন, ও মানের কোন নিরাপত্তা ছিল না। মানুষের জীবন ছিল কদর্য, পাশবিক ও স্বল্পায়ু। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই অনিশ্চয়তা ও দুর্বহ জীবন যখন অসহনীয় হইয়া উঠিল, মানুষ তখন নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়া প্রাকৃতিক পরিবেশে তাহারা যে সমস্ত অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ ক্ষমতার অধিকারী ছিল, সে সমুদয়ই একটি রাজতন্ত্রে নিঃশেষে ও পুনঃপ্রাপ্তির দাবী না রাখিয়া সমর্পণ করিল। চুক্তির ফলে যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাই হইল সর্বক্ষমতার অধিকারী। রাজার বিরুদ্ধে প্রজার কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না।

লক্ বলেন যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যভাব কিছু পরিমাণে থাকিলেও অন্য কতকগুলি অসুবিধা দূর করিবার জন্য মানুষ প্রথম একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া সমাজ সৃষ্টি করে। পরে দ্বিতীয় একটি চুক্তিদ্বারা তাহারা সরকার (রাজতন্ত্র) গঠন করে এবং এই রাজতন্ত্রে তাহারা শর্তসাপেক্ষে তাহাদের কতিপয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে। রাজার সঙ্গে এই চুক্তি হয় যে, রাজা যতদিন চুক্তির শর্ত পালন করিবেন ততদিন পর্যন্ত প্রজাগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে।

ফরাসী লেখক রুশোর মতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মর্ত্যের স্বর্গ। এখানে সব মানুষই ছিল স্বাধীন ও সমান। কিন্তু কালক্রমে জনসংখ্যা ও সভ্যতা বৃদ্ধির ফলে মানুষের জীবন কৃত্রিম ও জটিল হইল ও শেষ পর্যন্ত মানুষের আদিম স্বাধীনতা ও সাম্যভাব দূর হইয়া তাহারা হবস্ বর্ণিত এক অসহনীয় পরিবেশে উপনীত হইল। প্রাকৃতিক পরিবেশের শেষ পর্যায়ের এই অসহনীয় পরিবেশ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করিয়া কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা সংসদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না করিয়া সমগ্র সমাজের হাতে অর্থাৎ তাহাদের সাধারণ ইচ্ছার (General will) হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করিল। সুতরাং দেখা যায় যে হবস্ তাঁহার মতবাদ দ্বারা গণশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। লক্ রাজশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া গণশক্তির উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। ফলে শাসনব্যবস্থা অস্থায়ী ও দুর্বল হয়। রুশো, হবস্ ও লক্—উভয়ের মতবাদের সমন্বয়সাধন দ্বারা স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান।

সমালোচনা—এই মতবাদ ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত হয় না। ইতিহাসে এমন কোন একটি রাষ্ট্রের খোঁজ পাওয়া যায় না যে রাষ্ট্রটি চুক্তি দ্বারা গঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক পরিবেশে যেখানে অধিকারগুলি রক্ষা করিবার কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছিল না সেখানে অধিকার থাকিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত তাহাদের কোন রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। সুতরাং রাজনৈতিক চেতনাবিহীন মানুষ যে রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হইয়া হঠাৎ রাষ্ট্র গঠন করিল, ইহা সম্ভব নয়। চতুর্থতঃ, এই মতবাদটি বিপজ্জনক, কারণ এই মতবাদে জনমতকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, যুক্তিবিহীন উত্তেজনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া জনমত অনেক সময় অত্যাচারী শাসক অপেক্ষাও দেশের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।

মতবাদের মূল্যনির্ণয়—রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে মতবাদটি গ্রহণযোগ্য না হইলেও অন্যদিক দিয়া ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার উপর স্থাপিত এই সত্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মতবাদটি বর্তমান গণতন্ত্রের গোড়া পত্তন করে।

4. 'The state is the result of brute force'. Discuss the statement.

'রাষ্ট্র পশুবলের ফল' উক্তিটি আলোচনা কর।

উঃ—অনেকে বলেন রাষ্ট্র পশুবলের সাহায্যে গঠিত হইয়াছে। সবল লোক বা সবল জাতি দুর্বল লোক বা দুর্বল জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। ইতিহাসেও দেখা যায় যে, অতীতের বহু সাম্রাজ্যই বলপ্রয়োগ সাহায্যে বিজয় দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। এই মতবাদে আরও বলা হয় যে, বলপ্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্র শুধু গঠিত হয় না, গঠিত রাষ্ট্র স্থায়ী করিতে হইলেও বলপ্রয়োগ আবশ্যক ও এইজন্য স্থায়ী পুলিশবাহিনী ও সেনাবাহিনী আবশ্যক।

এই মতবাদের ত্রুটি হইল যে, ইহা বলপ্রয়োগ নীতিকে রাষ্ট্র গঠনের একমাত্র উপাদান বলিয়া মনে করে। কিন্তু শাসকের অধিকার শুধু পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ যে অধিকার শুধু পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে অধিকার চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারেরও অবসান ঘটে। ইতিহাসও এই সাক্ষ্য প্রদান করে।

এই মতবাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য পশুবলের প্রয়োজন। কিন্তু সকলের পালক ও রক্ষক হিসাবে রাষ্ট্র শুধু শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনের জন্য এই পশুবল প্রয়োগ করিবে এবং এই বলপ্রয়োগ জনমত দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। সুতরাং পশুবল রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতে পারে না—জনগণের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি—'Will, not force, is the basis of the state.'

5. Explain the characteristics of the state and distinguish it from other associations. H. S. (Hu) 1961

রাষ্ট্র গঠনের উপাদানগুলি আলোচনা কর এবং রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সংঘের পার্থক্য বর্ণনা কর।

উঃ—রাষ্ট্রের গঠনের উপাদান—প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১। রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড চাই, সংঘের ভূখণ্ড না হইলেও চলে।

২। রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সংঘ; অন্যান্য সংঘগুলি স্থায়ী না হইতেও পারে।

৩। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বহুমুখী। রাষ্ট্র মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার সর্ববিধ উন্নতিসাধনে সহায়তা করে, অন্যান্য সংঘগুলি দুই একটি বিষয়ে মানুষের উন্নতির সাহায্য করে।

৪। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্রান্তর্গত সকলের উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে পারে, অন্যান্য সংঘগুলির অবাধ ক্ষমতা নাই।

৫। মানুষ ইচ্ছামত এক বা একাধিক সংঘের সভ্য হইতে পারে বা সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু কোন-না-কোন একটি রাষ্ট্রের সভ্য তাহাকে হইতেই হইবে—নাগরিক হওয়া বাধ্যতামূলক।

তৃতীয় অধ্যায়

সরকার

(The Government)

সরকারের বিভিন্ন রূপ—Forms of Government

প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একই উপাদানে—জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, সরকার ও সার্বভৌমশক্তি—গঠিত বলিয়া রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের শাসন-ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শাসন-ব্যবস্থার এই বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল্ বিশদ আলোচনা করেন।

অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণী-বিভাগ—Aristotle's Classification

অ্যারিস্টট্‌লেব রচনায় দুই প্রকারের শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়। যথা, স্বাভাবিক (Normal) ও বিকৃত (Perverted)। জনকল্যাণেব জন্য যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, সেই শাসন-ব্যবস্থাকে তিনি স্বাভাবিক শাসন-ব্যবস্থা আখ্যা দিয়াছেন। আর যে শাসন-ব্যবস্থা শুধুমাত্র শাসকশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয়, তাহাকে তিনি বিকৃত শাসন-ব্যবস্থা বা কু-শাসন বলেন। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা যাঁহাবা পরিচালনা করেন, তাঁহাদেব সংখ্যানুসারে স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুইটি প্রধান শ্রেণীকে আরও কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেন।

অ্যারিস্টট্‌ল্ নিম্নলিখিতভাবে সরকারেব শ্রেণী-বিভাগ কবেন।

শাসন-ক্ষমতা পবিচালনাকারীর সংখ্যা	স্বাভাবিক	বিকৃত
একব্যক্তি	রাজতন্ত্র	স্বৈবতন্ত্র
একাধিক ব্যক্তি (একটি সংসদ)	অভিজাত-তন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহুব্যক্তি (জনসাধারণ)	গণতন্ত্র	বিকৃত গণতন্ত্র

অ্যারিস্টট্‌লের এই শ্রেণী-বিভাগের বিরুদ্ধে সমালোচনা হইয়াছে। তিনি

যে নীতি অনুসারে **সরকারের** শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছিলেন তাহা বর্তমান যুগে অচল। বর্তমান যুগের শাসন-ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিশ্রধরণের। কোন দেশেও নিছক রাজতন্ত্র অথবা অভিজাত-তন্ত্র বা গণতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ দেখা যায়। ইংলণ্ডের রাণী রাজতন্ত্রের প্রতীক, লর্ডসভা অভিজাত-তন্ত্রের প্রতীক, আর কমন্স সভা হইল গণতন্ত্রের প্রতীক। ইহা ছাড়া, অ্যারিস্টটলের শ্রেণী-বিভাগে আধুনিক এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রভৃতি শাসন-ব্যবস্থার কোন স্থান নাই।

অ্যারিস্টটলের শ্রেণী-বিভাগ প্রধানতঃ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আধুনিককালেও যখন ভাল ও মন্দ রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করা হয়, তখন কোন রাষ্ট্রকে পুলিসি রাষ্ট্র বা যুদ্ধবাদী রাষ্ট্র বলা হয়, আবার কোনটিকে বা কল্যাণ-রাষ্ট্র বলা হয়। জনসাধারণের হিতসাধন করাই হইল আধুনিক কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষণ। সুতরাং রাষ্ট্রের শ্রেণী-বিভাগের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগেও অ্যারিস্টটলের নৈতিক মানের গুরুত্ব বিশেষ হ্রাস পায় নাই।

আধুনিক শ্রেণী-বিভাগ—Modern Classification

বর্তমানকালে নিম্নলিখিতভাবে শাসন-ব্যবস্থার শ্রেণী-বিভাগ করা হয়।

১। রাজতন্ত্র, ২। অভিজাত-তন্ত্র, ৩। গণতন্ত্র, ৪। একনায়ক-তন্ত্র, ৫। আমলাতন্ত্র।

রাজতন্ত্র—Monarchy

যে শাসন-ব্যবস্থায় রাজাই হইলেন শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, তাহাকে রাজতন্ত্র বলা হয়। এই ব্যবস্থায় সরকারের সমস্ত শাসন-ক্ষমতা রাজার হস্তে ন্যস্ত থাকে। রাজতন্ত্র সাধারণতঃ জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর নির্ভর করে। কদাচিৎ রাজা আবার জনগণদ্বারা নির্বাচিতও হইতে পারেন। প্রাচীন পোলাণ্ডে এইরূপ নির্বাচিত রাজা ছিলেন।

রাজতন্ত্র আবার **অবাধ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy)** ও **নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (Constitutional or Limited Monarchy)** হইতে পারে। অবাধ রাজতন্ত্রে একমাত্র রাজার ইচ্ছায়ই শাসন-কার্য পরিচালিত হয়। এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। প্রাচীন কালে ইংলণ্ড, ফরাসী প্রভৃতি দেশে এই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

অবাধ রাজতন্ত্রের সুবিধা হইল যে, একমাত্র রাজার হস্তে ক্ষমতা থাকে বলিয়া রাজা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন এবং রাজা প্রজাবৎসল হইলে তাহাদের নানাবিধ হিতসাধন করিতে পারেন। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, শাসন-কার্যে জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা জন্মিতে পারে না। রাজা অত্যাচারী হইলে জনসাধারণের আদৌ কোন স্বাধীনতা থাকে না, এবং স্বাধীনতার অভাবে তাহাদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে একজন রাজা শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় হইলেও কার্যতঃ তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকে না। তাঁহার সমস্ত ক্ষমতাই জনগণের প্রতিনিধিগণের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। ইংলণ্ডে এই শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এইজন্য ইংলণ্ডের রাজার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না (He reigns but does not govern)।

অভিজাত-তন্ত্র—Aristocracy

দেশের শাসনকার্য যখন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সাহায্যে পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে অভিজাত-তন্ত্র বলা হয়। জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সংখ্যা স্বভাবতঃই কম বলিয়া অনেক সময় অভিজাত-তন্ত্রকে অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা পবিচালিত শাসন-ব্যবস্থা বলা হইত। পুরাকালে শাসনকার্যে গুণ বলিতে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য বুঝাইত, যথা, অভিজাত বংশে জন্মলাভ, বিত্তসম্পদ, সামরিক খ্যাতি প্রভৃতি। বর্তমান যুগে অভিজাত-তন্ত্র অচল হইলেও প্রত্যেক দেশের শাসন-ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, দেশের প্রকৃত শাসকগোষ্ঠী প্রায়ই উচ্চবংশজাত ও ধনিক শ্রেণী হইতেই নির্বাচিত হন।

গণতন্ত্র—Democracy

গণতন্ত্র বলিতে এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা বুঝায়, যেখানে শাসন ক্ষমতার প্রধান উৎস হইল জনসাধারণ এবং জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা আছে।

একনায়ক-তন্ত্র—Dictatorship

একনায়ক-তন্ত্র রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা একটি রাজনৈতিক দল দ্বারা সমর্থিত এক-

জন নেতার হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীতে নাৎসী-দল কর্তৃক সমর্থিত নেতা হিট্‌লারই ছিলেন জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতা। একনায়ক-তন্ত্র সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরে করা হইবে।

আমলাতন্ত্র—Bureaucracy

যখন শাসনকার্য একদল স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের সাহায্যে পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা যোগ্যতা স্থির করিয়া এই কর্মচারীগণকে সরকারী কার্যে নিযুক্ত করা হয়। ইঁহারা অত্যধিক পরিমাণে ধরা-বাঁধা নিয়মের দাস হইয়া পড়েন, সেজন্য সরকারী কার্যে বিলম্ব হয়। জনসাধারণের সহিত ইঁহাদের বিশেষ কোন সংযোগ থাকে না বলিয়া ইঁহারা জনসাধারণের স্বার্থ-সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। আমলাতান্ত্রিক সরকার সাধারণতঃ সুদক্ষ হয়।

গণতন্ত্র ও ইহার বিভিন্ন রূপ—Democracy and its different forms :

শাসন-ব্যবস্থাকে সাধারণতঃ গণতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্র এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা আবার নানা প্রকারের হইতে পারে। নিম্নে গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপের একটা তালিকা দেওয়া হইল।
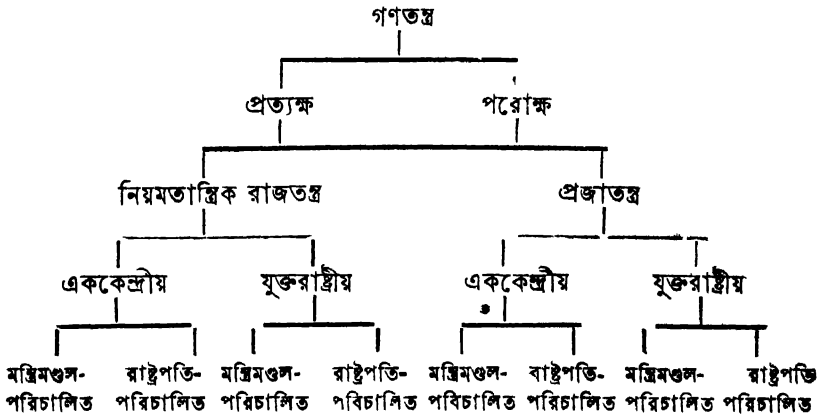
গণতন্ত্র—Democracy

গণতন্ত্র শব্দটি Demos ও Cratos এই দুইটি গ্রীক শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। Demos শব্দটির অর্থ হইল জনসাধারণ এবং Cratos শব্দটির অর্থ হইল ক্ষমতা। সুতরাং, গণতন্ত্র শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল গণশাসন অর্থাৎ যে শাসন-ব্যবস্থায়

জনগণই হইল শাসন-ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। এই শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ এব্রাহাম লিঙ্কন্ অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, জনসাধারণকে লইয়া জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণকর্তৃক যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় (Government of the people, for the :people and by the people.), তাহাকেই গণতন্ত্র বলা হয়। জনসাধারণকে লইয়া ও জনসাধারণের কল্যাণে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ দ্বারা শাসনকার্য কিভাবে পরিচালিত হইতে পারে ইহা চিন্তার বিষয়।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের রাষ্ট্রগুলি ছিল ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্র। ক্রীতদাসশ্রেণীর লোকের শাসন-ক্ষমতায় কোন অধিকার ছিল না। মুষ্টিমেয় লোক প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিত এবং শাসনকার্যে যাহারা অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাহাদিগকেই নাগরিক বলা হইত। বর্তমান যুগে দেশজোড়া বৃহৎ রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে এবং এই রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসীমাত্রই হইল রাষ্ট্রের নাগরিক। এইরূপ বৃহৎ রাষ্ট্রের সমগ্র নাগরিকের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নহে। তাই নাগরিকগণ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং শাসনকার্য এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়। এইজন্য আধুনিক গণতন্ত্রকে পরোক্ষ গণতন্ত্র (Indirect or Representative Democracy) বলা হয়। গণতন্ত্র প্রত্যক্ষই হউক আর পরোক্ষই হউক, এই শাসন-ব্যবস্থা জনগণের মত অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে থাকে। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মূল নীতি হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'জন প্রতি এক ভোট' প্রবর্তন করিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শকে সার্থক করা যায় না। সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই আদর্শ কার্যকরী করিতে হইবে। সমাজ-ব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক জীবনে এই স্বাধীনতা ও সাম্য একান্ত প্রয়োজন। সমাজ-ব্যবস্থায় যদি উচ্চ-নীচ ভেদ থাকে ও এই ভেদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী কোন সম্প্রদায় থাকে, তাহা হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের গুরুতর পার্থক্য থাকিলে গণতন্ত্র সফল হয় না। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে গণতান্ত্রিক আদর্শ পূর্ণ হয় না। ভারতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নূতন শাসনতন্ত্রে অস্পৃশ্যতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা

হইয়াছে। মন্দির, জলাশয়,হোটেল, বিদ্যালয় প্রভৃতি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও জমিদারী-প্রথার বিলোপসাধন, অনেক বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ, ও নানাবিধ শ্রমিক-কল্যাণকর আইন-প্রণয়ন দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন করিবার পথের বাধা দূর করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং গণতন্ত্র বলিতে এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা বুঝায়, যে ব্যবস্থায় সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সমান সুযোগ-সুবিধা পাইয়া তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করিতে পারে।

গণতন্ত্রের গুণ—Merits of Democracy

(ক) গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার কারণ হইল যে, এই ব্যবস্থায় যাঁহারা শাসন করেন তাঁহারা জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। ইহাতে শাসকশ্রেণী যাহা খুসী তাহা করিতে পারেন না। শাসকগণ জনগণদ্বারা নির্বাচিত ও জনগণেব নিকট দায়ী বলিয়া সর্বদা সতর্ক থাকেন ও জনমত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

(খ) এই শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকই তাহার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার সুযোগ পায়। অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থায় জনস্বার্থ এরূপভাবে রক্ষা হয় না।

(গ) গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিই শিখে যে, সে রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই মনোভাব ব্যক্তিকে স্বদেশপ্রেমিক করে ও তাহার রাজনৈতিক চেতনা জাগরিত করিয়া তাহাকে সু-নাগরিক করে।

(ঘ) গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান গৌরব হইল যে, মূঢ় ও মূক জনগণকে ভোটদান করিবার ক্ষমতা দিয়া ইহা তাহাদিগকে নিজ নিজ অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে। ইহাতে সাধারণ লোকের মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করে।

(ঙ) এই শাসন-ব্যবস্থায় সমষ্টিগত জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধিত হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজ শক্তি অনুযায়ী সমষ্টিগত কল্যাণসাধনে সহায়তা করে। ফলে ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গল হয়।

(চ) গণতন্ত্র মানুষে মানুষে পার্থক্য দূর করিয়া স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করে।

গণতন্ত্রের দোষ—Defects of Democracy

গণতন্ত্র সবচেয়ে উৎকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা হইলেও ইহার যে একেবারেই কোন ত্রুটি নাই, একথা বলা চলে না। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি সচরাচর দেখা যায়।

(ক) গণতান্ত্রিক শাসনের অর্থ হইল, যাহারা সংখ্যায় বেশী তাহাদের শাসন। সুতরাং গণতন্ত্রে গুণ ও যোগ্যতা অপেক্ষা সংখ্যার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। সংখ্যাধিক্যের উপর জোর দেওয়াব ফলে গণতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে অক্ষম ও বিকৃত গণতন্ত্র অর্থাৎ অযোগ্য লোকের দ্বারা পরিচালিত কু-শাসনে পরিণত হয়।

(খ) গণতন্ত্রেব আদর্শ অনুযায়ী মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করা যায় না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের কাজ অল্পসংখ্যক চতুর ও বিবেকবর্জিত লোক দ্বাবা পবিচালিত হয়। ইহারা ছলে-বলে-কৌশলে অজ্ঞ জনসাধারণের ভোট সংগ্রহ করিয়া নিজেদের স্বার্থে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

(গ) গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় যে আইন তৈয়ারী হয়, তাহাও যে দলের হাতে ক্ষমতা থাকে সেই দলের স্বার্থের জন্যই রচিত হয়। ইহাতে অন্যান্য দলেব স্বার্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নষ্ট হয়।

(ঘ) গণতন্ত্র অজ্ঞলোকেব দ্বারা পবিচালিত সংখ্যাধিক্যের শাসন-ব্যবস্থা। সুতরাং এই শাসন-ব্যবস্থায় গুণ ও যোগ্যতার সমাদর হয় না। ফলে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান যেগুলিব চর্চা মানুষের অধ্যাত্ম জীবন গঠনেব সহায়ক সেগুলি উপযুক্তভাবে সমাদব পায় না।

(ঙ) এই শাসন-ব্যবস্থাব প্রধান দোষ হইল যে, ইহা স্থায়ী হইতে পাবে না। নির্বাচক-মণ্ডলীর ইচ্ছার উপর ইহার স্থায়িত্ব নির্ভব কবে এবং নির্বাচকমণ্ডলী খুসীমত ইহার পরিবর্তন করিতে পারে। স্থায়ী নয় বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থায় কোন দীর্ঘমেয়াদী জনহিতকব নীতি বা গঠনমূলক কার্য সম্ভব নহে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের উপাদান—Essential conditions for the success of Democracy

রাজতন্ত্রে, অভিজাত-তন্ত্রে বা একনায়ক-তন্ত্রে এক ব্যক্তি বা অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা থাকে, কিন্তু গণতন্ত্রে জনসাধাবণ দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হয়। সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্য যে জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি, দায়িত্ববোধ ও কর্মক্ষমতার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইংরাজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে গণতন্ত্রের সাফল্য প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, দেশের লোকের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণকে তাহাদের অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণকে তাহাদের কর্তব্যপালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্য অনেক পরিমাণে নাগরিকগণের অধিকার রক্ষা করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প ও কর্তব্যপালনের তৎপরতা—এই দুইটি গুণের উপর নির্ভর করে। এজন্য চাই:বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত নাগরিক। সু-শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত সু-নাগরিক সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্র সফল করিতে হইলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার করিয়া তাহাদের মধ্যে বিচারবুদ্ধি ও কর্তব্যবোধ সঞ্চারিত করিতে হইবে। জনমতই হইল গণতন্ত্রের প্রকৃত ভিত্তি। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষাদ্বারা জনমতকে সুশিক্ষিত ও সুসংবদ্ধ করিতে পারিলে গণতন্ত্রের সাফল্য নিশ্চিত।

অনেক দেশে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য একনায়ক-তন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে লোকের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিফল প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা সত্য যে, গণতন্ত্র সব সময়ে মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্য আনিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অভিজাত-তন্ত্র বা একনায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যুক্তিযুক্ত নহে। মোটর-যান মধ্যে মধ্যে অচল হয় বলিয়া গো-যান প্রবর্তন করা যেরূপ নির্বোধের কার্য, গণতন্ত্রের দোষত্রুটির জন্য গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা পরিহার করিয়া একনায়ক-তন্ত্র বা অভিজাত-তন্ত্র গ্রহণ করাও সেইরূপ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আসল কথা হইল গণতন্ত্রের দোষ-ত্রুটি দূর করিয়া ইহার প্রকৃত সার্বজনীন রূপ দিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নাগরিকগণের কর্মক্ষমতা ও দায়িত্ববোধের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। নাগরিকগণ যদি তাহাদের অধিকার রক্ষায় ও কর্তব্যপালনে তৎপর হন, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সাফল্য অবধারিত। এজন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সকলে যাহাতে সমান অধিকার পায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ—Methods of Direct Democracy as applied to Indirect Democracy

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলি দেশজোড়া আয়তন ও বহু জনসমষ্টি লইয়া গঠিত বলিয়া

জনসাধারণের পক্ষে আর প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই তাহারা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া এই প্রতিনিধিদের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত করে। প্রতিনিধিদের হস্তে শাসনভার ছাড়িয়া দিলেও অনেক সময়ে ভোটদাতাগণ আইন প্রণয়নে সরাসরিভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় এইরূপ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি হইল চারি প্রকার।

১। গণনির্দেশাধিকার—Referendum

এই ব্যবস্থায় আইনসভা যে আইনের প্রস্তাব করে, সেই প্রস্তাব জনসাধারণের বিবেচনার জন্য পাঠান হয়। যদি ভোটদাতাগণ অধিক সংখ্যার ভোটে প্রস্তাবটি সমর্থন করে, তাহা হইলে প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয়। আইনসভার আর পৃথক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

২। গণপ্রস্তাব অধিকার—Initiative

ভোটদাতাগণ যদি মনে করেন যে, কোন বিষয়ে আইন তৈয়ারী করা প্রয়োজন, তাহা হইলে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটদাতা সেই আইনের একটা প্রস্তাব আইনসভার নিকট পাঠাইতে পারে। আইনসভা সেই আইনের প্রস্তাবটিকে ভোটদাতাগণের সম্মতির জন্য পুনরায় পাঠাইতে পারে। যদি ভোটদাতাগণ সংখ্যাধিক্যে প্রস্তাবটি পাশ করে, তাহা হইলে তাহা আইনে পরিণত হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে ভোটদাতাগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করিলেও শাসন-ব্যাপারে একেবারে উদাসীন থাকিতে পারে না। প্রতিনিধিগণও খুসীমত কাজ করিতে পারে না।

৩। গণভোট—Plebiscite

গণভোট অনেকটা গণনির্দেশাধিকারের অনুরূপ। গণভোট সাহায্যে শাসন-কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি স্থির করিবার জন্য জনমত গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের সময় আসাম রাজ্যের শ্রীহট্ট জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবে, না পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবে, ইহা নির্ণয় করিবার জন্য গণভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল।

৪। প্রত্যাবর্তনের আদেশ—Recall

নির্বাচিত প্রতিনিধির কার্যে যদি ভোটদাতাগণ অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে এই

ব্যবস্থার দ্বারা তাঁহার পরিবর্তে অন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। কিছুসংখ্যক ভোটদাতা নির্বাচিত প্রতিনিধির নির্বাচন বাতিল করিয়া নূতন নির্বাচনের দাবী করিতে পারেন। যদি দ্বিতীয়বারের নির্বাচনে পূর্বনির্বাচিত প্রতিনিধি নির্বাচিত না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পদত্যাগ করিতে হয়।

উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলির দ্বারা একদিকে যেরূপ জনসাধারণকে শাসনকার্যে সক্রিয় ও উৎসাহী করা যায়, অপরদিকে সেইরূপ শাসকশ্রেণীর দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি হয়। জনসাধারণ যদি তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ থাকে, তাহা হইলে আইনসভা বা শাসন-কর্তৃপক্ষ তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় না।

কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলির দোষ হইল যে, ইহাতে প্রতিনিধিগণের দায়িত্ববোধ কমিয়া যায়, কারণ তাঁহারা জানেন যে, ভোটদাতাগণ ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে পারেন। বহু জনসমষ্টি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রেও সচরাচর এই পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া, জনসাধারণের উপর আইন-তৈয়ারীর ও শাসননীতি নির্ধারণের ভার ন্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

একনায়ক-তন্ত্র—Dictatorship

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে আধুনিক একনায়ক-তন্ত্রের জন্ম হয়। যুদ্ধের পরে রাশিয়া, ইতালি, জার্মানী, তুর্কি, পোলাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের কয়েকটি দেশে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের পুনর্গঠন সমস্যা ও বেকার সমস্যাই ছিল প্রধান সমস্যা। এ সমস্যাগুলির সমাধান করিতে সেই সময়কার সরকার সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হয়। ফলে, দেশের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা কমিয়া যায়। এই সুযোগে একনায়ক-তন্ত্রের আবির্ভাব হয়। রুশ দেশে এই সময়ে যে বিপ্লব ঘটে তাহার ফলে সেই দেশে সাম্যবাদী দল শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া দলীয় একনায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। রুশ দেশের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য অনেক দেশেই এই একনায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইতালি ও জার্মানদেশে একনায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইতালির ফ্যাসিস্ট-নেতা মুসোলিনি ও জার্মানীর নাৎসী-নায়ক হিট্‌লার রুশীয় সাম্যবাদ গ্রহণ করেন নাই।

একনায়ক-তন্ত্রের মূলনীতি হইল এক জাতি, এক রাষ্ট্র ও এক নায়ক। একনায়ক-তন্ত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা দলের নেতার উপর ন্যস্ত হয় ও রাষ্ট্রের সকল কার্যকলাপই দলের নায়কের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। একনায়ক-তন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার অধীনে একটি মাত্র দল থাকে ও নেতা হইলেন

দলের সর্বময় কর্তা। দেশে অন্য কোন রাজনৈতিক দল থাকিতে দেওয়া হয় না। বলপ্রয়োগ করিয়া অন্য দলগুলিকে বিনষ্ট করা হয়। অবাধ দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দলের নেতা ব্যক্তির সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার প্রভৃতি সব কিছুই রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। একনায়ক-তন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্রই হইল সর্বশক্তিমান এবং এই সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোনও অভিযোগ দূরের কথা, কোন অধিকারও থাকিতেও পারে না। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও দলীয় নেতৃত্ব অভিন্ন হইয়া রাষ্ট্রের ইচ্ছা নেতার ইচ্ছায় পরিণত হয়।

গণতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্র—Democracy and Dictatorship

গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল স্বাধীনতা ও সাম্য। কিন্তু একনায়ক-তন্ত্রে ইহাদের কোন স্থান নাই। গণতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং রক্ষা করে, একনায়ক-তন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না। গণতন্ত্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল থাকিতে পারে, কিন্তু একনায়ক-তন্ত্রে একটি মাত্র দল থাকে। অন্য দলগুলির অস্তিত্ব বরদাস্ত করা হয় না। গণতন্ত্র পারস্পরিক সম্মতি, সুবিধা ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত, আর একনায়ক-তন্ত্র হইল দলীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য একনায়ক-তন্ত্রে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও দলীয় স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ বলিয়া গণ্য করা হয়। গণতন্ত্রে শাসকশ্রেণী শাসিতের নিকট তাহাদের কাজের জন্য দায়ী থাকে। একনায়ক-তন্ত্রে শাসকের আদৌ কোন দায়িত্ব নাই। সুতরাং গণতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্র দুইটি পরস্পর-বিরোধী আদর্শ।

একনায়ক-তন্ত্রের গুণ—Merits of Dictatorship

একনায়ক-তন্ত্রের যে কোন গুণ নাই একথা বলা ঠিক নহে। এই শাসন-ব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একনায়ক-তন্ত্র জটিল সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধান করিতে পারে। একটি মাত্র দলের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে বলিয়া একনায়ক-তন্ত্র যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্থায় জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে অধিকতর সাহায্য করে। সু-নাগরিক সৃষ্টি করিতেও একনায়ক-তন্ত্রের কার্যকারিতা কম নহে। রুশ দেশে একনায়ক-তন্ত্র জনগণকে অনেক ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমিক করিয়া তাহাদের আত্মত্যাগ দ্বারা জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার শিক্ষা দিয়াছে। একনায়ক-তন্ত্রে যে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব একেবারে বিনষ্ট হয়, তাহা

বলা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তারে জার্মানী, ইতালি ও বিশেষ করিয়া রুশ দেশ একনায়ক-তন্ত্রের অধীনে অতি স্বল্প কালের মধ্যে যে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা গণতন্ত্রে কোথাও সম্ভব হয় নাই।

দোষ—Defects

একনায়ক-তন্ত্রের যতই গুণ থাকুক না কেন তাহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, এই শাসন-ব্যবস্থা আদৌ কাম্য নহে। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান সুযোগ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করা। একনায়ক-তন্ত্রে ব্যক্তির এই ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সম্ভব নহে, কারণ একনায়কতন্ত্র হইল ব্যক্তি-বিশেষের শাসন এবং এই শাসন শেষ পর্যন্ত শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ আইনের শাসন মানিতে চায়, কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষের শাসনের প্রতি স্বাধীন চিন্তাশীল মানুষের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। সুতরাং জনকল্যাণকর হইলেও এই শাসন-ব্যবস্থা কেহই পছন্দ করে না। অনগ্রসর ও অপরাধপ্রবণ জনগণকে শাসন করিবাব জন্য একনায়ক-তন্ত্রের উপযোগিতা থাকিতেও পারে, কিন্তু জ্ঞানী, গুণী ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনগণের ক্ষেত্রে একনায়ক-তন্ত্র ব্যক্তিত্ব-বিকাশের একটা প্রধান অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হয়। একনায়ক-তন্ত্র অনেক সময় উগ্র জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয় ও জগতের শান্তি নষ্ট হয়। জার্মানী ও ইতালির একনায়ক-তন্ত্রের ইহাই ছিল প্রধান দোষ। এইজন্যই তাহাদের পতন ঘটিয়াছিল।

প্রজাতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র—Republic

যখন বংশানুক্রমিক রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা হইয়া থাকেন তখন তাহাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়। এই শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের ইচ্ছা পরোক্ষভাবে কার্যকরী হয়। ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা—Unitary Government

এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমগ্র দেশের জন্য একটি

শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকে এবং একটিমাত্র সরকারের হাতে সমস্ত শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। দেশে বিভিন্ন ধরণের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা থাকিতে পারে, যেমন, প্রাদেশিক শাসন, জেলা ও মহকুমা শাসন ইত্যাদি। কিন্তু এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সকল ক্ষমতার অধিকারী। প্রাদেশিক বা জেলার সরকারগুলি সর্ববিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাধীন। এই স্থানীয় সরকারের নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকে না। তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশমত কাজ করে মাত্র। সুতরাং এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না। একটিমাত্র সরকাব অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সর্ববিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। ইংলণ্ড, ফরাসী প্রভৃতি দেশে এই ধরণের শাসন-ব্যবস্থা দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা—Federal Government

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কতকগুলি স্থানীয় সরকার পাশাপাশি থাকে। সবকারের সমুদয় ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা দুই ভাগে ভাগ করিয়া একভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেওয়া হয়, অপর ভাগ স্থানীয় সরকারগুলি (রাজ্য বা প্রাদেশিক) হাতে দেওয়া হয়। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দুইটি সরকার পাশাপাশি শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং এই উভয় সরকারের শাসন ক্ষমতার সীমা একটি লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলি নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বাধীনভাবে তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করে। একে অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীর শাসন-ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলি স্থানীয় শাসন ব্যাপারে স্বাধীন থাকে। মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র, বর্তমান ভারত প্রভৃতি হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার উদাহরণ।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য—Features or Characteristics of a Federal Government

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়:

১। একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির সহ-অস্তিত্ব। যেমন, ভারতে দেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য বিষয়গুলির শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার আছে ও স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়

গুলির পরিচালনার জন্য পশ্চিমবাংলা, বিহার, আসাম প্রভৃতি ১৫টি রাজ্যে স্থানীয় সরকার আছে।

২। সরকারের ক্ষমতাসমূহের বিভাগ ও বণ্টন :

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা ভাগ করিয়া একটা নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়।

৩। লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য :

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার এই বিভাগ শাসনতন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হয়। সুতরাং উভয় সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়া শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

৪। নিরপেক্ষ ও স্বাধীন উচ্চ বিচারালয়ের অবস্থিতি :

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য হইল যুক্তরাষ্ট্রের একটা বিশেষত্ব। শাসনতন্ত্রের এই প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য সকল যুক্তরাষ্ট্রেই একটি উচ্চ বিচারালয় থাকে। ভারতে এই উদ্দেশ্যে একটি সুপ্রিম কোর্ট সৃষ্টি হইয়াছে।

৫। রাজস্বের বণ্টন-ব্যবস্থা :

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ক্ষমতা বণ্টনের সঙ্গে রাজস্বও ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারগুলি নির্ধারিত রাজস্ব দ্বারা তাহাদের নিজেদের শাসনকার্যের ব্যয় নির্বাহ করে।

এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য—Distinction between Unitary and Federal Governments

১। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি মাত্র শাসন-ব্যবস্থা থাকে এবং সেই শাসন-ব্যবস্থা হইল কেন্দ্রীয় সরকার। যুক্তরাষ্ট্রে দুই জাতীয় সরকার—কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়—পাশাপাশি থাকে।

২। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না—সমুদয় শাসন-ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে, যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ হয়।

৩। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সমস্ত ক্ষমতার উৎস। স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতা পায়। আর যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার উৎস হইল শাসনতন্ত্র। কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলি উভয়েই শাসনতন্ত্র হইতে ক্ষমতা পায়, সুতরাং এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য, আর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য দেখা যায়।

৪। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ লিখিত ও অনমনীয় হয়। ইহার কারণ হইল যে, যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি প্রায় সমান ক্ষমতার অধিকারী সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ হয় বলিয়া ভবিষ্যতে এই ক্ষমতা ভাগ সম্পর্কে উভয় সরকারের মধ্যে যাহাতে কোন বিরোধ না হয়, সেজন্য এই ক্ষমতা ভাগের বিষয় একটা দলিলে লেখা থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার বা স্থানীয় সরকার কেহই যাহাতে অন্যের বিনা সম্মতিতে এই দলিলে লিখিত ক্ষমতা ভাগের পরিবর্তন করিতে না পারে, সেজন্য এই দলিল অর্থাৎ শাসনতন্ত্র অনমনীয় অর্থাৎ সহজে পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না বলিয়া শাসনতন্ত্র লিখিত বা অনমনীয় হওয়ার প্রয়োজন নাও হইতে পারে।

৫। ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে বিরোধ ঘটিলে যাহাতে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়, সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রে একটা সুপ্রিম কোর্ট থাকে। কিন্তু এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় এই জাতীয় আদালতের কোন প্রয়োজন হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের গঠন-পদ্ধতি—Process of Formation of a Federal Government

যুক্তরাষ্ট্র সাধারণতঃ দুইভাবে গঠিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র একত্রিত হইয়া একটি মাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সাধারণতঃ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় ও পূর্ব অবস্থিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি স্থানীয় সরকারে পরিণত হয় এবং তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্পিত ক্ষমতাগুলি ব্যতীত অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলির অধিকারী হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পদ্ধতিতে গঠিত হয়।

আবার, একটি বড়দেশের এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে কতকগুলি স্থানীয় সরকারে ভাগ করিয়া নবগঠিত স্থানীয় সরকারগুলির হাতে নির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। ক্যানাডায় এই পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। ভারতে এই উভয় পদ্ধতির সহযোগে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার বিভাগ—Distribution of powers in a Federal Government

একটি নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার ভাগ করা হয়। যে বিষয়-

গুলি সমগ্র জাতীয় স্বার্থের সহায়ক বলিয়া সমগ্র দেশে একই ধরণের শাসন-ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, সেই সমস্ত বিষয় সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতাভুক্ত করা হয়। আর যে যে বিষয়গুলি শুধু স্থানীয় স্বার্থ-সম্পর্কিত বলিয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরণের শাসন-ব্যবস্থা প্রয়োজন, সেই সেই বিষয়গুলিকে স্থানীয় সরকারের শাসনক্ষমতাভুক্ত করা হয়। এই নীতি অনুযায়ী দেখা যায় যে, দেশরক্ষা, রেল, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ, পররাষ্ট্র সম্পর্ক, টাকা-পয়সা-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকে, আর কৃষি, জলসেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর কর্তৃত্ব স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আবার কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতাসমূহকে দুই ভাগের পরিবর্তে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, যুক্তরাষ্ট্রীয়, স্থানীয় ও যুগ্ম (concurrent) ক্ষমতা। যুগ্ম ক্ষমতার অর্থ হইল যে, কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারে। কিন্তু যে যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা থাকে সেখানে নিয়ম থাকে যে, একই বিষয়ে উভয় সরকার কর্তৃক তৈয়ারী আইনের মধ্যে যদি বিরোধ হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের তৈয়ারী আইনই বলবৎ হইবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা চালু আছে।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ও সাফল্যের উপাদান—Conditions essential to the formation and success of a Federation

যুক্তরাষ্ট্র সব দেশে গঠন করা সম্ভব নয় এবং গঠন করিলেও যে সাফল্যের সহিত কাজ করিবে ইহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা যাহাতে ভালভাবে কাজ করিতে পারে, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির পরস্পরের সংলগ্ন (Geographical Contiguity) হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বিভিন্ন অঞ্চলগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাদের মধ্যে একতা জন্মিতে পারে না। একতার অভাবে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিয়া এক জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে না। পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল পরস্পরের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া উভয় প্রদেশের লোকের মধ্যে মেলামেশা সম্ভব নহে। এইজন্য উভয় এলাকার মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা যায়। ফলে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পাইতে বিলম্ব ঘটিতেছে। ইহা ছাড়াও, যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক দিক দিয়া সমতা (equality) থাকাও একান্ত আবশ্যক। নতুবা কোন যুক্তরাষ্ট্রই সাফল্যের সহিত কাজ করিতে পারে না। যদি কয়েকটি

প্রদেশ ভোটের জোরে অধিক ক্ষমতাশালী হয়, তাহা হইলে এই বড় প্রদেশগুলি দলবদ্ধভাবে ছোট ছোট প্রদেশগুলির উপর আধিপত্য করিতে পারে। ভারতের পার্লামেণ্ট সভায় উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের সদস্যসংখ্যা এত বেশী যে, তাহাদের একত্রিত ভোট সাহায্যে তাহারা সবভারতীয় বিষয়ে যে কোন নীতি নির্ধারণ করিতে পারে। এইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেট ছোট বড় সকল রাজ্য হইতে সমান সংখ্যক অর্থাৎ দুইজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য দেশের জনসাধারণের শিক্ষা, একাত্মবোধ ও কর্মদক্ষতাও একান্ত প্রয়োজন।

এককেন্দ্রীয় সরকারের সুবিধা—Advantages of Unitary Government

এককেন্দ্রীয় সবকারেব প্রথম সুবিধা হইল যে, দেশের সর্বত্র একই ধরণের আইন ও একই রকমের শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকে বলিয়া শাসনব্যয়ও কম হয়। তৃতীয়তঃ, জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সবকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

অসুবিধা—Disadvantages

এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, স্থানীয় সরকারগুলির কোন বিষয়ে এমন কি স্থানীয় শাসন-ব্যাপারেও কোন হাত থাকে না, কাজেই স্থানীয় সমস্যাগুলির দ্রুত সন্তোষজনক কোন সমাধান বা আদৌ কোন সমাধান হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের এই অত্যধিক ক্ষমতার জন্য স্থানীয় লোক শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। ইহাতে গণতন্ত্রের আদর্শ অর্থাৎ জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সব কাজ ন্যস্ত থাকে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সব কাজ ঠিকমত করা সম্ভব হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা—Advantages of Federal Government

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অনেক সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থার দ্বারা একটি খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন দেশকে একত্রিত করা যায়। অথচ এই একতার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলগুলি তাহাদের স্বতন্ত্র স্থানীয় সরকারের সাহায্যে তাহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যে দেশে নানা ভাষা-ভাষী ও

নানা ধর্মের লোক থাকে, এই ব্যবস্থার দ্বারা সেই দেশের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলির সাহায্যে স্থানীয় সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করা যায়। এজন্য দূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করিতে হয় না। চতুর্থতঃ, এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই শাসন-ব্যবস্থা অধিক সংখ্যক লোককে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দেয়। ইহাতে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। পঞ্চমতঃ, এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় শাসনের ভারমুক্ত হয়। ফলে, কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের জাতীয় স্বার্থ-সম্পর্কিত ব্যাপারে অধিক মনোযোগ দিতে পারে।

অসুবিধা—Disadvantages

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকে বলিয়া সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা জটিল হয়। দ্বিতীয়তঃ, দুই রকম শাসন-ব্যবস্থার জন্য শাসন ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা সাধারণতঃ দুর্বল হয়, কারণ, সব বিষয়েই আঞ্চলিক সরকারগুলির মত লইতে হয়। মতের পার্থক্য হইলে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়। যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্থায় এই ত্রুটি মারাত্মক হয়। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে এবং শক্তিশালী কয়েকটি প্রদেশ একত্রিত হইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে।

উপরে যুক্তরাষ্ট্রের যে অসুবিধাগুলির উল্লেখ করা হইল তাহা যুক্তরাষ্ট্রের গঠন-পদ্ধতির সংস্কার করিয়া দূর করা যায়। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড ও অতি অল্পকালের মধ্যে ভারত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে এই দেশগুলির যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা।

আইনসভা-প্রধান বা মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থা—Parliamentary or Cabinet Government

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারে শাসন বিভাগের সমুদয় ক্ষমতা একটি মন্ত্রিসভার হাতে থাকে। এই ব্যবস্থায় শাসন বিভাগীয় ও আইন বিভাগীয় ক্ষমতার একত্র

সমাবেশ হয়। মন্ত্রিগণকে সাধারণতঃ আইনসভার সদস্য হইতে হয়। আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন, আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিসংসদ তাঁহাদের নীতি ও কার্যের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভা যদি অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে, তাহা হইলে মন্ত্রিপরিষদের একজোটে পদত্যাগ করিতে হয়। আইন-সভায় যে দল সংখ্যায় বেশী হয়, সেই দলের নেতাগণকে লইয়া মন্ত্রিসংসদ গঠিত হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থাকে দায়িত্ব-শীল সরকার (Responsible Government) বলা হয়। এই শাসন-ব্যবস্থায় অবশ্য একজন রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন। আইনতঃ তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেও মন্ত্রিসংসদই হইল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। বর্তমানে ভারতে এই শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার—Presidential or Non-Parliamentary Governmeut

এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা ও আইন বিভাগীয় ক্ষমতার পৃথকীকরণ। এই ব্যবস্থায় একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হস্তে নির্ধারিত কালের জন্য শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং বা তাঁহার সাহায্য-কারী মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য হইতে পারেন না এবং আইনসভার নিকট তাঁহারা দায়ী নহেন। আইনসভাও অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়া রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে না। রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত কার্যকালে শাসনতন্ত্র অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শাসন-ব্যবস্থা দেখা যায়।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের গুণাগুণ—Merits and Demerits of Parliamentary Government

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের প্রধান গুণ হইল যে, আইনসভা ও শাসন-বিভাগ সহযোগিতামূলকভাবে একত্রে কাজ করে বলিয়া শাসনকার্য সুপরিচালিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিসংসদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে বলিয়া শাসকগোষ্ঠী যাহা খুসী তাহা করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় আলাপ-আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ থাকে বলিয়া বিভিন্ন দলের মতভেদ দূর করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

সহজ হয়। চতুর্থতঃ, প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা সম্ভব বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থা জরুরী অবস্থায় বিশেষ কার্যকরী হয়। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময় সর্বদলীয় সরকার গঠিত হইয়া জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখে।

এই গুণগুলি থাকাসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার দুর্বল। মন্ত্রিগণের মধ্যে ঐক্যের অভাবে অনেক সময় শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হয় না। আপৎকালে এই ঐক্যের অভাবে দেশের স্বার্থহানি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিসংসদের স্থায়িত্ব দলের সমর্থনের উপর নির্ভর করে। বারবার মন্ত্রিপরিষদের পরিবর্তন ঘটিলে শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি বাধা পায়। তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসংসদের বিশেষ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়।

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের গুণাগুণ—Merits and Demerits of Presidential Government

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের প্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব। নির্ধারিত কালের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য নির্বাচিত হন। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে অপসারিত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্থায় এই শাসন-ব্যবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসকগণকে আইনসভার নিকট কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় না বলিয়া তাঁহারা শাসনকার্যে মন দিতে পারেন।

এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, আইনসভা ও শাসন-বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা না থাকার ফলে সময় সময় শাসনকার্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, নির্ধারিত কার্যকালের মধ্যে রাষ্ট্রপতি কাহারও নিকট দায়ী নহেন বলিয়া অনেক বিষয়ে তিনিই যাহা তাহা করিতে পারেন।

সংক্ষিপ্তসার

সরকারের শ্রেণী বিভাগ

শাসন-ব্যবস্থাকে নানাভাবে ভাগ করা হয়; অ্যারিস্টট্‌ল গুণবাচক ভিত্তির উপর সরকারকে স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। তাহার পর শাসকের সংখ্যানুসারে উক্ত দুই শ্রেণীর ছয়টি বিভিন্ন নামকরণ করেন। জন-

কল্যাণের জন্য এক ব্যক্তি দ্বারা যখন শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে রাজতন্ত্র আখ্যা দেন। শাসনক্ষমতা কতিপয় অথবা বহু ব্যক্তির হস্তে থাকিলে, তাহাকে যথাক্রমে অভিজাত-তন্ত্র ও গণতন্ত্র আখ্যা দেন। বিকৃত শ্রেণীকেও সংখ্যানুসারে স্বৈরতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ও বিকৃত গণতন্ত্র আখ্যা দেন। এই প্রকার শাসনের উদ্দেশ্য হইল শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা।

বর্তমানকালে নিম্নলিখিত শাসন-ব্যবস্থাগুলি দেখা যায়:

রাজতন্ত্র

জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত একব্যক্তির শাসনকে রাজতন্ত্র বলা হয়। রাজা যখন নিজ ইচ্ছানুসারে অবাধে ক্ষমতা পরিচালনা করেন, তখন ইহা অবাধ রাজতন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। রাজার ক্ষমতা যখন শাসনতন্ত্র কর্তৃক সীমাবদ্ধ হইয়া শুধু নামসর্বস্ব রাজা হিসাবে থাকে, তখন এই শাসন-ব্যবস্থাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলা হয়।

অভিজাত-তন্ত্র

স্বল্পসংখ্যক জ্ঞানী ও গুণী লোকের দ্বারা যখন শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে অভিজাত-তন্ত্র বলা হয়।

প্রজাতন্ত্র

রাষ্ট্রের প্রধান যখন রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন, তখন তাহাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়। প্রজাতন্ত্রে জনসাধারণের ইচ্ছাই পরোক্ষভাবে কার্যকরী হয়।

গণতন্ত্র

এই শাসন-ব্যবস্থায় জনগণই হইল শাসনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। তাহারা প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ও লোকসংখ্যায় বৃহৎ বলিয়া প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্যকরী করা সম্ভব নয়। এইজন্য পরোক্ষ গণতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য একান্ত প্রয়োজন। এই শাসন-ব্যবস্থা ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সাহায্য করে ও জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে।

বর্তমানে গণতন্ত্রকে বিশেষভাবে কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনে গণনির্দেশ, গণভোট প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

একনায়ক-তন্ত্র

প্রথম মহাযুদ্ধের পর গণতন্ত্রের কতকগুলি দুর্বলতার সুযোগ লইয়া একনায়ক-তন্ত্রের আবির্ভাব হয়। একনায়ক-তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, অন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্মূল করিয়া একটিমাত্র দল শাসনক্ষমতা হস্তগত করে। এই দলের নেতাই হইলেন সর্বশক্তিমান পুরুষ এবং তাহার নির্দেশেই সমস্ত শাসনকার্য পরিচালিত হয়। নেতার পশ্চাতে দলের সমর্থন থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালি, জার্মানী ও রুশিয়ায় একনায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। একনায়ক-তন্ত্র সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আংশিকভাবে কার্যকরী হইলেও বলপ্রয়োগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না।

আমলাতন্ত্র

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ লইয়া আমলাতন্ত্র গঠিত হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা করিয়া ইহাদের যোগ্যতা স্থির করা হয়। জনসাধারণের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। ইহারা ধরাবাঁধা নিয়মে কাজ করে। সুদক্ষ হইলেও এই শাসন-ব্যবস্থাকে দায়িত্বশীল বলা চলে না।

এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সমুদয় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। স্থানীয় সরকারগুলি সব-বিষয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করা হয়। স্থানীয় ব্যাপারে স্থানীয় সরকারগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে।

এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য

(১) এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না, যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার ভাগ হয়। (২) এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকার থাকে,

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি পাশাপাশি থাকে। ৩। এক-কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য, আর যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। (৪) এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রের কোন প্রয়োজন হয় না বা (৫) কোন সুপ্রিম কোর্টেরও প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে উভয় সরকারের মধ্যে ভবিষ্যৎ বিরোধ মিটাইবার জন্য লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র ও একটি উচ্চ আদালতের প্রয়োজন হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদান—১। বিভিন্ন অঞ্চলগুলির অবিচ্ছিন্নতা, ২। একতাবোধ, ৩। রাজনৈতিক সমতা, ৪। জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সংহতি-বোধ।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা-ভাগ নীতি

যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে, আর কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি স্থানীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে।

এককেন্দ্রীয় সরকারের গুণাগুণ

এককেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান গুণ হইল ইহার অখণ্ডতা এবং এই অখণ্ডতার জন্য ইহা শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু ইহার দোষ হইল যে, বিভিন্ন অঞ্চলগুলির বিভিন্ন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হয় না। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অভাবে লোকশিক্ষার কোন ব্যবস্থা সম্ভব হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের গুণাগুণ

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। এই ব্যবস্থার সাহায্যে আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য একসঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে পারে। বহুসংখ্যক লোক এই শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

কিন্তু ইহার দোষ হইল যে, শাসনক্ষমতা ভাগ হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া পড়ে এবং কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। বড়বড় আঞ্চলিক সরকারগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করিবার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার ও ইহার গুণাগুণ

মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় শাসন-কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে সহ-যোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখা যায়। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিসংসদ আইন-সভার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে কাজ করে; আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতার পৃথিকীকরণ না-থাকার জন্য সহযোগিতার ভিত্তিতে দক্ষতার সহিত শাসন-কার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু আইনসভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিসংসদকে পদত্যাগ করিতে হয় বলিয়া এই ব্যবস্থা স্থায়ী হয় না। দলীয় শাসনের ফলে জাতীয় স্বার্থ অনেক সময় উপেক্ষিত হয়।

রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থা ও ইহার গুণাগুণ

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই এই ব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে কোন যোগসূত্র থাকে না, সুতরাং প্রত্যেক বিভাগই স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে। জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সম্ভব হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় সহযোগিতা থাকে না বলিয়া আইন-সভা ও শাসন-বিভাগের মধ্যে গুরুতর মতভেদের ফলে শাসনকার্যের ক্ষতি হয়। আইনসভার নিকট দায়ী নয় বলিয়া শাযন-বিভাগও যাহা খুসী তাহা করিতে পারে।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Explain what do you mean by Democracy. What are its merits and defects.
H. S. (Hu.) 1961, Comp.

গণতন্ত্র বলিতে কি বুঝ তাহা ব্যাখ্যা কব। ইহাব গুণ ও দোষ কি কি?

উঃ—জনসাধাবণকে লইয়া, জনসাধাবণের কল্যাণে, জনসাধারণ কর্তৃক যে শাসন-ব্যবস্থা, (Government of the people, for the people and by the people) তাহাকে গণতন্ত্র বলা হয়। গণতন্ত্র আবার দুই প্রকারেব হইতে পাবে, যথা, প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে বাষ্ট্রের সামা নগরেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সেজন্য প্রাচীন রাষ্ট্রগুলিকে নগব-রাষ্ট্র বলা হইত। এই নগর-রাষ্ট্রগুলিব সকল নাগবিকই একত্র হইয়া আইন-প্রণযন ও শাসনকার্য পরিচালনা করিত। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে প্রাপ্তবযস্ক সকল নাগবিকই আইনসভাব সদস্য হিসাবে আইন-প্রণয়ন ও কবধার্য ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করে। সুতবাং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে ভোটদাতা ও আইনসভার সদস্য—এ দুই-ই অভিন্ন। বর্তমানযুগে সুইজারল্যাণ্ডেব চারিটি ক্ষুদ্র ক্যান্টনে (বিভাগে) এই ব্যবস্থা চালু

আছে। রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা যদি স্বল্প হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্যকরী হইতে পারে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ও জনসংখ্যায় শুধু বিশাল নয়, এই রাষ্ট্রগুলির সমস্যাগুলিও জটিলতাপূর্ণ। ভারত, চীন প্রভৃতি বিশালায়তনের ও বিপুল জনসংখ্যা দ্বারা অধ্যুষিত দেশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব নহে। দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পক্ষে একস্থানে মিলিত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা ছাড়াও সাধারণ লোকের রাজনৈতিক জ্ঞান এত কম যে, তাহাদের পক্ষে দক্ষতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এই কারণে বর্তমান যুগে পরোক্ষ গণতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। এই শাসন-ব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইনসভা, মন্ত্রিসভা প্রভৃতি গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অবশ্য এই নির্বাচিত শাসকগণ তাহাদের কার্যের জন্য জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। সুতরাং পরোক্ষ গণতন্ত্রে ভোটদাতা ও আইনসভা দুইটি পৃথক সংস্থা। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণের হিতসাধন করা। পরোক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচন দ্বারা দক্ষ লোকের হস্তে শাসনভার অর্পিত হয়, সুতরাং পরোক্ষ গণতন্ত্র বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই।

গুণ (Merits)

(ক) অধুনা গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার প্রথম কারণ হইল যে, এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠী শাসিতের নিকট দায়ী থাকে। তাহাতে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়।

(খ) এই শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকই তাহার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার সুযোগ পায়। জনস্বার্থ এই শাসন-ব্যবস্থায় যেরূপভাবে সংরক্ষিত হয়, অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থায় তাহা সম্ভব হয় না।

(গ) গণতন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শাসন-কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সাহায্য করে।

(ঘ) এই শাসন-ব্যবস্থায় সমষ্টিগত জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজ সামর্থ্যমত সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ সাধনে তৎপর হয়।

(ঙ) এই শাসন-ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করে। লর্ড ব্রাইসের মতে, এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান কৃতিত্ব হইল যে, মূঢ় ও মূক জনগণকে ভোটদানের ক্ষমতা দিয়া উহা তাহাদের স্ব স্ব অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সহায়তা করে।

দোষ (Demerits)

(ক) গণতান্ত্রিক শাসনের অর্থ হইল, যাহারা সংখ্যায় বেশী তাহাদের শাসন। সুতরাং গণতন্ত্রে গুণ ও যোগ্যতা অপেক্ষা সংখ্যার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়।

Distinguish between Unitary and Federal Government? Give examples.
(H. S. Comp. 1961)

এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পার্থক্য উদাহরণসহ লিখ।

উঃ—এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র প্রধান শাসন-ব্যবস্থা থাকে এবং সেই শাসন-ব্যবস্থা হইল কেন্দ্রীয় সরকার। যুক্তরাষ্ট্রে দুই জাতীয় সরকার—কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়—পাশাপাশি থাকে।

২। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন-ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না—যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ হয়—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার এই ভাগ দেখা যায়।

৩। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সমস্ত ক্ষমতার উৎস, আর যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রই হইল ক্ষমতার উৎস। এই কারণে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের আর যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য দেখা যায়।

৪। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ লিখিত ও অনমনীয় হয়, কিন্তু এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র লিখিত ও অনমনীয় নাও হইতে পারে।

৫। যুক্তরাষ্ট্রে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় থাকিবেই, এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ইহার কোন গুরুত্ব নাই। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, তাই এখানে একটি সুপ্রিম কোর্ট আছে।

5. What are the conditions of success of a Federation?

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদান কি কি?

উঃ—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা যাহাতে ভালভাবে কাজ করিতে পারে, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য (Geographical contiguity) থাকা একান্ত আবশ্যক। এই নৈকট্যের অভাবে প্রদেশগুলির মধ্যে একতাবোধ জন্মিতে পারে না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এই নৈকট্য নাই, কিন্তু ভারতের আন্দামান প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য অংশগুলির মধ্যে এই নৈকট্য বর্তমান আছে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন অঞ্চল লইয়া গঠিত হইলেও যুক্তরাষ্ট্র একটিমাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র। সুতরাং ইহার নাগরিকগণের মধ্যে একজাতীয়তাবোধ একান্ত আবশ্যক। তৃতীয়তঃ, এই জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধিতে ভৌগোলিক নৈকট্য ও এক জাতি, এক ভাষা ও এক ধর্ম বা একই ঐতিহ্য সাহায্য করে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত বা ভাবগত ঐক্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমতা (Political equality) বাঞ্ছনীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার উচ্চ কক্ষে প্রত্যেক অঞ্চল হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া মার্কিন দেশে ছোট-বড় সকল অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক সমতা রক্ষা করা হইয়াছে। ভারতে প্রত্যেক রাজ্য হইতে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে রাজ্যসভায় প্রতিনিধির সংখ্যা স্থির হয়। রাজনৈতিক সমতা না থাকিলে বড় বড় রাজ্যগুলি ভোটের জোরে ছোট ছোট রাজ্যগুলির মতামত উপেক্ষা করিতে

পারে। ইহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্ত দেশের জনসাধারণের শিক্ষা, একাত্মবোধ ও কর্মদক্ষতা একান্ত প্রয়োজন।

6. Distinguish between Parliamentary and Presidential forms of government and indicate their respective merits and demerits.

আইনসভা-প্রধান ও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের পার্থক্য কর। ইহাদের দোষ-গুণ লিখ।

উঃ—আইনসভা-প্রধান শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সমুদয় ক্ষমতা একটি মন্ত্রিসভার হাতে থাকে। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের কাজের জন্ত আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিলে তাহাদের পদত্যাগ করিতে হয়। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাগণ মন্ত্রিসংসদ গঠন করেন এবং এই ব্যবস্থায় শাসন-বিভাগীয় ও আইন-বিভাগীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ হয়। ভারতে এই শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা ও আইন বিভাগীয় ক্ষমতার পৃথকীকরণ। এই ব্যবস্থায় একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার অধস্তন সহকর্মিগণের সাহায্যে শাসন পরিচালনা করেন। তিনি আইনসভার সদস্য নহেন ও আইনসভার নিকট দায়ী নহেন।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের গুণ হইল (১) আইনসভা ও শাসন-বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা থাকার ফলে শাসনকার্য সু-পরিচালিত হয়। (২) মন্ত্রিসংসদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে বলিয়া তাঁহারা যাহা খুসী তাহা করিতে পারেন না। (৩) বিভিন্ন মতাবলম্বী দলগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলিয়া দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয়।

ইহার ত্রুটি হইল যে, এই শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল ও অস্থায়ী। মন্ত্রিসংসদের সদস্যগণের মতভেদ হইলেই ইহাদের পতন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, দলীয় সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার পুনঃপুনঃ পরিবর্তন সম্ভব এবং বার বার পরিবর্তন হইলে কোন দীর্ঘমেয়াদী কার্যসূচী গ্রহণ করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পর্যন্ত দলের ক্ষমতা দলের নেতার হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়।

রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থার গুণ হইল যে, এই ব্যবস্থায় শাসন-কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন যোগসূত্র থাকে না। সুতরাং প্রত্যেক বিভাগই পরস্পরের প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য করিবার সুযোগ পায়। আইনসভার প্রভাবমুক্ত বলিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে ও জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

কিন্তু ইহার দোষ হইল যে, দায়িত্বশীল নয় বলিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারে। আর ক্ষমতা পৃথকীকরণের ফলে আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতার অভাবে গুরুতর মতভেদ ঘটিয়া শাসনকার্যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে।

7. Distinguish between Unitary and Federal forms of government. Is India Unitary or Federal ?

এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য কর। ভারতের শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় ?

উঃ—পার্থক্যের জন্য ৪নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

ভারতের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা মূলতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয়। যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে পূর্ণভাবে দেখা যায়। ক্ষমতা বিভাজন, লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়, রাজস্বের বণ্টন প্রভৃতি হইল যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয়, রাজ্য ও যুগ্মতালিকায় ভাগ করা হইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্র লিখিত ও অনমনীয়। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের কাজ করে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা সত্ত্বেও ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার কতকগুলি নিদর্শন রহিয়াছে। ভারতের এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হইল যে, (১) একই শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির গঠন, প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র স্থান পাইয়াছে। রাজ্য সরকারগুলির কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা নাই। (২) ভারতে সদস্য রাজ্যগুলির কোন রাজনৈতিক সমতা নাই। (৩) ক্ষমতা বিভাজনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির শাসনভার অর্পিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। (৪) এই শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা বণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। (৫) সমগ্র ভারতের জন্য এক দফা নাগরিকত্ব, একটিমাত্র আপীল আদালত ও একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য সূচিত হয়। (৬) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে অনায়াসে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করা যায়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য-গুলি এই শাসনতন্ত্রে স্থান পাইলেও ইহার কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না।

8. Distinguish between Parliamentary and Presidential forms of Government. Is the Government of India Presidential or Parliamentary ?

H. S. (Hu.) Comp. 1960

আইনসভা-প্রধান ও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য কর। ভারতের শাসন-ব্যবস্থা মন্ত্রিসংসদ-চালিত অথবা রাষ্ট্রপতি-চালিত ?

উঃ—পার্থক্যের জন্য ৬নং প্রশ্নের উত্তরের প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য।

ভারতের শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকিলেও এই শাসন-ব্যবস্থা মূলতঃ আইনসভা-প্রধান বা মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থা। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থায়

আইনতঃ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন রাজা কিম্বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। কিন্তু কার্যতঃ শাসনক্ষমতা একটি মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে। এই সভাই-শাসন পরিচালনা করেন। আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতারা মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া আইনসভার অনুমোদনে সমস্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিসভা তাহাদের নীতি ও কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রিসভার কার্য যদি আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করিতে হয়। এই শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল শাসন-বিভাগীয় ও আইন-বিভাগীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ।

ভারতের রাষ্ট্রপতি হইলেন শাসকপ্রধান। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলের নেতাগণ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া আইনসভার অনুমোদনে শাসনকার্য, আইন-প্রণয়ন ও আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করেন। আইনসভার আস্থা হারাইলে তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং শাসকবর্গ আইনসভার নিকট দায়ী। এইজন্য ইহাকে দায়িত্বশীল সরকার বলা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

(Organs of Government)

বিভিন্ন বিভাগ—Different organs

সরকারকে নানাধরণের কাজ করিতে হয়, যথা—আইন প্রণয়ন করা, শাসন করা ও বিচার করা। সরকারের এই তিনটি প্রধান কাজ যথাক্রমে আইনসভা, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই বিভাগগুলি কি, ইহাদের গঠন-প্রণালী ও কর্তব্য সম্পর্কে এখন আলোচনা করা যাউক।

আইনসভা ও ইহার কাজ—The Legislature and its functions

আধুনিককালে প্রত্যেক দেশেই আইনসভা থাকে। আইনসভার প্রধান কাজ হইল একটা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করা। আইনসভা নুতন আইন প্রণয়ন করিতে পারে, পুরাতন আইনগুলিকে সংশোধন বা বাতিল করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আইনসভা রাষ্ট্রের সমগ্র আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত শাসনকর্তৃপক্ষ রাজস্ব আদায় বা রাজস্ব ব্যয় করিতে পারে না। এই উপায়ে আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষের কাজের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারে। তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিপরিষদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ আইনসভার নিকট ইহার শাসননীতি ও কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকে। শাসনকর্তৃপক্ষের কার্য যদি আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রিপরিষদের পদত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং আইনসভার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উপরই শাসন-ব্যবস্থার ভাল মন্দ নির্ভর করে। চতুর্থতঃ, আইনসভা শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, অনেক দেশে আইনসভা রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নির্বাচন করে। ভারতের রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্ট সভা ও রাজ্য-সভাগুলির নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সুইজারল্যাণ্ড ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতিগণ আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হন। ষষ্ঠতঃ, আইনসভা কিছু বিচারবিষয়ক কার্যও করিয়া থাকে। আইনসভা রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে পারে

ও এই অভিযোগের বিচার করিতে পারে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়া তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট সভার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে, আইন-প্রণয়ন ছাড়াও আইনসভাকে অন্য নানাবিধ কাজ করিতে হয়।

আইনসভার গঠন—Organisation of the Legislature

আইনসভা বর্তমানে উচ্চপরিষদ (Upper House or Second Chamber) ও নিম্নপরিষদ (Lower House) এই দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়। আবার চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি কয়েকটি দেশের আইনসভা একটিমাত্র পরিষদ লইয়া গঠিত।

যে সমস্ত আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়, তাহাকে দ্বি-পরিষদ আইনসভা (Bi cameral legislature) এবং একটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইলে এক-পরিষদ আইনসভা (Unicameral legislature) বলা হয়। এক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপরিষদ সিনেট ছাড়া অন্যান্য দেশের উচ্চপরিষদের ক্ষমতা কম। উচ্চপরিষদগুলি সাধারণতঃ বেশী সময়ের জন্য অধিক বয়স্ক সদস্যগণ দ্বারা গঠিত হয়। উচ্চপরিষদের গঠন-পদ্ধতি সর্বত্র সমান হয় না। ইংলণ্ডের লর্ডসভার অধিকাংশ সদস্য উত্তরাধিকারবলে বা লর্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া লর্ডসভার সদস্য হন। আবার ক্যানাডায় গবর্ণর-জেনারেল উচ্চপরিষদের সদস্যগণকে আজীবন সদস্য হিসাবে মনোনয়ন করেন। ভারত প্রভৃতি কয়েকটি দেশের উচ্চপরিষদের সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশে উচ্চপরিষদের সদস্যগণ সরাসরি ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। আবার কয়েকটি দেশের উচ্চপরিষদের কিছুসংখ্যক সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন ও অবশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন।

নিম্নপরিষদের ক্ষমতা বেশী। ইহার গঠন পদ্ধতিও সর্বত্র প্রায় সমান। নিম্ন-পরিষদের সদস্যগণ সাধারণতঃ ভোটদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

আইনসভায় একটি পরিষদ বা দুইটি পরিষদ থাকিবে—Will Legislatures be Unicameral or Bi-cameral ?

আধুনিককালে প্রায় সকল সভ্যদেশের আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত

হয়। একটি পরিষদ থাকিলে সেই একটি পরিষদের ইচ্ছানুসারে আইন তৈয়ারী হয়। ইহাতে আর কেহ বাধা দিতে পারে না। কিন্তু দুইটি পরিষদ থাকিলে এই দ্বিতীয় (উচ্চ) পরিষদ নিম্নপরিষদের দ্রুত ও বিবেচনাহীন আইন-প্রণয়নে বাধা দিতে পারে। সুতরাং এদিক দিয়া উচ্চপরিষদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, উচ্চপরিষদ থাকিলে নিম্নপরিষদের রচিত আইনের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, নিম্নপরিষদের হাতে এত বেশী কাজ থাকে যে, নিম্ন-পরিষদের পক্ষে প্রত্যেকটি আইনের প্রস্তাবের বিশদ আলাপ-আলোচনা করা সম্ভব হয় না। অথচ বিশদ আলাপ-আলোচনা না করিয়া কোন আইন পাশ করাও উচিত নহে। এই কারণে উচ্চপরিষদ থাকিলে বিশেষ বিচার-বিবেচনা করা সম্ভব হয়। চতুর্থতঃ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, জ্ঞানীগুণী লোক ও বিশেষ স্বার্থগুলির প্রতিনিধিগণকে উচ্চপরিষদের সদস্য মনোনীত করিয়া আইনসভাকে দেশের সব রকম মতের প্রতিনিধিমূলক করা সম্ভব হয়। নিম্নপরিষদে নির্বাচন পদ্ধতিতে সব সময়ে যে যোগ্যব্যক্তির নিয়োগ হয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। উচ্চপরিষদ থাকিলে মনোনয়ন-পদ্ধতির দ্বারা যোগ্যব্যক্তির নিয়োগ সম্ভব হয়। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দ্বি-পরিষদ আইনসভা একান্ত অপরিহার্য। যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্ত অঞ্চল লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়, সেই অঞ্চলগুলির স্বতন্ত্র স্বার্থরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চপরিষদের প্রয়োজন দেখা যায়।

উপরে উচ্চপরিষদের স্বপক্ষে যে যুক্তিগুলি দেখান হইল তাহা সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লওয়া যায় না। প্রায় সব দেশেই আইনসভার নিম্নপরিষদই হইল অধিক ক্ষমতার অধিকারী এবং নিম্নপরিষদ যদি কোন আইন পাশ করিবে বলিয়া স্থির করে, তাহা হইলে উচ্চপরিষদ তাহাতে কোনক্রমে বাধা দিতে পারে না। সুতরাং এদিক দিয়া উচ্চপরিষদের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। মনোনয়ন-পদ্ধতি দ্বারা যোগ্যব্যক্তির নিয়োগ সম্ভব, কিন্তু মনোনয়ন-পদ্ধতি গণতান্ত্রিক নীতি-বিরোধী। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও উচ্চপরিষদের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চ আদালতের সাহায্যে আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা থাকে, এজন্য উচ্চপরিষদের প্রয়োজন হয় না। ইহা ছাড়া, বলা যায় যে, উচ্চপরিষদ যদি নিম্নপরিষদের সহিত একমত হয়, তাহা হইলে উচ্চপরিষদ বাহুল্য মাত্র, আর যদি একমত না হয় তাহা হইলে ইহা ক্ষতিকর। উচ্চপরিষদ যতই কাযকরা হউক না কেন, জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত নিম্ন-পরিষদের কার্যে বাধা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ইহার থাকিতে পারে না। আইনসভায়

দুইটি পরিষদ থাকিলে উভয় পরিষদের মতবিরোধ ঘটিলে কাজে অযথা বিলম্ব ঘটে। দুইটি পরিষদ ব্যয়সাপেক্ষও বটে।

উচ্চপরিষদের বিরুদ্ধে যতই যুক্তি দেখান হউক না কেন, প্রায় সব দেশের আইনসভাই দুই পরিষদ লইয়া গঠিত। আইন-প্রণয়নে বিশেষ বিচার বিবেচনা করা ও নিম্নপরিষদ কর্তৃক রচিত আইনের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করাই হইল উচ্চ-পরিষদের প্রধান কাজ।

আইনসভার কার্যকাল ও সংগঠন—Duration and Organisation of the Legislature

আইনসভার কার্যকাল অতি দীর্ঘ বা অতি স্বল্প হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। অতি দীর্ঘ হইলে আইনসভা দ্রুত পরিবর্তনশীল জনমতের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। আবার স্বল্পস্থায়ী হইলে দীর্ঘমেয়াদী গঠনমূলক কোন নীতি নির্ধারণ বা গ্রহণ কবিতে পারে না। এইজন্য আইনসভার স্থায়িত্ব চাব বৎসরের কম ও পাঁচ বৎসরের বেশী হওয়া উচিত নহে। ভারত, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি অনেক দেশের উচ্চপরিষদের সদস্যগণের এক নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট কাল অন্তে পরিবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা আইনসভাকে প্রচলিত জনমতের প্রতিনিধিমূলক করা হয়।

প্রত্যেক আইনসভায় আইনসভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন সভাপতি (President or Speaker) ও সহঃ-সভাপতি (Deputy Speaker) থাকেন। তিনিই সভার কার্য পরিচালনা করেন। সদস্যগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে সভার কার্য পরিচালনা করিতে পারেন, সেজন্য সভার মধ্যে তাঁহারা বাক্-স্বাধীনতা ও অন্য কয়েকটি বিশেষ সুবিধার অধিকারী। সদস্যগণ তাঁহাদের কাজের জন্য বেতন ও ভাতা পাইয়া থাকেন।

আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি—Process of Law-making

একটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন তৈয়ারী হয় এবং সবদেশেই আইন মোটামুটি একই পদ্ধতিতে তৈয়ারী হয়। আইনসভাব যে সদস্য আইন প্রণয়ন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকে প্রথমেই আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত (Drafting) করিতে হয়। খসড়া প্রস্তুত হইলে খসড়াটিকে আইনসভায় পেশ (Introduction) করিতে হয়। তারপর একটা নির্ধারিত দিনে খসড়াটির প্রথম পাঠ (First Reading) হয়। প্রথম পাঠের দিনে খুব জরুরী আইন ব্যতীত কোন আলাপ-

আলোচনা হয় না। প্রথম পাঠের পর দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading) হয়। এই সময়ে খসড়াটির মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং আলোচনার পর খসড়াটিকে একটি কমিটিতে পাঠান হয় (Committee Stage)। কমিটি বিশেষভাবে খসড়াটি পরীক্ষা করিয়া সংশোধিত আকারে বা বিনা সংশোধনে (Report Stage) খসড়াটিকে আইনসভায় ফেরত পাঠায়। ইহার পর তৃতীয় পাঠ (Third Reading) হয়। তৃতীয় পাঠে খসড়াটি পাশ হইলে অন্য পরিষদ থাকিলে সেখানে পাঠান হয়। অন্য পরিষদ একই পদ্ধতিতে খসড়াটিকে আলোচনা করিয়া পাশ করিলে খসড়াটিকে রাজা, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের নিকট পাঠান হয় এবং তাঁহার অনুমোদন পাইলে খসড়াটি আইন বলিয়া গণ্য হয়। আইনের প্রস্তাবকে খসড়া বা বিল বলে, এবং খসড়া পাশ হইলে আইন বলা হয়। ভারত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রথম পাঠের পরেই বিলটিকে কমিটিতে পাঠান হয়। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে পাশ হয়। আইন-প্রণয়নে উভয় পরিষদের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে বিরোধ নিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রত্যেক দেশেই ব্যবস্থা আছে।

শাসন-বিভাগ—The executive

ব্যাপক অর্থে শাসনকর্তৃপক্ষ বলিতে শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশ বিভাগের অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত বুঝায়। সংকীর্ণ অর্থে শাসন-কর্তৃপক্ষ বলিতে শাসনকার্যের নীতি ও কার্যক্রম যিনি বা যাঁহারা নির্ধারণ করেন তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে বুঝায়।

শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বংশানুক্রমিক রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন। এই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি আবার নামসর্বস্ব (Nominal) অথবা প্রকৃত (Real) শাসনকর্তৃপক্ষ হইতে পারেন। যখন শাসনকর্তৃপক্ষের আইন-সভার সহিত যোগসূত্র থাকে ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তখন ইহাকে আইনসভা-প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ (Parliamentary Executive) বলা হয়। ইংলণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে এই শাসন-ব্যবস্থা দেখা যায়। যেখানে রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসনকর্তা এবং তিনি মন্ত্রিগণের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন, সেই শাসন-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসন-ব্যবস্থা (Non-parliamentary or Presidential) বলা হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিগণ হইলেন শাসনবিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। ইঁহারা শাসন-নীতি নির্ধারণ করেন। ইঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য নানা শ্রেণীর অসংখ্য কর্মচারী থাকেন। এই কর্মচারিবৃন্দ নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করেন। সাধারণতঃ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা করিয়া যোগ্যতা অনুযায়ী এই সমস্ত কর্মচারী নিযুক্ত হন। ইঁহারা একটা নির্দিষ্ট বয়স হইতে কাজ আরম্ভ করেন ও একটা নির্দিষ্ট বয়সে ইঁহাদের অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ইঁহারাই হইলেন বিভাগীয় স্থায়ী কর্মচারী (Permanent Civil Service)

শাসন-বিভাগের কার্য—Functions of the Executive

শাসন-বিভাগের কার্য নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়:

১। শাসন-সংক্রান্ত কার্য—শাসন-বিভাগের প্রধান কার্য হইল আইন বলবৎ করিয়া দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং পুলিশ বাহিনী পরিচালনা ও কারাবাসের ব্যবস্থা করা।

২। কূটনৈতিক কার্য—পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থির করা। এজন্য ভিন্ন দেশের সহিত দূত বিনিময় করা, চুক্তি সম্পাদন করা ও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করা।

৩। সামরিক কার্য—পররাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করা এবং এজন্য স্থল, নৌ ও বিমান-বাহিনী গঠন করা।

৪। সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন কার্য—শাসনকর্তৃপক্ষ আইনসভার অঙ্গ হিসাবে সাধারণ আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থায়ও পরোক্ষভাবে শাসনকর্তৃপক্ষ আইন-প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। আপৎকালে শাসনকর্তৃপক্ষ জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ভারতের রাষ্ট্রপতির ব্যাপক জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা আছে।

৫। বিচার-বিষয়ক কার্য—অনেক দেশের উচ্চবিচারালয়ের বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। উর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মার্জনা করিতে পারেন।

বিচার-বিভাগ ও ইহার কার্য—The Judiciary and its functions

বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক রচিত আইনগুলিকে যথাযথভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। বিচারপতিগণ যে শুধু আইনগুলি প্রয়োগ করিয়া আইন-ভঙ্গকারি-

গণকে শাস্তিদান করেন তাহা নহে, প্রয়োজনমত তাঁহারা প্রচলিত আইনগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া এরূপভাবে প্রয়োগ করেন, যাহাতে দোষী ব্যক্তি শাস্তি পায় ও নির্দোষ ব্যক্তি অব্যাহতি পায়। এইরূপে একজন বিচারপতি কর্তৃক ব্যাখ্যা করা আইন অনুসারে যখন অন্য বিচারপতিগণ বিচার করেন তখন নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা নূতন আইন সৃষ্টি হয়। বিচারপতিগণ আর এক প্রকারে আইন সৃষ্টি করেন। যদি কোন বিষয় প্রচলিত আইনের গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহা হইলে বিচারপতিগণ তাহাদের বিবেক ও ন্যায়বুদ্ধি অনুসারে সেই সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইল শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে বিরোধ ঘটিলে শাসনতান্ত্রিক আইনের ভিত্তিতে সেই বিরোধের মীমাংসা করা। ইহা ছাড়াও, বিচারপতিগণ নির্দিষ্টক্ষেত্রে আইনসভা বা শাসনকর্তৃপক্ষের অনুরোধে কোন আইন সম্বন্ধে তাহাদের পরামর্শ দিয়া থাকেন।

বিচারক-নিয়োগ পদ্ধতি—Mode of appointment of the Judiciary

সাধারণতঃ বিচারকগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। সুইজারল্যাণ্ড, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। আবার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যগুলির বিচারকগণ সাধারণ নির্বাচনে নিযুক্ত হন। শেষোক্ত দুইটি পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত হইলে বিচারকগণ আইনসভার প্রভাবের অধীন থাকিতে পারেন। সুতরাং বিচারকার্যে যে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রয়োজন, আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত বিচারপতিগণের মধ্যে তাহা দেখা যায় না। আবার সাধারণ নির্বাচন পদ্ধতিতে বিচারক নিয়োগের ত্রুটি হইল যে, সাধারণ ভোটদাতা বিচারকের যোগ্যতা স্থির করিয়া যোগ্যব্যক্তিকে নির্বাচন করিতে পারে না।

বিচার-ব্যবস্থার উপরই একটা দেশের শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। বিচারপতি যদি বিচারকার্যে পক্ষপাতিত্ব করেন, তাহা হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। এজন্য নিরপেক্ষ, স্বাধীনচেতা ও আইনজ্ঞ বিচারপতি নিয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। আইনসভা বা সাধারণ ভোটদাতা কর্তৃক নিযুক্ত বিচারক নিরপেক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। সুতরাং নির্দিষ্টকালের জন্য শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচারক নিযুক্ত হওয়া কাম্য। বিচারকগণকে উপযুক্ত পরিমাণ

বেতন দিয়া ও তাঁহাদের কার্যকালের স্থায়িত্ব স্থির করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়।

সরকারের বিভিন্ন কার্যের পৃথকীকরণ—Separation of Powers

সরকার সাধারণতঃ তিন প্রকার কাজ করিয়া থাকে, যথা, আইন-প্রণয়ন, আইন বলবৎ করা ও আইন প্রয়োগ করিয়া আইনভঙ্গ হইয়াছে কিনা স্থির করিয়া আইন-অমান্যকারীকে শাস্তি দেওয়া। সরকারের এই তিনটি কার্য যথাক্রমে আইন-সভা, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। সুতরাং সরকারের তিনটি প্রধান কার্যের জন্য তিনটি বিভাগ আছে। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে কি সম্পর্ক হওয়া উচিত তাহা লইয়া মতভেদ দেখা যায় এবং এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী লেখক-গণ বহু আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল ও রোমান দার্শনিকগণের আলোচনায় এই ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির উল্লেখ দেখা গেলেও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ফরাসী লেখক মণ্টেস্কুই সর্বপ্রথম এই নীতিটির বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সরকারের তিনটি কাজ সম্পূর্ণ পৃথক এবং সেজন্য তিনটি পৃথক ও স্বাধীন বিভাগ দ্বারা এই কার্য পরিচালনা করা উচিত। যদি এই তিনটি কাজই অথবা যে-কোন দুইটি একটি হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে স্বেচ্ছা-চারিতা প্রশ্রয় পায় এবং ইহার ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা হয়। সুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই তিনটি ক্ষমতা একহস্তে ন্যস্ত না হইয়া তিনটি পৃথক ও স্বাধীন হস্তে ন্যস্ত হওয়া কাম্য। পূর্বে রাজার হাতে যখন সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল, তখন তিনি তাঁহার খুসীমত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন এবং তাঁহার খুসীমত বিচারকার্য পরিচালনা করিতেন। এই ব্যবস্থায় প্রজা-সাধারণের জীবন, ধন ও মানের কোন নিরাপত্তা থাকিতে পারে না। সুতরাং শাসন-ব্যবস্থার এই অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার নিরোধ করিবার জন্য প্রত্যেকটি বিভাগের কাজ এরূপভাবে পৃথক হওয়া উচিত যে, প্রত্যেক বিভাগ অপর বিভাগের অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়।

সমালোচনা—সরকারী বিভিন্ন কাজগুলি পৃথক হওয়া উচিত এ কথা মানিয়া লইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সরকারী কার্যে এইরূপ সূক্ষ্ম বিভাগ সম্ভব নহে। কারণ প্রত্যেক বিভাগেরই অপর বিভাগ দুইটির কিছু-না-কিছু কাজ করিতে হয়। আইন প্রণয়ন করা আইনসভার প্রধান কাজ হইলেও ইহাকে কিছু কিছু শাসন-বিভাগীয় ও

বিচার বিভাগীয় কাজ করিতে হয়। অনুরূপভাবে অন্য দুইটি বিভাগের প্রতিটির নিজের বিভাগীয় কাজ ব্যতীত অন্য দুইটি বিভাগেরও কিছু কাজ করিতে হয়।...

দ্বিতীয়তঃ, কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থায়ই ক্ষমতার এইরূপ সূক্ষ্ম বিভাগ স্থান পায় নাই। ভারতে শাসন-বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইলেন রাষ্ট্রপতি। তাঁহার জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ও দণ্ডিত ব্যক্তিকে মার্জনা করিবার বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা আছে। ভারতে প্রকৃত শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হইল মন্ত্রিসংসদ। কিন্তু এই মন্ত্রিসংসদের সদস্যগণ আবার আইনসভার সদস্য এবং আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন। শাসনকার্যের জন্য তাঁহারা আইনসভায় নিকট দায়ী। বৃটিশ শাসনকালে ভারতে ক্ষমতার পৃথকীকরণ ছিল না। জেলাশাসক একাধারে জেলার শাসনকর্তা ও বিচারক ছিলেন। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইত। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিবার নির্দেশ দেওয়া আছে এবং এই নির্দেশ অনুসারে কোন কোন রাজ্যে কার্য আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায়ও এই ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি স্থান পায় নাই। রাজাই হইলেন শীর্ষস্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষ। আইন-প্রণয়নে রাজার সম্মতি অপরিহার্য। তিনি বিচারপতিগণকে নিয়োগ করেন ও দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি মকুব করিতে পারেন। কেবিনেট সদস্যগণ আইনসভার সদস্য হিসাবে আইন প্রণয়ন করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা পৃথকী-করণ নীতির প্রয়োগ বিশেষভাবে দেখা যায়। রাষ্ট্রপতি, আইনসভা ও বিচার-বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক ও পারস্পরিক প্রভাব-মুক্ত। কিন্তু পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি আইন-প্রণয়ন কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। আইনসভাও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উচ্চপদে নিয়োগসমূহ ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিগুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। উচ্চবিচারালয়ের বিচারপতিগণও আইনসভার উচ্চপরিষদের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন, রাষ্ট্রপতির কাজ ও আইনসভা-প্রণীত আইন বিচারপতিগণ বেআইনী বলিয়া অবৈধ ঘোষণা করিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ, ক্ষমতার পূর্ণ পৃথকীকরণের ফলে তিনটি বিভাগের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়। দেহের উন্নতির জন্য যেরূপ প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা দরকার, সরকারের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সেইরূপ সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। উদরের সহিত অসহযোগ ঘোষণা করিয়া হাত, পা, মুখ প্রভৃতি অঙ্গ-গুলি যদি নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহা হইলে শুধু উদর নয়, সমস্ত দেহই দুর্বল হয়।

সরকারের বিভিন্ন কাজগুলির মধ্যে এইরূপ পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকিলে সুশাসন সম্ভব হয় না।

চতুর্থতঃ, 'বলা হয় যে, ক্ষমতাগুলি পৃথক না থাকিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্ভব। কিন্তু এ যুক্তিও সমর্থন করা যায় না। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় এই তিনটি ক্ষমতা বিশেষ পৃথক নাই, অধিকন্তু একত্রিত আছে, তাহা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের লোক অতিমাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা শুধুমাত্র ক্ষমতা-পৃথকীকরণের উপর নির্ভব করে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ হইল জনগণের স্বাধীনতা বক্ষা করিবার আন্তরিক প্রয়াস ও সদা-জাগ্রত দৃষ্টি (Eternal vigilance is the price of liberty)।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বর্তমানে আর ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির কোন সার্থকতা নাই। স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থায় এই নীতি কাযকরী কবিবার প্রয়োজন ছিল বটে, কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই নীতিব আব বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই। তবে সরকারের বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন ধরণের এবং এই বিভিন্ন ধবণের বিভিন্ন কাজগুলি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, সেজন্য বিভাগগুলির কাজের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। আইনসভা বহুসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ইহার সদস্য-গণের বিশেষ কোন যোগ্যতার আবশ্যক হয় না। জনমত অনুসারেই ইহাদের কাজ করিতে হয়। কিন্তু বিচাব-বিভাগেব কাজ সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। বিচারক-গণের বিশেষ যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন এবং বিচারকগণ জনমত অনুসাবে বিচার-কার্য পরিচালনা কবিলে বিচাব-ব্যবস্থা ভাল হইতে পাবে না। এই কারণে বিচারকের কাজ আইনসভার দ্বারা সম্পাদিত হওযা উচিত নয়। সুতরাং বিচার-বিভাগ ও আইনসভার কাজের মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত। এই পার্থক্য থাকিলে প্রত্যেক বিভাগেব কাজ উপযুক্ত লোকের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি হইতে পাবে।

ভারতে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ—Application of the Theory of Separation of Powers in India.

১৯৪৭ সালের পূর্বে বৃটিশ শাসনকালে এই নীতি ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় আদৌ স্থান পায় নাই। তখন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্ণরগণ শুধুমাত্র শাসকপ্রধান ছিলেন না, তাঁহাদের হস্তে যথেষ্ট আইন-প্রণয়ন ক্ষমতাও ন্যস্ত ছিল।

প্রাণদণ্ড মকুব করিবার বিচার-সম্পর্কিত ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তেও জিলা শাসনের কাজ ও বিচারের কাজ ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা যে-কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটকও রাখিতে পারিতেন।

দেশ স্বাধীন হইবার পর পূর্বতন অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিলেও ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি যে সম্পূর্ণভাবে ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় গৃহীত হইয়াছে—একথা বলা চলে না। ভারতে পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকার ফলে শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রহিয়াছে; যথা, মন্ত্রি-পরিষদের সদস্যগণকে অবশ্যই আইনসভার সদস্য হইতে হইবে এবং আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণের হস্তে সাময়িকভাবে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা (ordinance making power) ন্যস্ত আছে। সংবিধানে বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করিবার ব্যবস্থার উল্লেখ থাকিলেও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এখনও পর্যন্ত একাধারে জিলার প্রধান শাসক ও বিচারক হিসাবে কাজ করিতেছেন। নূতন শাসনতন্ত্রের নির্দেশ বলবৎ হইলে অবশ্য ম্যাজিষ্ট্রেটের হাত হইতে বিচার-বিভাগীয় কার্য অপসৃত হইবে।

শাসন-বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর—Departments of government

শাসন-বিভাগের কাজ আবার বিভিন্ন উপ-বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই উপ-বিভাগগুলিকে দপ্তর বলা হয়। প্রত্যেক দপ্তরের একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকেন, যাঁহার হস্তে এই দপ্তর-সংক্রান্ত সমস্ত ভার ন্যস্ত থাকে। দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর একজন প্রধান কর্মসচিব (Chief Secretary), সহঃ-কর্মসচিব এবং অধস্তন কর্মচারী থাকে। মন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে প্রধান কর্মসচিব তাঁহার অধস্তন সহকর্মিগণের সাহায্যে বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করেন। বিভাগীয় কার্যের জন্য মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রী-মহাশয় আইনসভার নিকট দায়ী হইলেও এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের কোন দায়িত্ব নাই। মন্ত্রিগণ বিভাগীয় শাসনকার্যের নীতি নির্ধারণ করেন ও স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ এই নীতিকে কার্যে রূপদান করে। এইরূপে প্রত্যেক দেশের শাসন-ব্যবস্থায় শাসনকার্য সু-পরিচালনার জন্য বহু বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ প্রায় ৬০টি দপ্তর আছে। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা ২০ হইতে ২৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত এবং এই প্রত্যেকটি মন্ত্রীর একটি পৃথক দপ্তর আছে। ভারত সরকারের কার্য বর্তমানে ২০টি বিভিন্ন দপ্তর দ্বারা পরিচালিত

হয়। দপ্তরগুলি হইল :—১। পররাষ্ট্র, ২। শিক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ৩। প্রতিরক্ষা, ৪। স্বাস্থ্য, ৫। আভ্যন্তরীণ শাসন ও রাজ্য-সংক্রান্ত, ৬। অর্থ, ৭। যোগাযোগ, ৮। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা, ৯। শিল্প, ১০। আইন ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ১১। রেল ও অন্যান্য পরিবহন-ব্যবস্থা, ১২। সরবরাহ, গৃহ-নির্মাণ ও অন্যান্য কায, ১৩। শ্রম, ১৪। উৎপাদন, ১৫। খাদ্য, ১৬। পুনর্বাসন, ১৭। পার্লামেন্ট-সংক্রান্ত, ১৮। দেশরক্ষা-ব্যবস্থা, ১৯। সংবাদ ও বেতার, ২০। কৃষি।

সংক্ষিপ্তসার

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

সরকারের তিনটি প্রধান কাজ তিনটি বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়, যথা, আইনসভা, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ।

আইনসভা ও ইহার কার্য

আইনসভার প্রধান কায হইল (১) আইন প্রণয়ন করা। ইহা ছাড়াও আইনসভা (২) আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে, (৩) শাসনকর্তৃপক্ষের কায নিয়ন্ত্রণ করে ও (৪) বিচার-বিভাগীয় কিছু কায করে।

এক-পরিষদ ও দ্বি-পরিষদ আইনসভা

আইনসভা একটি অথবা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইতে পারে। নিম্ন-পরিষদের সদস্যগণ ভোটদাতা কর্তৃক নির্বাচিত হন, আর উচ্চপরিষদের সদস্যগণ উত্তরাধিকার-সূত্রে অথবা মনোনয়ন-পদ্ধতিতে বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন।

বর্তমানে প্রায় সকল দেশের আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়। উচ্চ পরিষদের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি বলা হয় :—১। নিম্নপরিষদের বিবেচনাহীন ও দ্রুত আইন-প্রণয়নে উচ্চপরিষদ বাধা দিতে পারে। ২। আইন-প্রণয়নে নিম্নপরিষদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে। ৩। বিশেষ শ্রেণী ও যোগ্য ব্যক্তিগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। ৪। যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে।

বিপক্ষে যুক্তি :—১। নিম্নপরিষদের ক্ষমতা বেশী বলিয়া এই পরিষদ ইচ্ছা করিলে উচ্চপরিষদের বিনা সম্মতিতে আইন পাস করিতে পারে। ২। যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চবিচারালয়ই আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থ রক্ষা করে। সেজন্য উচ্চপরিষদের প্রয়োজন হয় না। ৩। উচ্চপরিষদ নিম্নপরিষদের সহিত একমত হইলে ইহা বাহুল্যমাত্র, আবার একমত না হইলে ইহা হানিকর।

আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি

আইনের প্রস্তাবককে আইনের খসড়া প্রণয়ন করিয়া আইনসভায় পেশ করিতে হয়। নির্দিষ্ট দিনে প্রথম পাঠ হয়। তাহার পর দ্বিতীয় পাঠ হয়। দ্বিতীয় পাঠের পর উহা একটি কমিটিতে যায়। কমিটি বিচার-বিবেচনা করিয়া আইনসভায় পাঠায়। তারপর তৃতীয় পাঠে আইনটি পাশ হইলে অন্য পরিষদ থাকিলে সেই পরিষদের বিবেচনার জন্য পাঠান হয়। অপর পরিষদের সম্মতি পাইলে প্রস্তাবটি শাসন-বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সম্মতিক্রমে আইনের মর্যাদা লাভ করে।

শাসন-বিভাগ

শাসন-বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদকে শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হইলেও শাসনকার্যে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারিগণকে লইয়া শাসন-বিভাগ গঠিত হয়।

শাসন-বিভাগের কাজ

১। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা কার্য, ২। বৈদেশিক ব্যাপার নিষ্পন্ন করিবার জন্য কূটনৈতিক কার্য, ৩। যুদ্ধ-পরিচালনা ও শান্তি-স্থাপনের জন্য সামরিক কার্য, ৪। সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন কার্য, ৫। বিচার-বিষয়ক কার্য।

বিচার-বিভাগ ও ইহার কার্য

(১) বিচার-বিভাগ আইন প্রয়োগ করে ও আইন-ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেয়, (২) আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি করে, (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে।

বিচারক-নিয়োগ পদ্ধতি

(১) জনগণ কর্তৃক অথবা, (২) আইনসভা কর্তৃক বিচারকগণ নির্বাচিত হইতে

পারেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার দ্বারা বিচারকগণের স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সেজন্য (৩) শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচারক-নিয়োগ পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া বিবেচিত হয়।

সরকারের বিভিন্ন কার্যের পৃথকীকরণ—Separation of Powers

সরকারের তিনটি বিভিন্ন কার্য আছে, যথা, আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচার-কার্য। এই তিনটি কার্য তিনটি পৃথক বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়। ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি অনুসারে বলা হয় যে, এই তিনটি বিভাগের কার্য এক হস্তে ন্যস্ত না হইয়া তিনটি পৃথক ও স্বাধীন বিভাগের হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত, কারণ এক হস্তে একাধিক ক্ষমতা ন্যস্ত হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে। ফরাসী লেখক মন্‌টেস্কু এই নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই নীতিটির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ক্ষমতার পৃথকীকরণ কার্যতঃ সম্ভবও নহে এবং কাম্যও নহে। কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থায়ই এই নীতি সম্পূর্ণভাবে বলবৎ হয় নাই। প্রত্যেক বিভাগেরই অপর বিভাগের কিছু কিছু কার্য করিতে হয়। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় এই নীতি কার্যকরা হয় নাই, তাহা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের লোক স্বাধীন। বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে শাসন-ব্যবস্থার কার্য সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। সুতরাং নীতি হিসাবে ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। তবে কর্মদক্ষতার জন্য কিছু পরিমাণ পৃথকীকরণ থাকা উচিত।

শাসন-বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর

শাসন-বিভাগের বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন দপ্তর থাকে এবং প্রত্যেক দপ্তরের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকেন। মন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য বহুসংখ্যক স্থায়ী কর্মচারী থাকে। আধুনিক সরকারগুলির প্রধান প্রধান বিভিন্ন দপ্তর হইল: আভ্যন্তরীণ, পররাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প, শ্রমিক, খাদ্য, বেতার ইত্যাদি।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. **What are the different organs of the Government? Describe their respective functions.**

সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলি কি ও উহাদের প্রত্যেকের কার্যের বিবরণ লিখ।

উঃ—আধুনিককালে সরকারগুলির কাজ প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। বিভাগ তিনটি হইল। ১। আইনসভা ২। শাসন-বিভাগ ও ৩। বিচার-বিভাগ।

আইনসভার কায—১। আইনসভার প্রধান কার্য হইল একটা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করা। আইনসভা নূতন আইন প্রণয়ন করে ও পুরাতন আইন বর্জন বা সংশোধন করিতে পারে। ২। আইন পাস করিবার পূর্বে আইনসভা প্রত্যেকটি আইন বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করে এইজন্য আইন প্রণয়ন করিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ৩। সরকারী আয়-ব্যয়ের আলোচনা ও মঞ্জুরি করা আইনসভার আর একটি কাজ। শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচার-বিভাগকে আইনসভা কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ব্যয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। ৪। শাসন-কর্তৃপক্ষ তাহাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। শাসন-বিভাগীয় কায বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইতে গেলে অনেক দেশে আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন। ৫। রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতিগণ অনেক দেশে আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ৬। আইনসভার কিছু বিচার-বিভাগীয় কাজও থাকে। রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদিগকে অভিযুক্ত ও বিচার করিবার ক্ষমতা আইনসভার উচ্চ কক্ষের হস্তে ন্যস্ত থাকে। সুতরাং আইন প্রণয়ন ব্যতীতও আইনসভাকে আরও নানাবিধ কায করিতে হয়।

শাসন-বিভাগীয় কায—১। শাসন-বিভাগের প্রধান কায হইল আইনসমূহ প্রয়োগ করিয়া শাসনকায পরিচালনা করা। ২। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা ও চুক্তি সম্পাদন করা। ৩। যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করা। ৪। জরুরী অবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ভারতের রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা আছে। শাসনকর্তৃপক্ষের কিছু কিছু বিচার-বিষয়ক ক্ষমতাও থাকে।

বিচার বিভাগীয় কায—১। বিচার বিভাগের প্রধান কায হইল আইন প্রয়োগ করা। ২। আইনগুলির প্রয়োগ ব্যতীতও তাঁহারা আইনগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। ৩। আইন ব্যাখ্যাকালে অনেক সময় তাঁহারা নূতন আইন সৃষ্টি করেন। ৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে শাসনতন্ত্রের আইনগুলির ব্যাখ্যা করিতে হয়। ৫। অনেক সময় বিচারপতিগণকে আইনসভা ও শাসন বিভাগকে আইনসম্বন্ধীয় পরামর্শ দান করিতে হয়।

2 Why is Separation of powers considered desirable? Show that a complete separation of powers is neither necessary, nor desirable,

ক্ষমতার পৃথকীকরণ কেন কাম্য? ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ প্রয়োজনীয়ও নহে, সম্ভবও নহে কেন? (H S (Hu) 1968)

উঃ—সরকারের শাসনপরিচালনা কায সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়, যথা, আইন-প্রণয়ন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার-বিভাগ। ক্ষমতা-পৃথক করণ নীতি অনুযায়ী বলা হয় যে, সরকারের এই তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক থাকিয়া স্বাধীনভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কায পরিচালনা করিবে। একে অপরের কাযে হস্তক্ষেপ করিবে না। যদি একাধিক ক্ষমতা একই ব্যক্তি বা একই ব্যক্তি সংসদের উপর ন্যস্ত হয় তাহা হইলে স্বৈরাচার-শাসন প্রবর্তন হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে। পুরাকালে রাজার হাতে যখন আইন-প্রণয়ন, আইন বলবৎ ও বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজা স্বৈরাচারী হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতেন। এই মতবাদের প্রধান ব্যাখ্যাতা ও সমর্থক ছিলেন ফরাসী দার্শনিক মন্টেস্কু ও ইংরাজ লেখক ব্ল্যাকষ্টোন। ফরাসী দেশের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের উপর এই মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সমালোচনা—এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ক্ষমতার পৃথকীকরণ কার্যতঃ সম্ভবও নহে, কাম্যও নহে। কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থায়ই এই নীতি সম্পূর্ণভাবে বলবৎ হয় নাই। ভারতে মন্ত্রিমণ্ডলী-আইনসভার সদস্য, আবার জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় যে, এক বিভাগ অন্য বিভাগের কিছু কিছু কায করে। সব দেশেই আইনসভা কিছু বিচারবিষয়ক কার্য করে। সুতরাং বাস্তবক্ষেত্রে ক্ষমতার সূক্ষ্ম বিভাগ সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষমতা পৃথকীকরণের উপর একান্ত নির্ভরশীল নহে। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় এই নীতি কাযকরী হয় নাই, তাহা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের লোক স্বাধীন। চতুর্থতঃ, এই মতবাদে বলা হয় যে, সরকারের তিনটি বিভাগই সমান ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু কাযতঃ দেখা যায় যে, আইনসভার ক্ষমতা অপর দুইটি বিভাগের ক্ষমতা অপেক্ষা বেশী। পঞ্চমতঃ, ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের ফলে তিনটি বিভাগের মধ্যে গুরুতর মতভেদ হইলে সরকারী কাজে অচল অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

সুতরাং দেখা যায় যে, বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে শাসনকায সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। তবে এই মতবাদের মূল্য হইল যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিভাগগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য থাকিবে—বিশেষ করিয়া বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা অটুট রাখিতে হইবে। বিভিন্ন বিভাগগুলির কর্মদক্ষতার জন্য কিছু পরিমাণ পৃথকীকরণ কাম্য।

3. "The function of the legislature is not merely the making of laws"
What other functions does the legislature in a democratic country discharge?
'আইন প্রণয়ন করাই আইনসভার একমাত্র কায নহে'। আইন প্রণয়ন ছাড়া আইনসভা অন্য কি কাজ করে তাহা লিখ।

উঃ—১নং প্রশ্নের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য।

4. What is meant by a bi-cameral form of legislature? Do you favour such a form of legislature? If so, why?
দ্বি-পরিষদ আইনসভা বলিতে কি বুঝ? দ্বি-পরিষদ আইনসভা কি পছন্দ কর? পছন্দের কারণগুলি বিবৃত কর

উঃ—যে আইনসভা দুইটি কক্ষ—উচ্চ ও নিম্ন লইয়া গঠিত হয় তাহাকে দ্বি-পরিষদ আইনসভা বলা হয়। ভারতের আইনসভা পার্লামেণ্ট—রাজ্যসভা ও লোকসভা এই দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। সুতরাং ভারতের আইনসভা দ্বি-পরিষদযুক্ত।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশের আইনসভাই দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা জনপ্রিয় হওয়ার ফলে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আইনসভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত হইলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইলে উচ্চ পরিষদ নিম্ন পরিষদের দ্রুত ও বিবেচনাহীন

আইন-প্রণয়নে বাধা দিয়া জনমত জাগ্রত করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে উভয় পরিষদ পরস্পরের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, দুইটি পরিষদ থাকিলে দেশের অধিকতর সংখ্যক লোক আইন-প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ফলে, আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অধিকতরভাবে জনমত প্রতিফলিত করে। চতুর্থতঃ, উচ্চ কক্ষ বিশেষ শ্রেণী ও যোগ্যব্যক্তিগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দ্বি-পরিষদ আইনসভার বিশেষ গুরুত্ব আছে। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ-পরিষদ সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় বলিয়া বিভিন্ন প্রদেশগুলির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে।

উপরি-উক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে দ্বি-কক্ষ আইনসভার অস্তিত্ব সমর্থন করা হয়, কিন্তু এই যুক্তিগুলির বিরুদ্ধেও আবার অনেক যুক্তি দেখান যায়।

5. **Why is it considered desirable to separate powers of the legislative, executive and judicial organs of a government ?** H. S. (Hu) 1960

সরকারের আইন-বিভাগ, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগের কার্য পৃথক করিবার প্রয়োজনীয়তা কি লিখ।

উঃ—সরকারের তিনটি প্রধান কার্য হইল আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচার। এই তিনটি কার্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক দেশেই আইনসভা, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ থাকে। আইন-সভার প্রধান কাজ হইল আইন প্রণয়ন করা। শাসন-বিভাগ এই আইন বলবৎ করে এবং বিচার-বিভাগ আইন ভঙ্গ হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া অপরাধীকে শাস্তি দেয়।

ক্ষমতাবিভাজন নামে একটি মতবাদে সরকারের এই তিনটি বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচিত হইয়াছে। এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ফরাসী দার্শনিক মন্টেস্কু বলেন যে, এই তিনটি ক্ষমতা একই হস্তে ন্যস্ত করা সমীচীন নহে। একই হস্তে তিনটি ক্ষমতা ন্যস্ত হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, কারণ একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ যদি তিনটি ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহা হইলে এই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ তাহাদের খুসীমত আইন প্রণয়ন করিবে এবং নিজেদের খামখেয়াল মত বিচার করিয়া আইন বলবৎ করিবে। শাসনকর্তা যদি আবার বিচারক হন তাহা হইলে তিনি বে-আইনীভাবে লোক গ্রেপ্তার করিয়া খুসীমত শাস্তি দিতে পারেন। এই ব্যবস্থায় ন্যায় আশা করা যায় না—ফলে শাসকের অত্যাচারে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। এই জন্যই আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচার এই তিনটি কাজ পৃথক রাখা প্রয়োজন যাহাতে এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্যের উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করিতে না পারে।

কিন্তু বর্তমানে উপরি-উক্ত যুক্তির ভিত্তিতে সরকারের তিনটি কার্যের পৃথকীকরণ সমর্থন করা যায় না। কারণ ক্ষমতা পৃথকীকরণ ব্যতীতও ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। গ্রেটবৃটেনের শাসন-ব্যবস্থা ক্ষমতা পৃথক না করিয়াও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচার সরকারের এই তিনটি কাজ বর্তমানযুগে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। আর এই তিনটি কাজ সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। সুতরাং একই ব্যক্তি বা একই ব্যক্তিসংসদের পক্ষে এই তিনটি পৃথক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নহে।

সুতরাং পৃথক, যোগ্যতাসম্পন্ন তিনটি পৃথক সংস্থার হস্তে এই কাজগুলি ন্যস্ত করা কাম্য। কিন্তু সরকারী কাজগুলির মধ্যে যে মূলগত ঐক্য আছে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা কাম্য। তবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচার-বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নিশ্চয়ই বজায় রাখিতে হইবে।

6. **Explain the limits to the theory of Separation of powers.**

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির বাধা কি উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

উঃ—ক্ষমতা পৃথকীকরণ-নীতি অনুসারে বলা যায় যে, সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগ—আইনসভা, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য পরস্পর হইতে পৃথক ও স্বাধীন থাকিবে, কিন্তু নীতিগতভাবে ইহা কাম্য নহে এবং কার্যক্ষেত্রে ইহা প্রয়োজন নহে। কারণ, এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আইন প্রণয়ন করা ছাড়াও আইনসভা শাসন ও বিচার বিভাগীয় কিছু কাজ করে। দ্বিতীয়তঃ, আবার দেখা যায়, এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে। ভারতে মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে আইনসভার সদস্য হইতে হয় এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাহাদের কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। এইরূপ কোন বিভাগই অন্য দুইটি বিভাগের সম্পূর্ণরূপে প্রভাবমুক্ত বা সম্পর্কহীন নহে। তৃতীয়তঃ, এই নীতি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ নহে। ইহার প্রয়োগ ব্যতীতও গ্রেটবৃটেনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। চতুর্থতঃ, তিনটি বিভাগই সমান ক্ষমতার অধিকারী ও সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে না। কারণ, বিভাগগুলির মধ্যে বিরোধ হইলে মীমাংসার আর কোন উপায় থাকে না। এইজন্য সব দেশেই আইনসভাই হইল সবচেয়ে বেশী ক্ষমতার অধিকারী। পঞ্চমতঃ, বর্তমান যুগে কল্যাণ রাষ্ট্র ধারণার আবির্ভাবে এই নীতির গুরুত্ব অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কল্যাণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সমগ্রভাবে জনকল্যাণ সাধন করা। সরকারের বিভাগগুলির মধ্যে বিরোধিতা ও প্রতিযোগিতার স্থলে ঐকান্তিক সহযোগিতা না থাকিলে জনকল্যাণ সাধন সম্ভব নহে। সুতরাং ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ নীতি প্রয়োগের পথে অনেক বাধা আছে।

———

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্রের কার্যাবলী

(Functions of Government)

রাষ্ট্র কি কাজ করিবে বা রাষ্ট্রের কি কাজ করা উচিত—এ সম্পর্কে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, রাষ্ট্রের কাজ যতই কম হইবে ব্যক্তির পক্ষে ততই মঙ্গল। আবার, কাহারও কাহারও মতে রাষ্ট্রের কাজ যতই প্রসারিত হইবে ব্যক্তির মঙ্গল ততই বেশী হইবে। সুতরাং একদলের মত হইল রাষ্ট্রের কার্যকলাপ ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা, অপরদলের মত হইল রাষ্ট্রের কার্যকলাপ বহুদূর প্রসারিত করা। সুতরাং রাষ্ট্র-কর্তব্য সম্পর্কে এই দুইটি মতবাদকে পরস্পর-বিরোধী বলা যাইতে পারে। যাঁহারা রাষ্ট্রের কাজ কমাইবার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগের মতবাদকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বলা হয় এবং যাঁহারা রাষ্ট্রের কাজ প্রসারিত করিবার পক্ষপাতী তাঁহাদের মতবাদকে সমাজতন্ত্রবাদ বলা হয়। এখন এই দুইটি মতবাদ আলোচনা করিলে রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যাইতে পারে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ—Individualism

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে বলা হয় যে, রাষ্ট্র মানবজীবনের প্রধান অভিশাপ। ইহা ভাল প্রতিষ্ঠান নহে, নিতান্ত মন্দ। তথাপি রাষ্ট্র না হইলে মানুষের চলে না। মানব-সমাজে যতদিন পর্যন্ত অপরাধমূলক কার্য অনুষ্ঠিত হইবে, ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র না হইলে চলিবে না। যেদিন সমাজ হইতে সমস্ত প্রকার দুষ্কার্য দূর হইবে, সেদিন আর রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং বর্তমানে রাষ্ট্র না হইলে নেহাৎ চলে না বলিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ রাষ্ট্রকে একটি অপরিহার্য পাপ বলিয়া মনে করেন। এইজন্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ বলেন, রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি যতই কম হইবে, ব্যক্তির পক্ষে ততই মঙ্গল। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের প্রধান কার্য হইল আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য শাসনকার্য পরিচালনা ও বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করা। ইহার অতিরিক্ত কোন কাজ রাষ্ট্র করিতে পারিবে না। অন্য সমস্ত বিষয়ে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা থাকিবে এবং তাঁহারা

বলেন এইরূপ স্বাধীন অবস্থায়ই ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের সুযোগ পাইতে পারে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি—Arguments for Individualism

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ তাঁহাদের মত সমর্থনের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, মানুষ নিজের ভাল নিজেই বুঝে। সুতরাং নিজের যাহাতে ভাল হয় প্রত্যেকে তাহাই করিবে। ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল হইবে এবং সকলের মঙ্গল হইলে সমষ্টিগত মঙ্গলও সাধিত হইবে। সুতরাং ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা আরও বলেন যে, রাষ্ট্র যদি ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে ব্যক্তি তাহার নিজের চেষ্টার দ্বারা কোনদিনই স্বাবলম্বী হইতে পারিবে না। সে চিরদিনই শিশু থাকিয়া যাইবে। ব্যক্তিগত ব্যাপারে অত্যধিক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে কোন কাজেই ব্যক্তির আর অনুপ্রেরণা থাকিবে না এবং ইহার ফলে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব হইবে না। ইহা ছাড়া, রাষ্ট্র যদি সব কাজ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে কোন কাজই ভাল করিয়া করিতে পারিবে না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ তাঁহাদের মতবাদের সমর্থনে অর্থনৈতিক যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন, রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ না করিলে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ও উৎপন্ন দ্রব্য উন্নতশ্রেণীর হইবে এবং প্রতিযোগিতার ফলে মূল্য কমিবে। প্রতিযোগিতার ফলে একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিগণ টিকিয়া থাকিবে আর যাহারা অযোগ্য তাহারা অপসারিত হইবে। ইহাতে সমাজের মঙ্গল হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়ুরোপে রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই অত্যধিক রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের প্রতিবাদস্বরূপ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হয়। এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন জার্মান দার্শনিক ক্যান্ট, ফরাসী দার্শনিক হুতকভেল ও ইংরাজ ধনবিজ্ঞানী রিকার্ডো, স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতি।

বিপক্ষে যুক্তি—Arguments against Individualism

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণের যুক্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। যুক্তিগুলির মধ্যে বহু ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে অতীতে ও বর্তমানে রাষ্ট্র যেরূপ সাহায্য করিয়াছে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান তাহা করিতে পারে নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের একেবারেই কোন প্রয়োজন নাই একথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ নিজের ভাল নিজে বুঝিলেও সব সময়ে তাহা বুঝিতে

পারে না বা বুঝিতে চায় না। বসন্ত ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় সকলে স্বেচ্ছায় টিকা না লইয়া নিজের ও অপরের নিরাপত্তা নষ্ট করে। এইরূপ ক্ষেত্রে সমষ্টির মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়া, ব্যক্তিগত স্বার্থ সমষ্টিগত স্বার্থের সহিত এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, একমাত্র রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কেহ ব্যক্তি তথা সমষ্টির শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। ইহা ছাড়াও বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে সব সময়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তির যাহা খুসী তাহা করিবার ক্ষমতা বুঝায় না। এইজন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র স্থির করিয়া দেয়। রাষ্ট্র না থাকিলে দুর্বলের কোন স্বাধীনতা থাকিত না। সুতরাং সকলের সমান স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তির যাহাতে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়, সেই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র বিবিধ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সুতরাং সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান ঘটাইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ন্যায্য অধিকার ভোগ করিতে সাহায্য করে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে এই নীতি অনুসারে পরিচালিত হইতে পারে না। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি জনসাধারণের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে রাস্তাঘাট, পার্ক, সেতুনির্মাণ, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যের উন্নতি ও অন্য নানাবিধ কল্যাণকর কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহার ফলে জনসাধারণের অভাবনীয় কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী মত অনুসারে রাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হইলে রাষ্ট্রের এই জনকল্যাণকর কার্যগুলি করিবার আর কোন অধিকার থাকে না। আধুনিককালে এই জনহিতকর কার্যগুলিকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না।

সমাজতন্ত্রবাদ—Socialism

রাষ্ট্রের কাজ কি হইবে এ সম্পর্কে সমাজতন্ত্রবাদিগণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী মত হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহারা রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের চরম উৎকর্ষলাভের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন এবং এই কারণে তাঁহারা রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত করিবার পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, রাষ্ট্র শুধু পুলিশের কার্যই করিবে না, জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার সব কিছু রাষ্ট্র করিবে।

ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণসাধন করাই হইল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী—উভয় দলের উদ্দেশ্য। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ ব্যক্তির ক্ষমতায় আস্থাবান, তাই তাঁহারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে মত পোষণ করেন। অপরপক্ষে সমাজতন্ত্রবাদিগণ ব্যক্তিগত ক্ষমতায় বিশ্বাসী নহেন, তাই তাঁহারা রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষপাতী। সুতরাং উদ্দেশ্য এক হইলেও কার্যক্রমের দিক দিয়া উভয় মতবাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদ শুধু একটি রাজনৈতিক মতবাদ নহে, ইহা প্রধানতঃ নির্দিষ্ট কার্যক্রম-সমন্বিত একটি অর্থনৈতিক মতবাদ। অত্যধিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ফলে সমাজ-ব্যবস্থায় যে ধনতান্ত্রিকতার উদ্ভব হয়, তাহার প্রতিবাদ হিসাবে সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোক জমি, মূলধন ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলির মালিক হয় এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লাভের বেশীর ভাগ তাহারা গ্রহণ করে। এইরূপে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য সৃষ্টি হয় ও উত্তরাধিকার-আইনের বলে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য স্থায়ী হয়। সমাজতন্ত্রবাদিগণ বলেন যে, সরকার জমি, মূলধন ও উৎপাদনের সমগ্র ব্যবস্থার মালিক হইবে। এই মত অনুযায়ী রাষ্ট্র শুধু উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, উৎপাদিত সম্পদ সকলের মধ্যে এরূপভাবে ভাগ করিয়া দিবে, যাহাতে প্রত্যেকে তাহার গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে জাতীয় আয়ের একটা ন্যায্য অংশ পাইতে পারে। তাঁহারা বলেন, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার এই চরম আয়-বৈষম্য দূর করা সম্ভব নহে।

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন প্রকার-ভেদ—Different forms of Socialism

সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত সমাজতন্ত্রবাদী মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কসের মতবাদের ভিত্তির উপর গঠিত। সুতরাং কার্ল মার্কসের মতবাদের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদ—Marxian Socialism

ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার উপরই মার্কস্ তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি

স্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে, প্রত্যেক যুগেই সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রেণীবৈষম্য ছিল। প্রাচীনকালে দাস, সাধারণ ও অভিজাত শ্রেণী ছিল। মধ্যযুগেও ভূমির অধিকারী অভিজাত শ্রেণী ও ভূমিদাস ছিল। এই শ্রেণীবৈষম্যের ফলে যে শ্রেণী-সংগ্রাম ঘটে, তাহার ভিত্তিতেই রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস রচিত হয়। বর্তমান যুগের সমাজ-ব্যবস্থার রূপ হইল ধনতান্ত্রিক। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা হইল পূর্ববর্তী ব্যবস্থার শেষ পরিণতি। এই ব্যবস্থায় অল্পসংখ্যক পুঁজিপতি মালিক শ্রমিকগণকে বঞ্চিত করিয়া উৎপাদিত সম্পদের বেশীর ভাগ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে। ফলে, সমাজে শ্রমিক ও মালিক এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। মার্কস্ বলেন, কালক্রমে এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা ও তাহাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়া এরূপ অবস্থায় আসিবে যে, শ্রমিকশ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিদ্রোহ করিবে। বিদ্রোহের ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিবে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা শেষ হইলে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দেশের সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মার্কসের মতবাদের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, তিনি মানব ইতিহাসের শুধু দ্বন্দ্ব ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দিকটাই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু মানুষ এই দ্বন্দ্ব ও ধ্বংসের মধ্য দিয়া কিরূপভাবে গঠনমূলক কার্যের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, সে সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন। মার্কসের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিতে পারা গেলেও একথা সত্য যে, মার্কস্ তাহার মতবাদ প্রচার দ্বারা শ্রমিকগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্যে তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করেন। শ্রমিকের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলেই মালিক কর্তৃক শ্রমিক-নির্যাতন ও শোষণ অন্ততঃ আংশিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

সমষ্টি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদ—Collectivism ৩৮

এই মতের সমর্থকগণ উৎপাদনের উপাদানগুলির রাষ্ট্র-মালিকানা দাবী করেন। ইহাদের মতে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে, কিন্তু বিনিময় ও ভোগব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ হইবে। তাঁহাদের মতে সমাজে বিশেষ সুবিধা-ভোগী কোন সম্প্রদায় থাকিতে পারিবে না। জার্মানিতে সমষ্টিপ্রধান

সমাজতন্ত্রবাদ **রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ**—State Socialism নামে অভিহিত হয়।

অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ—Syndicalism (SY)

অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগণ ধ্বংসাত্মক কার্যপদ্ধতির দ্বারা বর্তমান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবসান ঘটাইয়া শ্রমিক সঙ্ঘের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষপাতী। রাষ্ট্রের ধ্বংস-সাধন করিয়া মানুষের সমগ্র জীবনকে ইঁহারা শ্রমিক সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার চেষ্টা করেন।

সমিতি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদ—Guild Socialism (GS)

সমষ্টি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদ ও অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া সমিতি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদিগণ সমাজতন্ত্রবাদের এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইঁহারা রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতায় বিশ্বাসী নহেন, কিন্তু অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগণের মত রাষ্ট্রকে একেবারে ধ্বংস করিবার পক্ষপাতী নহেন। ইহারা বলেন, বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলির মালিক হইবে রাষ্ট্র, কিন্তু পরিচালনার ভার থাকিবে বিভিন্ন শ্রমিকসঙ্ঘের উপর। জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল, এই শ্রমিকসঙ্ঘ ও সমাজের অন্যান্য সঙ্ঘগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

সাম্যবাদ—Communism (CJ)

সাম্যবাদ হইল মার্কস্-প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের শেষ অধ্যায়। শ্রমিক-মালিক বিরোধের পরে যে সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহা পূর্ণ সাম্যবাদ নহে। এই ব্যবস্থায় মালিকশ্রেণী নির্মূল হইয়া শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ও শ্রমিকের স্বার্থে রাষ্ট্র-শক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুসারে কাজ করে এবং যোগ্যতা অনুসারে পারিশ্রমিক পায়। বিনিময়-কার্যও অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কালক্রমে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হইয়া এমন নূতন এক শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা গঠিত হইবে যেখানে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র প্রভৃতির কোন পার্থক্য থাকিবে না। শ্রেণীহীন যে নূতন ব্যবস্থা গঠিত হইবে তাহাতে কি উৎপাদনে, কি ভোগে কোনরূপ ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে না। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে আর মুনাফার লোভে উৎপাদন করিবে না। এইরূপ অবস্থায় অর্থের মাধ্যমে কোন বিনিময়ের প্রয়োজন থাকিবে না, কারণ প্রত্যেকে তাহার সাধ্যমত কাজ করিবে ও প্রয়োজন অনুসারে অভাব

মিটাইবার সামগ্রী পাইবে। এইরূপে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। সাম্যবাদী ব্যবস্থার সাহায্যে মানুষ স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইলে রাষ্ট্র-সংগঠন আপনা হইতেই বিলীন হইবে।

রুশ বিপ্লবের পর সাম্যবাদী নেতাগণ এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। উৎপাদনের সব রকম উপাদানই রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে সাম্যবাদী নেতাগণ বুঝিতে পারিলেন যে, ব্যক্তিগত লাভের কিছু আশা না থাকিলে ব্যক্তির কাজে অনুপ্রেরণা হয় না। তাই তাঁহারা মার্কসীয় নীতির কিছু পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রুশ দেশে বর্তমানে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভোগ ও দখল স্বীকৃত হইয়াছে। যোগ্যতা অনুসারে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয় এবং আয়-বৈষম্য কমিলেও একেবারে দূর হয় নাই। বিনিময় কার্যও টাকা-পয়সার সাহায্যে পরিচালিত হয়। সাম্যবাদী ব্যবস্থার সাহায্যে জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইলেও সে দেশে এখনও পর্যন্ত পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি—Arguments for Socialism

সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে প্রথম যুক্তি হইল যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শুধুমাত্র মালিক শ্রেণীর স্বার্থের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর বিশেষ করিয়া বিত্তহীন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার ভিত্তিতে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হইবে। সুতরাং অপচয় বন্ধ হইয়া প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদন হইবে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুনাফা-অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালিত হয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোগ-ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালিত হইবে। সুতরাং উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়তঃ, মানুষ সমাজে বাস করে, সুতরাং সমষ্টিগত স্বার্থের সহিত তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা সমষ্টিগত স্বার্থের উৎকর্ষ-সাধনের মধ্য দিয়াই ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নয়ন সম্ভব। চতুর্থতঃ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ যদি ভয় ও অভাব-মুক্ত না হইতে পারে, তাহা হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আয়ের বৈষম্য দূর করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে তাহার জীবিকা অর্জনে সাহায্য করে।

অভাবমুক্ত হইলে মানুষ অভিরুচি অনুযায়ী তাহার 'ব্যক্তিত্ববিকাশের' পথ বাছিয়া লইতে পারে।

বিপক্ষে যুক্তি—Arguments against Socialism

এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল যে, এই মতবাদে রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান নহে। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই সব কাজ করিতে পারে না। রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতারও একটা সীমা আছে এবং এই সীমার অতিরিক্ত হইলে রাষ্ট্রের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ, অত্যধিক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে ব্যক্তিগত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা নষ্ট হয়। ইহার ফলে ব্যক্তি স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইতে পারে না; ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুযায়ী পরিচালিত না হইয়া সকল ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র সমাজ-জীবন বৈচিত্র্যবিহীন হইয়া নিয়মানুবর্তী সৈনিক জীবনে পরিণত হইবে। চতুর্থতঃ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য মানুষের মধ্যে যে পরিমাণ সমাজচেতনা ও পরার্থপরতা থাকা আবশ্যক, কার্যতঃ মানুষ ততটা পরার্থপর নহে। পরিশেষে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থায় অযোগ্যতা, কর্মবিমুখতা ও পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে বুদ্ধিমত্তা, কর্মক্ষমতা ও আত্ম-নির্ভরশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ নষ্ট হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদক হওয়া অপেক্ষা কপর্দকশূন্য হওয়া ভাল (Better to be a pauper than to be a producer), কারণ দরিদ্র হইলেই রাষ্ট্রের সাহায্য পাওয়া যায়, আর ধনী হইলে কর দিতে হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপের পরিধি—Proper Sphere of the Modern State

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের গুণাগুণ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, রাষ্ট্রের কাজ শুধু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বা শুধু সমাজতন্ত্রবাদী মতের দ্বারা পরিচালিত হয় না। রাষ্ট্র শুধু পুলিশের ও সৈনিকের কাজ করিবে, আর কিছুই করিবে না ইহা যেমন সত্য নহে, আবার রাষ্ট্র সব কিছুই করিবে তাহাও সত্য নহে। তবে আধুনিককালে পুলিশি রাষ্ট্রের ধারণা পরিবর্তিত হইয়া মানুষের মনে কল্যাণ-রাষ্ট্রের ধারণা জন্মিয়াছে। তাই আধুনিককালের অধিকাংশ রাষ্ট্রই সম্পূর্ণরূপে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত না হইলেও জনকল্যাণের

উদ্দেশ্যে নানাবিধ গঠনমূলক কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি খনি, রেলপথ ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-পরিচালনা প্রভৃতি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির ভার গ্রহণ করিয়াছে। যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ, অহিফেন ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য-উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি শ্রমিক ও অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৃদ্ধবয়সের ভাতা, কল-কারখানা ও প্রজাস্বত্ব-সংক্রান্ত নানাবিধ আইন প্রণয়ন করিতেছে। ইহা ছাড়া, সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে আধুনিক অনেক রাষ্ট্রই নানাবিধ আইন প্রবর্তন করিতেছে। ভারত সরকার অস্পৃশ্যতা-বর্জন, বাল্যবিবাহ-নিরোধ প্রভৃতি নানাবিধ সমাজ-উন্নয়নমূলক বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিয়াছেন। সু-নাগরিক সৃষ্টি করিতে হইলে নাগরিক জীবনের নৈতিক মান উন্নয়ন করা একান্ত আবশ্যক। এইজন্যই আধুনিক রাষ্ট্রগুলি সমাজ-ব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ, মদ্যপান, অশিক্ষা প্রভৃতি প্রগতি-বিরুদ্ধ সে সমস্ত কুপ্রথা প্রচলিত আছে, সেগুলি আইনের দ্বারা দূর করিয়া প্রগতিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে।

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ফ্যাসীবাদী বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলিতেও এই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংলণ্ড, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলিতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রায়ত্তের অধীন হইতেছে। সুতরাং পূর্বের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদ যে পরিত্যক্ত হইতে চলিয়াছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

সরকারের কার্যাবলী—Functions of Government

সরকার সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর কার্য করে। প্রথম শ্রেণীর কার্যকে একান্ত প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য কার্য বলা হয়, কারণ এই কার্যগুলি না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে এই কার্যগুলি করিতে হয়। অন্য কার্যগুলি না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বা নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না বটে, তবে প্রায় সব রাষ্ট্র এই ধরণের কাজ করিয়া থাকে, কারণ এই কাজগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা সম্ভব হয় না। এইজন্য এই ধরণের কাজগুলিকে ইচ্ছাধীন কার্য বলা হয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ রাষ্ট্রের এই স্বেচ্ছামূলক কার্য-গুলিকে রাষ্ট্র-কর্তব্য বলিয়া মনে করেন না।

অবশ্যকরণীয় বা অপরিহার্য কার্য—Essential Functions

১। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রাথমিক বা অবশ্য কর্তব্য। নতুবা কোন রাষ্ট্রই বাঁচিতে পারে না।

২। পররাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নিজ অস্তিত্ব নিরাপদ রাখা।

৩। পারিবারিক সম্পর্ক অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া পারিবারিক জীবন স্থিতিশীল রাখাও বর্তমান রাষ্ট্রগুলির অবশ্যকরণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

৪। মুদ্রাব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রণ ও নির্দিষ্ট পরিমাপের (ওজন) ব্যবস্থা করা। নতুবা বিনিময় ও ব্যবসায় চলিতে পারে না।

৫। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, উত্তরাধিকার, নাগরিকত্ব গ্রহণ ও বর্জন নিয়ন্ত্রণ করা।

ইচ্ছামূলক কার্য—Non-essential or Optional Functions

রাষ্ট্র যে কাজগুলি প্রয়োজন অনুসারে করে, সেগুলিকে ইচ্ছামূলক কার্য বলা হয়। এই ইচ্ছামূলক কার্যগুলির মধ্যে (১) কতকগুলি শিল্প ও ব্যবসায়ের পরিচালনা অনেক রাষ্ট্র স্বহস্তে গ্রহণ করে। অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য, তামাক, রেলপথ প্রভৃতি অনেক শিল্পব্যবসায় রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করে।

(২) আবার অনেক সময় রাষ্ট্র শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া সেগুলিকে নানা বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

(৩) শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র শ্রমিক-কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করে। স্ত্রীলোক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

(৪) জনসাধারণের সুবিধার জন্য ডাক, তার, টেলিফোন ও বেতার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে।

(৫) পূর্ত-কার্য, রাস্তাঘাট-নির্মাণ, স্বাস্থ্য-রক্ষা, কৃষির উন্নতি, ট্রাম, বাস প্রভৃতি পরিবহন-ব্যবস্থা, গ্যাস, ও বিদ্যুৎসরবরাহ এবং সর্বোপরি শিক্ষাবিস্তার-কার্যে আধুনিক রাষ্ট্রগুলি বিশেষ তৎপর হইয়াছে।

(৬) দরিদ্র, অসহায়, বৃদ্ধ, পঙ্গু ও বেকার লোকদের সাহায্যদান প্রভৃতি কার্য-গুলিও বর্তমান রাষ্ট্র স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে।

সুতরাং আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্য ও ইচ্ছামূলক কার্যের মধ্যে সীমারেখা ক্রমশঃই বিলীন হইয়া যাইতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের কার্যাবলী

রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পর্কে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। একটি হইল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, অপরটি হইল সমাজতন্ত্রবাদ।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ রাষ্ট্রের ক্ষমতা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া ব্যক্তিগত অবাধ স্বাধীনতা প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র শুধু অপরাধ নিবারণ করিবে, মানুষের অন্যবিধ উন্নতির জন্য কোনরূপ প্রচেষ্টা করিবে না।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি

১। মানুষ নিজের ভাল নিজে বুঝে, সুতরাং রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা দেয়। ২। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে যোগ্যতম টিকিয়া থাকে, দুর্বল অপসারিত হয়। ৩। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইয়া ক্রেতার সুবিধা হয়। ৪। রাষ্ট্র মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনে অসমর্থ।

বিপক্ষে যুক্তি

১। মানুষ সব সময়ে তাহার স্বার্থ-সম্পর্কে সজাগ নহে, এজন্য রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। ২। রাষ্ট্র না থাকিলে আইন-শৃঙ্খলা থাকে না এবং আইন-শৃঙ্খলার অবর্তমানে প্রকৃত ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। ৩। রাষ্ট্র-প্রচেষ্টার দ্বারা সমান সুযোগ-সুবিধা পাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার অভিরুচি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারে। ৪। রাষ্ট্র ছাড়া সমষ্টিগত স্বার্থের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না।

সমাজতন্ত্রবাদ

এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রকে মানুষের একটি পরম হিতকর প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করা হয়। সমাজতন্ত্রবাদিগণ বলেন, একমাত্র রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা দ্বারাই মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সম্ভবপর। তাই তাহারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রকারভেদ

সমাজতন্ত্রবাদ বর্তমানে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার মধ্যে **মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ** পৃথিবীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শ্রেণী-সংগ্রামের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সাম্যের ভিত্তিতে এক শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করাই হইল মার্কসের মতবাদের উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া, রাষ্ট্র-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদ, অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ, সমিতি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। রুশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি

১। সমাজতন্ত্রবাদ মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর সুবিধার পরিবর্তে সকল শ্রেণীর সুবিধা প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার সাহায্যে অর্থনৈতিক জীবনে গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকরী করে। ৩। সমষ্টিগত উন্নতির দ্বারা ব্যক্তিগত উন্নতির ব্যবস্থা করে। ৪। আয়-বৈষম্য হ্রাস করিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

বিপক্ষে যুক্তি

১। রাষ্ট্রও ভুল করিতে পারে, সুতরাং রাষ্ট্রদ্বারা সব কাজ সম্ভব নয়। ২। ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকিলে ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা নষ্ট হয়। ৩। এই ব্যবস্থায় মানুষ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ পায় না। ৪। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের ফলে মানুষ কর্মবিমুখ হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপের পরিধি

বর্তমানে জনকল্যাণ-সাধনই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। তাই আজ অতীতের পুলিশি-রাষ্ট্র কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং

জনকল্যাণের জন্য যাহা অপরিহার্য, তাহা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। মানুষের সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার সব কিছুই রাষ্ট্র করিতে পারে। এদিক দিয়া রাষ্ট্রের কার্য-কলাপের কোন সীমারেখা স্থির করা সম্ভব নহে।

সরকারের কার্যাবলী

সরকারের কার্যাবলী দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা অপরিহার্য কার্য ও ইচ্ছা-মূলক কার্য। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য অপরিহার্য কার্যগুলি করিতে হয়। অন্য কার্যগুলি রাষ্ট্র প্রয়োজন অনুসারে করে।

অপরিহার্য কার্য

১। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করা ২। পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা। ৩। পারিবারিক সম্পর্ক স্থির করা ও ৪। মুদ্রা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা—অপরিহার্য কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

ইচ্ছামূলক কার্য

১। শিল্প-ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা, ২। শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করা, ৩। জনসাধারণের সুবিধা সৃষ্টি করা, ৪। দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিগণের সাহায্য করা—ইচ্ছামূলক কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ও উত্তর

1 State and explain the Socialist theory about the functions of Government.

II S. (Hu) Comp. 1960

সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর।

উঃ—সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে সমাজতন্ত্র-বাদ একটি শক্তিশালী মতবাদ বলিয়া বর্তমান যুগে পরিগণিত হয়। অত্যধিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ফলে যে পুঁজিবাদের (Capitalism) আবির্ভাব হয় তাহারই প্রতিবাদস্বরূপ সমাজতন্ত্রবাদের আবির্ভাব হয়। সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা হইল রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সীমাহীন। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র শুধু পুলিশি কার্যে সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব বাঞ্ছনীয়। জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার সব কিছুই রাষ্ট্র করিবে।

সমাজতন্ত্রবাদিগণ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন দেশের যাবতীয় ধনোৎপাদনের উৎস, যথা, জমি, খনি, শিল্প, কলকারখানা, রেল, ডাক, জাহাজ, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, প্রভৃতি এবং ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, সর্বপ্রকার বাণিজ্য প্রভৃতির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইবে। প্রত্যেক মানুষ রাষ্ট্রের কর্মী হিসাবে তাহার গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিবে এবং আপন প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ্যবস্তু পাইবে। সমগ্র সামাজিক জীবন অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখিবার জন্য রাষ্ট্র দেশের নিরাপত্তা, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ও জনসেবা পরিচালনা করিবে।

এই ব্যবস্থার ফলে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য দূর হইয়া সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ফলে যে ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা হয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তাহা দূর করিয়া তৎপরিবর্তে মানুষের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করিয়া সমষ্টির তথা সমষ্টির অংশ ব্যক্তির উন্নতি সাধনে সাহায্য করিবে।

2. Classify the functions of a modern government. Explain clearly why some are called essential while others optional.

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপের শ্রেণী বিভাগ কর। কতকগুলি কার্যকে অপরিহার্য ও কতকগুলি কার্যকে ইচ্ছামূলক কেন বলা হয় তাহা বুঝাইয়া দাও।

উঃ—আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপগুলিকে অপরিহার্য ও ইচ্ছামূলক—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যে সমস্ত কাজ না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে না, সেগুলিকে অপরিহার্য বা অবশ্য-করণীয় কার্য বলা হয়, আর যে কাজগুলি জনহিতকর হইলেও রাষ্ট্র করিতেও পারে, আবার নাও করিতে পারে সেগুলিকে ইচ্ছামূলক কার্য বলা হয়।

দেশরক্ষা ও সেই উদ্দেশ্যে সশস্ত্রবাহিনী রাখা, পুলিশবাহিনীর সাহায্যে আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বিচারালয় সাহায্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা হইল প্রধান প্রধান অপরিহার্য কার্য।

নানাবিধ জনহিতকর কার্য যথা, শিল্প-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ, পূর্ত-কার্য, স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি হইল ইচ্ছামূলক কার্য।

বর্তমান যুগের কল্যাণ রাষ্ট্রের পক্ষে সামাজিক হিতসাধনের সহায়ক সব কাজই অপরিহার্য কাজ বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং অপরিহার্য ও ইচ্ছামূলক কাজের আর কোন পার্থক্য করা চলে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যক্তি ও সমাজ

(Individual and Society)

ব্যক্তিকে লইয়াই সমষ্টি এবং সমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন কবিতে চায় না। পিতা-মাতার স্নেহ, আত্মীয়-বন্ধুর ভালবাসা পাইবার এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমোদ-প্রমোদ উপভোগ ও আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই মানুষ সমাজ গঠন করিয়া বাস করে। সমাজ একদিনে বা একজন লোকের দ্বারা গঠিত হয় নাই। মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মানুষ যতই বুদ্ধিমান ও সভ্য হইয়া উঠিতেছে, সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা সে ততই বুঝিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবনের উপর সমাজের প্রভাব প্রসাব লাভ করিতেছে। মানুষেব জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজ নানাভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এখন প্রশ্ন হইল, মানুষ কেন স্বেচ্ছায় সমাজের এই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইল ?

এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হইল যে, মানুষ সমাজ ছাড়া বাস করিতে পারে না। সমাজের বাহিরে তাহার জীবন শুধু নিঃসঙ্গ ও দুঃসহ হয় না, সমাজের বাহিরে মানুষ ভাবের ও চিন্তাধারার আদান-প্রদান করিবার সুযোগ পায় না। মানুষের মধ্যে যে স্বভাব-জাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতাগুলি থাকে, সমাজের বাহিরে সেগুলির বিকাশ আদৌ সম্ভব নহে। সমাজে মানুষের কতকগুলি রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিতে হয়। এই রীতি-নীতিগুলি মানুষের বহু অভিজ্ঞতার ফল এবং এইগুলির সাহায্যে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা সুনিয়ন্ত্রিত হয়। চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা-প্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। সামাজিক পরিবেশে, সামাজিক প্রভাবে মানুষের মন শুদ্ধ ও সৎপথগামী হয়—সমাজের বাহিরে সামাজিক প্রভাবের অবর্তমানে তাহার ভালমন্দ-জ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাই গ্রীক দার্শনিক আরিস্ট্টল বলিয়াছেন, যে মানুষ সমাজে বাস করে না সে পূর্ণ মানুষ নহে। সে হয় অতি-মানব না হয় নিম্নস্তরের জীব।

তাহা হইলে কি সমাজ-ছাড়া ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই? মানুষকে কি একেবারেই সমাজের দাসরূপে ভাবিতে হইবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, মানুষকে লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি মানুষ হইল সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষ যেমন সমাজ ছাড়িয়া বাস করিতে পারে না, সেইরূপ মানুষ ছাড়া সমাজের কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। মানুষের মঙ্গলের জন্যই সমাজের উৎপত্তি এবং মানুষের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। উন্নত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের উন্নতি হয় এবং মানুষের উন্নতি হইলেই সমাজ-ব্যবস্থাও উন্নত হয়। মানুষকে বাদ দিয়া সমাজ গঠিত হইতে পারে না এবং সমাজকে বাদ দিয়া মানুষ তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারে না। সুতরাং মানুষ ও সমাজের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

মানুষ বড় না সমাজ বড়, এ প্রশ্নের আজ আর বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে যখন সমাজ-চেতনা দুর্বল ছিল, তখন ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গলের পথ সুগম করা হইয়াছিল। তাই প্রাচীনকালে সামাজিক নির্দেশ ও সামাজিক বিধানগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়া অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা হয়। এইরূপে ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই ব্যক্তির উপর সমাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে মানুষের সমাজ-চেতনা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, মানুষ যতই বুঝিতে পারিতেছে যে, সমষ্টির কল্যাণ না হইলে তাহার নিজের কল্যাণ স্থায়ী হইতে পারে না, মানুষ ততই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমাজের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। সমাজের প্রতি মানুষের এই স্বেচ্ছাকৃত আনুগত্য একদিকে যেমন সামাজিক বন্ধন দৃঢ়তর করিতেছে, অপরদিকে সেইরূপ সামাজিক বিধি-নিষেধগুলির কঠোরতা প্রশমিত করিয়াছে। কারণ সমাজও বুঝিতে পারিয়াছে যে, ব্যক্তিকে খর্ব করিয়া ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা লোপ করিয়া সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না। যে সমাজ অহেতুক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে, সে সমাজ স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই হইল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা।

সমাজতন্ত্রবাদ—পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সংক্ষিপ্তসার

ব্যক্তি ও সমাজ

ব্যক্তি ও সমাজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। সমাজ ছাড়া মানুষ বাস করিতে পারে না, তাই সমাজের সৃষ্টি। একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই মানুষের ব্যক্তিত্ব চরম পরিণতি লাভ করিতে পাবে। সুতরাং ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া কোন সমাজই স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, ব্যক্তি লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত মঙ্গল হইলেই সামাজিক মঙ্গল হয়। যে সমাজ ব্যক্তিগত কল্যাণ-সাধনে অসমর্থ, সে সমাজেব অস্তিত্বের কোন মূল্য থাকিতে পারে না; সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একের অবর্তমানে অপরের অস্তিত্ব কল্পনা কবা যায় না।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Discuss the relation between individual and society

ব্যক্তি ও সমাজেব মধ্যে সম্বন্ধ আলোচনা কর।

উঃ—ব্যক্তি ও সমাজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। সমাজ ছাড়া মানুষ বাস করিতে পাবে না, তাই সমাজেব সৃষ্টি। একমাত্র সামাজিক পবিবেশেই মানুষের ব্যক্তিত্ব চবম পবিণতি লাভ করিতে পারে। এই কাবণে গ্রীক দার্শনিক আবিস্টটল বলিয়াছেন যে, যে মানুষ সমাজে বাস কবে না, সে হয় অতি-মানব কিংবা অতি নিকৃষ্ট স্তরেব জীব। সুতবাং ব্যক্তিব কল্যাণেব জন্য সমাজের অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকাব কবা উচিত; কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে খর্ব কবিয়া কোন সমাজই স্থায়ী হইতে পাবে না। কাবণ, ব্যক্তি সমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত মঙ্গল হইলেই সামাজিক মঙ্গল হয়। যে সমাজ ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনে অসমর্থ বা যে সমাজ অহেতুক ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি কবে, সে সমাজেব কোন মূল্য নাই। সুতবাং ব্যক্তি ও সমাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একের অবর্তমানে অপবেব অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

সপ্তম অধ্যায়

জাতি

(The Nation)

স্বজাতীয় মানুষ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতীয়তাবোধ—People, Nationality, Nation and Nationalism

স্বজাতীয় মানুষ বলিতে বুঝা যায়, একই ঐতিহ্যদ্বারা পরিপুষ্ট একদল লোক, যাহারা একই নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস না করিতেও পারে অথবা এক ভাষাভাষী নাও হইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও ইহুদি জাতির কোন নির্দিষ্ট মাতৃভূমি ছিল না। তাহারা বিভিন্ন দেশে বাস করিত ও সেইজন্য তাহাদের ভাষাগত কোন ঐক্য ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের নাগরিক হইলেও সমষ্টিগতভাবে এক অতি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী বলিয়া ইহুদি জাতির মধ্যে এক গভীর ঐক্যবোধ আছে। সমগ্র ইহুদি জাতি এই ঐক্যবোধ দ্বারা আজ পর্যন্ত অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের সকলকেই স্বজাতীয় মানুষ বলিয়া মনে করে।

জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয় তখনই, যখন স্বজাতীয় একদল লোক আরও গভীরতর ঐক্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের অন্য জনসমাজ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে করে। জাতীয় জনসমাজের মধ্যে ভাষাগত, বংশগত, ধর্মগত বা কৃষ্টিগত ঐক্য বিদ্যমান থাকে। রক্তের, ভাষার, ধর্মের বা কৃষ্টির অভিন্নতা এই একতাবোধকে শক্তিশালী করিয়া জাতীয় জনসমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের সহায়তা করে।

জাতীয় জনসমাজ যখন রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ আত্মচেতন হয় ও নিজেদের বহিঃশাসন হইতে মুক্ত করিয়া এক স্বাধীন রাষ্ট্রের মাধ্যমে তাহাদের নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার প্রয়াস পায়, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে রূপান্তরিত হয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশের ফলে স্বজাতীয় মানুষ জাতীয় জনসমাজ বলিয়া পরিচিত হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের ফলে জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয়।

জাতীয় জনসমাজ বা জাতিগঠনের উপাদান—Elements of Nationality

জাতীয় জনসমাজ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইলে জাতিতে পরিণত হয়। সুতরাং যে উপাদানগুলি জাতীয় জনসমাজ-গঠনে সহায়তা করে, সেইগুলিই জাতিগঠনেরও সহায়ক। একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উপস্থিতি বা অভাবের উপর ইহাদের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত। জাতিগঠনের উপাদানগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—বাহ্যিক উপাদান ও ভাবগত উপাদান। এই উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিলে জাতিগঠনে ইহাদের প্রত্যেকটির কার্যকারিতা উপলব্ধি করা যায়।

কুলগত ঐক্য—Racial Unity

অনেকে মনে করেন জাতিগঠনে কুলগত ঐক্য অপরিহার্য। যখন জাতীয় জনসমাজের সমস্ত মানুষ নিজেদের এক বংশোদ্ভব বলিয়া মনে করে তখনই জাতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ কথা সব সময় সত্য নয়। উদ্ভবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে জার্মান ও ইংরেজ একই টিউটন বংশোদ্ভব, কিন্তু জাতি হিসাবে ইহারা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। অপর পক্ষে, ইংরাজ ও স্কচ্ এক বংশোদ্ভব না হইলেও এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক বংশোদ্ভব মানুষ—জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসী একজাতি বলিয়া পরিচিত। সুতরাং অভিন্ন কুল জাতিগঠনের একমাত্র উপাদান বা অপরিহার্য বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। ইহা ছাড়া, ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুগযুগান্তর ধরিয়া রক্তের যে সংমিশ্রণ চলিয়াছে, তাহার ফলে কোন জাতিই আজ আর অবিমিশ্র জাতি বলিয়া দাবী করিতে পারে না। কিন্তু এককুলোদ্ভব হইলে জাতীয় ঐক্য দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয় এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

ভাষাগত ঐক্য—Sameness of Language

কুলগত ঐক্য যেরূপ জাতিগঠনের অপরিহার্য নয়, ভাষাগত ঐক্যও সেরূপ অপরিহার্য নয়। সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক বাস করে, কিন্তু তাহাদের ভাষাগত বিভেদ জাতিগঠনের অন্তরায় হয় নাই। পরন্তু এই ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা এক আদর্শ জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া একই রাষ্ট্রে একজাতি হিসাবে বসবাস করিতেছে। ভাষা ভাবের আদান-প্রদানে

সহায়তা করিয়া ঐক্যবোধ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। সুতরাং ভাষাগত ঐক্য জাতিগঠনে সাহায্য করে একথা সত্য হইলেও ভাষাগত ঐক্যের অভাবে যে জাতির সৃষ্টি হইতে পারে না, একথা বলা যায় না।

ধর্মগত ঐক্য—Religious Unity

মধ্যযুগে ধর্মগত ঐক্য জাতিগঠনের একটি প্রধান উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইলেও বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহে ইহার প্রভাব অনেক হ্রাস পাইয়াছে। একমাত্র মধ্য-প্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্রগুলি ব্যতীত অন্য কোথাও ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠিত হয় নাই। ধর্মগত ঐক্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পাকিস্তানের সৃষ্টি করিয়াছে। ইয়ুরোপে অনেক জাতি আছে যাহাদের মধ্যে ধর্মগত অনৈক্য জাতিগঠনের অন্তরায় হয় নাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদি প্রভৃতি বহু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান যুগে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব জাতিগঠনের উপাদান বলিয়া গণ্য হয় না।

ভৌগোলিক ঐক্য—Geographical Unity

কতকগুলি লোক এক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস করিলে তাহারা একজাতিতে পরিণত হয়। ভৌগোলিক ঐক্য জাতিগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহাকে অপরিহার্য বলা চলে না। বহুদিনব্যাপী এক ভৌগোলিক ঐক্যের মধ্যে বসবাস করিয়াও ভারতের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমান এক জাতিতে পরিণত হয় নাই। আবার, বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাস করিয়াও ইহুদি জাতি তাহাদের একজাতিত্ব হারায় নাই।

ভাবগত ঐক্য—Spiritual Unity

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে, জাতিগঠনে বাহ্যিক উপাদানগুলি সব সময়ে বিশেষ কার্যকরী হয় না। এগুলির অবিদ্যমানেও জাতির উদ্ভব সম্ভব। জাতীয় জনসমাজ বা জাতিগঠন প্রধানতঃ নির্ভর করে জাতির এক বিশেষ মনোভাবের উপর। যখন জাতীয় জনসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহাদের মূলগত ঐক্যে একান্ত আস্থাবান্ হইয়া একজাতিত্বভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তখনই কুলগত, ভাষাগত বা ধর্মগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা একজাতিতে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হইল, এই ভাবগত ঐক্য কি?

ভাবগত ঐক্য একটা মানসিক অনুভূতির ব্যাপার। এই অনুভূতি বাহ্যিক ঐক্য অপেক্ষা মানসিক ঐক্যের উপর বেশী নির্ভর করে। একদল লোকের মধ্যে কুলগত বা ভাষাগত বা আরও অনেক প্রকার সামাজিক বিভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু অতীতে যদি একই ইতিহাসের ঘটনাবলীর পথে তাহাদের জীবন গঠিত হইয়া থাকে, যদি তাহারা একই ঐতিহ্য বা সভ্যতার অধিকারী ও একই সুখ-দুঃখের অংশ-গ্রহণকারী হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে একই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শে উপনীত হইবার জন্য তাহারা দলবদ্ধ হয়, তাহা হইলে এইরূপ মনোভাব-সম্পন্ন একদল লোক নিজেদের অন্যান্য সকল দল হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে। অতীতের এই সম-সুখদুঃখভোগের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আদর্শ এই জনসমষ্টির মধ্যে ঐক্যবোধ জাগরিত করিয়া সকলকে একতার সূত্রে গ্রথিত করে। সময়ের অগ্রগতির ফলে এই ভাবগত ঐক্যের বন্ধন তাহাদের মধ্যে দৃঢ়তর হয় ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলিকে সম-সুখদুঃখ ও সম-স্বার্থের ভিত্তিতে একত্রিত করিয়া একজাতিতে পরিণত করে। সুইস্ জাতির অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

বাহ্যিক ও ভাবগত ঐক্যের ফলে যখন একদল লোক নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জনসমাজ হইতে নিজেদের পৃথক্ মনে করে, তখনই তাহাদের জাতীয় ভাবের উদয় হয়। এই জাতীয় ভাব বা সাজাত্যবোধ (Nationalism) জাতিগঠনের চরম পরিণতি। সাজাত্যবোধ দুইটি পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের উপর গড়িয়া উঠে। একটি দ্বারা সম-সুখদুঃখভোগী ও সম-আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল লোক পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়। অপরটি অসম-সুখদুঃখভোগী ও অসম-আদর্শে অনুপ্রাণিত জনসমষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিভেদের সৃষ্টি করে ও বিভিন্ন জাতিতে পরিণত করে।

জাতি ও রাষ্ট্র—Nation and State

নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলার সহিত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয়। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, শাসন-ব্যবস্থা ও সর্বোপরি সার্বভৌমিকতা—এই চারিটি হইল রাষ্ট্র অস্তিত্বের লক্ষণ। কিন্তু জাতির সংজ্ঞা রাষ্ট্রের সংজ্ঞা হইতে শুধু পৃথক নয়, গভীরতর বটে। জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে রাষ্ট্রভুক্ত জনসমষ্টির মধ্যে একাত্মবোধ থাকা অপরিহার্য। রাষ্ট্র ও জাতি একাত্মবোধক হয় তখন, যখন রাষ্ট্রভুক্ত সমগ্র জনসমষ্টি একই ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ও একই আদর্শে

অনুপ্রাণিত হয়। একাত্মবোধের অবর্তমানে একটি রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে কিন্তু একজাতি গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু একই রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘকাল বসবাস করিলে একই শাসন, আইন ও শিক্ষাব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন জাতি ক্রমশঃই একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া এক'জাতিতে পরিণত হয়। আবার একদল লোক যখন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের নিজস্ব জীবন, ভাষা, কৃষ্টি ও অর্থ নৈতিক স্বার্থ রক্ষা করিতে দৃঢ়সংকল্প হয়, তখন এই একাত্মবোধই তাহাদের জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন করিতে সাহায্য করে। এইজন্য বলা হয় যে, রাষ্ট্র জাতি সৃষ্টি করে, আবার জাতিও রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। ("The state creates the nation and the nation creates the state").

ভারতীয়গণকে কি এক জাতি বলা যায়?—Is India a Nation?

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বে ভারতীয়গণকে একজাতি বলিয়া অনেকে গণ্য করিতেন না। বিশেষ করিয়া মুসলীম লীগ্ প্রচারিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয়গণকে একজাতি বলিয়া পরিগণিত করা যুক্তিসম্মত ছিল না। দেশ-বিভাগের পরবর্তী কালে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতীয়গণকে আর একজাতি বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। সত্য বটে, ভারতে কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত প্রভৃতি জাতি গঠনের বিভিন্ন বাহ্যিক ঐক্যের অভাব। কিন্তু ভারতবাসী আজ এক গভীরতর ভাবগত ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাধ্যমে ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি তাহাদের ভাবগত ঐক্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বের দরবারে তাহাদের ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করাই হইল ভারতীয় সভ্যতার মূল আদর্শ। এই আদর্শ স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে আজ সফল হইতে চলিয়াছে। সুতরাং তিন জাতি সমন্বিত সুইস দেশ ও বহু জাতি সমন্বিত রুশ দেশের মত ভারতীয়গণও আজ এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

এক জাতি এক রাষ্ট্র—One Nation one State

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয়, যে, যখন একদল লোক বাহ্যিক বা ভাবগত ঐক্যের দ্বারা নিজেদের পৃথক্ সত্তা সম্বন্ধে আত্মসচেতন হয়, তখনই তাহারা তাহাদের পৃথক্ সত্তা এক পৃথক্ রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের

সাহায্যে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক আত্মসচেতন জাতি তাহাদের নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করিয়া তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাঁচাইতে চায়। জাতির এই দাবী স্বীকৃত হইলে প্রত্যেক রাষ্ট্র মাত্র একটি সম-অনুভূতি-সম্পন্ন জাতি লইয়া গঠিত হইবে—একটি রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক বিরোধী মনোভাবাপন্ন জাতির সমন্বয় উভয় জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার অন্তরায় হইবে। বৈরিভাব, আত্মকলহ প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া যাহাতে প্রত্যেক জাতি পরস্পরের সহিত শান্তি ও সম্প্রীতিতে বাস করিয়া নিজেদের সভ্যতা ও কৃষ্টির অবদানে জগৎ-সভ্যতার উন্নতি করিতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রগুলির 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের চিন্তাবীর জন ষ্টুয়ার্ট মিল জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন।

আত্মনির্ধারণের নীতি ও বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ—Right of Self-determination and its application to practical politics.

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের দাবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি উড্‌রো উইলসনের আন্তরিক চেষ্টায় স্বীকৃত হইল, তখন এই নীতিতে ইয়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে জাতির ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিবার একটা প্রচেষ্টা চলিল। প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের এই দাবীকে আত্ম-নির্ধারণের নীতি বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এই নীতির ভিত্তিতেই 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' মতবাদ সমর্থিত হয়। যে সমস্ত জাতি তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধিকার হইতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হইয়া নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য-বিলোপের শেষ ধাপে উপনীত হইয়াছিল, এই আত্মনির্ধারণ-নীতি সেই সমস্ত নষ্টগৌরব জাতিকে তাহাদের ভাব, ভাষা, ধর্ম, তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধিকার ও ঐতিহ্য-পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। সুতরাং এই নীতির প্রয়োগের উপর একটা মুমূর্ষু জাতির জীবন-মরণ নির্ভর করে। বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং রাজনৈতিক স্বাধিকারের ভিত্তি বহুজাতি না হইয়া একজাতি হওয়া উচিত।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই আত্মনির্ধারণের নীতি অবাধভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা ও ইহার অবাধ প্রয়োগ জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কি প্রতিকূল তাহা বিবেচনা করা উচিত। যাঁহারা সর্বক্ষেত্রে এই নীতির অবাধ প্রয়োগ সমর্থন করেন না, তাঁহারা এই নীতির বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তি দেখান। প্রথমতঃ, বলা হয় যে,

সর্বক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করা সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বহুদিন হইতে এক ভৌগোলিক ভূ-ভাগে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করিবার ফলে সম-সুখদুঃখভোগী হইয়া এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তী কালে কোন আকস্মিক কারণে ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে আত্মনির্ধারণ-নীতির ভিত্তিতে পৃথক্ রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার দেওয়া জাতিগুলির স্বার্থের প্রতিকূল হইবে। অপর পক্ষে যদি একটি জাতির দুইটি অংশ সমুদ্র, পর্বত বা অন্য কোন নৈসর্গিক ব্যবধানে দুইটি পৃথক ভৌগোলিক ভূ-ভাগের বাসিন্দা হয়, তাহা হইলেও তাহাদের এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একত্র সমাবেশ দ্বারা আত্মনির্ধারণের নীতি কার্যকরী করা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যাহাকে পূর্বে অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয় বলা হইল, ঘটনাচক্রে বর্তমান শতাব্দীতে তাহা সম্ভব, সুতরাং বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করা হয় প্রথম মহাসমরের পর গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে প্রথম লোক-বিনিময় আরম্ভ হয় তুরস্কের গ্রীক অধিবাসিগণ গ্রীসে ফিরিয়া আসে আর গ্রীসের তুর্ক অধিবাসিগণ তুরস্কে প্রত্যাবর্তন করে। লোক-বিনিময়ের মাধ্যমে আত্মনির্ধারণ-নীতির প্রয়োগ দ্বারা 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' এই সমস্যার সমাধান জার্মানি ও চেকোশ্লোভাকিয়া এবং জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়। ইদানীং কালে ভারত-বিভাগের ফলে লোক-বিনিময় অনেক স্থলে পরোক্ষভাবে বাধ্যতামূলকরূপে দেখা দিয়াছে। এরূপ অধিক সংখ্যায় ও অনিয়মিতভাবে লোক-বিনিময় বোধহয় অন্য কোন দেশে ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিষ্ঠিত পুরাতন রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে যদি এই নীতির অবাধ প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে বর্তমান আটাশটি রাষ্ট্রের পরিবর্তে ইয়ুরোপে প্রায় আটষট্টিটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হইবে। ক্ষুদ্র সুইস দেশ ও ইংলণ্ড প্রত্যেকটি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিনটি অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। এই তিনটির কোনটিই স্বয়ং-সম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। পরন্তু, দেশবিভাগের ফলে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিবে, সেগুলির সন্তোষজনক সমাধান না হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সর্বদাই আত্মকলহে লিপ্ত থাকিয়া তাহাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির অগ্রগতিতে যত্নবান হইতে পারিবে না। ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কলহ ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

তৃতীয়তঃ, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়া তাহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করিতে পারিবে, ইহার

কোন নিশ্চয়তা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র জাতিগুলির অচিরে কোন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের তাঁবেদার হইবার সম্ভাবনা থাকে।

চতুর্থতঃ, এই নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র-পুনর্গঠন কার্য একবার আরম্ভ হইলে ইহার আর পরিসমাপ্তি হইবে না। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র জাতি এই আত্মনির্ধারণ-নীতির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিবার দাবী করিবে। ফলে, ঐক্যবদ্ধ বহু রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিবে। রাজনীতি গ্রাম্য দলীয় মনোভাবে পর্যবসিত হইবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। জাতিগুলির মধ্যে আত্মকলহ, ক্ষমতালিপ্সা, প্রতিশোধস্পৃহা প্রভৃতি প্রবল আকার ধারণ করিয়া যুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তুলিবে। ফলে, শান্তির পরিবর্তে জগতে এক অশান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পঞ্চমতঃ, এই নীতির অবাধ প্রয়োগের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রগুলি (Poly-national States) যে এক জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি (Mono-national States) অপেক্ষা অনগ্রসর বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল একথা ঠিক নয়। অধিকন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সভ্যতায়, কৃষ্টিতে ও শক্তি-সামর্থ্যে অনেক এক জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক অগ্রসর ও শক্তিশালী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রুশিয়া, সুইস্ দেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি ইহার সত্যতা প্রমাণ করে।

এতদ্ব্যতীত এই আত্মনির্ধারণ-নীতি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন অসন্তুষ্ট জাতির দাবীর দ্বারা স্বীকৃত হইতে পারে না—ইহার স্বীকৃতি ও ইহার প্রয়োগ ক্ষমতা নির্ভর করে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ইচ্ছার উপর। সুতরাং এই আত্মনির্ধারণ নীতি একটি নৈতিক দাবী মাত্র, কাজেই ইহাকে একটি আইনসঙ্গত দাবী বলা চলে না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আলাণ্ড দ্বীপ এই আত্মনির্ধারণ নীতির ভিত্তিতে যখন ফিনল্যাণ্ড দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুইডেনের সহিত মিলিত হইবার দাবী জানাইল, তখন লীগ অব নেশন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ জাতির এই দাবী শুধু নৈতিক দাবী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল।

সুতরাং এই দাবী সম্পর্কে বলা যায় যে, ইহা সর্বক্ষেত্রে অবাধভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া যখন একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবিশিষ্ট জাতিকে বলপূর্বক অপর একটি জাতি তাহার পদানত করিয়াছে, বা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও সমগ্র জনসমষ্টির এক বিশাল অংশ তাহাদের পৃথক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে এই স্বাধিকার দাবী করে—এই সকল ক্ষেত্রে, আত্মনির্ধারণ-নীতি প্রয়োগ

করা একান্ত আবশ্যক। পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, ভারত, বর্মা ও কোরিয়ার এই দাবী নৈতিক ও আইনসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পশুবলের সাহায্যে জাতির এই আত্মনির্ধারণের দাবা চিবদিন দমিত রাখা সম্ভব নয়—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য।

জাতির অন্যান্য দাবী—Other Rights of Nationalities

আত্মনির্ধারণের দাবী সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ না করা গেলেও জাতির অন্যান্য দাবীগুলি পূরণ করা উচিত। বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি অন্যান্য কতকগুলি অধিকারের দাবী করিতে পারে। এই অধিকার-গুলি পূরণ করিতে জাতীয় রাষ্ট্রের যত্নবান্ হওয়া উচিত।

(ক) জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার—Right of Exist

একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সম্প্রদায়েব লোকগুলিকে তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিবার অধিকাব দেওয়া উচিত। জাতীয় রাষ্ট্র এমন কোন নীতি বা আইন বলবৎ করিবে না, যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হইতে পাবে।

(খ) ভাষারক্ষার অধিকার—Right to Language

একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বাস করিতে পারে। এই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি তাহাদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমে যাহাতে ভাবেব আদান-প্রদান, শিক্ষাকার্য বা সাহিত্য ও কৃষ্টির পুষ্টিসাধন কবিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত। বলপূর্বক সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষার ব্যবহার বন্ধ করিয়া তাহাদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাধ্যতামূলক করা উচিত নয়।

(গ) সংখ্যালঘিষ্ঠের স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার অধিকার—Right to Retention of local Laws and Customs

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এই অধিকারের দাবী লীগ অব নেশন্‌স কর্তৃক স্বীকৃত হয়। প্রত্যেক জাতির সামাজিক জীবন কতকগুলি আচার, রীতিনীতি ও প্রথার দ্বারা অনেক পরিমাণে নিয়মিত হয়। জাতির জীবনের অনেকখানি স্থান এই সামাজিক প্রথাগুলি অধিকার করিয়া থাকে। কোন সম্প্রদায়ের এই সামাজিক প্রথাগুলি যদি সমগ্র জাতীয় জীবনের বা জাতীয় নৈতিক জ্ঞানের বিরোধী না হয়, তাহা হইলে এই প্রথাগুলি রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(ঘ) আইনগত ও রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার—Right to Legal and Political Equality

জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক এই দুই প্রকার অধিকারের দাবী করিতে পারে। যোগ্যতা থাকিলে প্রত্যেক নাগরিকই—সে যে সম্প্রদায়ের লোক হউক না কেন, ভোট দিবার ক্ষমতা বা সরকারের সর্ববিধ কার্যে যোগদান করিবার অধিকার অর্জন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া কাহারও অধিকারের কোন তারতম্য হওয়া উচিত নয়। আইনের চক্ষে সব নাগরিকই সমান। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া কোন সম্প্রদায় রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনরূপ বিশেষ অধিকার উপভোগের দাবী করিতে পারে না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি—Origin of the United Nations

মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আন্তর্জাতিকতা হইল শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এই আদর্শ প্রত্যেক জাতিকে তাহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বন্ধুত্বের সহিত অপরাপর জাতির সহিত বাস করিবার শিক্ষা দেয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার উপর এই আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি। লীগ অব নেশন্‌স ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের দ্বারা জাতিসমূহ এই আদর্শে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

পারস্পরিক সহযোগিতা যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির পক্ষে অপরিহার্য, এই সত্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর অনেক জাতি বুঝিতে পারিয়া লীগ অব নেশন্‌সের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের গঠনগত ও প্রকৃতি-গত ত্রুটি থাকায় ইহা সম্পূর্ণরূপে ইহার উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে নাই। কয়েক বৎসর আংশিক সাফল্যের সহিত কাজ করিবার পর ইতালির সহিত আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময় এই প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা বিশেষরূপে প্রকাশ পায় ও ইহার নিষ্ক্রিয়তার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শীঘ্রই আরম্ভ হইয়া ইহার ব্যর্থতা প্রমাণিত করে।

১৯৪১ সালের ১৪ই আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর আটটি বিষয় সমন্বিত যে যুক্ত ঘোষণা প্রচারিত হয়, তাহার মধ্যেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি সূচিত হয়। ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী ২৬টি বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও গৃহীত হইয়া এই ঘোষণা অতলান্তিক সনদের ভিত্তি স্থাপন করে। অতলান্তিক সনদের অব্যবহিত পরে আর একটি ঘোষণা মস্কো হইতে প্রচারিত হয়। এই ঘোষণায়ও বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে 'সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির সমবায়ে একটি বাস্তব আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের উল্লেখ করা হয়। ১৯৪৩ সালের জুন ও

নভেম্বর মাসে সম্মিলিত জাতিগুলির আরও দুইটি অধিবেশনে যুদ্ধজনিত অনেক সমস্যার আলোচনা হয়। ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে ডাম্বারটনওক্‌সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এক সম্মেলনে বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের বিশদ বিবরণ আলোচিত হয়। ডাম্বারটনওক্‌সে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, ১৯৪৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর সম্মিলিত জাতিগুলির স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো অধিবেশনে সেই প্রস্তাব কার্যকরী হয়। স্যানফ্রান্‌সিসকো অধিবেশনে পূর্ববর্তী প্রস্তাবগুলি একটি নির্দিষ্টরূপ ধারণ করিয়া বিশ্বশান্তির রক্ষক হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্মদান করে। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দেশ্য—Objectives

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা আরও ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। যুদ্ধে লিপ্ত জাতিগুলি ও নিরপেক্ষ জাতিগুলি এবার বুঝিতে পারিল যে, একটা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে এই সর্বনাশা যুদ্ধব্যবসায় বন্ধ করিতে না পারিলে মানুষের আর পরিত্রাণের পথ নাই। তাই যুদ্ধকালীন অবস্থায় যুদ্ধরত জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধশেষে একটি আন্তর্জাতিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার ইচ্ছা তীব্র হইয়া উঠে। প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের চেষ্টায় এবং বৃটিশ ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধানদ্বয়ের সহযোগিতায় এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) নামে গঠিত হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের গঠন-ব্যাপারে বিজিত জাতিগুলির কোন প্রকার প্রভাব ছিল না।

লীগ অব্ নেশন্‌সের ন্যায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এক মহান আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হইল শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং নানাভাবে জাতিপুঞ্জের সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। ইহা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, তাহার মর্যাদা এবং মূল্য-সংরক্ষণ, জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। জাতিপুঞ্জের সনদের ভূমিকায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতির সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়া যাহাতে সকল জাতি পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীর ন্যায় বাস করিতে পারে তাহার জন্যও জাতিপুঞ্জ সংকল্প করিয়াছে। সংকল্প কার্যে পরিণত হইলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা

সুনিশ্চিত। ষাটটি রাষ্ট্র লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত। বর্তমানে ইহার মোট সদস্য সংখ্যা হইল ৯৯। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্ম হয়।

সংগঠন—Organisation

সাধারণ সভা (General Assembly), স্বস্তিপরিষদ্ (Security Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), অছি পরিষদ্ (Trusteeship Council), দপ্তরখানা (Secretariat) এবং আরও কতকগুলি শাখাসমিতি লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত।

সাধারণ সভা—General Assembly

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের পাঁচজন প্রতিনিধি সাধারণ সভায় যোগদান করিতে পারে, কিন্তু কোন রাষ্ট্রের একটির বেশী ভোট দিবার ক্ষমতা নাই। আন্তর্জাতিক সমস্যা-সমূহের আলোচনা করা ও সেই সম্পর্কে সুপারিশ করা এই সভার প্রধান কার্য। ইহা ছাড়া, এই সভা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারে। এই সভার বৎসরে একটি মাত্র অধিবেশন বসে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অধিবেশন বসিতে পারে।

নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদ—Security Council

পাঁচজন স্থায়ী (জাতীয় চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সদস্য ও দুই বৎসরের জন্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত ছয়জন—মোট এগার জন সদস্য লইয়া স্বস্তিপরিষদ্ গঠিত। এই পরিষদের প্রধান কার্য হইল শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক কলহের সমাধান করা। বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে এই পরিষদ আন্তর্জাতিক বিবাদ সম্পর্কে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে পারে। ১। যে কোন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পারে, ২। বিরোধী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা বিবাদের মীমাংসা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, ৩। মধ্যস্থতার দ্বারা মীমাংসা করিতে পারে, ৪। সালিশী ব্যবস্থার সুপারিশ করিতে পারে, অথবা ৫। স্বস্তি পরিষদ নিজে মীমাংসা করিতে পারে। শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ হইলে এই পরিষদের বলপ্রয়োগ দ্বারা শান্তি-স্থাপনের ক্ষমতা আছে। এই পরিষদের যে-কোন সিদ্ধান্ত পরিষদের স্থায়ী পাঁচজন সদস্যের একজনের অসম্মতিতে বলবৎ করা যায় না।

কর্মসংস্থা—Secretariat

একজন প্রধানসচিবের অধীনে আটটি বিভাগ দ্বারা দপ্তরখানার কার্য পরিচালিত হয়। প্রধানসচিব স্বস্তিপরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়—International Court of Justice

আন্তর্জাতিক বিচারালয় হল্যাণ্ডের হেগ সহরে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত পনর জন বিচারপতিকে লইয়া এই বিচারালয় গঠিত। আন্তর্জাতিক আইন-সংক্রান্ত বিষয়গুলির মীমাংসা করা এই আদালতের প্রধান কার্য।

অছি পরিষদ—Trusteeship Council

লীগ অব্ নেশন্‌সের সময়ে অছি পরিষদের উদ্ভব হয়। কিছু পরিবর্তিত আকারে এই পরিষদ্ নূতনভাবে গঠিত হইয়া অনগ্রসর জাতিসমূহের তদারক করে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ, অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি ও সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির সমান সংখ্যক সদস্য লইয়া এই পরিষদ্ গঠিত।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ—Economic and Social Council

জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন স্তরের সামাজিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সাধারণ সভা এই পরিষদের মোট ১৮ জন সদস্য নির্বাচন করে। এই সভার কার্য সভার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ, বিশ্ব ব্যাংক, কৃষিসংস্থা, মানবীয় অধিকার সংস্থা প্রভৃতি হইল এইরূপ কয়েকটি সংস্থা।

গত পাঁচ-ছয় বৎসরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে এই সংগঠন অনেকটা সাফল্য অর্জন করিয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, ইসরাইল-আরব সীমান্ত-সমস্যা, ইরাণের তৈল লইয়া বিরোধ ও কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এখনও পর্যন্ত করিতে পারে নাই। যে জাতীয় চীন সরকারের চীনের মূল ভূখণ্ডে কোন অস্তিত্ব পর্যন্ত নাই, সেই চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য, আর বাস্তব চীন সাধারণ-তন্ত্র সরকার ইংলণ্ড, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াও জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ

হইতে বঞ্চিত আছে। জার্মানি, জাপান প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলিকে প্রতি-হিংসার বশবর্তী হইয়া যে অবস্থায় রাখা হইয়াছে তাহাতে স্বভাবতই জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের প্রতি কাহারও বিশেষ আস্থা থাকিতে পারে না। স্বস্তিপরিষদের পাঁচটি স্থায়ী পদ চারিটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ও এক নামসর্বস্ব তাঁবেদার রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত আছে। এই নীতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সমানাধিকারের পরিচায়ক নহে। আণবিক শক্তি ও হাইড্রোজেন বোমা নিয়ন্ত্রণ করিতে এখনও পর্যন্ত এই সঙ্ঘ সমর্থ হয় নাই।

সংক্ষিপ্তসার

স্বজাতীয় মানুষ, জাতীয় জনসমাজ ও জাতি

রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাবিহীন কিন্তু একই ঐতিহ্য দ্বারা ঐক্যবদ্ধ একদল মানুষকে স্বজাতীয় মানুষ বলা যাইতে পারে। যখন এই স্বজাতীয় মানুষ বংশগত, ভাষাগত বা অন্য কোন ঐক্য দ্বারা আরও গভীরভাবে একতাবদ্ধ হয়, তখন তাহাদের জাতীয় জনসমাজ বলা হয়। জাতীয় জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ হইলে যখন তাহারা স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র গঠন করে, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে রূপান্তরিত হয়।

জাতিগঠনের উপাদান

কুলগত, ভাষাগত, ধর্মমত বা ভাবগত ঐক্য—এইগুলিকে সাধারণতঃ জাতি-গঠনের উপাদান বলা হয়। কিন্তু জাতিগঠনে বাহিরের উপাদান অর্থাৎ কুলগত বা ভাষাগত ঐক্য অপেক্ষা ভাবগত ঐক্য অর্থাৎ সম-সুখদুঃখবোধ ও সম-আদর্শে অনুপ্রাণিত ঐক্য অধিক সহায়ক।

এক জাতি এক রাষ্ট্র

জাতীয়তা বা সাজাত্যবোধ একটা মানসিক অনুভূতির ব্যাপার। ইহা প্রধানতঃ ভাগবত ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাগবত ঐক্য আছে বলিয়া সুইস্ জাতি কুল ও ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও এক শক্তিশালী ও দেশপ্রেমিক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রত্যেক জাতি তাহাদের নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শে উপনীত হইবার জন্য পৃথক রাষ্ট্রগঠনের দাবী করে। জাতির এই স্বাতন্ত্র্যবোধের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন হইলে জাতিগুলির মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ

অনেক কমিয়া যাইবে। প্রত্যেক জাতি নিজ আদর্শ অনুযায়ী তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া জগতকে সমৃদ্ধ করিতে সাহায্য করিতে পারে।

আত্মনির্ধারণের নীতি

'এক জাতি এক রাষ্ট্র'—এই নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রগঠনের যে দাবী তাহাকে জাতির আত্মনির্ধারণের দাবী বলা হয়। সম্পূর্ণ পৃথক্ ঐতিহ্যবিশিষ্ট জাতির ক্ষেত্রে এই আত্মনির্ধারণের দাবী প্রযোজ্য হইলেও সকল ক্ষেত্রে ইহার অবাধ প্রয়োগ সম্ভবও নয়, যুক্তিযুক্তও নয়। জাতির এই দাবী অবাধভাবে স্বীকৃত হইলে বহু প্রতিষ্ঠিত ও প্রাচীন রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইয়া তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না। পরস্পরের সহিত কলহ-বিবাদে বিশ্বশান্তিও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

জাতির অন্যান্য দাবী

কোন জাতিকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ধারণের অধিকার না দিলেও তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ভাষা, সামাজিক প্রথা, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়গুলিতে স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা ও নানাভাবে জাতিগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ইহার প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। স্বস্তিপরিষদ্, সাধারণ সভা, আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও দপ্তরখানা লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি বড় বড় রাষ্ট্রগুলির এই প্রতিষ্ঠানের উপর বেশী প্রভাব বলিয়া এখনও পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের মনে সম্পূর্ণ আস্থা সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. **Explain the theory "One Nation, one State." Would you accept it? State your reasons fully.**

   'এক জাতি এক রাষ্ট্র' মতবাদটির ব্যাখ্যা কর। এই মতবাদটি গ্রহণযোগ্য কিনা যুক্তিসহ বিচার কর।

নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে আইন ও শৃংখলার সহিত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয়। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূভাগ, শাসনব্যবস্থা ও সর্বোপরি সার্বভৌমিকতা—এই চারিটি হইল রাষ্ট্র অস্তিত্বের লক্ষণ। কিন্তু জাতির সংজ্ঞা রাষ্ট্রের সংজ্ঞা হইতে শুধু পৃথক নয়, গভীরতর বটে। জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে রাষ্ট্রভুক্ত জনসমষ্টির মধ্যে একাত্মবোধ থাকা অপরিহার্য। রাষ্ট্র ও জাতি একাত্মবোধক হয় তখন, যখন রাষ্ট্রভুক্ত সমগ্র জনসমষ্টি একই ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। একাত্মবোধের অবর্তমানে একটি রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে কিন্তু একজাতি গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু একই রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘকাল বসবাস করিলে একই শাসন, আইন ও শিক্ষাব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন জাতি ক্রমশঃই একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া এক জাতিতে পরিণত হয়। আবার একদল লোক যখন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের নিজস্ব জীবন, ভাষা, কৃষ্টি ও অর্থ নৈতিক স্বার্থ রক্ষা করিতে দৃঢ়সংকল্প হয়, তখন এই একাত্মবোধই তাহাদের জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন করিতে সাহায্য করে। এইজন্য বলা হয় যে, রাষ্ট্র জাতি সৃষ্টি করে, আবার জাতিও রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। ("The state creates the nation and the nation creates the state").

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বে ভারতকে একজাতি বলিয়া অনেকে গণ্য করিতেন না। বিশেষ করিয়া মুসলীম লীগ্ প্রচারিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতকে একজাতি বলিয়া পরিগণিত করা যুক্তিসম্মত ছিল না। দেশবিভাগের পরবর্তী কালে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতকে আর এক জাতি বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। সত্য বটে, ভারতে কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত প্রভৃতি জাতি গঠনের বিভিন্ন বাহ্যিক ঐক্যের অভাব। কিন্তু ভারতবাসী আজ এক গভীরতর ভাবগত ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাধ্যমে ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি তাহাদের ভাবগত ঐক্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বের দরবারে তাহাদের ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করাই হইল ভারতীয় সভ্যতার মূল আদর্শ। এই আদর্শ স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে আজ সফল হইতে চলিয়াছে। সুতরাং তিন জাতি সমন্বিত সুইস দেশ ও বহু জাতি সমন্বিত রুশ দেশের মত ভারতীয়-গণও আজ এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

5. State the principal aims and objects of the United Nations. Give a brief outline of its organisation. H. S. (Hu) 1962 Comp.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা কর। ইহার গঠন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উঃ—যে উদ্দেশ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই একই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের পর জাতিপুঞ্জ জন্মলাভ করে। চিরতরে যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করাই হইল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে ও নানাভাবে জাতিগুলির মধ্যে সদ্ভাব ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে এই প্রতিষ্ঠান সাহায্য করে। ইহা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, তাহার মূল্য ও মর্যাদা সংরক্ষণ, জনগণের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান সম্মিলিত প্রচেষ্টায়

আরা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতির সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়া যাহাতে সকল জাতিই পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীর ন্যায় বাস করিতে পারে তাহার জন্য জাতিপুঞ্জ সংকল্প করিয়াছে।

বর্তমানে প্রায় একশত জাতি এই সংস্থার সদস্যভুক্ত। নিম্নলিখিত বিভাগগুলি লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত :

১। সাধারণ সভা—সদস্য জাতিসমূহ হইতে পাঁচজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া এই সভা গঠিত হইলেও প্রত্যেক জাতির একটি মাত্র ভোট আছে।

২। নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদ—পাঁচজন স্থায়ী ও ছয়জন অস্থায়ী মোট এগার জন সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত। এই পরিষদই হইল জাতিপুঞ্জের শাসনবিভাগ। কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে সমস্ত স্থায়ী সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন।

৩। অছি পরিষদ—আত্ম নির্ধারণের অধিকারহীন জাতিসমূহের শাসনব্যাপারে এই পরিষদ তত্ত্বাবধায়কের কাজ করে।

৪। আন্তর্জাতিক আদালত—সাধারণ সভাকর্তৃক নির্বাচিত ১৫ জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত। আন্তর্জাতিক আইন-সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে এই আদালত মীমাংসা করে।

৫। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ—আঠার জন সদস্যসমন্বিত এই পরিষদ জাতিসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করে।

ইহা ছাড়াও কর্মসংস্থা, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শ্রমিক সম্পর্কিত বিষয়গুলির সমাধান করিবার জন্য বহু শাখা-সমিতি আছে।

দশম শ্রেণীর জন্য

অষ্টম অধ্যায়

নাগরিকতা

(Citizenship)

নাগরিক সংজ্ঞা—Definition of a Citizen

• সাধারণ অর্থে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে যাহারা বাস করে তাহাদের ঐ শহরের নাগরিক বলা হয় ও নাগরিক হিসাবে তাহারা কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে, 'নাগরিক' শব্দটি এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। নাগরিক শব্দটির প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ নাগরিক শব্দটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে বাস করিতেন। এই নগর-রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইত না। যে সমস্ত অধিবাসীর প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান করিবার যোগ্যতা ও অপর্যাপ্ত সময় ছিল, তাহাদিগকেই নাগরিক আখ্যা দেওয়া হইত। সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্র-পরিচালনাকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতাই ছিল নাগরিকত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বর্তমানকালে নাগরিক শব্দের ব্যবহার আর ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নাই। বর্তমানে রাষ্ট্রগুলি প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা আয়তনে ও জনসংখ্যায় বহুগুণ বৃহত্তর। নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইতে গেলে আর পূর্বের মতন কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন যোগ্যতারও প্রয়োজন হয় না। কোন রাষ্ট্রের সদস্য হইলেই তাহাকে বর্তমান নাগরিক বলা হয়। যে লোক একটি রাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বাস করিয়া সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলা হয়। নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের সদস্যরূপে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয় এবং অন্যদিকে তাহাকে কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। সুতরাং বর্তমান রাষ্ট্র তাহার নাগরিকদের নিকট হইতে সক্রিয়ভাবে কোন কর্তব্যপালনের দাবী করে না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি একথা মনে করা

যায় যে, বর্তমান নাগরিকগণ শুধু কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী, রাষ্ট্রসম্পর্কে তাহাদের কোনরূপ কর্তব্য-সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা নাই তাহা হইলে মারাত্মক ভুল হইবে। জনসমষ্টি লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। প্রত্যেকটি লোক রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন করিয়া উন্নততর সমাজ-জীবন প্রবর্তনের জন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই তৎপর হওয়া প্রয়োজন। সমষ্টিগত জীবন যাহাতে রাষ্ট্রের মাধ্যমে একটা আদর্শস্তরে উন্নীত হইতে পারে, সেইজন্য প্রত্যেক নাগরিকই এরূপভাবে তাহার ব্যক্তিগত কার্যকলাপ পরিচালিত করিবে যাহাতে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয়। সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান না করিলেও প্রত্যেক নাগরিকেরই কিছু পরিমাণে ক্রিয়াশীল থাকা চাই। প্রত্যেক নাগরিকই তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া সমষ্টিগত জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য যত্নবান্ হইবে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নাগরিকতা হইল ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি গুণের সমাবেশ—যে সমাবেশে সমাজ-জীবন সহজ ও সুগম হয়। এইজন্য অধ্যাপক ল্যাস্কি নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, নাগরিকতার সারমর্ম হইল—সাধারণের হিতার্থে, ব্যক্তির শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত মার্জিত বুদ্ধির প্রয়োগ। (Citizenship "is the contribution of one's instructed judgment to public good") সমাজের প্রত্যেক নাগরিক এইরূপভাবে তাহার চিন্তাধারা ও কার্যাবলী পরিচালিত করিবে যাহাতে জনকল্যাণ সাধিত হয়। এইজন্য অবশ্য প্রত্যেক নাগরিকেরই উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়া চাই।

নাগরিক ও বিদেশী—Citizen and Alien

নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিদেশী ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। যে দেশে বিদেশী কার্যব্যপদেশে সাময়িকভাবে বাস করে, সে দেশের সাধারণ বিধি-নিষেধ তাহাকে মানিতে হয় ও সেই দেশের প্রবর্তিত করও তাহাকে দিতে হয়। বিদেশী কতকগুলি পৌর অধিকার ভোগ করিলেও তাহার কোন রাজনৈতিক অধিকার জন্মে না, বা সে দাবী করিতে পারে না। বিদেশীকে অসদাচরণের জন্য দেশ হইতে বহিষ্কার করা যায়। কিন্তু বিদেশীকে বলপূর্বক যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না। বিদেশী সাময়িকভাবে যে দেশে বাস করে সে দেশই পরিত্যাগ করিলে তাহার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে সে রাষ্ট্রের আর কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু নাগরিক জীবন সম্পূর্ণভাবে

রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। নাগরিক স্বদেশেই থাকুক আর বিদেশেই থাকুক, সর্বত্রই তাহার নিজ রাষ্ট্র তাহার নিরাপত্তা রক্ষা করে। নাগরিক পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে ভোগ করে ও নাগরিক জীবনের সমস্ত দায়িত্ব—এমন কি প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে যোগদান—তাহাকে পালন করিতেই হইবে।

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি—How citizenship is acquired

নাগরিক অধিকার দুই উপায়ে পাওয়া যায় :—প্রথম, জন্মাধিকারে এবং দ্বিতীয় অর্জনের দ্বারা। জন্মাধিকার দুই প্রকার—একটি হইল রক্তগত অধিকার (*Jus Sanguinis*), অপরটি হইল জন্মভূমিগত অধিকার (*Jus Soli*)। প্রথমোক্ত নীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্মকালে তাহার পিতা যে দেশের নাগরিক ছিলেন সে সেই দেশের নাগরিক হইবে, তাহার জন্মস্থান যে-কোন দেশেই হউক না কেন। ভারতীয় পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে-কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন ভারতীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। দ্বিতীয় নিয়মানুসারে যদি কোন ভারতীয় পিতামাতার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে সে সন্তান তাহার পিতামাতা ভারতীয় হাওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই নিয়মে জন্মভূমির বিচার করিয়া নাগরিকত্ব স্থির হয়।

যদি কোন রাষ্ট্র একই সঙ্গে এই উভয় নীতি প্রয়োগ করিয়া নাগরিকত্ব স্থির করে, তাহা হইলে একই ব্যক্তি একই সময়ে দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া কথা উঠিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে-কোন দেশে জাত হউক না কেন রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়। অপরপক্ষে ভিন্ন দেশের পিতামাতার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাত হইলে ভূমিগত অধিকারের বলে তাহাকেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া দাবী করা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে নাগরিক সাবালক হইয়া এক দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিজ ইচ্ছানুসারে অন্য দেশের নাগরিক হইতে পারে।

স্ত্রীলোকগণ বিবাহের দ্বারা তাহাদের স্বামীর নাগরিকত্ব পায়। বৈবাহিক সম্বন্ধ ছাড়াও ভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের অধীনে চাকুরী লইয়া, বহুদিন অপর রাষ্ট্রে বসবাস করিয়া বা ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ও সামরিক বাহিনীতে যোগদান করিয়া নূতন নাগরিকের অধিকার পাওয়া যায়।

সকল রাষ্ট্রই বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব অর্পণ করে। এইরূপে কোন দেশের জন্মগত নাগরিক যদি ভিন্ন রাষ্ট্রে অর্পিত নাগরিকত্ব অর্জন করে, তাহা হইলে

তাহাকে অর্জিত নাগরিকত্ব (Naturalized citizenship) বলা হয়। বিবাহ, সম্পত্তি-ক্রয় বা সেনাবিভাগে যোগদান—সবগুলি উপায়ই হইল নাগরিক অধিকার অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি, কিন্তু এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে অর্পিত নাগরিকত্ব একটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে বিদেশীকে কতকগুলি শর্ত পালন করিতে হয়। বিদেশী যে রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে ইচ্ছুক সে রাষ্ট্রের নিয়মানুযায়ী বিদেশীর সে দেশে একটি নির্দিষ্ট সময় বসবাস করিতে হয় ও তাহাকে সৎভাবাপন্ন বলিয়া প্রমাণিত করিতে হয়। সে দেশের ভাষাভাষী হওয়ারও অনেক সময় প্রয়োজন হয়। এই শর্তগুলি পূরণ হইলে রাষ্ট্র ইহার ইচ্ছামত বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব প্রদান করিতে পারে। এইরূপে নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে বিদেশীকে আবেদন করিতে হইবে এবং কোন বিচারালয় বা শাসনবিভাগীয় উচ্চতর কর্তৃপক্ষ ঐ আবেদন বিবেচনা করিয়া নাগরিকত্ব প্রদান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করে।

এইরূপে নাগরিকত্ব অর্জিত হইলে বিদেশীও সেই দেশের জাত নাগরিকদের সমপর্যায়ভুক্ত হইয়া নাগরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতার দ্বারা আবদ্ধ হয়। সাধারণতঃ এই দুই শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশ কোন বিদেশী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলেও তাহাকে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে না। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির পদ জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব-প্রাপ্ত নাগরিক ব্যতীত অন্য কোন নাগরিক পাইতে পারে না।

নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি—Loss of Citizenship

নূতন নাগরিকত্ব অর্জন করিলে পূর্ব-নাগরিকত্বের অবসান ঘটে। বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকের পূর্ব-নাগরিকত্ব নষ্ট হয়। অপর দেশে জমি খরিদ বা বিদেশী সরকারের চাকুরীগ্রহণ, দীর্ঘকাল স্বদেশে অনুপস্থিতি, বা গুরুতর অপরাধে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার, প্রভৃতি কারণে নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে।

সু-নাগরিকের গুণ—Qualities of a good Citizen

নাগরিক জীবনের চরম সার্থকতা নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি গুণের সমাবেশে। যে গুণগুলি থাকিলে সু-নাগরিক হওয়া যায়, সেগুলি হইল

বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম, বিচারবুদ্ধি ও সমাজচেতনা। নাগরিককে সকল সময়ে নিজের অধিকার ও কর্তব্যসম্বন্ধে সমানভাবে সজাগ থাকিতে হইবে। অধিকার সম্বন্ধে অত্যধিক উৎসাহী আর কর্তব্যসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলে নাগরিক জীবন কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সু-নাগরিক নিজের অধিকার-সম্বন্ধে যেরূপ সচেতন অন্যের অধিকারসম্বন্ধেও তাহার অনুরূপ শ্রদ্ধাবান্ হওয়া উচিত। এইরূপ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সম-সুখদুঃখবোধের দ্বারাই নাগরিক জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহার অভাবে নাগরিক জীবন আদর্শচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র দলাদলি ও কলহে লিপ্ত হইয়া উঠে।

পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়—Hindrances to good Citizenship

পূর্ণ নাগরিক জীবনের যে সকল অন্তরায় আছে, তন্মধ্যে উদাসীনতা (Indolence) হইল প্রধান। উদাসীনতার কারণ হইল কর্তব্যবোধের অভাব। নাগরিক জীবন যে শুধু কতকগুলি অধিকারের সমষ্টি নয়, একথা প্রত্যেক নাগরিকেরই স্মরণে রাখিতে হইবে। কি সাধারণ নাগরিক, কি সরকারী কর্মচারী প্রত্যেকের স্বীয় কর্তব্যসম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে। সাধারণ নাগরিকের হয়ত অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বৃহৎ ও জটিল সমস্যাগুলির সমাধানে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা না থাকিতে পারে; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে ভোটদান করা, রাষ্ট্রের সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধানে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়া অংশ গ্রহণ করা, বা যুদ্ধের সময়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সাহায্য করা বিষয়ে কোন নাগরিকেরই উদাসীন থাকা উচিত নয়। নাগরিকেরা যদি তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্যে সাহায্য না করে, তাহা হইলে গণতন্ত্র একনায়কত্বে পরিণত হইয়া নাগরিক অধিকার পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। আধুনিক গণতন্ত্র জনমত ও জনসহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণ যদি এই সহযোগিতাপ্রদানে কার্পণ্য করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হওয়া স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকগণ যদি অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত থাকে তাহা হইলে এই স্বার্থপরতা (Private Self-interest) তাহাদের আদর্শ নাগরিক জীবনের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। সমাজ-জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থকে বলি দিতে হইবে। নাগরিকগণ অনেক সময় যোগ্যতা বিচার না করিয়া আত্মীয়তা-বন্ধনের জন্য অথবা অর্থলোভে অযোগ্য লোক

প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সরকারী চাকুরীতেও অনেক সময়ে যোগ্যব্যক্তির নিয়োগ না হইয়া ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অযোগ্য লোক নিয়োগ করা হয়। এরূপ স্বার্থপ্রণোদিত কার্যের দ্বারা দেশের ও দশের অনিষ্ট করা হয়। এতদ্ব্যতীত দলগত রাজনীতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে দলীয় স্বার্থও (Party Spirit) নাগরিক জীবনের এক অভিশাপরূপে দেখা দিয়াছে। দলীয় স্বার্থ যখন প্রবল হইয়া দেখা দেয়, তখন জাতীয় স্বার্থ নষ্ট হয়। দলীয় স্বার্থের হানাহানিতে অনেক দেশে বৃহত্তর জনকল্যাণের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে। এই দলীয় স্বার্থের প্রাবল্যে আয়ারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও একটি দেশে সু-নাগরিকতার আরও অন্তরায় থাকিতে পারে। দেশে যদি জনকল্যাণমূলক সুচিন্তিত অভিমত প্রাধান্য লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে নাগরিকগণের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। এজন্য উচ্ছৃঙ্খল, দায়িত্বজ্ঞানহীন মতকে প্রতিরোধ করা আবশ্যক। এবিষয়ে দেশের সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা প্রভৃতির গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। চিন্তাশীল, বিচক্ষণ জননেতাগণ সভাসমিতি ও প্রচার-পুস্তিকার সাহায্যে সু-নাগরিক সৃষ্টিতে সাহায্য করিতে পারেন। দেশের নির্বাচন-পদ্ধতি যদি পক্ষপাতশূন্য না হয় তাহা হইলেও নাগরিকগণ রাজনৈতিক ব্যাপারে ক্রমশঃই উদাসীন হইয়া পড়েন।

অন্তরায়গুলির প্রতিকার—Remedies

পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়গুলিকে দূর করিতে পারিলে আদর্শ নাগরিক হওয়া যায়। লর্ড ব্রাইস্ এই সম্পর্কে দুইটি উপায়ের কথা বলিয়াছেন। প্রথম হইল, শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন এবং দ্বিতীয় হইল জনসাধারণের জীবনযাত্রার নৈতিক মানের উন্নয়ন। শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন বলিতে আমরা বুঝি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভোটদানে বাধ্য করা, নাগরিকগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়ন, অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রতিনিধি নির্বাচন, অবিশ্বস্ত বা অযোগ্য সরকারী কর্মচারীদের শাস্তিবিধান, ইত্যাদি। শাসন-ব্যবস্থায় এইগুলি বলবৎ করা হইলে লোকের উদাসীনতা, দলীয় মনোভাব ও স্বার্থপরতা অনেক পরিমাণে দূর হইয়া তাহাদিগকে রাষ্ট্রের কার্যপরিচালনায় সক্রিয় করিয়া তুলিবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজন হইল লোক-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা। মানুষের মনে কর্তব্যবোধ জাগরিত করিতে হইবে। কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ যখন কাজ করে তখন তাহার দ্বারা মহৎ অনেক কিছু সম্ভব হয়। মানুষের মধ্যে কর্তব্যবোধ

সঞ্চারিত করিবার জন্য চাই শিক্ষার প্রসার। এই শিক্ষার ফলে নাগরিকগণ সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া সমাজ-জীবনকে উন্নততর করিতে পারে। প্রকৃত শিক্ষা ফলপ্রসূ হইতে হয়ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষার বীজ সমাজদেহে একবার প্রোথিত হইলে আজই হউক আর কালই হউক রাজনৈতিক জীবনে সোনার ফসল ফলাইবে। ভারতীয় জনগণের নৈতিক মান যে আজ এত নীচু হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ হইল প্রকৃত শিক্ষার অভাব।

সংক্ষিপ্তসার

নাগরিক

একটি রাষ্ট্রের আনুগত্যে বদ্ধ স্থায়ী বাসিন্দাকে নাগরিক বলা হয়। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে; আর তাহাদের কতকগুলি দায়িত্বও থাকে।

নাগরিক ও বিদেশী

বিদেশী হইল ভিন্নদেশবাসী। যে রাষ্ট্রে বিদেশী সাময়িকভাবে বাস করে, সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাহার অবস্থানকালে তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিলেও বিদেশী সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে পারে না। বিদেশীকে দেশ হইতে বহিষ্কার করা যায় কিন্তু সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না।

নাগরিকতা অর্জন ও বর্জনের উপায়

পুত্র-কন্যাগণ পিতৃত্বের ভিত্তিতে অথবা জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা প্রাপ্ত হয়। কোন কোন দেশ উভয় নীতিই প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহাতে অনেক অসুবিধা হয়। ইহা ছাড়া, বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয়। ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া, বা সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া, বা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আবেদন করিয়া নূতন নাগরিকত্ব লাভ করা যায়। এই পদ্ধতিগুলির দ্বারা পূর্বতন নাগরিকত্ব বিনষ্ট হয় ও নূতন নাগরিকত্ব সৃষ্ট হয়।

সু-নাগরিকের গুণ

বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম, বিচারবুদ্ধি, সমাজচেতনা হইল সু-নাগরিকের প্রধান গুণ।

পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায় ও তাহার প্রতিকার

নাগরিক জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে প্রধান অন্তরায় হইল সাধারণের কাজে উদাসীনতা, স্বার্থপরতা ও দলগত স্বার্থবুদ্ধি। শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন ও শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা নাগরিকদের নৈতিক উন্নতিসাধন করিতে পারিলে অন্তরায়গুলি দূর হইয়া সু-নাগরিক গঠন সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. **Distinguish between an alien and a citizen. How is citizenship acquired?**
নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য কর। নাগরিকতা কিভাবে অর্জিত হয়?

উঃ—নাগরিক হইল রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী এবং এই হিসাবে তাহাকে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। রাষ্ট্র স্বদেশে ও বিদেশে নিজের নাগরিকের নিরাপত্তা রক্ষা করে। পরিবর্তে নাগরিককে রাষ্ট্রের আইন মান্য করিতে হয় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্য কর প্রদান করিতে হয়। নাগরিক হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিকট কতকগুলি সুখ-সুবিধা পাইতে পারে—এইগুলি হইল পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার।

ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক সাময়িকভাবে অন্য দেশে বাস করিলে সে দেশে সে বিদেশী বলিয়া পরিগণিত হয়। বিদেশী যে দেশে সাময়িকভাবে বাস করে, সে দেশের আইন-কানুন তাহাকে মানিতে হয় ও সাধারণ করও প্রদান করিতে হয়। স্বদেশী রাষ্ট্র দেশের মধ্যেই বিদেশীর নিরাপত্তা রক্ষা করে, বিদেশী ভিন্ন দেশে গেলে তাহার নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব স্বদেশের নাই। বিদেশী কিছু পৌর অধিকার ভোগ করিলেও রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে পারে না। নাগরিকের ন্যায় বিদেশীকে আপৎকালে যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না, কিন্তু স্বদেশ উপযুক্ত কারণ থাকিলে বিদেশীকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারে।

দুই প্রকারে রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায়, যথা—(১) জন্মাধিকার ও (২) অর্জন। জন্মাধিকার দুই প্রকার—একটি হইল রক্তগত অধিকার, অপরটি হইল জন্মভূমিগত অধিকার। প্রথমোক্ত নীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্মকালে তাহার পিতা যে দেশের নাগরিক ছিল সে সেই দেশের নাগরিক হইবে তাহার জন্মস্থান যে-কোন দেশ হউক না কেন। ভারতীয় পিতার সন্তান যে-কোন দেশে জাত হউক না কেন সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে যদি কোন ভারতীয় পিতার সন্তান মার্কিন দেশে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে পিতা ভারতীয় হওয়া

সত্বেও সে মার্কিন দেশের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই বিষয়ে জন্মস্থান বিচার করিয়া নাগরিকত্ব স্থির হয়।

ইহা ছাড়া নানা উপায়ে অন্য দেশে নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়। বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকগণ স্বামীর নাগরিকত্ব অর্জন করে। ভিন্ন রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী লইয়া, বহুদিন ভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাস করিয়া বা ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বা সামরিক বাহিনীতে যোগদান করিয়া ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায়।

2. Define a citizen. What are the hindrances to good citizenship ?

H. S. (Hu) 1960

নাগরিক কাহাকে বলে? সুনাগরিকতার বাধা কি?

উঃ—প্রথম প্রশ্নের প্রথম ভাগের উত্তর দ্রষ্টব্য।

নাগরিক জীবনের চরম সার্থকতা নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি গুণের সমাবেশে। যে গুণগুলি থাকিলে সু-নাগরিক হওয়া যায় সেগুলি হইল বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম ও সমাজচেতনা। এই গুণগুলির অভাবই হইল পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়। অন্তরায়গুলির মধ্যে উদাসীনতা (indolence) হইল প্রধান। উদাসীনতার কারণ হইল কর্তব্যবোধের অভাব। নাগরিক জীবন যে শুধুমাত্র কতকগুলি অধিকার লইয়া গঠিত নয়, এ কথা সকল নাগরিকেরই স্মরণ রাখিতে হইবে। কি সাধারণ নাগরিক, কি সরকারী কর্মচারী প্রত্যেকেরই নিজ কর্তব্যপালনে সচেতন থাকা উচিত। নাগরিকগণ যদি কর্তব্যপালনে বিমুখ হয় তাহা হইলে গণতন্ত্র একনায়কত্বে পরিণত হইয়া তাহাদের অধিকার পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকগণ যদি অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত থাকে তাহা হইলে এই স্বার্থপরতা (Private Self interest) তাহাদের আদর্শ নাগরিক জীবন গঠনের বাধাস্বরূপ হইবে। সমাজ-জীবনের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নাগরিকগণের ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, দলীয় মনোভাবও (Party Spirit) নাগরিক জীবনের এক অভিশাপরূপে দেখা দিয়াছে। দলীয় স্বার্থ যখন প্রবল হয়, জাতীয় স্বার্থ তখন নষ্ট হয়। দলীয় স্বার্থের হানাহানিতে অনেক দেশে বৃহত্তর জনকল্যাণের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে। এই দলীয় মনোভাবের আতিশয্যে ভারত, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে।

শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন ও সু শিক্ষা প্রসার দ্বারা নাগরিকগণের নৈতিক উন্নতিসাধন করিতে পারিলে অন্তরায়গুলি দূর হইয়া সু-নাগরিক গঠন সম্ভব হইবে।

3 Define a citizen What are the qualities of a good citizen ? H. S (Hu) 1961

নাগরিক কাহাকে বলে? সু-নাগরিকের কি কি গুণ থাকা উচিত?

উঃ—নাগরিক হইল রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী এবং এই অধিবাসী হিসাবে প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রপ্রদত্ত সমগ্র অধিকারই—পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক—ভোগ করিতে পারে। পক্ষান্তরে

নাগরিককে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয় ও প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নাগরিককে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য সু-নাগরিকতার উপর নির্ভর করে, কারণ গণতন্ত্র হইল জনগণের শাসন। তাই দেশে সু-নাগরিকের সংখ্যা বেশী হইলে সু-শাসন সম্ভব হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে, নাগরিকতার সারমর্ম হইল—'সাধারণের হিতার্থে ব্যক্তির শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত মার্জিত বুদ্ধির প্রয়োগ, ('Citizenship is the contribution of one's instructed judgement to public good")। সমাজের প্রত্যেক নাগরিক এরূপভাবে তাহার চিন্তাধারা ও কার্যাবলী পরিচালিত করিবে যাহাতে সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হয়। তাই নাগরিক জীবনের চরম সার্থকতা নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি গুণের সমাবেশে আর এই গুণগুলি হইল, বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম, বিচারবুদ্ধি ও সমাজচেতনা। নাগরিককে সকল সময়ে নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সমানভাবে সজাগ থাকিতে হইবে। প্রত্যেক নাগরিকই তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া সমষ্টিগত জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য যত্নবান হইবে। সমষ্টির কল্যাণ-কার্যে উদাসীনতা, স্বীয় স্বার্থসাধনে অত্যধিক তৎপরতা ও দলীয় স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া—এইগুলিই হইল সু-নাগরিকতার প্রধান অন্তরায়। সুশিক্ষার সাহায্যে এই অন্তরায়গুলি দূর করিতে পারিলে নাগরিক জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে।

নবম অধ্যায়

নাগরিক অধিকার

(The Citizen's Rights)

অধিকার—Rights

সাধারণ অর্থে নাগরিক অধিকার বলিতে আমরা বুঝি নাগরিকের স্ব-ইচ্ছায় কিছু করিবার বা না-করিবার অবাধ ক্ষমতা। সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত এই নাগরিক অধিকার আর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। তস্কর মনে করে চৌর্যবৃত্তিতে তাহার অধিকার আছে। কিন্তু সমাজ যদি তস্করের এই অধিকার স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে সমাজ-জীবন অচল হইয়া উঠিবে। তাই রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় তস্করের এই অধিকারকে অনধিকাব বলা হয়। রাষ্ট্র তস্করের এই অধিকার স্বীকার করা দূরে থাকুক তাহা খর্ব করিয়া দেয়। রাষ্ট্রেব উদ্দেশ্য হইল আইনের দ্বারা সমাজে এরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করা, যে পরিবেশে ব্যক্তির পূর্ণবিকাশ সম্ভব করিয়া সমষ্টিগত জীবনের উন্নতিসাধন করিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে সকল অধিকার প্রয়োজন, সেগুলিকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলা হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, অধিকার হইল মানুষের সামাজিক জীবনের সেই সকল ক্ষমতা, যেগুলির অভাবে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে ক্ষমতাগুলি ব্যক্তিব পূর্ণতা-প্রাপ্তিব সহায়ক সেইগুলি প্রকৃত অধিকার, আর যেগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে অন্তরায় সেগুলিকে অধিকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কবে এই অধিকারের দাবীতে। রাষ্ট্র এই অধিকার-গুলি অক্ষুণ্ন রাখে ও পরিবর্তে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে।

নাগরিক অধিকারের প্রকারভেদ—Classification of Rights

যে অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যেগুলি রাষ্ট্র আইন দ্বারা রক্ষা করে, সেইগুলিকে আইনগত অধিকার (Legal Rights) বলা হয়। এই আইনগত অধিকার ছাড়াও মানুষের কতকগুলি নৈতিক অধিকারের কথাও বলা হইয়া থাকে, যেমন বৃদ্ধ ও অক্ষম মাতাপিতা পুত্রের দ্বারা পালিত হইবেন—এই অধিকার

তাঁহারা দাবী করিতে পারেন। কিন্তু এই অধিকার নীতিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভঙ্গ করিলে আইনতঃ কেহ শাস্তি পায় না। সেইজন্য এগুলিকে নৈতিক অধিকার (Moral Rights) বলা হয়।

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার

আইনগত অধিকারগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—পৌর অধিকার (Civil Rights) ও রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)।

পৌর অধিকারগুলি মানুষের সভ্য জীবন যাপন করিবার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এগুলির অভাবে মানুষ তাহার চরিত্রের পূর্ণবিকাশ করিতে সমর্থ হয় না। রাজনৈতিক অধিকারের দ্বারা মানুষ দেশের শাসন-পরিচালনা-কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

পৌর অধিকার—Civil Rights

নাগরিকগণের যে সমস্ত পৌর অধিকারের দাবী স্বীকৃত হইয়াছে, সেগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। জীবন ধারণের অধিকার—Right to Life

(এই অধিকারের অর্থ হইল যে প্রত্যেক ব্যক্তির বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে এবং রাষ্ট্র ব্যক্তির এই অধিকার পুলিশ, সামরিক ও বিচার ব্যবস্থার সাহায্যে রক্ষা করিবে। তবে কেহ যদি অপরের প্রাণনাশ করে তাহা হইলে রাষ্ট্র ন্যায়-সঙ্গত বিচার করিয়া খুনীর ফাঁসীর হুকুম দিতে পারে।)

২। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার—Right to Personal safety and Freedom of Movement

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার ও গোপনীয়তা রক্ষা করিবার অধিকার আছে। একমাত্র আইনভঙ্গ করিলে আইন সম্মতভাবে ন্যায় বিচারের পর বন্দী করা ছাড়া রাষ্ট্র অন্য কোন প্রকারে ব্যক্তির এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না।

৩। কাজ করিবার ও সম্পত্তির অধিকার—Right to work and Property

প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে। রাষ্ট্র সকলের জন্যই কর্ম সংস্থান করিবে নতুবা বেকারগণকে ভাতা দিবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজস্ব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ-দখল, বিনিময়,

দান বা হস্তান্তর করিতে পারিবে। তবে সাধারণ স্বার্থে রাষ্ট্র সম্পত্তির ভোগ-দখল ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

৪। চুক্তি করিবার অধিকার—Right to Contract

প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ ইচ্ছানুযায়ী সম্পত্তি বিনিময়ে ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপারে অপরের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে। তবে বে-আইনী, শ্লীলতা হানিকর বা ধ্বংসাত্মক চুক্তি অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

৫। ধর্মাচরণের অধিকার—Right to Religion

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেক ও বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মাচরণ করিতে পারিবে। তবে দেখিতে হইবে যে, একজনের ধর্মাচরণ অপরের ধর্মাচরণে যেন বাধা না দেয়।

৬। বাক্-স্বাধীনতা, সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—Freedom of Speech and Press and Right to Public Meeting

স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও চিন্তার বিষয় ভাষায় ব্যক্ত করা ইহাই হইল মনুষ্যত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষের চিন্তাধারার ক্রমাগত উৎকর্ষের ভাষায় যে অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহারই ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে জগৎসভ্যতা আজ সমৃদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এই অধিকার ব্যক্তিত্ব বিকাশের একান্ত সহায়ক। মানুষের এই অধিকার না থাকিলে তাহার পক্ষে আত্মরক্ষা ও আত্মসমর্থন সম্ভব নয়। তাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার গণতন্ত্রে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয়। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাক্-স্বাধীনতা এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যে, যাহাতে অন্যের সুনাম বা সামাজিক শালীনতাবোধ নষ্ট না হয় বা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা না থাকে।

৭। শিক্ষার অধিকার—Right to Education

প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা পাইবার অধিকার আছে। সভ্যদেশগুলিতে রাষ্ট্রকর্তৃক সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

৮। সংঘ গঠন করিবার অধিকার—Right to form Association

মানুষের বহুমুখী জীবনের বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ রাষ্ট্রের মধ্যে নানাবিধ সংঘ গঠন করে। পরিবার, ক্রীড়াসংঘ, বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতি হইল এই জাতীয় সংঘ। এই সংঘগুলি মানুষের চরিত্র-বিকাশে সাহায্য করে। তাই এই অধিকারটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয়।

উপরি-উক্ত অধিকারগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিই আইনতঃ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে

দাবী করিতে পারে, কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অধিকারগুলির কোনটিই অবাধভাবে প্রয়োগ করা চলে না। প্রত্যেক অধিকারই কর্তব্যের গণ্ডির দ্বারা সীমায়িত। আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে সত্য, কিন্তু আমি যদি অন্যের জীবননাশ করি তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার হইতে আমি বঞ্চিত হইব। আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া যাহা সত্য বলিয়া মনে করি তাহা ব্যক্ত করিবার অধিকার আমার আছে; কিন্তু আমার স্বাধীন মতামত এরূপভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে যাহাতে অন্যের মতামত প্রকাশের পথে অন্তরায় না হয়, বা অন্যের সুনাম নষ্ট না হয়, বা সমাজের শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা না থাকে। সেরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আমার এই স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থরক্ষাকল্পে সরকার অনেক সময় এই অধিকারগুলিকে সঙ্কুচিত করিতে পারে। যে অধিকারগুলি প্রয়োগের ফলে সমাজ-বিরোধী হিংসাত্মক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হইতে পারে বা শান্তি-শৃঙ্খলাভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে, জনকল্যাণের জন্য সরকার সে অধিকাবগুলিও খর্ব করিতে পারে।

বর্তমান যুগে নাগরিক অধিকার-সম্পর্কিত ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অধিকার-সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে, কোন অধিকারই অবাধ বা সমাজ-নিরপেক্ষ নহে। এতদ্ব্যতীত আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সর্বকালের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে এই অধিকারগুলির সংজ্ঞা নির্ণয় করা বা এইগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্র স্থির করা যায় না। যেহেতু এই অধিকারগুলি একটা নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়, সেইহেতু সমাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত অধিকারগুলিরও পরিবর্তন ঘটে। মানুষের শিক্ষার অধিকার বা জীবিকা অর্জনের অধিকার পূর্বে স্বীকৃতিলাভ করে নাই বা বর্তমান জগতে বহু দেশে এই অধিকারগুলি স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু কালের পরিবর্তনের বহুদেশে এই অধিকারগুলি স্বীকৃতি লাভ করিয়া মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। সুতরাং অধিকারগুলি গতিশীল—স্থিতিশীল নহে।

মৌলিক অধিকার—Fundamental Rights

সকল অধিকার অবাধ, অসীম বা চিরন্তন না হইলেও মানুষের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশেব অপরিহার্য অবস্থা বলিয়া সর্বদেশে স্বীকৃত হয় এবং এইজন্য এই অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীন

ধর্মমত পোষণ করিবার অধিকার প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত। বর্তমান যুগে এই অধিকারগুলি সকল সভ্য দেশের রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই অধিকারগুলি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রগুলি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এই অধিকারগুলি যাহাতে অন্য ব্যক্তি বা শাসনকর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতায় ব্যাহত না হয়, তজ্জন্য অনেক দেশে শাসনতন্ত্রে একটি অধিকারের সনদ (Bill of Rights) যোগ করা হয়। অধিকারের সনদে মানুষের এই প্রাথমিক অধিকারগুলি স্থান পায়। এই অধিকারগুলিকে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিকার হইতে পৃথক্ করিয়া শাসনতন্ত্রে সন্নিবদ্ধ করা হয়। এইজন্য এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বলা হয়। যদি কোন কারণে এই অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে লিখিত শাসনতন্ত্রে অধিকারের সনদ দ্বারা অধিকারগুলি সুরক্ষিত হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে প্রধান বিচারালয়ের বিচার-বিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের উপর এই অধিকারগুলির নিরাপত্তা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

রাজনৈতিক অধিকার—Political Rights

১। ভোটদানের অধিকার—Right to vote

আধুনিক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হইল জনমত। এই জনমত রাষ্ট্রের প্রত্যেক সাবালক ও সুস্থ মস্তিষ্কের লোকের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ভোটাধিকার যত ব্যাপক ও সার্বজনীন হয়, রাষ্ট্রের প্রকৃতিও তদনুরূপ গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ভোটদান ক্ষমতা ব্যক্তির একটা প্রধান অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয়। এই অধিকারের সাহায্যে ব্যক্তি রাষ্ট্র-পরিচালনাকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

২। ভোট পাইবার অর্থাৎ নির্বাচনের অধিকার—Right to be elected

ভোট দিবার মত ভোট পাইবার অর্থাৎ রাষ্ট্রপরিচালনা কার্যে অংশগ্রহণ করিবার অধিকারও প্রত্যেক নাগরিক দাবী করিতে পারে।

৩। সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার—Right to hold public offices

স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই সরকারী চাকুরী

পাইতে পারিবে। সরকার এবিষয়ে নাগরিকগণের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা করিবে না।

(৪।) আবেদন করিবার অধিকার—Right to petition

ব্যক্তি বা সমষ্টি সরকারের নিকট তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে শান্তি-পূর্ণভাবে আবেদন জানাইতে পারিবে।

অর্থনৈতিক অধিকার—Economic Rights

আধুনিককালে মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ এই অধিকারগুলি না থাকিলে রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক অধিকারগুলি নিরর্থক। অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির ভোটাধিকার বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং গণতান্ত্রিক আদর্শ সফল করিতে হইলে অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অর্থনৈতিক অধিকারের তাৎপর্য হইল যে, প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিবার অধিকার অর্থাৎ বেকার না থাকা, নির্দিষ্ট সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অসুস্থ বা বেকার অবস্থায় ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক অধিকার বলা হয়। প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশের শাসনতন্ত্রে এই অধিকারগুলি স্থান পাইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্রে নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে এই অধিকারগুলির উল্লেখ দেখা যায়।

ভোটদান করিবার ক্ষমতা: ইহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য—The Right to vote : Its importance and implications

ভোটদান করিবার ক্ষমতা বর্তমান যুগে নাগরিকগণের একটি সর্বপ্রধান অধিকার বলিয়া বিবেচিত হয়। এই ক্ষমতার বলে নাগরিকগণ পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থা-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ভোটদান-ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইলে কয়েকটি যোগ্যতা থাকা চাই। কারণ ভোটদান শুধু অধিকার নহে, ইহা নাগরিকের কর্তব্যও বটে। অপ্রাপ্তবয়স্ক, উন্মাদ, অপরাধী, দেউলিয়া প্রভৃতি অযোগ্য বিবেচিত হয় বলিয়া তাহাদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয় না। ভোটদান-ক্ষমতা যথাযথভাবে পরিচালিত না হইলে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারে না। ইহাতে শাসনকার্যের অবনতিও ঘটে। অপর পক্ষে ভোটদান-ক্ষমতার গুরুত্ব হইল যে, এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নাগরিকগণ তাহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে ও সরকারের যথেচ্ছাচারিতায় বাধা দিতে

পারে। উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন হইলে জাতি-ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে। নাগরিকগণ অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ও শাসন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আইনসঙ্গতভাবে সরকারের কার্যের সমালোচনা করিতে পারে।

সার্বজনীন ভোটাধিকার—Universal Franchise

গণতান্ত্রিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বর্তমানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভোটদানের অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক ভোটদানের অধিকারী হইবে গণতন্ত্র হইবে সেইরূপ ব্যাপক। ভোটদান-ক্ষমতা একদিকে যেমন একটি অধিকার অন্যদিকে ইহা আবার সেইরূপ একটি গুরুদায়িত্ব। যে ক্ষেত্রে এই অধিকার অর্জনের ও কর্তব্যপালনের ক্ষমতার অভাব দেখা যায় সেখানে ভোটদান-ক্ষমতা অর্পণ করা ঠিক নহে। এই কারণে প্রত্যেক সভ্য দেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিকৃত-মস্তিস্ক, দেউলিয়া, দুর্বৃত্ত প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় না।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণের সম্মতি তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং জনগণের ভোটদান-ক্ষমতা না থাকিলে সে শাসন-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী হইলে জনগণ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া দায়িত্ববোধ-হীন ও স্বৈরাচারী সরকারকে অপসারণ করিতে পারে। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল নাগরিকই সমান অধিকার দাবী করিতে পারে এবং সকলের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হয়। যেখানে সকলের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হয় একমাত্র তাহাকেই কল্যাণ-রাষ্ট্র বলা যায়।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান করিবার বিরুদ্ধে জন ষ্টুয়ার্ট মিল, মেইন প্রভৃতি মনীষিগণ অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন। মিল ভোটদান ব্যাপারে ভোটদাতার শিক্ষার উপর বেশী জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না ও গণিতশাস্ত্রের প্রাথমিক সূত্রগুলির সহিত পরিচিত নয়, তাহাদের ভোটদান অধিকার দেওয়া মিল যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। তাঁহার মতে পূর্বে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া পরে তাহাদের ভোটদান অধিকার দেওয়া উচিত ("Universal teaching must precede universal enfranchisement"), কিন্তু একথা সব সময়ে সত্য নয়। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোটদাতা হিসাবে

যে নিরক্ষর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাহা স্বীকার করা যায় না। অধিকন্তু ভোটদানের অধিকার থাকিলে লোকে তাহাদের অন্য অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হইয়া সেগুলি দাবী করিতে পারে। পূর্বে কিছু সম্পত্তির মালিক হওয়া ও কিছু কর-প্রদানের ক্ষমতা থাকা আবশ্যিক বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বর্তমানে এগুলিকে ভোটদান অধিকারের বিশেষ যোগ্যতা বলিয়া গণ্য করা হয় না। ১৯৫২ সাল হইতে ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের (২১ বৎসর) ভোটাধিকার নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

নাগরিক অধিকার

অধিকারের সাধারণ অর্থ হইল ক্ষমতা। কিন্তু অবাধ ক্ষমতার প্রয়োগ ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। সেইজন্য এই ক্ষমতাগুলি কতকগুলি কর্তব্যের দ্বারা সীমায়িত করা হয়। এই অধিকারগুলি ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এগুলি এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে সমাজের অন্য লোকের অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়। কাজেই ব্যক্তিবিশেষের অধিকার-প্রয়োগ অন্যের প্রতি তাহার কর্তব্যবোধ দ্বারা সীমাবদ্ধ। এক ব্যক্তির যাহা অধিকার, অন্যের তাহা কর্তব্য। এই পারস্পরিক সম্বন্ধ রাষ্ট্র আইনের দ্বারা অব্যাহত রাখে।

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার

অধিকারগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার। জীবন-ধনসম্পত্তির অধিকার, বাক-স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা প্রভৃতি পৌর অধিকার। ভোটদান-ক্ষমতা, সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রভৃতিকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। কিন্তু এই অধিকার-গুলির কোনটিই শর্তহীন নয়।

মৌলিক অধিকার

মানুষের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যতীত তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না। তাই শাসনতন্ত্র কর্তৃক এই অধিকারগুলি

রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হয়। জীবন ও সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়।

সার্বজনীন ভোটাধিকার

একটি দেশে যখন স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ভোটদান করিবার ক্ষমতা থাকে তখন তাহাকে সার্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়। কিন্তু সার্বজনীন ভোটাধিকার থাকিলেও নাবালক, দেউলিয়া, পাগল প্রভৃতির ভোট থাকে না। পূর্বে ভোটদানের অধিকারী হইতে হইলে সম্পত্তির মালিক, কর-প্রদান সামর্থ্য থাকা অপরিহার্য বিবেচিত হইত। মিলের মতে ভোটদাতার শিক্ষার যোগ্যতাও আবশ্যিক বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এই যোগ্যতাগুলির উপর আর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

প্রশ্ন ও উত্তর—একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দশম অধ্যায়

নাগরিকের কর্তব্য

(Duties of Citizens)

কর্তব্য—Duties

নাগরিক কর্তব্য বলিতে বুঝায়, যে কর্তব্যগুলি নাগরিকের পক্ষে অবশ্যকরণীয় —যেগুলি পালন না করিলে আইনসঙ্গতভাবে শাস্তি পাইতে হয়। নাগরিক যেরূপ রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিকার দাবী করে, রাষ্ট্রও তদ্রূপ নাগরিকের নিকট কতকগুলি কর্তব্যপালনের দাবী করিতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য আলোচনার পূর্বে নাগরিকের অন্য কর্তব্যগুলির আলোচনা হওয়া দরকার।

পরিবারের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য—Citizen's Duty to the Family

নাগরিক শুধু রাষ্ট্রের সদস্য নহে। সে যে পরিবারে বাস করে সেই পরিবারেরও সে একজন সদস্য। জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতেই শিশু মাতা-পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-যত্নে লালিত-পালিত হয়। মাতা-পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিশুর ভার গ্রহণ করেন। শিশু স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত পরিবারের উপরই নির্ভরশীল থাকে। পরিবারের মধ্যে না থাকিলে শিশু যে শুধু বড় হইতে পারে না তাহা নহে, তাহার ব্যক্তিত্বেরও পূর্ণবিকাশ পারিবারিক পরিবেশ ছাড়া সম্ভব নহে। সুতরাং যে পরিবার সাবালক না হওয়া পর্যন্ত শিশুর সমস্ত ভার গ্রহণ করে, সেই পরিবারের প্রতি শিশুর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা পবিত্র কর্তব্য। বৃদ্ধবয়সে অথবা অক্ষম হইলে মাতা-পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে-কষ্টে সাহায্য করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের এই কর্তব্য আইনানুমোদিত কর্তব্য না-ও হইতে পারে। পরিবারের প্রতি এই কর্তব্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি পরিবারের প্রতি কর্তব্যপালনে অবহেলা করে, তাহাকে কু-সন্তান বলা যাইতে পারে।

সমাজের প্রতি কর্তব্য—Duties to the Community

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক পরিবেশেই তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব। শুধু পরিবারের সদস্য হইয়াই মানুষ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না, তাই পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মানুষ বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজ গঠন করিয়াছে। সুতরাং সামাজিক মানুষ হিসাবে সমাজের প্রতিও মানুষের একটা কর্তব্য রহিয়াছে। মানুষ যে সমাজে বাস করে, সে সমাজের বিধি-নিষেধগুলি তাহার মানিয়া চলা উচিত। যাহাতে সমষ্টির কল্যাণ, তাহাতে ব্যক্তিরও কল্যাণ হয়। সুতরাং সমাজ-বিরোধী কোন কাজ কোন নাগরিকেরই করা উচিত নহে। মানুষ শুধু যে সমাজ-বিরোধী কোন কাজ করিবে না তাহা যথেষ্ট নহে, সে তাহার চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ এরূপভাবে পরিচালিত করিবে যাহাতে ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গল হয়।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য—Allegiance

প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য হইল স্বরাষ্ট্রের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করা। আনুগত্যের অর্থ হইল, রাষ্ট্রের কার্যে বাধা না দিয়া সর্বতোভাবে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা। অপরাধ নিবারণ ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারের কার্যে সাহায্য করা প্রত্যেক নাগরিকেরই গুরু দায়িত্ব বলিয়া সর্বদেশে বিবেচিত হয়।

রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়া চলা—Obedience to laws

রাষ্ট্র আইনের দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষা করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের জন্যই প্রত্যেক নাগরিকের আইন মানিয়া চলা উচিত। কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের মতে যদি কোন আইন অন্যায় বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে জনমত সৃষ্টি করিয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সে আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হইবে।

করপ্রদান—Payment of Taxes

আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনহিতকর কার্যসম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রের প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। জনগণের প্রদত্ত কর হইতে এই অর্থ সংগৃহীত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সেজন্য প্রত্যেকের দেয় কর সময়মত রাষ্ট্রকে প্রদান করিতে হইবে।

ভোটদান—Voting

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদান-ব্যাপারে অবহিত হইতে হইবে। ভোটদান করা শুধু একটি নাগরিক অধিকার নয়, ইহা নাগরিকের পক্ষে একটা গুরু দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। সুতরাং সততা ও সুবিবেচনা-সহকারে এই দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। সমাজ-জীবন যাহাতে উন্নততর হয়, সেজন্য নাগরিকগণের সর্বদা সচেতন থাকা উচিত।

প্রয়োজনমত সরকারী কার্যে সাহায্য করা নাগরিকদের অবশ্য কর্তব্য। এইজন্য সর্বদেশে জুরীর বিচার প্রবর্তিত আছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কোন কারণে বিপন্ন হইলে নাগরিকগণের কর্তব্য হইল নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া রাষ্ট্রকে রক্ষা করা। রাষ্ট্র সকল অধিকারের উৎস। রাষ্ট্রের অবর্তমানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। তাই রাষ্ট্রকে রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য।

সংক্ষিপ্তসার

নাগরিক কর্তব্য

যে পরিবারের স্নেহ-যত্নে নাগরিক লালিত-পালিত হয় এবং যে সমাজ ব্যবস্থায় তাহার চরিত্র গঠিত হয়, সেই পরিবার ও সমাজের প্রতি নাগরিকের আনুগত্য দেখান পবিত্র কর্তব্য।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা, যথাযথভাবে ভোটদান করা, সময়মত কর প্রদান করা ও প্রয়োজনমত অন্যভাবে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা নাগরিকদের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এই সকল কর্তব্যপালনে উদাসীন হইলে তাহার অধিকারের দাবী রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় না।

প্রশ্ন ও উত্তর—একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

একাদশ অধ্যায়

অধিকার ও কর্তব্য

(Rights and Duties)

অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক—Correlation of Rights and Duties

কোন নাগরিক অধিকারই অবাধ বা অসীম নয়। সমাজ-জীবনে প্রত্যেকটি অধিকার একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে প্রয়োগ করিতে হয়, আর অপর ব্যক্তির অধিকারের দ্বারা এই গণ্ডির সীমারেখা স্থির হয়। নাগরিকের যেরূপ কতকগুলি অধিকার আছে, সেইরূপ কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আমার যেমন বাঁচিয়া থাকিবার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার ও ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা করিবার অধিকার আছে, অন্যেরও সেইরূপ অধিকার আছে। আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই বলিয়া অন্যের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে পারি না। আমার যেমন অধিকার আছে, সমাজের অন্য সকলেরও সেইরূপ অধিকার আছে এবং অন্যের সেই সকল অধিকারে আমার হস্তক্ষেপ না করিবার দায়িত্ব রহিয়াছে। আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ না-করা অন্যের যেরূপ কর্তব্য, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করাও আমার সেইরূপ কর্তব্য। তাই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি থাকিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, অধিকার ও কর্তব্য একই আদর্শের দুইটি বিভিন্ন রূপ।

প্রথমতঃ, বলা যায়, আমার যাহা অধিকার, অন্যের তাহা কর্তব্য। আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, এ কথার অর্থ হইল যে, অপর সকলের কর্তব্য হইল আমার জীবন নাশ না-করা। দ্বিতীয়তঃ, অন্যের যাহা অধিকার, আমার তাহা কর্তব্য। অন্য লোকের জীবনের অধিকার ক্ষুণ্ণ না-করা আমার কর্তব্য। তৃতীয়তঃ, আমার ও অন্য লোকের অধিকারগুলিকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সুতরাং ব্যক্তিগত অধিকারগুলি রক্ষা করা রাষ্ট্রের পক্ষে কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। চতুর্থতঃ, যেহেতু রাষ্ট্রই আমাদের অধিকারগুলির স্রষ্টা ও রক্ষক সেইহেতু আমাদের সকলেরই কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, সময়মত কর দেওয়া এবং সবরকমে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সুনাম রক্ষা করা। ব্যক্তির পক্ষে যাহা

কর্তব্য রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা অধিকার এবং ব্যক্তির পক্ষে যাহা অধিকার রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা কর্তব্য। এইরূপে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকই এইরূপভাবে তাহার অধিকার প্রয়োগ করিবে, যাহাতে অন্যের অধিকার কোনমতে ক্ষুণ্ণ না হয়। অধিকারের এইরূপ প্রয়োগই ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশে সাহায্য করিয়া সামাজিক-জীবনে অগ্রগতির পথ সুগম করে।

সংক্ষিপ্তসার

অধিকার ও কর্তব্য

অধিকার ও কর্তব্য একই আদর্শের দুইটি বিভিন্ন রূপ। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি থাকিতে পারে না। আমার যাহা অধিকার অন্যের তাহা কর্তব্য এবং অন্যের যাহা অধিকার আমার তাহা কর্তব্য। আবার রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কেও নাগরিকের যাহা অধিকার রাষ্ট্রের তাহা কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের যাহা অধিকার নাগরিকের তাহা কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। নাগরিকগণের এই পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা জন্মিলে সমাজ-জীবনের অগ্রগতি সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What is meant by the term Rights? "Rights and Duties go together" Explain. (H. S. (Hu) 1961)

অধিকার বলিতে কি বুঝ? "অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত"—উক্তিটি বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

উঃ—সাধারণ অর্থে অধিকার বলিতে আমরা বুঝি নাগরিকের স্ব-ইচ্ছায় কিছু করিবার বা না করিবার অবাধ ক্ষমতা। কিন্তু একজনের এইরূপ অবাধ অধিকার অন্য ব্যক্তির অধিকার ভোগে বাধা জন্মাইতে পারে। সেই জন্য সমাজ-ব্যবস্থায় কাহারও এইরূপ অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত অধিকার স্বীকৃত হয় না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল আইনের সাহায্যে সমাজে এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা যে পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ করিয়া সমষ্টিগত জীবনের উন্নতিসাধন করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে সমস্ত অধিকারের প্রয়োজন সেগুলিকে প্রকৃত অধিকার বলা হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, অধিকার হইল মানুষের সামাজিক জীবনের সেই সকল ক্ষমতা, যেগুলির অভাবে মানুষ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে ক্ষমতাগুলি মানুষের পূর্ণতা প্রাপ্তির সহায়ক—অথচ অন্য ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করে না—সেইগুলি প্রকৃত অধিকার, আর যেগুলি পূর্ণতা প্রাপ্তির অন্তরায় সেগুলিকে অধিকার না বলিয়া অনধিকার বলা যায়।

অধিকার ও কর্তব্য একই আদর্শের দুইটি বিভিন্ন প্রকাশ। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি থাকিতে পারে না। আমার যাহা অধিকার অন্যের তাহা কর্তব্য এবং অন্যের যাহা অধিকার আমার তাহা কর্তব্য। আমার যেরূপ বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, অন্যের সেইরূপ বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। আমার কর্তব্য হইল অন্যকে বাঁচিয়া থাকিতে দেওয়া ও অন্যের কর্তব্য হইল

আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার ক্ষুণ্ণ না করা। তাই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আবার রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কেও নাগরিকের যাহা অধিকার রাষ্ট্রের তাহা কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের যাহা অধিকার, নাগরিকের তাহা কর্তব্য। নাগরিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দাবী করিতে পারে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এই নিরাপত্তা রক্ষা করা। আবার রাষ্ট্র নাগরিকগণের নিকট হইতে আনুগত্য ও কর প্রদান দাবী করিতে পারে এবং নাগরিকের কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও কর প্রদান। অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নাগরিকগণের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিলে সমাজ-জীবনের অগ্রগতি সম্ভব হয়।

2. Define the term 'Right' of a citizen. Enumerate the principal rights of a citizen. H. S. (Hu) Comp. 1961
নাগরিক অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। নাগরিকের প্রধান প্রধান অধিকারগুলি বর্ণনা কর।

অধিকারের সংজ্ঞা—প্রথম প্রশ্নের প্রথম প্যারা দ্রষ্টব্য।

উঃ—যে অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যেগুলি রাষ্ট্র আইন দ্বারা রক্ষা করে, সেইগুলিকে আইনগত অধিকার (Legal Rights) বলা হয় এই আইনগত অধিকার ছাড়াও মানুষের কতকগুলি নৈতিক অধিকারের (Moral Rights) কথা বলা হইয়া থাকে। এই অধিকারগুলি দেশের নৈতিক মতবাদ দ্বারা সমর্থিত হয়। বৃদ্ধ পিতার সন্তান কর্তৃক পালিত হইবার অধিকার আছে। ইহা হইল পিতার একটি নৈতিক অধিকার। সন্তান তাঁহাকে পালন না করিলে সে সমাজে নিন্দিত হইবে, কিন্তু রাজদ্বারে শাস্তি পাইবে না। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর নিকট ভরণপোষণের দাবী করিতে পারে। স্ত্রীর এই অধিকার শুধু নৈতিক নয়—ইহা আইনগতও বটে। ইহা ভঙ্গ করিলে লোকে শাস্তি পায়।

আইনগত অধিকারগুলিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, পৌর অধিকার (Civil Rights) ও রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)। নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা সম্পর্কিত অধিকারগুলিকে পৌর অধিকার বলা হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা ও মতামত প্রকাশের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তি করিবার অধিকার প্রভৃতি হইল এই পর্যায়ভুক্ত। রাজনৈতিক অধিকার হইল মানুষের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ও সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার অধিকার।

3. What are the fundamental duties of a citizen in a modern state ?
বর্তমান রাষ্ট্রের নাগরিকগণের মৌলিক কর্তব্য কি কি?

উঃ—কর্তব্যের অর্থ হইল দায়িত্ব অর্থাৎ যেগুলি নাগরিক হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যকরণীয়। অধিকারের ন্যায় কর্তব্য আবার দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা, নৈতিক কর্তব্য ও আইনগত কর্তব্য। পিতার কর্তব্য হইল পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া—এই কর্তব্য হইল নৈতিক, ইহা পালন না করিলে পিতা সমাজে নিন্দনীয় হইলেও শাস্তি পান না। কিন্তু কর প্রদান করা হইল নাগরিকগণের আইনগত কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন না করিলে নাগরিক শাস্তি পায়।

আইনগত কর্তব্য ছাড়াও প্রত্যেক নাগরিকের কতকগুলি নৈতিক কর্তব্য আছে। এই কর্তব্যগুলি হইল পরিবারের প্রতি ও সমাজের প্রতি। মানুষ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ও যে সামাজিক পরিবেশে সে বর্ধিত হয়, সেই পরিবার ও সমাজের প্রতি তাহার আনুগত্য ও শ্রদ্ধা থাকা

উচিত। মানুষ যে সমাজ-বিরোধী কোন কাজ করিবে না তাহা যথেষ্ট নহে, সে তাহার চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ এরূপভাবে পরিচালিত করিবে যাহাতে তাহার নিজের ও সমাজের মঙ্গল হয়।

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হইল আনুগত্য স্বীকার করা। আনুগত্যের অর্থ হইল, রাষ্ট্রের কার্যে বাধা না দিয়া সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত কাজে সাহায্য করা। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র-প্রবর্তিত আইন মান্য করা নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। রাষ্ট্রপ্রণীত আইন যদি অন্যায় বা অসঙ্গত মনে হয় তাহা হইলে নাগরিকের কর্তব্য হইল জনমত সৃষ্টি করিয়া আইনানুমোদিতভাবে অসঙ্গত আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র পরিচালনা কার্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে সময়মত ধার্য কর প্রদান করা। পরিশেষে বলা যায় যে, সততা ও সুবিবেচনা সহকারে ভোটদান করাও প্রত্যেক নাগরিকের গুরু দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হয়।

4. Show that 'Rights imply duties'. Mention some of the important duties of a citizen.

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক নির্ণয় কর। নাগরিকের কতিপয় প্রধান প্রধান কর্তব্যের উল্লেখ কর।

উঃ—প্রথম ভাগের উত্তরের জন্য ১নং প্রশ্নের উত্তরের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় ভাগের উত্তরের জন্য ৩নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

5. What is meant by the Right of Free Speech? Is it essential for Democracy? Should there be any limits to these Rights?

বাক্-স্বাধীনতা-দ্বারা কি বুঝা যায়? ইহা কি গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ? ইহার কি কোন বাধা থাকা উচিত?

উঃ—বাক্-স্বাধীনতা সর্বদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার বলিয়া পরিগণিত হয়, কারণ এই অধিকারটি ব্যতীত মানুষ পূর্ণ নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে না। এই অধিকারটির অবর্তমানে মানুষ চিন্তা ও ভাবের পারস্পরিক আদান-প্রদান দ্বারা উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গঠন করিতে পারে না। ফলে সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান হইল বাক্-স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা প্রয়োগ করিয়া জনগণ তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা এবং সরকারী অন্যায় ও অত্যাচার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়।

বাক্-স্বাধীনতার অপরিহার্য অঙ্গ হইল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা। বাক্-স্বাধীনতার অর্থাৎ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার তাৎপর্য হইল যে, লোকে যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া বিবেচনা করে তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা। বাক্-স্বাধীনতার অভাবে লোকের চিন্তাশক্তি থাকে না—আর যে লোক চিন্তা করিতে শিখে না, সে লোক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সু-নাগরিক হইতে পারে না।

বাক্-স্বাধীনতা নাগরিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইলেও এই স্বাধীনতা অবাধ বা শর্তশূন্য নহে। বাক্-স্বাধীনতার দাবীতে কেহ অপর ব্যক্তির সুনাম নষ্ট বা মানহানি করিতে পারে না। রাষ্ট্রদ্রোহমূলক বক্তৃতার দ্বারা জনসাধারণকে বে-আইনীভাবে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিশেষ আইন সাহায্যে এই জাতীয় অনিষ্টকর বাক্-স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে। অনেকের মতে যুদ্ধের সময় এই বাক্-স্বাধীনতা দেশের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষাকল্পে সংকুচিত করা যাইতে পারে। কিন্তু এবিষয়ে মতভেদ দেখা যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

আইন ও স্বাধীনতা

(Law and Liberty)

আইন—Law

যখনই বহুলোক একসঙ্গে বাস করে, তখনই এই সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য সকলকেই কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, নতুবা সঙ্ঘবদ্ধ জীবন অচল হয়। পরিবার হইল মানুষের আদি ও প্রাথমিক সঙ্ঘ। এখানেও পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পরিবারের কর্তার নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে হয়, নতুবা পরিবার চলিতে পারে না। এইরূপ দেখা যায় যে, মানুষ সমাজে বিদ্যালয়, শ্রমিকসঙ্ঘ, ক্রীড়াসঙ্ঘ প্রভৃতি যে সমস্ত অসংখ্য সঙ্ঘ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির সু-পরিচালনার জন্য কতকগুলি বিধি নিষেধ ও আইন-কানুন সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই নিয়ম অনুসারেই সঙ্ঘগুলির সদস্যগণের পরিচালিত হইতে হয়।

রাষ্ট্র হইল মনুষ্য-সৃষ্ট সঙ্ঘগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রও সমাজস্থিত অন্যান্য সঙ্ঘগুলির কার্যক্ষেত্র অপেক্ষা বহুদূর বিস্তৃত। এইজন্য রাষ্ট্র নিজের কর্মক্ষেত্র স্থির করিতে এবং নাগরিকগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত এই বিধি-নিষেধগুলিকে আইন বলা হয়। আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র প্রথমতঃ তাহার নিজের কাজগুলি সুনিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্র সরকার বা শাসন-ব্যবস্থা গঠন করিয়া ইহার সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করে। শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ না থাকিলে সরকার স্বৈরাচারী হইতে পারে। এইজন্য সরকারী কার্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে আইন সৃষ্টি হয়, তাহাকে শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law) বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে নিয়ম-কানুন রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়, তাহাকে সাধারণ আইন (Ordinary Law) বলা হয়।

রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইনের বৈশিষ্ট্য হইল যে ব্যক্তি-নির্বিচারে ইহা প্রযোজ্য। আইনের চক্ষে ছোট-বড় নাই—সকলেই সমান। দ্বিতীয়তঃ, এই আইন সকলে

সব সময় মানিতে বাধ্য। রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করিলে শাস্তি পাইতে হয়। কোন কোন লোক নৈতিক কর্তব্যবোধে আইন মান্য করে, আর কেহ কেহ শাস্তির ভয়ে আইন মানে। লোকে কেন আইন মান্য করে, একটু বিচার করিয়া দেখিলে ইহার সদুত্তর পাওয়া যায়। আইন যদি এরূপ হয় যে, ইহা মান্য করিলে ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গল হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থে লোকের আইন মানিবার ইচ্ছা হয়। সুতরাং আইন প্রণয়ন করিবার সময় জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন করা উচিত। যদি আইন অধিক-সংখ্যক লোকের স্বার্থ-বিরোধী হয়, তাহা হইলে সে আইন বলবৎ-করা রাষ্ট্রের পক্ষে কঠিন হয়। এককথায় বলিতে গেলে আইন যতই জনমত প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইবে, আইনের বাধ্যবাধকতা অর্থাৎ আইন মানিবার কর্তব্যবোধ ততই বৃদ্ধি পাইবে।

আইনের উৎস—Sources of Law

আধুনিককালে শাসন-ব্যবস্থার একটি বিভাগের উপর অর্থাৎ আইনসভার উপর **আইন প্রণয়নের (Legislation)** ভার থাকে। আইনসভা একটা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ আইনই এইরূপে প্রণয়ন করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক দেশেই এমন বহু আইন আছে যাহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তৈয়ারী হয় নাই। মানুষের বহু প্রাচীন প্রথা ও আচার-ব্যহার হইতেই এইগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। যখন সকলেই এই প্রচলিত **প্রথাগুলি (Customs)** মানিয়া চলে এবং রাষ্ট্রও এই প্রথাগুলিকে আইন বলিয়া স্বীকার করে, তখন এইগুলি আইনের মর্যাদা পায়।

তৃতীয়তঃ, প্রথার মত **ধর্মীয় অনুশাসনগুলিও (Religious rules)** আইন সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে। প্রচলিত ধর্মের বিধিগুলি যদি শাসন-পরিচালনা কার্যে সাহায্য করে, তাহা হইলে রাষ্ট্র এই বিধিগুলিকে সমর্থন করিয়া আইনের মর্যাদা দেয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের আইনের মধ্যে ধর্মীয় বিধিগুলি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, অভিজ্ঞ আইনবিদ্‌গণ তাঁহাদের **ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ (Scientific discussion by eminent jurists)** দ্বারা অনেক সময় নূতন আইন সৃষ্টি করিতে ও প্রচলিত আইনের পরিবর্তনের সাহায্য করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ, বিচারালয়ের **সিদ্ধান্তগুলি (Adjudication)** আইন-সৃষ্টিতে

সাহায্য করে। বিচারকগণ শুধু আইন প্রয়োগ করেন না, তাঁহারা প্রয়োজনমত প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যাও করেন। আইনের অর্থ যদি সুস্পষ্ট না হয় তাহা হইলে বিচারকগণ ব্যাখ্যা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহাই সঠিক আইন বলিয়া গণ্য হয়। একজন বিচারক কর্তৃক ব্যাখ্যাত আইন অনুসারে যখন অন্যান্য বিচারকগণ বিচারকার্য পরিচালনা করেন, তখন এই সিদ্ধান্ত আইনে পরিণত হয়।

ষষ্ঠতঃ, আইনের অসম্পূর্ণতার জন্য অনেক সময়ে বিচারকগণের নিজেদের ন্যায়বোধ ও বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বিচারকার্য পরিচালনা করিতে হয়। এই **ন্যায়ধর্মের (Equity)** ভিত্তিতে অনেক আইন গঠিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়ম—Law and Morality

রাষ্ট্রকর্তৃক প্রবর্তিত আইন ও নৈতিক নিয়মের মধ্যে বহু পার্থক্য দেখা যায়। নৈতিক নিয়মগুলি মানুষের চিন্তাধারা, কার্যের উদ্দেশ্য ও বাহিরের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, আর রাষ্ট্রীয় আইন শুধু মানুষের বাহিরের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং নৈতিক নিয়মগুলির প্রয়োগ ক্ষেত্র বহুদূর-বিস্তৃত। দ্বিতীয়তঃ, নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করিলে কোন দৈহিক শাস্তি নাই, শুধু নিজের বিবেক-দংশন ভোগ করিতে হয়, অপরপক্ষে রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তি পাইতে হয়। তৃতীয়তঃ, নৈতিক নিয়ম-গুলি মানুষের ঔচিত্য ও অনৌচিত্য, ন্যায় ও অন্যায়বোধের একটা নির্দিষ্ট মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে এরূপ কোন নির্দিষ্ট মান নাই। সাধারণের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইন সব সময়ে নৈতিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না। অকৃতজ্ঞতা, পরবিদ্বেষ প্রভৃতি নৈতিক অপরাধ হইলেও বে-আইনী নহে। খাদ্য-বরাদ্দের সময় (Rationing) এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে চাউল লওয়া বে-আইনী ছিল, কিন্তু বর্তমানে এই কার্য আইন-সম্মত। সুতরাং দেখা যায় যে, নীতিবিরুদ্ধ বলিয়াই যে মানুষের আচরণ বে-আইনী হয় তাহা সব সময়ে সত্য নহে। জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্র মানুষের অনেক আচরণকে বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে।

এতগুলি পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, নৈতিক নিয়ম ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মানুষের ধর্মগত ধারণা হইতেই উভয় নিয়মের জন্ম হইয়াছে। প্রচলিত নীতিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করা উচিত, নতুবা লোকে আইন মান্য করে না। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্য করিয়া সু-নাগরিক সৃষ্টি করা।

সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এমন আইন সৃষ্টি করা যেগুলি মানুষের নৈতিক উন্নতি সাধন করিয়া মানুষের মনে বিচারবুদ্ধি সঞ্চারিত করিতে পারে। এইজন্য অনেক সময় রাষ্ট্রকে পুরাতন আইন বা সামাজিক আচার-প্রথার স্থলে নূতন আইন প্রবর্তন করিতে হয়। এইরূপে নূতন আইনের দ্বারাও রাষ্ট্র মানুষের ঔচিত্যবোধ সৃষ্টি করিতে পারে। ভারতে রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে সতীদাহ-প্রথা বন্ধ হইলে মানুষের নীতিবোধ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই কু-প্রথা আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

স্বাধীনতা—Liberty

ব্যক্তির স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতাকেই সাধারণতঃ স্বাধীনতা বলা হয়। কিন্তু এই শব্দটি এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যে, এই শব্দটি সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট ধারণা করা প্রয়োজন। 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। রাষ্ট্রজন্মের পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত স্বাধীনতার অধিকারী ছিল, সেই স্বাধীনতাকে **প্রাকৃতিক স্বাধীনতা** (Natural Liberty) বলা হয়। প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীনতা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার বা স্বাধীনতা রক্ষা করিবার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। সুতরাং এই প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলিতে সবলের স্বেচ্ছাচারিতা ব্যতীত আর কিছু বুঝায় না।

দ্বিতীয়তঃ, **পৌর স্বাধীনতা** (Civil Liberty) অর্থে এই শব্দটিকে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে কতকগুলি অধিকার ভোগ করা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। এই স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাহার নাগরিকগণকে এই পৌর স্বাধীনতা ভোগ করিবার সম্পূর্ণ সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা, বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মমতের স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি অধিকারের সমষ্টিকে পৌর-স্বাধীনতা বলা হয়।

তৃতীয়তঃ, স্বাধীনতা বলিতে **রাজনৈতিক স্বাধীনতাও** (Political Liberty) বুঝায়। রাজনৈতিকক্ষেত্রে শাসনপরিচালনা-ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার সমষ্টিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আখ্যা দেওয়া হয়। প্রত্যেক বয়স্ক ও যোগ্যব্যক্তির ভোট দিবার ও ভোট পাইবার ক্ষমতা, যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে রাজকার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার ও সরকারের অনুসৃত নীতির নিরপেক্ষ সমালোচনা করিবার অধিকারগুলিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়।

চতুর্থতঃ স্বাধীনতা বলিতে বর্তমান যুগে **অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও** (Economic Liberty) বুঝায়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল যে, প্রত্যেক মানুষকে তাহার নিজের শিক্ষা ও সামর্থ্যানুযায়ী কার্য করিয়া জীবিকা অর্জনের সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। অনশনের ভয় বা বেকার হইবার ভয় থাকিলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। পৌর স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা একদিকে যেমন মানুষকে তাহার অধিকারসম্বন্ধে আত্মচেতন করে, অপর দিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সেইরূপ মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তাহার অন্যবিধ স্বাধীনতাকে সার্থক করিয়া তুলে। কাজ করিয়া জীবিকা-অর্জনের অধিকার, নির্দিষ্ট সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অসুস্থ বা বেকার অবস্থায় ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশের শাসনতন্ত্রে এই অধিকারগুলি স্থান পাইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, স্বাধীনতা শব্দটিকে **জাতীয় স্বাধীনতা** (National Liberty) অর্থেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল, ভিন্ন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করিবার অধিকার। এই স্বাধীনতার অবর্তমানে কোন জাতিই পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রভৃতির অধিকারী হইতে পারে না। যে স্বাধীনতা অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, সে স্বাধীনতা কখনও পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে পারে না। বৃটিশশাসিত ভারতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সব দিক দিয়াই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পর ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য ও আইনের সহিত ইহার সম্পর্ক—True Liberty and its relation to Law and Authority

সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় মানুষের নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য করিবার অবাধ ক্ষমতা। ব্যক্তির এই অবাধ ক্ষমতাপ্রয়োগের ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সবল ব্যক্তির স্বাধীনতা দুর্বল ব্যক্তির স্বাধীনতাকে হরণ করিতে পারে। অধিক বলশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে। এইরূপ অবাধ স্বাধীনতার ফলে সমাজে মুষ্টিমেয় অধিকতর শক্তিশালী বা চতুর ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারী হইবে: অপরপক্ষে দুর্বল ও নিরীহ প্রকৃতির লোকদের কোন স্বাধীনতা থাকিবে না। স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতায়

পর্যবসিত হইবে। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া অধিকারের বস্তু নয়। সমাজের প্রত্যেক নাগরিকই এই স্বাধীনতার সমান অধিকারী। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের সুযোগ পায়, সেইজন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের অভিভাবক হিসাবে এই স্বাধীনতা ভোগ করিবার মত অবস্থা সমাজে সৃষ্টি করে। একজনের স্বাধীন ইচ্ছাপ্রয়োগের ফলে যাহাতে অপরের স্বাধীনতা নষ্ট না হয়, সেজন্য রাষ্ট্র ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা প্রয়োগকে কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ করে। এই বিধি-নিষেধগুলিকে আইন বলা হয়, আর আইনের উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরের স্বাধীনতার হানি না করিয়া নিজ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দেওয়া। রাষ্ট্র যদি এই বিধি-নিষেধগুলি দ্বারা সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত না করিত, তাহা হইলে মানব-সমাজের অবস্থা হব্‌স্‌-বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের 'জোর যার মুল্লক তার' অবস্থার অনুরূপ হইত। সুতরাং প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বাধীন ইচ্ছা এইরূপভাবে প্রয়োগ করিবে যাহাতে সমাজেব অন্য লোকের অনুরূপ স্বাধীনতা কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয়। স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধাবোধের ভিত্তির উপর প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে রাষ্ট্র সাহায্য করে। আর এইজন্যই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বেব প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হইতে হইলে এই সার্বভৌম শক্তিকে মানিয়া লইতে হইবে। নতুবা একজনের স্বাধীনতা অধিকতর বলশালী বা চতুর ব্যক্তিব ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং সার্বভৌম শক্তি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী নয় (Sovereignty and Liberty are not contradictory)। আইন হইল রাষ্ট্রের প্রধান অস্ত্র, যাহার দ্বারা রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া সমাজে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে যে-পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রনির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে নিজ ইচ্ছামত কার্য করিতে পারে। সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ-সাধনের জন্যই রাষ্ট্র আইনের দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার সীমারেখা নির্ধারণ করে। আইনের দ্বারা রাষ্ট্র তিন প্রকারে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করে। প্রথমতঃ, ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা যদি অন্য ব্যক্তির অধিকতর শক্তির জন্য ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে আইন তাহাকে রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, শাসকসম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতায়

যাহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিনষ্ট না হইতে পারে, সেজন্যও রাষ্ট্র বিশেষ ধরণের আইন প্রণয়ন ও প্রয়োজনমত প্রয়োগ করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, আইনের দ্বারা রাষ্ট্র সমাজে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে, যে-পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি এই স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ পাইয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সাধন করিতে পারে। এই সুযোগ-সৃষ্টির জন্যই বর্তমান রাষ্ট্রগুলি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুপালন ও শিশুরক্ষা, মাদকদ্রব্য-বর্জন প্রভৃতি বিষয়ক জনহিতকর আইন প্রবর্তন করিতেছে। সুতরাং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকিতে পারে না। একে অন্যের পরিপূরক। এই-জন্যই বলা হয় যে, আইন হইল প্রকৃত স্বাধীনতার নির্ধারক ও রক্ষক (Law is the condition of liberty)।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায়—Safeguards of Liberty

স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অপরিহার্য সহায়ক বলিয়া সর্বদেশে বিবেচিত হয়। সেইজন্য সকল দেশেই এই ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে একটা সুনির্দিষ্ট লিখিত শাসনতন্ত্রের সাহায্যে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকাবগুলি সুসংবদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে। এই অধিকাবগুলির কোনটি যদি শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্য দ্বারা ব্যাহত হয়, তাহা হইলে নাগরিকগণ সুপ্রিম কোর্টে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে ও এই আদালতের নির্দেশ অনুসারে শাসন-কর্তৃপক্ষকে কার্য পরিচালনা করিতে হইবে। সুতরাং অনেক দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চ বিচারালয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

কিন্তু ইংলণ্ডে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই বা সেখানকার উচ্চ বিচারালয়ের শাসন কর্তৃপক্ষ বা আইনসভার কার্যের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডে কতিপয় অ-লিখিত আইন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা নাগরিক অধিকার-গুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করে। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় আইনের প্রাধান্য ও আইনের নিরপেক্ষতা নীতি (Rule of Law) বিশেষ কার্যকরী হইয়া নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করিয়াছে। যদি কোন নাগরিক বিনা বিচারে শাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দী হয়, তাহা হইলে বন্দী ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচারালয় ঐ ব্যক্তির

বিচার করিবার জন্য তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার আদেশ দিতে পারে। বিনা বিচারে কাহারও ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে না। ইংলণ্ডে আইনের চক্ষে সকল নাগরিকই সমান।

ক্ষমতার বিভাগ করিয়া (Separation of powers) অনেক সময় ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ক্ষমতার এই বিভাগ ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার একটি অপরিহার্য উপকরণ বলিয়া সর্বক্ষেত্রে গণ্য হইতে পারে না। গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার বিশেষ কোন বিভাগ নাই, তাহা সত্ত্বেও গ্রেটবৃটেনবাসী স্বাধীন।

নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার দ্বারা (Independence of the Judiciary) ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। বিচারালয়গুলি যদি শাসনবিভাগ ও আইনসভার নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে ন্যায়বিচার সম্ভব হয়। ন্যায়বিচারের দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় ইহা অনস্বীকার্য।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় (Democracy) ব্যক্তি-স্বাধীনতা সর্বতোভাবে রক্ষিত হয়। এই শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সাম্যের অধিকারী হইয়া স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকে। স্বাধীনতা কোন দিক দিয়া একটু বিপন্ন হইলে নিজেই তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। এইজন্যই বলা হয় যে, নাগরিকগণের আত্মচেতনভাবই হইল তাহাদের স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ।

সংক্ষিপ্তসার

আইন

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন বলিতে বুঝায় কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি, যে নিয়মগুলি ব্যক্তিগত জীবনে পারস্পরিক আচরণের মান নির্ণয় করে। আইনগুলির পিছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অনুমোদন আছে বলিয়া জনসাধারণ এগুলিকে মান্য করে।

আইনের উৎস

প্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, ন্যায়নীতি, আইনবিদ্‌গণের আলোচনা ও আইনপরিষদ্ কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন-প্রণয়ন—

এইগুলিই হইল আইনের জন্মদাতা। বর্তমানে অধিকাংশ আইনই শেষোক্ত পদ্ধতিতে রচিত হয়।

নৈতিক নিয়ম

নৈতিক নিয়ম ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায়।

(১) নৈতিক নিয়ম মানুষের চিন্তা ও বাহিরের আচরণ উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে—রাষ্ট্রীয় আইন শুধু মানুষের বাহিরের আচরণের একটা প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রিত করে।

(২) নৈতিক নিয়ম মানুষের বিবেক বা জনমত দ্বারা অনুমোদিত হয়, রাষ্ট্রীয় আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির দ্বারা বলবৎ করা হয়।

(৩) নৈতিক নিয়মগুলি মানুষের ঔচিত্যবোধের মান দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। সমাজের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন পরিবর্তিত হইতে পারে।

(৪) নীতিজ্ঞান-বিরোধী কার্যকলাপ সবসময়ে বে-আইনী বলিয়া পরিগণিত হয় না, অপরপক্ষে নীতিজ্ঞান-বিরোধী না হইলেও অনেক কার্যকলাপ বে-আইনী হইতে পারে।

উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা-সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়ম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। প্রচলিত নীতিজ্ঞান-সম্মত না হইলে কোন রাষ্ট্রীয় আইনই জনমতের সমর্থন পাইতে পারে না। মানুষের নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ-সাধন করাই হইল উভয়বিধ আইনের উদ্দেশ্য।

স্বাধীনতা ও আইনের সহিত ইহার সম্পর্ক

স্বাধীনতা শব্দটি প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। তাহা হইলে সমাজে অধিক শক্তিশালী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতার প্রয়োগে অপরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। এইজন্য রাষ্ট্র কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে যে স্বাধীনতা প্রয়োগ করা যায়, তাহাই হইল প্রকৃত স্বাধীনতা, কেন না স্বাধীনতা প্রয়োগের এই সীমারেখা স্থির করিয়া রাষ্ট্র সকল ব্যক্তিকেই স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ দেয়।

সুতরাং আইন না থাকিলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। রাষ্ট্র আইন-প্রণয়ন দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করে, স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

লিখিত শাসনতন্ত্র, নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা, আইনের অনুশাসন, ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যীকরণ প্রভৃতি নাগরিক অধিকার রক্ষার উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছাই হইল স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান উপায়।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. **"Law is generally defined as the command of the sovereign," Discuss and indicate the relation between Law and Liberty.**

   "আইন হইল সার্বভৌমের নির্দেশ"—এই উক্তিটি বুঝাইয়া দাও এবং আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক বিচার কর।

উঃ—জন অষ্টিনের মতে আইন হইল সার্বভৌমের আদেশ। আইন যে ভাবেই প্রচারিত হউক না কেন, ইহার একমাত্র উৎস হইল সার্বভৌম শক্তি। অষ্টিনপ্রদত্ত আইনের এই সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ; কেননা, রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট আইন ছাড়াও প্রত্যেক দেশে প্রচলিত রীতি-নীতি হইতে উদ্ভূত এমন কতকগুলি নিয়ম দেখা যায় যেগুলি লোকে মান্য করে। রাষ্ট্র এই প্রথাগত আইনগুলিকে বলবৎ করে। সুতরাং আইন বলিতে শুধু আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইনগুলিকে বুঝায় না। নাগরিকগণের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট আইন ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত রীতি-নীতিগুলির সমষ্টিকে আইন বলা হয়।

স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। তাহা হইলে সমাজে একমাত্র অধিক শক্তিশালী বা অধিক চতুর ব্যক্তির স্বাধীনতা ব্যতীত অপর কাহারও স্বাধীনতা থাকিত না। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা প্রয়োগে অপরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। এইজন্য রাষ্ট্র আইনের আকারে কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে। রাষ্ট্র কর্তৃক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে যে স্বাধীনতা ভোগ করা যায়, তাহা হইল প্রকৃত স্বাধীনতা, কেননা, স্বাধীনতা ভোগের এই সীমারেখা স্থির করিয়া রাষ্ট্র সকল ব্যক্তিকেই স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দেয়। সুতরাং আইন না থাকিলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। রাষ্ট্র আইন-প্রণয়ন দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করে, স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করে। তাই বলা হয় যে, আইন হইল স্বাধীনতার রক্ষক (Law is the condition of liberty.)

2. **Indicate the connection between Law and Morality.**

   আইন ও নৈতিক নিয়মের সম্পর্ক বিচার কর।

উঃ—রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়মের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। (১) নৈতিক নিয়ম মানুষের অভিপ্রায় ও বাহিরের আচরণ উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করে—রাষ্ট্রীয় আইন শুধু মানুষের বাহিরের আচরণের একটা প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

(২) নৈতিক নিয়ম মানুষের বিবেকবুদ্ধি বা জনমত দ্বারা অনুমোদিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইন রাষ্ট্রের শক্তির দ্বারা বলবৎ করা হয়।

(৩) রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের ঔচিত্যবোধের মান দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, সমাজের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তিত হয়।

(৪) নীতি-বিরোধী কাজ সব সময় বে-আইনী বলিয়া গণ্য হয় না, অপর পক্ষে নীতি-বিরোধী না হইলেও অনেক কাজ বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়ম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। মানুষের নৈতিকজ্ঞান হইতেই উভয়বিধ নিয়মের জন্ম হইয়াছে। প্রচলিত নীতিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করা হয়। প্রচলিত নীতিজ্ঞান বিরোধী হইলে লোকে সে আইন মান্য করে না। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষের নৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করিয়া সু-নাগরিক সৃষ্টি করা। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এমন আইন সৃষ্টি করা যেগুলি মানুষের নৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারে। এইজন্য রাষ্ট্রকে অনেক সময় পুরাতন আইন ও সামাজিক আচার-প্রথার স্থলে নূতন আইন প্রবর্তন করিতে হয়। এইরূপে নূতন আইনের দ্বারাও রাষ্ট্র মানুষের ঔচিত্যবোধ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। ভারতে রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হইলে মানুষের নীতিজ্ঞান বৃদ্ধির ফলে এই প্রথা আপনা হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

8. What is meant by liberty ? How is it related to law ?

H. S. (Hu) 1960, 1962

স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝ? আইনের সহিত ইহার কি সম্পর্ক?

উঃ—সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় মানুষের নিজ ইচ্ছানুসারে কাজ করিবার অবাধ ক্ষমতা। কিন্তু এরূপ স্বাধীনতার ফল হইল স্বেচ্ছাচারিতা। এই স্বেচ্ছাচারিতার ফলে অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। আমার যদি যাহা খুশী তাহা করিবার অবাধ ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে অন্য লোকের স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। সকলে যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, সেইজন্য রাষ্ট্র মানুষের অবাধ ক্ষমতার উপর কতকগুলি বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া অবাধ স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতায় পরিণত করে। সুতরাং স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা অপর লোকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না।

স্বাধীনতার আবার বিভিন্ন রূপ আছে, যথা, (১) পৌর স্বাধীনতা, (২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা, (৩) জাতীয় স্বাধীনতা, (৪) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

(১) পৌর স্বাধীনতা ব্যতীত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশ সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা, বাক্-স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি অধিকারের সমষ্টিকে পৌর স্বাধীনতা বলা হয়।

(২) প্রত্যেক বয়স্ক ও যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার ও ভোট পাইবার ক্ষমতা, যোগ্য হইলে সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রভৃতির সমষ্টিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়।

(৩) জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল ভিন্ন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন সমষ্টিগত জীবন পরিচালনার অধিকার। এই স্বাধীনতার অবর্তমানে কোন জাতিই পৌর বা রাজনৈতিক অধিকার যথাযথভাবে ভোগ করিতে পারে না।

(৪) অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হইল কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার।

উত্তরের অপরাংশের জন্য ১নং প্রশ্নের উত্তরের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য।

4, What is meant by the term Sovereignty? How far is sovereignty consistent with Individual liberty?

সার্বভৌমিকতা বলিতে কি বুঝ? ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা কতদূর সামঞ্জস্যপূর্ণ?

উঃ—সার্বভৌমত্ব হইল রাষ্ট্রের আদিম ও স্বৈর ক্ষমতা—যে ক্ষমতার বলে দেশের সকল লোক ও সকল প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পর্কেও সেই রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাষ্ট্র গঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হইল সার্বভৌম শক্তি। এই শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রে অস্তিত্ব থাকিতে পারে না এবং এই উপাদানটিই রাষ্ট্রকে সামাজিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। সার্বভৌম ক্ষমতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষমতা অসীম—ইহা দেশের অভ্যন্তরের বা বৈদেশিক কোন শক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ, এই ক্ষমতা অবিভাজ্য অর্থাৎ ইহার বিভাগ সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ, এই ক্ষমতা স্থায়ী। রাষ্ট্র ব্যতীত এই ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, আবার এই ক্ষমতা ব্যতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে না। সরকারের পরিবর্তনে এই ক্ষমতার কোন ব্যত্যয় হয় না। চতুর্থতঃ, এই ক্ষমতা হস্তান্তরযোগ্য নহে। সার্বভৌম ক্ষমতার আবার দুইটি রূপ আছে, যথা, আইনগত সার্বভৌমত্ব (Legal Sovereignty) ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (Political Sovereignty)।

এখন প্রশ্ন হইল রাষ্ট্রের এই অসীম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা কি পরস্পর-বিরোধী? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, রাষ্ট্রের এই অবাধ ক্ষমতার বর্তমানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। কিন্তু একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিরোধী নহে, পরন্তু এই ক্ষমতা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করে ও ইহার প্রয়োগক্ষেত্র প্রসারিত করে।

স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। স্বেচ্ছাচারিতার ফলে অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। আমার যদি যাহা খুশী তাহা করিবার অবাধ ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে অন্য লোকের স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। সকলে যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, সেইজন্য রাষ্ট্র মানুষের অবাধ ক্ষমতার

উপর কতকগুলি বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া অবাধ স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতায় পরিণত করে। এই বিধি-নিষেধগুলিকে আইন বলা হয়। আইনের উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরের স্বাধীনতার হানি না করিয়া নিজ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দেওয়া। রাষ্ট্র যদি ইহার সার্বভৌমশক্তির সাহায্যে এই বিধি-নিষেধগুলি সমাজে বলবৎ না করিত, তাহা হইলে মানবসমাজের অবস্থা হব স বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের 'জোর যার মুল্লুক তার' অবস্থার অনুরূপ হইত।

সুতরাং প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হইতে হইলে এই সার্বভৌমশক্তিকে মানিয়া লইতে হইবে। নতুবা একজনের স্বাধীনতা অধিকতর শক্তিশালী বা চতুর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। কাজেই সার্বভৌমশক্তি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে কোন অসংগতি নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাষ্ট্র কৃত্যক

(Public Service)

রাষ্ট্র কৃত্যক—ইহার বৈশিষ্ট্য ও কাজ—Public Service—its Characteristics and Functions.

একটি দেশ শাসন করিতে বহু কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলির কার্যক্ষেত্র সমাজ-জীবনের নানাদিকে এরূপভাবে বিস্তৃত হইয়াছে যে, বিভিন্ন ধরণের বহুসংখ্যক কর্মচারীর সাহায্য ব্যতীত সরকারের কাজ দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এই সমুদয় কর্মচারী লইয়াই রাষ্ট্র কৃত্যক গঠিত হয়।

রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল বা মন্ত্রিগণ সংখ্যায় অত্যল্প। তাঁহাদের কার্যকালও স্বল্পস্থায়ী। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে বর্তমান রাষ্ট্রের বিভিন্ন ও ক্রমবর্ধমান কাজগুলি নিষ্পন্ন করা সম্ভব নহে। ইহা ছাড়া, এই সমস্ত শাসনকর্তার সরকারী জটিল বিষয়সমূহ পরিচালনা-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা কম। এই জন্য রাষ্ট্র কৃত্যকের প্রয়োজন।

রাষ্ট্র কৃত্যকের কর্মচারিগণ গুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পর নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা স্থায়ী কর্মচারী—একটা নির্দিষ্ট বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কার্যে বহাল থাকেন। তাঁহাদের ভোটদান অধিকার থাকিলেও তাঁহারা রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ থাকেন। তাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনাকার্যে মন্ত্রিগণকে যে পরামর্শ বা সাহায্য করেন, সে জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন। বিভাগীয় মন্ত্রীই জনসাধারণের নিকট সেজন্য দায়ী থাকেন। সুতরাং কাজের স্থায়িত্ব, রাজনৈতিকদল-নিরপেক্ষতা ও জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ যোগসূত্রের অভাব—ইহাই হইল রাষ্ট্র কৃত্যকের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মন্ত্রিগণ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী আইন পাস হয়। এই আইন কার্যে বলবৎ করা হইল স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের প্রধান কাজ। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিবর্গের পরিবর্তন ঘটিলেও যাহাতে সরকারী কাজ অব্যাহত থাকে, সে জন্য এই স্থায়ীকর্মচারিবৃন্দ সরকারী কাজে নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষাগত ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত দক্ষতার দ্বারা রাষ্ট্র কৃত্যকের কর্মিগণ মন্ত্রিগণের কাজে প্রভূত সাহায্য করে।

বৃটিশ শাসনকালে ভারতে রাজকীয় কৃত্যক (Imperial Service) ছিল সর্বোচ্চ চাকুরি। এই কৃত্যকের পদগুলি সর্বভারতীয় কৃত্যক বলিয়া অভিহিত হইত। (১) ভারতীয় জনপালন কৃত্যক (Indian Civil Service), (২) ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক (Indin Police Service) ও (৩) ভারতীয় চিকিৎসা কৃত্যক (Indian Medical Service) ছিল রাজকীয় কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত। এই তিনটি কৃত্যকের অধিকাংশ সদস্যই ইয়ুরোপীয় কর্মচারী ছিলেন এবং ইঁহারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিলেন। স্বয়ং ভারতসচিব (Secretary of State for India) ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন।

সর্বভারতীয় কৃত্যক—All India Services

দেশ স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় কৃত্যক লোপ পায় এবং ভারতে রাজকীয় কৃত্যকে নিযুক্ত অধিকাংশ কর্মচারী পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। রাজকীয় কৃত্যকের স্থলে বর্তমানে **সর্বভারতীয় কৃত্যকের (All India or Union Services)** সৃষ্টি হইয়াছে। এই কৃত্যকগুলির মধ্যে ভারতীয় শাসন-পরিচালনা কৃত্যক (Indian Administrative Service) ও ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক (Indian Police Service) উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, ভারতীয় হিসাব পরীক্ষা কৃত্যক (Indian Audit and Accounts Service), ভারতীয় শুল্ক কৃত্যক (Indian Customs Service) প্রভৃতি হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় (Union) কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত সর্বভারতীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কৃত্যকের কর্মচারিগণ রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের (Public Service Commission) সুপারিশক্রমে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। সর্বভারতীয় কৃত্যকে নিযুক্ত কর্মচারিগণের বেতন ও কার্যাবলীর অন্যান্য শর্ত পার্লামেণ্ট সভা আইন প্রণয়ন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। পার্লামেণ্ট যতদিন আইন প্রণয়ন না করিবে ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি এই সর্বভারতীয় কৃত্যকে নিযুক্ত কর্মচারিসমূহের কার্যাদির শর্ত স্থির করিবেন।

সাধারণতঃ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা এই সমস্ত কর্মচারীর যোগ্যতা স্থির করিয়া তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হয়। সময় সময় মনোনয়ন দ্বারাও নিয়োগ করা হয়। সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্মচারিগণ ভারতের যে কোন অংশে ভারত সরকারের কার্যে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য। সর্বভারতীয় বিভিন্ন কৃত্যকগুলির মধ্যে ভারতীয় শাসনপরিচালনা কৃত্যক (I. A. S.) অধিক গুরুত্বসম্পন্ন। এই কৃত্যকের কর্মচারিবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। জেলা-

শাসক, জেলাজজ, বিভিন্ন বিভাগের মুখ্য-সচিব (Chief Secretary), সহ-সচিব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত শাসন-পরিচালনা কৃত্যকের সদস্যগণই শাসন-ব্যবস্থার মেরুদণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। রাজ্যশাসন-পরিচালনা কৃত্যকের উচ্চপদগুলি এই সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্মচারিগণ দ্বারা পূরণ করা হয়। ভারতীয় শাসন-পরিচালনা কৃত্যক ও ভারতীয় পুলিশ কৃত্যকে নিযুক্ত কর্মচারিবৃন্দের শিক্ষাদানের জন্য মুসৌরী ও মাউণ্ট আবুতে যথাক্রমে দুইটি শিক্ষাকেন্দ্র আছে।

ভারত স্বাধীন হইবার পর বিভিন্ন দেশের সহিত ইহার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং বহুদেশে ভারতের দূতাবাস স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্য **ভারতীয় বৈদেশিক কৃত্যকের** (Indian Foreign Service) উদ্ভব হইয়াছে। বৈদেশিক কৃত্যকে নিযুক্ত কর্মচারিগণ পৃথিবীর যে-কোন দেশে ভারত সরকারের কার্যে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য।

ভারত সরকার দেশরক্ষা বিভাগের জন্য **সমর কৃত্যক** (Military Service) গঠন করিয়াছেন। সমর কৃত্যকে স্থল, নৌ ও বিমান বিভাগ আছে। সমর কৃত্যকে নিযুক্ত কর্মচারিসমূহের চাকুরির শর্তাদিও পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

রাজ্য কৃত্যক—State Services

রাজ্যগুলির শাসনকার্য পরিচালনার উচ্চপদগুলি সর্বভারতীয় কৃত্যকগুলিতে নিযুক্ত কর্মচারিবৃন্দের দ্বারা পূরণ করা হয়। জেলাশাসক, জেলাজজ, জেলার পুলিশের অধিকর্তা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে সর্বভারতীয় শাসন-পরিচালনা কৃত্যক (I. A. S.) ও পুলিশ কৃত্যকের (I. P. S.) কর্মচারিগণ নিযুক্ত হন। এই পদগুলি ছাড়া রাজ্যশাসন-পরিচালনা-সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যগুলির জন্য রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত দুই শ্রেণীর কর্মচারী থাকেন। প্রথম শ্রেণীতে থাকেন বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মচারিগণ, যথা, রাজ্যশাসন বিভাগীয় কৃত্যক (State Civil Service), রাজ্য পুলিশ কৃত্যক (State Police Service), রাজ্য শিক্ষা কৃত্যক (State Education Service), রাজ্য কৃষি কৃত্যক (State Agriculture Service) প্রভৃতি। ইহা ছাড়া, প্রত্যেক বিভাগের ধরাবাঁধা কাজ করিবার জন্য অসংখ্য নিম্নতন কর্মচারী থাকেন। তাঁহাদের লইয়া অধস্তন কৃত্যকগুলি গঠিত হয়। রাজ্যের আইনসভাগুলি রাজ্যে কৃত্যকসমূহে নিযুক্ত কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ ও কার্যের অন্যান্য শর্ত স্থির করেন।

রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ—Public Service Commission

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ আছে। একজন পরিষদ-পতি (Chairman) ও সাতজন সাধারণ সদস্য লইয়া বর্তমানে এই পরিষদ গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ইঁহাদের সকলকেই নিযুক্ত করেন। পরিষদের সদস্যসংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়। পরিষদের সদস্যগণের কার্যকাল হইল ছয় বৎসর, কিন্তু পঁয়ষট্টি বৎসরের ঊর্ধ্বে কোন সদস্য থাকিতে পারেন না। অসদাচরণের জন্য অভিযুক্ত হইলে একমাত্র রাষ্ট্রপতিই ইঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। অন্ততঃ দশ বৎসর কাল কোন রাষ্ট্রকৃত্যকে নিযুক্ত ছিলেন এইরূপ ব্যক্তি-গণের মধ্য হইতেই পরিষদের প্রায় অর্ধেক সদস্য নিযুক্ত হন।

ভারত সরকারের বিভিন্ন কৃত্যকে নিয়োগ করিবার জন্য এই পরিষদ প্রতি-যোগ্যতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা (Viva Voce) ও আবেদনকারীকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এই পরিষদ তাহাদের যোগ্যতা স্থির করে। সরকারী কর্মচারিগণের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার ভার এই পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকে। কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইলেও এই পরিষদের সহিত সরকারের পরামর্শ করিতে হইবে এবং শাস্তিপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ এই পরিষদের নিকট শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারেন।

রাজ্য কৃত্যকগুলিতে কর্মচারী নিয়োগ করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটি **রাজ্য নিয়োগ পরিষদ** থাকিতে পারে অথবা কোন রাজ্য স্বতন্ত্র নিয়োগ পরিষদ গঠন না করিয়া কেন্দ্রীয় নিয়োগ পরিষদের উপর রাজ্য কৃত্যকগুলিতে নিয়োগ করিবার ভার অর্পণ করিতে পারে। আবার একাধিক রাজ্য প্রত্যেকে পৃথক নিয়োগ পরিষদ গঠন না করিয়া মিলিতভাবে একটি নিয়োগ পরিষদ গঠন করিয়া তাহাদের কার্য পরিচালনা করিতে পারে। বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের এইরূপ একটি মিলিত পরিষদ আছে। পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব নিয়োগ পরিষদ আছে।

রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত একজন পরিষদ্-পতি ও দুইজন সদস্য লইয়া রাজ্য নিয়োগ পরিষদ গঠিত হয়। রাজ্য নিয়োগ পরিষদগুলির কাজকর্ম সর্বভারতীয় নিয়োগ পরিষদের অনুরূপ।

তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কেন্দ্রীয় নিয়োগ পরিষদ ও রাজ্য নিয়োগ পরিষদগুলি কর্মচারী নিয়োগ ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নহে। সরকারী কৃত্যকসমূহে নিয়োগ ব্যাপারে ইহারা সুপারিশ করেন মাত্র। কেন্দ্রীয়

ও রাজ্যসরকারগুলি ইচ্ছা করিলে নিয়োগ পারিষদের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিতে পারে। তবে সাধারণতঃ সরকার এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করেন না। সরকারের বিভিন্ন কার্য যাহাতে দক্ষতার সহিত নিরপেক্ষভাবে সম্পাদিত হয়, সেজন্য দক্ষ ও নিরপেক্ষ কর্মচারী প্রয়োজন। সরকারী কর্মচারিগণ যদি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হন, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থার উপর লোকের আস্থা থাকে না। এই উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক দেশেই স্বাধীন ও সরকার-নিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ গঠন করা হয়। রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের কর্তব্য হইল শুধু যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র- কৃত্যকসমূহে কর্মচারী নিয়োগ করা। নিয়োগ পরিষদ যদি যথাযথভাবে ইহার কর্তব্য পালন করে, তাহা হইলে ইহার কাজে সরকারের আর হস্তক্ষেপ করিবার আদৌ প্রয়োজন হয় না। নিয়োগ পরিষদের কার্যে অহেতুক হস্তক্ষেপ করিলে বা ইহার সুপারিশ অগ্রাহ্য করিলে তাহা আইনসভাকে জানাইতে হয়।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রকৃত্যক কাহাকে বলে?

সরকারী বিভিন্ন কাজ করিবার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারিবৃন্দ লইয়া রাষ্ট্র কৃত্যক গঠিত।

সর্বভারতীয় কৃত্যক

ভারতীয় শাসন-পরিচালনা কৃত্যক ও ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক লইয়া সব-ভারতীয় কৃত্যক গঠিত। রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সুপারিশক্রমে ভারত সরকার কর্তৃক ইঁহারা নিযুক্ত হন। রাজ্যশাসন পরিচালনা কৃত্যকের উচ্চপদগুলি ইঁহাদের দ্বারা পূরণ করা হয়। ইহা ছাড়া, স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে বৈদেশিক কৃত্যক ও সমর কৃত্যক গঠিত হইয়াছে।

রাজ্য কৃত্যক

শাসন-বিভাগীয় কৃত্যক, পুলিশ কৃত্যক, শিক্ষা কৃত্যক প্রভৃতি বিভাগীয় কৃত্যক লইয়া রাজ্য কৃত্যক গঠিত হয়। এই উচ্চতন কৃত্যক ছাড়াও সাধারণ কাজ করিবার জন্য রাজ্যগুলিতে নিম্নতম কৃত্যক আছে।

রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন পরিষদ-পতি ও কয়েকজন সদস্য লইয়া কেন্দ্রীয়

রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ গঠিত হয়। প্রত্যেক রাজ্যে অথবা একাধিক রাজ্যে মিলিতভাবে একটি নিয়োগ পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ যথাক্রমে কেন্দ্রীয় কৃত্যক ও রাজ্য কৃত্যকগুলিতে কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করে।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What are Public Services? What are their essential characteristics and functions? [H. S. (Hu) 1962 Comp]

রাষ্ট্রকৃত্যক কাহাকে বলে? ইহার বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

উঃ— আধুনিক রাষ্ট্রগুলির কার্যপরিধি সমাজজীবনের নানাদিকে এরূপভাবে বিস্তৃত হইয়াছে যে বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞ বহু সংখ্যক কর্মচারীর সাহায্য ব্যতীত সরকারের কাজ দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন হইতে পারে না। দৈনন্দিন সরকারী কাজ পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এই সমুদয় কর্মচারী লইয়াই রাষ্ট্রকৃত্যক গঠিত হয়।

রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল বা মন্ত্রিগণ সংখ্যায় অত্যল্প। তাঁহাদের কার্যকালও স্বল্পস্থায়ী। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে বর্তমান রাষ্ট্রের বিভিন্ন ও ক্রমবর্ধমান কাজগুলি নিষ্পন্ন করা সম্ভব নহে। ইহা ছাড়া, এই সমস্ত শাসনকর্তার সরকারী জটিল বিষয়সমূহ পরিচালনা-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাও নাই। এই জন্যই রাষ্ট্রকৃত্যকের প্রয়োজন।

রাষ্ট্রকৃত্যকের কর্মচারিগণ গুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পর নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা স্থায়ী কর্মচারী—একটি নির্দিষ্ট বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কার্যে বহাল থাকেন। তাঁহাদের ভোটদান অধিকার থাকিলেও তাঁহারা রাজনৈতিক দল-নিরপেক্ষ থাকেন। তাঁহারা ঊর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষকে যে পরামর্শ দেন বা তাঁহারা শাসন পরিচালনার জন্য যে কাজ করেন, সেজন্য তাঁহারা দায়ী নহেন। শাসননীতি বা শাসনকার্যের জন্য বিভাগীয় মন্ত্রী জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। সুতরাং কাজের স্থায়িত্ব, নিরপেক্ষতা ও জনসাধারণ সম্পর্কে যোগসূত্রের অভাব—ইহাই রাষ্ট্রকৃত্যকের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রাষ্ট্রকৃত্যকের কর্মচারিবর্গের প্রধান কার্য হইল দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করা। মন্ত্রিগণ নীতি নির্ধারণ করেন, আইনসভা এই নীতি অনুযায়ী আইন পাস করে—আর স্থায়ী কর্মচারিগণ এই আইন কার্যে বলবৎ করে।

ইহাদের দ্বিতীয় কার্য হইল শাসনকার্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রিবর্গ পরিবর্তিত হইতে পারেন কিন্তু এই পরিবর্তনে সরকারী কাজ ব্যাহত হয় না। রাষ্ট্রকৃত্যকের কর্মচারিগণ সরকারী কাজের নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করে।

তৃতীয়তঃ, এই কর্মচারিবৃন্দ তাঁহাদের শিক্ষাগত ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত দক্ষতা দ্বারা মন্ত্রিগণের কাজে সাহায্য করেন। মন্ত্রিগণ সরকারী জটিল কার্য পরিচালনা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ—ইহা ছাড়া, তাঁহাদের কার্যকালেরও কোন স্থায়িত্ব নাই। সুতরাং দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা সম্পর্কে তাঁহারা একান্তভাবেই এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের উপর নির্ভরশীল।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কৃত্যক ও সর্ব-ভারতীয় কৃত্যক এবং রাজ্যগুলির জন্য রাজ্য কৃত্যক আছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

জনমত

(Public Opinion)

গণতন্ত্র ও জনমত—Democracy and Public Opinion

গণতন্ত্র সফল করিবার একমাত্র উপায় হইল শিক্ষিত ও সচেতন জনমত সৃষ্টি করা। বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে শাসন-কার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অথচ জনগণ যদি তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে আত্মসচেতন এবং অধিকারগুলি রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের অবসান হইয়া স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কত্বের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা সচেতন ও সক্রিয় জনমতের উপর নির্ভর করে।

জনমতের প্রকৃতি—Nature of Public Opinion

জনমতের অর্থ এই নয় যে, দেশের সকল ব্যক্তিই একমত হইবে। প্রত্যেকটি বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ও বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতামত থাকিতে পারে। জনমত বলিতে ইহাদের কোন একটি বিশেষ মত বুঝায় না। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের মতই যে সকল সময় নির্ভুল হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং জনমত বলিতে সর্ববাদিসম্মত মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত বুঝায় না। এ অবস্থায় কোন্ মতকে জনমত বলা যায় তাহা স্থির করা এক সমস্যা। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে মত পোষণ করে সাধারণতঃ তাহাই জনমতরূপে পরিগণিত হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল এই জনমত সমর্থন না করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যেন এই মতের প্রতি বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন না হয়। সংখ্যালঘু দল যদি বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন হইয়া সক্রিয়ভাবে এই মতের বিরোধিতা করে, তাহা হইলে তাহাকে সুসংবদ্ধ জনমত বলা চলে না। তবে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি তাহাদের সংখ্যাধিক্যের বলে সংখ্যালঘু দলের স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া স্বার্থসাধনের নিমিত্ত কোন মত পোষণ করে, তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বলিয়াই তাহাকে জনমত বলা সমীচীন নয়।

জনসাধারণের প্রায়ই নিজস্ব কোন মতামত থাকে না। বুদ্ধিমান ও কর্মঠ ব্যক্তিগণ জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ ও তাহাদের সমাধানের উপায়গুলি স্থির করেন এবং এইগুলি জনগণের মধ্যে প্রচার করিয়া জনসাধারণের মধ্যে মতের সৃষ্টি করিতে সহায়তা করেন। জনসাধারণ তাহাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এই সকল চিন্তানায়কের মতে আস্থাবান্ হয়। এইরূপে জনসংখ্যার বিশাল এক অংশ যখন কোন নির্দিষ্ট মতের সমর্থক হয়, তখন তাহাকে জনমত বলা হয়। সুতরাং যে মত জনগণের বিচার-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা, সেই মতকেই প্রকৃত জনমত বলা হয়। ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের স্বার্থসম্পর্কিত কোন মতকে জনমত আখ্যা দেওয়া চলে না।

জনমত-গঠনের বিভিন্ন উপায়—Organs of Public Opinion

নানা উপায়ে জনমত গঠিত ও প্রভাবিত হইয়া থাকে। বর্তমান যুগে জনমতগঠনে **সংবাদপত্র** (Newspaper) এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র-পাঠার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সংবাদপত্রগুলি যে নানাবিধ সংবাদ পরিবেশন করিয়া কেবল জনগণের জ্ঞানের পরিধি-বিস্তারে সহায়তা করে তাহা নয়, সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদ পরিবেশন পদ্ধতির মধ্য দিয়া তাহারা পাঠকদের মত গঠনের সহায়তা করে। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে জনমত-গঠনে সংবাদপত্র যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। সংবাদপত্রগুলি যদি এই গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ রাখিয়া তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে দেশে প্রকৃত জনমত গঠিত হইতে পারে। সঠিক সংবাদ-পরিবেশন এবং নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক সমালোচনা দ্বারা সংবাদপত্রগুলি জনমতকে শিক্ষিত ও চিন্তাশীল করিয়া তুলিতে পারে।

জনমত-গঠনে **শিক্ষায়তনগুলির (Educational Institutions)** প্রভাবও উপেক্ষণীয় নহে। বাল্যকাল ও কৈশোরে মানুষ যে শিক্ষালাভ করে, পরবর্তী জীবনে সে শিক্ষার প্রভাব অনতিক্রমণীয় হইয়া উঠে। দেশে যাঁহারা নেতা ও বিভিন্ন মতবাদের স্রষ্টা, তাঁহারা প্রায় সকলেই বাল্যের ও যৌবনের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন। এই কারণে একনায়ক-পরিচালিত দেশগুলিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সেই সমস্ত দেশের রাজনীতির মূলসূত্রগুলি সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে পরবর্তী জীবনে তাহারা ঐভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

রাজনৈতিক দলসমূহ (Political Parties) দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট জনসভা, সংবাদপত্র ও পুস্তিকা মারফৎ তাহাদের মতবাদ প্রচার করিয়া জনমত প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারকার্যের দ্বারা জনগণ দেশের বিভিন্ন সমস্যাগুলির সহিত পরিচিত হয় ও রাজনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে।

অধুনা **বেতার ও চলচ্চিত্রের (Radio & Cinema)** সাহায্যে প্রচারকার্য পরিচালনা করা হয়। জনশিক্ষার প্রসার করিয়া জনমতগঠনে বেতার ও চলচ্চিত্রের অবদান আদৌ উপেক্ষণীয় নহে।

দেশের **আইনসভার (Legislature)** তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা দ্বারাও জনমত সচেতন হইয়া রাজনৈতিক ব্যাপাবে অধিকতর উৎসাহী হয়।

আইন ও জনমত—Law and Public Opinion

বর্তমান যুগে নাগরিকগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা রাষ্ট্র-প্রণীত আইন দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি আইন প্রণয়ন করিয়া মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মসম্বন্ধীয় ও কৃষ্টিগত জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়তা কবিবাব অধিকার দাবী করে। বস্তুতঃ মানব-জীবনের এমন কোন অংশ নাই যাহা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপ্রভাবমুক্ত বলা যাইতে পারে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-প্রণীত আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধগুলি যদি সার্বজনীন ও সর্ববাদীসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র-প্রবর্তিত আইনগুলি ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক না হইয়া তাহার অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে। এইজন্যই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং গণতন্ত্রের মূলকথা হইল যে, শাসন-ব্যবস্থা জনমতের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। জনগণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত আইনসভা আইন প্রণয়ন করে এবং আইনসভার প্রধান কর্তব্য হইল জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন করা। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যদি জনস্বার্থ-বিরোধী আইন প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা জনগণের আস্থাহীন হইবেন ও পরবর্তী নির্বাচনকালে জনগণের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং শাসন-বিভাগ বা আইনসভার পক্ষে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জনমত-বিরোধী কার্য করা সম্ভব নয়। আইন-সভা-প্রণীত আইন যদি দেশের জনমতকে প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে সে আইনের বিশেষ কোন মর্যাদা থাকে না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাকে

জনমতের বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। যে শাসন-ব্যবস্থা জনমত দ্বারা সমর্থিত নয়, তাহা কখনও সুদৃঢ় ও স্থায়ী হইতে পারে না। জনগণের অকুণ্ঠ আনুগত্য ও বশ্যতার অভাবে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। জনগণ সভা-সমিতি; সংবাদপত্র, শোভাযাত্রা, প্রচার-পুস্তিকা প্রভৃতির দ্বারা আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়গুলি ব্যর্থ হইলে জনসাধারণ তাহাদের চরম অস্ত্র 'বিদ্রোহ' দ্বারা শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। সুতরাং আইন-প্রণয়নে জনমতের জয় অবশ্যম্ভাবী।

ভারতে জনমত—Public Opinion in India

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ভারতে প্রকৃত জনমত বলিয়া কার্যতঃ কোন শক্তি ছিল না। জনমত-গঠনের প্রধান অন্তরায় ছিল দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও পরাধীনতা। পরাধীনতার অবসান হইবার ফলে ভারতবাসী ক্রমশঃ আত্ম-সচেতন হইয়া তাহার ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে অবহিত হইতে শিখিতেছে। শিক্ষাবিস্তার ও সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদানের ফলে তাহাদের জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতেছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি যদি তাহাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ দ্বারা প্ররোচিত না হইয়া জাতীয় স্বার্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে অচিরে ভারতে শক্তিশালী ও সক্রিয় জনমত গঠিত হইবে।

বর্তমানে প্রাদেশিকতা ভারতে জনমত-গঠনের একটি প্রধান অন্তরায়রূপে দেখা দিয়াছে। প্রাদেশিকতার মূল কারণ হইল প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার অভাব। প্রকৃত শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হইলে বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসিগণ এক অখণ্ড জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের ভারতবাসী বলিয়া মনে করিবেন। জনমত যাহাতে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, সেজন্য দেশে প্রকৃত শিক্ষার প্রবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংক্ষিপ্তসার

জনমত

গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে শাসন-পরিচালনায় জনমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। জনমতের কার্যকরী শক্তির অভাবে গণতন্ত্র বিকৃত হইয়া স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে।

জনমতের প্রকৃতি

জনমত বলিতে সকল ব্যক্তিই যে একমতাবলম্বী হইবে ইহা বুঝায় না বা কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতও বুঝায় না। যে মত জনগণের বিবেকবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৃহত্তর কল্যাণসাধন করা, সেই মতকেই জনমত বলা হয়। সংখ্যালঘু দল এই মত সমর্থন না করিলেও সক্রিয়ভাবে এই মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না।

জনমত-গঠনের বিভিন্ন উপায়

দেশে প্রকৃত জনমত-গঠনে সংবাদপত্র, শিক্ষায়তন, রাজনৈতিক দল, চলচ্চিত্র ও বেতার বিশেষভাবে সহায়তা করে। বর্তমানে সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র ও বেতার-সাহায্যে জনমত প্রভূতভাবে প্রভাবিত হয়। এইজন্য এইগুলিকে ঠিকপথে পরিচালিত করা জাতীয় জীবনে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

আইন ও জনমত

গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল জনমতের সমর্থন। রাষ্ট্র-প্রণীত আইন যদি জনমত প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সে আইন লোকে মান্য করিতে চায় না। জনমতের প্রতিকূলতা করিয়া কোন সরকারই স্থায়ী হইতে পারে না। জনগণ নানা উপায়ে, সংবাদপত্র, সভাসমিতি প্রভৃতি দ্বারা আইন-প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করে।

ভারতে জনমত

অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও পরাধীনতার জন্য ভারতে এতদিন পর্যন্ত কোনরূপ প্রকৃত জনমত গঠিত হইতে পারে নাই। স্বাধীনতালাভের পর জাতীয় জীবনে নানাদিক দিয়া যে পরিবর্তন দেখা যাইতেছে তাহাতে আশা করা যায় যে, শিক্ষাবিস্তার হইলে ভারতে শক্তিশালী জনমত গঠিত হইতে পারিবে। জনমতগঠনে ভারতের সংবাদপত্রগুলির ও রাজনৈতিক দলগুলির যথেষ্ট দায়িত্ব আছে।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. **Explain the nature and importance of public opinion in modern states.**
   বর্তমান রাষ্ট্রে জনমতের প্রকৃতি ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

উঃ—জনমত বলিতে সর্ববাদীসম্মত মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বুঝায় না। যে মত জনগণের বিচার-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৃহত্তর কল্যাণসাধন করা সেই মতকে জনমত বলা হয়।

গণতন্ত্র সফল করিবার একমাত্র উপায় হইল শিক্ষিত ও সচেতন জনমত সৃষ্টি করা। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে শাসনকার্য পরিচালনার অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অথচ জনগণ যদি তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে উদাসীন থাকে এবং অধিকারগুলি রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়। জনগণ যদি সুসংবদ্ধভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাদের মতামত প্রকাশ করে তাহা হইলে শাসকগোষ্ঠী জনমতের বিরুদ্ধে কোন কায করিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সচেতন ও সক্রিয় জনমতের উপর নির্ভর করে।

2. What is meant by Public opinion? How is public opinion formed in a country? H. S. (Hu.) Comp. 1960

জনমত কাহাকে বলে? দেশে জনমত কি ভাবে গঠিত হয়?

উঃ—প্রথম প্রশ্নের উত্তরের প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য।

নানা উপায়ে জনমত গঠিত ও প্রভাবিত হইয়া থাকে।

১। বর্তমান যুগে জনমত গঠনে সংবাদপত্র এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সংবাদপত্রগুলি শুধু নানাবিধ সংবাদ পরিবেশন করিয়া জনগণের জ্ঞানের পরিধিবিস্তারে সাহায্যে করে তাহা নয়, সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদ পরিবেশন পদ্ধতির মধ্য দিয়া পাঠকদের মত গঠনে সাহায্য করে।

২। জনমত গঠনে শিক্ষায়তনগুলি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। বাল্যকালে ও কৈশোরে মানুষ যে শিক্ষা পায় পরবর্তী জীবনে সে শিক্ষার প্রভাব অনতিক্রমণীয়।

৩। রাজনৈতিকদলগুলি সংবাদপত্র, প্রচার-পুস্তিকা ও সভাসমিতির মাধ্যমে তাহাদের মতবাদ প্রচার করিয়া জনমত গঠন ও প্রভাবিত করে।

৪। অধুনা বেতার ও চলচ্চিত্রের সাহায্যে প্রচার কার্যদ্বারাও জনমত সৃষ্টি করা হয়।

৫। দেশের আইনসভার তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার দ্বারাও জনমত সচেতন হইয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে জনগণ অধিকতর উৎসাহী হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল

(Political Party)

রাজনৈতিক দল—Political Party

বর্তমানে সভ্য রাষ্ট্রগুলির শাসন-ব্যবস্থা দলীয় রাজনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য আধুনিক গণতন্ত্রগুলিকে প্রতিনিধি-পরিচালিত গণতন্ত্র বলা যাইতে পারে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসম্পর্কে সকলে একমতাবলম্বী হইতে পারে না। যে সমস্ত লোক একই নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, সেই সমস্ত লোক লইয়া এক একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ব্যক্তিবিশেষের মত যতই যুক্তিযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন তাহা এককভাবে কার্যকরী হইতে পারে না। সেজন্য এক-নীতিতে আস্থাবান্ অধিকসংখ্যক লোক যদি একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের নীতি ও কার্যক্রম সফল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে প্রতিরোধ করা যায় না। সুতরাং রাজনৈতিক দল-গঠনের মূলনীতি হইল—একতাই বল। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাহাদের নীতি ও কার্যক্রম স্থির করে। জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষসাধন হইল রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য। দলীয় স্বার্থসাধন করিবার উদ্দেশ্যে দল গঠিত হইলে, সে দল আদর্শভ্রষ্ট হইয়া কুচক্রীদলে (Faction) পরিণত হয়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। কিন্তু 'দলীয় শাসন ঈশ্বরানুমোদিত—এই কথা প্রচার করিয়া কোন রাজনৈতিক দলই বর্তমান যুগে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে না। দলীয় শাসন-ব্যবস্থার পশ্চাতে জনগণের সমর্থন থাকা চাই।

রাজনৈতিক দলের কার্য—Functions of Political Parties

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একজন নেতা ও একাধিক উপনেতার অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। কোন রাজনৈতিক দল যদি বাস্তবক্ষেত্রে ইহার মত কার্যকরী

করিতে মনস্থ করে, তাহা হইলে ইহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল দেশের বিভিন্ন সমস্যাসম্পর্কে ইহার দলীয় নীতি স্থির করা। জাতীয় সমস্যাগুলি নির্ধারণ করিয়া সেই সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের কার্যক্রম স্থির করিতে হয়। জাতীয় সমস্যা ও সমস্যাসমাধানের নীতি স্থির হইলে দলের কার্য হইল সেই নীতিকে নানা উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। সংবাদপত্র, সভা-সমিতি ও পুস্তিকা-প্রকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া জনমতকে দলের অনুকূল করিয়া গঠন করিবার জন্য প্রত্যেক দলকে প্রচারকার্য চালাইতে হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক এই প্রচারকার্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া দলীয় নীতিতে আস্থাবান্ হয়, দলের সমর্থকসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পায়। আইনসভার সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়। প্রার্থী নির্বাচন করিয়া সাধারণ নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া রাজনৈতিক দলের আর একটি প্রধান কার্য। নিজ নিজ দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোটসংগ্রহের জন্য এই সময় প্রত্যেকটি দলকে জোর প্রচারকার্য চালাইতে হয়। নির্বাচনের পর যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলের নেতৃগণ মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া শাসনকার্য-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হইলে রাজনৈতিক দল তাহার নীতি ও কার্যক্রম অনুসারে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিতে সচেষ্ট থাকে। এইরূপে নির্বাচনের সময় জনসাধারণের সমর্থন-লাভের জন্য যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত হয়, ক্ষমতালাভের পর সেগুলিকে যথাসম্ভব রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। যে দলগুলি আইনসভার অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক আসন দখল করে, তাহারা বিরোধীদল বলিয়া পরিচিত হয়। প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও বিরোধীদল আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তরের দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলীকে তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত রাখে। মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া খুশীমত শাসনকার্য পরিচালনা করিলে, বিরোধীদল জনমত জাগ্রত করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের মতের পার্থক্য অনুসারে সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়—উগ্র বামপন্থী (Extreme Left), বামপন্থী (Left), দক্ষিণপন্থী (Right) ও উগ্র দক্ষিণপন্থী (Extreme Right)। উগ্র বামপন্থীদল সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করিতে চান। বামপন্থীরা প্রয়োজনমত বর্তমান অবস্থার প্রগতিমূলক পরিবর্তনে বিশ্বাসী।

দক্ষিণপন্থীরা কোনরূপ পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহেন। বর্তমান অবস্থাকে বজায় রাখা তাঁহারা সমীচীন মনে করেন। উগ্র দক্ষিণপন্থিদল অতিরিক্তমাত্রায় রক্ষণশীল। তাঁহারা অধুনালুপ্ত পুরাতন ব্যবস্থার পক্ষপাতী।

দলীয় শাসনের গুণ—Merits of Party Government

প্রথমতঃ, রাজনৈতিক দল অসংবদ্ধ জনমতকে সুসংবদ্ধভাবে গঠন করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলে। এই উদ্দেশ্যে দলগুলি নানাপ্রকারে প্রচারকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। রাজনৈতিক দলগুলি দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও তাহাদের সমাধানের প্রস্তাব জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া জনসাধারণকে ঐ সমস্ত বিষয়ে সচেতন করিবার চেষ্টা করে। প্রচারকার্যের মধ্য দিয়া দেশবাসী ঐ সমস্ত জাতীয় সমস্যা ও তাহাদের সমাধান-প্রস্তাবগুলির সহিত পরিচিত হয়। ফলে, সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে জনসাধারণের উৎসাহ জন্মে ও তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপের মধ্য দিয়া জনশিক্ষা বিস্তার লাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ, সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলের অবর্তমানে শাসন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং দলের নীতি ও নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি যথাসম্ভব সফল করিতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু আইনসভার সদস্যগণ যদি তাঁহাদের দলের নেতৃগণ কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যে সহায়তা না করিয়া তাঁহাদের খুশীমত ভোট দেন, তাহা হইলে মন্ত্রিমণ্ডলীর শাসন-পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। দলের সদস্যগণের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার অভাবে শাসনকর্তৃপক্ষ স্থায়িভাবে কোন শাসননীতি প্রবর্তন করিতে পারে না। দলের সমর্থন ব্যতীত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থায়িত্বলাভ করিয়া দলীয় নীতি ও কার্যক্রম সফল করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, দলীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন না হইলে শাসনকার্যের কোনরূপ উৎকর্ষসাধন হওয়া সম্ভবপর হইত না। ক্ষমতার অধিকারিদল নিজ ইচ্ছানুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া যাইত। বর্তমান যুগে দলীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল শাসনকার্য পরিচালনা করিবার সুযোগ পায় এবং এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া শাসনকার্যের উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য-পরিচালনার ভার গ্রহণ

করিলেও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয়ে তাহারা জনস্বার্থ-বিরোধী কোন কাজ করিতে সাহসী হয় না।

দলীয় শাসন-ব্যবস্থার আর একটি গুণ হইল যে, যে-সমস্ত দেশে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান-নীতি শাসন-পরিচালনাক্ষেত্রে কার্যকরী করা হইয়াছে, সে-সমস্ত দেশে রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়াই সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। দলীয় শাসন-ব্যবস্থার ফলে শাসন-কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে যোগসূত্র ও সহযোগিতা স্থাপিত হইয়া শাসন-ব্যবস্থা অব্যাহত আছে।

দলীয় শাসনের দোষ—Demerits of Party Government

প্রথমতঃ, রাজনৈতিক দল মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দলাদলির সূত্রপাত করে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখিবার নিমিত্ত অনেক সময় ব্যক্তিত্ব উপেক্ষিত হয়। দলীয় সংহতি অব্যাহত রাখিবার জন্য কোনরূপ মতানৈক্য বরদাস্ত করা হয় না। দলের নেতার মাধ্যমে যে দলীয় নীতি নির্ধারিত হয়, বিবেকবুদ্ধি-বিরোধী হইলেও প্রত্যেক সদস্যকে সেই নীতি মানিয়া চলিতে হয়। ফলে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা বা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং দলীয় শাসন-ব্যবস্থা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ, দলীয় অনুশাসনের প্রতি অন্ধ ও অখণ্ড আনুগত্যের ফলে দলের সমর্থকগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলিয়া দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হয়। জাতীয় সমস্যাগুলিকে নিরপেক্ষভাবে জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া বিবেচনা না করিয়া দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের দিক দিয়া বিবেচনা করা হয়।

তৃতীয়তঃ, আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ভোটসংগ্রহ-ব্যাপারে তৎপর হয়। আর এই ভোটসংগ্রহ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণতঃ যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করে, তাহাতে দেশের নৈতিক আবহাওয়ার ও নৈতিক মানের অবনতি ঘটে। বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট নেতৃগণ তাঁহাদের সামাজিক পদমর্যাদা ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চালনা করিয়া সমাজে এরূপ দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন, যাহাতে জনশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। দুর্নীতি, মিথ্যাভাষণ ও মিথ্যাপ্রচার, কলহ ও দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নানাবিধ দোষ সমাজদেহে দুষ্ট ব্রণের মত আবির্ভূত হয়।

চতুর্থতঃ, নির্বাচনদ্বন্দ্বে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেইদল রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয় ও মন্ত্রিসংসদ গঠন করে। দলীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকারী চাকুরী, সরকারী সাহায্য ও সম্মান যোগ্যতা বিচার না করিয়া দলের সমর্থনকারীদের মধ্যে অকুণ্ঠভাবে বিতরণ করিয়া দলের সংহতি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। ফলে, যোগ্যব্যক্তি অপর দলভুক্ত বলিয়া সরকারী কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। ইহাতে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে, যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতালাভ করিতে পারে না, সে দল বিরোধী-দল বলিয়া পরিচিত হয় ও সর্বদা সরকারী কার্যের ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ছিদ্রান্বেষণ করে ও সর্বপ্রকারে সরকারী কার্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট থাকে।

দলীয় শাসনের আর একটি প্রধান ত্রুটি হইল যে, দলের নেতৃত্ব যখন জনকয়েক স্বার্থপর কুচক্রী লোকের হস্তগত হয় তখন এই কুচক্রী দল নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের নিমিত্ত জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

দুই-দল বনাম বহু-দল—Two-Party System vs. Multiple-Party System

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। অনেক মনে করেন যে, শাসন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য বহুদল অপেক্ষা দুইটি দল থাকা ভাল। ইংলণ্ডে বহুদিন হইতে দুইটি প্রধান দলের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। উভয় ব্যবস্থার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হইয়া থাকে।

দুই দলের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—Arguments for and against Two-Party System

দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থাকিলে যে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল ক্ষমতার অধিকারী হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে। ইহাতে সরকার স্থায়িত্বলাভ করিয়া নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে ইহার কার্যক্রম রূপায়িত করিতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল স্থায়িত্বলাভ করিলেও ইহা জনমতবিরোধী কার্য করিতে সাহস পায় না। কারণ, শাসনকার্যে কোনপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে বিরোধী দল সমালোচনা দ্বারা জনমতকে ইহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত

ঘুরিয়া দিতে পারে। ফলে, পরবর্তী নির্বাচনকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচন দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া ক্ষমতাচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে। দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হওয়ার ফলে শাসনকার্যও উৎকর্ষ লাভ করে। ইহা ছাড়া, দুইটি দল বর্তমান থাকিলে ভোটদাতাগণের পক্ষে প্রার্থী নির্বাচন করাও অধিকতর সহজ ও সরল হয়। ভোটদাতাগণের মাত্র দুইটি নীতির সমর্থক দুইজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে নির্বাচন করিতে হয়। সুতরাং তাহারা সহজেই প্রার্থী স্থির করিতে পারে।

দেশে দুইটি মাত্র দল থাকিবার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহাতে জনমতের বিভিন্ন দিক সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। দেশে যদি উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দুইটি মাত্র দল থাকে, তাহা হইলে মধ্যপন্থী কোন লোকের পক্ষে উল্লিখিত দুইটি দলের কোন দলেই বিবেকবুদ্ধি-সম্মতভাবে যোগদান করা সম্ভব নয়। দেশের সমস্যাগুলিও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। দুইটি মাত্র দল থাকিলে দেশের শাসকগোষ্ঠীও স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনলাভ করিয়া মন্ত্রিসংসদ স্থায়িত্বলাভ করে। ক্ষমতাচ্যুত হইবার আশঙ্কা কম থাকিলে মন্ত্রিসংসদ তাহাদের খুশীমত শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া সর্ববিষয়ে একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। ফলে, মন্ত্রিসংসদ সর্বেসর্বা হইয়া উঠে ও আইনসভার প্রাধান্য খর্ব হয়। দুই-দল ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহাতে কোন ব্যক্তির স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের ক্ষমতা থাকে না। ভোটদাতা নিজের বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া দলের অনুশাসন অনুসারে ভোট দিতে বাধ্য হয়।

বহু-দলের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—Arguments for and against Multiple-Party System

দুই-দল ব্যবস্থার উল্লিখিত গলদ থাকার জন্য অনেকে বহু-দলের অস্তিত্ব-সমর্থন করেন। বহু-দল থাকিলে জনমত এই বিভিন্ন দলের মাধ্যমে প্রকাশিত হইতে পারে ও আইনসভাও অধিকতর প্রতিনিধিমূলক হইতে পারে। জনগণ তাহাদের স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিবার অধিকতর সুযোগ লাভ করে। এই ব্যবস্থা দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের একাধিপত্য-বিস্তার প্রতিরোধ করা যায়। বিভিন্ন দল আলাপ-আলোচনা দ্বারা সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে। ফলে আইন-প্রণয়নকার্য ও শাসনকার্য বহু-দলের সমর্থনলাভ করিয়া ব্যাপক

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু-দল-ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু দলও শাসনকার্য-পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। মন্ত্রিসংসদ একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বহুদলের সম্মিলিত সমর্থনপুষ্ট বলিয়া স্বৈরাচারী হইতে পারে না। একদল দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসংসদ অপেক্ষা বহু-দল-সমর্থিত মন্ত্রিসংসদ দেশের জনমতকে অধিকতর প্রতিফলিত করিতে পারে এবং জাতীয় স্বার্থকে অধিকতর সংরক্ষিত করিতে সক্ষম হয়।

কিন্তু বহু-দলের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, এই ব্যবস্থায় শক্তিশালী ও স্থায়ী মন্ত্রিসংসদ গঠন করা সম্ভব নয়। দুই বা ততোধিক দলের সমর্থনে যে মন্ত্রিসংসদ গঠিত হয়, দলগুলির মধ্যে সামান্য মতানৈক্য হইলেই ঐ মন্ত্রিসংসদ ভাঙ্গিয়া পড়ে। আইনসভায় কোন দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার ফলে মন্ত্রিসংসদকে দলগুলির সম্মিলিত সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হয়। মন্ত্রিগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে এক বা একাধিক দলের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়া মন্ত্রিসংসদের পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিসংসদ যে শুধু অস্থায়ী হয় তাহা নয়, উহার দুর্বলতাও প্রকাশ পায়। মন্ত্রিসংসদের কোন সদস্যই স্বাধীনভাবে তাঁহার নিজের বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতে পারেন না। সর্বদাই আলাপ-আলোচনা দ্বারা অন্য দলের সদস্যদের সম্মতির উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয়। ফলে, কোন নীতি কার্যকরী করিতে গেলে বহু সময় অতিবাহিত হয়। কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ইহাতে দেশের সুশাসন ও হিতকর কোন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। অল্প সময়ের ব্যবধানে মন্ত্রিসংসদ পুনর্গঠিত হয় বলিয়া মন্ত্রি-সংসদের সদস্যনির্বাচনে অনেক সময় দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। ইহা ছাড়া, বহু দল থাকার জন্য জনসাধারণের পক্ষে প্রার্থীনির্বাচন করাও একটা সমস্যারূপে দেখা দেয়। বিভিন্ন দল তাহাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করিয়া সাধারণ ভোটদাতার কাছে একটা সমস্যার সৃষ্টি করে।

এক-দলীয় শাসন—One-Party Government

বিগত প্রথম বিশ্বসমরের পরবর্তী কালে ইয়ুরোপের কয়েকটি দেশে এক-দলীয় শাসন আরম্ভ হয়। রুশ দেশে প্রথম সাম্যবাদী দল কর্তৃক পরিচালিত এক-দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্যবাদী দল বলপ্রয়োগ দ্বারা অন্য দলগুলিকে বিতাড়িত করিয়া দলীয় এক-নায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করে। রুশ দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্রেও সাম্যবাদী ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না।

রুশ দেশের পর জার্মানি ও ইতালিতে যথাক্রমে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী দলের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এক-দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নাৎসী দল ও ফ্যাসিবাদী দল সাম্যবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে বল প্রয়োগ দ্বারা সমূলে উৎপাটিত করে। ইংলণ্ডেও যুদ্ধের সময় যে জাতীয় সরকার গঠিত হয়, তাহাকে কার্যতঃ এক-দলীয় সরকাব বলা যাইতে পারে। জাতীয় বিপদের সময় ইংলণ্ডে বিভিন্ন দলগুলি তাহাদের দলগত বিভেদ বিসর্জন দিয়া জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে যত্নবান হয়। সুতরাং রাশিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশের এক-দলীয় সবকার ও ইংলণ্ডের জাতীয় সরকারকে এক পর্যায়ভুক্ত করা উচিত নয়।

'ঐক-দলীয় সরকার' ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন যে, কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতিকে বিভিন্ন দলে ভাগ করিলে জাতীয় শক্তি ও একতা নষ্ট হয়। জাতির সমগ্র সদস্যই যদি একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহা হইলে জাতীয় শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এক-দলীয়, দ্বি দলীয় বা বহু-দলীয়, সকল শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণ দলের নেতৃগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। দলের নির্দেশ জনগণ অন্ধভাবেই পালন করিয়া থাকে। কোনরূপ দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া নানারূপ দল গঠন করিবার পরিবর্তে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি পাইতে পারে।

এক-দলীয় সরকারের স্বপক্ষে যতই যুক্তি দেখান হউক না কেন, এক-দলীয় সরকার যতদিন পর্যন্ত জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হইবে ততদিন এই সরকার স্থায়িত্বলাভ কবিতে পারে না। জার্মানি ও ইতালিতে ইতিমধ্যেই এক-দলীয় সরকাবেব অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু রুশ দেশে এক-দলীয় সরকার আজও সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমশঃই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। তাহার কারণ রুশ দেশের এক-দলীয় সবকার বলপ্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নানাবিষয়ে দেশের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া জনসংখ্যার বিশাল এক অংশের আস্থাভাজন হইতে সমর্থ হইয়াছে। রুশ দেশের এক-দলীয় সরকারের ভবিষ্যৎ ইহার জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট গঠনমূলক কার্যের উপর নির্ভর করে।

দলব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার উপায়—Means of Removing the Defects

দলপ্রথার যে অসুবিধাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বহুলাংশে নাগরিক

জীবনের অসম্পূর্ণতার জন্যই দেখা যায়। দলপ্রথার কুফলগুলি দুই প্রকারে দূর করা সম্ভব। প্রথমতঃ, শাসন-ব্যবস্থা এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ শাসনব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিতে না পারে। এই নিমিত্ত শাসনব্যাপারে জনসাধারণের মতকে গুরুত্ব প্রদান করিবার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। দেশের শাসনতন্ত্রে যদি গণভোট, গণ-প্রস্তাব ও গণপ্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে দলীয় এক-নায়কত্বের পরিবর্তে সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। জনগণ যতই অধিকতর সক্রিয়ভাবে শাসনব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবে শাসন-ব্যবস্থা হইতে সেই পরিমাণে দলীয় এক-নায়কত্বের ত্রুটিগুলি দূর হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী সাহায্য, সম্মান ও সরকারী চাকুরী বিতরণ করিয়া সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল তাহাদের সমর্থকগণকে বশীভূত রাখে। ইহাতে অনেক সময় নানাবিধ দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য শাসনতন্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, একমাত্র যোগ্যতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। তৃতীয়তঃ, শাসকবর্গ যাহাতে নিজেদের খুশীমত শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে সমর্থ না হয়, সেজন্য দেশের সংবিধান যথাসম্ভব অনমনীয় রাখিতে হইবে। জনগণের মৌলিক অধিকারগুলিও লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রদ্বারা সুরক্ষিত করা একান্ত আবশ্যক। চতুর্থতঃ, শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ উচ্চ বিচারালয় বর্তমানে শাসন-ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। পঞ্চমতঃ, সরকারের স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ যাহাতে দলনিরপেক্ষভাবে তাহাদের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করিতে পারে সেজন্য শাসনতন্ত্রে তাহাদের নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতির বিধিগুলি সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। কোনরূপ প্রলোভন বা ভয়ের দ্বারা তাহারা যাহাতে কর্তব্য-চ্যুত না হয়, সেজন্য শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ষষ্ঠতঃ, সংখ্যালঘু দলগুলির অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেজন্যও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায় যে, নাগরিকগণ যদি সৎশিক্ষা পাইয়া প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারা সাম্প্রদায়িক বা দলগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সব সময়ে জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে যত্নবান্ হয়।

সংক্ষিপ্তসার

রাজনৈতিক দল

যখন একদল লোক একটি নির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম অবলম্বন করিয়া জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করে, তখন তাহাকে রাজনৈতিক দল বলা হয়। রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উন্নতি করা।

রাজনৈতিক দলের কার্য

১। জাতীয় সমস্যাগুলি নির্ধারিত করিয়া তাহাদের সমাধান করিবার নীতি ও কার্যক্রম জনসাধারণের নিকট উপস্থিত কবা, ২। প্রচারকার্য দ্বারা জনসাধারণ যাহাতে দলে যোগদান করে সেজন্য চেষ্টা করা, ৩। নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করা, ৪। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া সবকার গঠন করা, ৫। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া দলীয় নীতি কার্যকরী করিয়া নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা।

দলীয় শাসনের গুণ

১। অসংবদ্ধ জনমতকে প্রচার-কার্যের দ্বারা সুসংবদ্ধ করিয়া জনশিক্ষা প্রচারে সাহায্য কবে, ২। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনলাভ করিয়া মন্ত্রিসংসদ স্থায়ী হয়, ৩। দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে শাসনকার্যের উন্নতি হয়, ৪। দলীয় শাসন প্রবর্তনের ফলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপিত হয়।

দোষ

১। দলীয় শাসন মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করে, ২। স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের বাধা সৃষ্টি করিয়া দলপ্রথা ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে, ৩। দলীয় স্বার্থ বড করিয়া দেখা হয় বলিয়া দলপ্রথায় জাতীয় স্বার্থ অনেক সময় উপেক্ষিত হয়, ৪। দলপ্রথায় নির্বাচনকালে নানাপ্রকার দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় ও লোকের নৈতিক মানের অবনতি ঘটে, ৫। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সবসময়ে সরকারী কাজের ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া বাধা দেয়।

দুই দল বনাম বহু-দল—দুই দলের গুণ

১। দুই-দল থাকিলে ভোটদাতার প্রার্থীনির্বাচনেব সমস্যা সহজ হয়। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেব সমর্থন লাভ করিয়া শাসনপরিষদ স্থায়িত্ব লাভ করে। ৩।

জীবনের অসম্পূর্ণতার জন্যই দেখা যায়। দলপ্রথার কুফলগুলি দুই প্রকারে দূর করা সম্ভব। প্রথমতঃ, শাসন-ব্যবস্থা এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ শাসনব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিতে না পারে। এই নিমিত্ত শাসনব্যাপারে জনসাধারণের মতকে গুরুত্ব প্রদান করিবার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। দেশের শাসনতন্ত্রে যদি গণভোট, গণ-প্রস্তাব ও গণপ্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে দলীয় এক-নায়কত্বের পরিবর্তে সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। জনগণ যতই অধিকতর সক্রিয়ভাবে শাসনব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবে শাসন-ব্যবস্থা হইতে সেই পরিমাণে দলীয় এক-নায়কত্বের ত্রুটিগুলি দূর হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী সাহায্য, সম্মান ও সরকারী চাকুরী বিতরণ করিয়া সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল তাহাদের সমর্থকগণকে বশীভূত রাখে। ইহাতে অনেক সময় নানাবিধ দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য শাসনতন্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, একমাত্র যোগ্যতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। তৃতীয়তঃ, শাসকবর্গ যাহাতে নিজেদের খুশীমত শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে সমর্থ না হয়, সেজন্য দেশের সংবিধান যথাসম্ভব অনমনীয় রাখিতে হইবে। জনগণের মৌলিক অধিকারগুলিও লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রদ্বারা সুরক্ষিত করা একান্ত আবশ্যক। চতুর্থতঃ, শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ উচ্চ বিচারালয় বর্তমানে শাসন-ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। পঞ্চমতঃ, সরকারের স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ যাহাতে দলনিরপেক্ষভাবে তাহাদের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করিতে পারে সেজন্য শাসনতন্ত্রে তাহাদের নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতির বিধিগুলি সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। কোনরূপ প্রলোভন বা ভয়ের দ্বারা তাহারা যাহাতে কর্তব্য-চ্যুত না হয়, সেজন্য শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ষষ্ঠতঃ, সংখ্যালঘু দলগুলির অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেজন্যও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায় যে, নাগরিকগণ যদি সৎশিক্ষা পাইয়া প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারা সাম্প্রদায়িক বা দলগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া সব সময়ে জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে যত্নবান্ হয়।

সংক্ষিপ্তসার

রাজনৈতিক দল

যখন একদল লোক একটি নির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম অবলম্বন করিয়া জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করে, তখন তাহাকে রাজনৈতিক দল বলা হয়। রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উন্নতি করা।

রাজনৈতিক দলের কার্য

১। জাতীয় সমস্যাগুলি নির্ধারিত করিয়া তাহাদের সমাধান করিবার নীতি ও কার্যক্রম জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা, ২। প্রচারকার্য দ্বারা জনসাধারণ যাহাতে দলে যোগদান করে সেজন্য চেষ্টা কবা, ৩। নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করা, ৪। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া সরকার গঠন করা, ৫। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া দলীয় নীতি কার্যকরী করিয়া নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা।

দলীয় শাসনের গুণ

১। অসংবদ্ধ জনমতকে প্রচার-কার্যের দ্বারা সুসংবদ্ধ করিয়া জনশিক্ষা প্রচারে সাহায্য করে, ২। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনলাভ করিয়া মন্ত্রিসংসদ স্থায়ী হয়, ৩। দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে শাসনকার্যের উন্নতি হয়, ৪। দলীয় শাসন প্রবর্তনের ফলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপিত হয়।

দোষ

১। দলীয় শাসন মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করে, ২। স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের বাধা সৃষ্টি করিয়া দলপ্রথা ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে, ৩। দলীয় স্বার্থ বড় করিয়া দেখা হয় বলিয়া দলপ্রথায় জাতীয় স্বার্থ অনেক সময় উপেক্ষিত হয়, ৪। দলপ্রথায় নির্বাচনকালে নানাপ্রকার দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় ও লোকের নৈতিক মানের অবনতি ঘটে, ৫। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সবসময়ে সরকারী কাজের ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া বাধা দেয়।

দুই-দল বনাম বহু-দল—দুই দলের গুণ

১। দুই-দল থাকিলে ভোটদাতার প্রার্থীনির্বাচনের সমস্যা সহজ হয়। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন লাভ করিয়া শাসনপরিষদ স্থায়িত্ব লাভ করে। ৩।

বিরোধীদলের সমালোচনার দ্বারা জনমত বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে এই ভয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বে-আইনী কার্য করিতে পারে না।

দুই-দলের দোষ

১। ইহাতে দেশের জনমত বিশেষ করিয়া মধ্যপন্থী মত সম্যকরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারী হইবার সম্ভাবনা থাকে। ৩। মন্ত্রিসংসদ একটিমাত্র দলের নেতৃগণ দ্বারা গঠিত হয় বলিয়া দেশের বিভিন্ন জনমত মন্ত্রিসংসদের কার্যদ্বারা প্রতিফলিত হয় না।

বহু-দলের গুণ

বহু-দল থাকিলে ১। দেশের জনমত অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায় ও জনসাধারণ এই বিভিন্ন দলের মাধ্যমে তাহাদের মত প্রকাশ করিতে পারে। ২। মন্ত্রিসংসদ বহু-দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহাকে জনমতের অধিকতর প্রতিনিধিমূলক বলা যাইতে পারে। ৩। বহু-দলের সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্ত্রিসংসদ অত্যাচারী হইতে পারে না।

বহু-দলের দোষ

১। বহু-দলের সহযোগিতায় যে মন্ত্রিসংসদ গঠিত হয় তাহা স্থায়ী হইতে পারে না, ২। অস্থায়ী বলিয়া মন্ত্রিসংসদ জাতীয় অগ্রগতির জন্য কোন দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম সফল করিতে পারে না, ৩। বহু-দলের সম্মতি-সাপেক্ষ বলিয়া শাসন-পরিষদ কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না, ৪। মন্ত্রিসংসদ-গঠনে দলাদলি বৃদ্ধি পায়।

এক-দলীয় শাসন

প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়া, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশে অন্য দলগুলিকে নির্মূল করিয়া এক-দলীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এক-দলীয় শাসনের উদ্দেশ্য হইল যে-কোন প্রকারে হউক না কেন দলীয় নীতি বলবৎ করা। এক-দলীয় সরকার দেশের স্বার্থে বিনাবাধায় দ্রুতগতিতে কার্য করিতে পারে। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

দলব্যবস্থার ত্রুটি দূরীকরণের উপায়

১। শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণকে গণভোট, গণ-প্রস্তাব, প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রভৃতি দ্বারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া দলীয় শাসনের ত্রুটি

দূর করা সম্ভব। ২। শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তির উপর সরকারী চাকুরী সরকারী সম্মান বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইলে, দলীয় শাসনের গলদ অনেক পরিমাণে কমিতে পারে। ৩। লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র এবং নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, রাজনৈতিক দল তাহাদের খুশীমত কার্য করিতে পারে না। ৪। সরকারী কর্মচারী ও সংখ্যালঘু দলের ন্যায্য অধিকারগুলি শাসনতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত হইলে দলীয় শাসনের ত্রুটি দূর করা সহজসাধ্য হয়।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Define a Party. What are the merits and demerits of a Party System of Government? [H. S. (Hu.), Comp. 1960]

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। দলীয় শাসন-ব্যবস্থার দোষ-গুণ বিচার কর।

উঃ—দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে একমতাবলম্বী একদল লোক যখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী শাসন-পরিচালনা করিতে চায়, তখন এই একমতাবলম্বী লোকদের লইয়া এক একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। একতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা হইল রাজনৈতিক দলের ভিত্তি। গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রসারের ফলে রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিয়াছে।

এ স্থলে রাজনৈতিক দলের সহিত কুচক্রের পার্থক্য করা দরকার। কুচক্রীদলও (Faction) অনেক সময় নিজেদের রাজনৈতিক দল বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুচক্রীদল অতি সংকীর্ণ আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়। রাজনৈতিকদলের উদ্দেশ্য হইল দেশের সর্বসাধারণের মঙ্গল সাধন করা আর কুচক্রীদল শুধু নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। কুচক্রীদলের বিশেষ কোন নীতি থাকে না।

গুণ: ১। রাজনৈতিক দল অসংবদ্ধ জনমতকে সুসংবদ্ধভাবে গঠিত করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করে। দলের প্রচার কার্যের মধ্য দিয়া দেশবাসী জাতীয়-সমস্যাগুলি ও এই সমস্যাগুলির সমাধান-প্রস্তাবগুলির সহিত পরিচিত হয়। ইহাতে জনশিক্ষা প্রসার লাভ করে।

২। সুসংবদ্ধ দলব্যবস্থা না থাকিলে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। দলের সমর্থন ব্যতীত কোন সরকারই স্থায়িত্ব লাভ করিয়া জনহিতকর কার্য সম্পাদন করিতে পারে না।

৩। দলীয় শাসনের আর একটি গুণ হইল যে, বিভিন্ন দলের প্রতিযোগিতায় শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ক্ষমতায় আসীন থাকে আর সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল হিসাবে সর্বদাই ক্ষমতায় আসীন দলের কার্যের সমালোচনা করে এবং ভুল-ত্রুটি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করে। এইজন্য ক্ষমতায় আসীন দল স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না।

দোষ: ১। রাজনৈতিক দল মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দলাদলি সৃষ্টি করে।

২। দল-ব্যবস্থায় মতামতের স্বাধীনতা থাকে না। দলীয় নীতি সকলকেই মানিতে হয়।

৩। দলের মতামত মানিয়া লইতে হয় বলিয়া দলের সমর্থকগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলিয়া দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হয়। ইহাতে দেশের বৃহত্তর কল্যাণ ব্যাহত হয়।

৪। নির্বাচনকালে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার ফলে কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং ইহার ফলে দেশের নৈতিক আবহাওয়া বিষাক্ত হয়।

৫। দলাদলীর ফলে অনেক সময় দলীয় কর্তৃত্ব অযোগ্য লোকের হস্তে যায় এবং এই অযোগ্য ব্যক্তিগণ দলের সাহায্যে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনে তৎপর হয়।

2. Discuss the relative advantages and disadvantages of (a) multi-party system, (b) two-party system, and (c) single-party system.

(ক) বহু দলীয়, (খ) দ্বিদলীয় ও (গ) একদলীয় ব্যবস্থার পারস্পরিক সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

উঃ— কোন কোন দেশে এক-দলীয় শাসন-ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে জার্মানী, ইতালি ও রুশ] দেশে এই এক-দলীয় শাসন-ব্যবস্থা চালু হয়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইংলণ্ডে দুই দলীয় শাসন-ব্যবস্থা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। আবার ফরাসী দেশ ও ভারতে বহু দলের অস্তিত্ব দেখা যায়।

দেশে বহুদল থাকিলে জনমত অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায়। দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী ও মধ্যপন্থী বিভিন্ন মতামত এই বিভিন্ন দলগুলির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিসংসদ বহুদলের সদস্য লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহা জনমত অধিকতর প্রতিফলিত করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, বহুদলের সমর্থনে গঠিত বলিয়া মন্ত্রিসংসদ জনমত-বিরোধী কাজ করিতে পারে না।

কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, ভিন্ন মতাবলম্বী বহুদলের সহযোগিতায় মন্ত্রিসংসদ গঠিত হয় বলিয়া ইহা স্থায়ী হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, অস্থায়ী বলিয়া মন্ত্রিসংসদ কোন দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম সফল করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, বহুদলের সম্মতিসাপেক্ষ বলিয়া শাসকগণ কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না।

দুই দল থাকিবার প্রধান সুবিধা হইল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনপুষ্ট মন্ত্রিসংসদ স্থায়ী হয়। দ্বিতীয়তঃ, দুই দল থাকিলে ভোটদাতারও প্রার্থী নির্বাচনের সমস্যা সহজ হয়। তৃতীয়তঃ, বিরোধী দলের সমালোচনার ভয়ে শাসকগণ বে-আইনী কাজ করিতে পারে না।

দুই দলব্যবস্থার ত্রুটি হইল যে, ইহাতে দেশের বিভিন্ন জনমত বিশেষ করিয়া মধ্যপন্থী মত প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ইচ্ছামত কাজ করিলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বাধা দিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, একটিমাত্র দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত মন্ত্রিসভা দেশের জনমত প্রতিফলিত করিতে পারে না।

এক-দলীয় শাসনের সুবিধা হইল যে, ইহাতে দেশে দলাদলি হইবার সম্ভাবনা নাই। একদলীয় সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে ও নির্ভয়ে ইহার কার্যক্রমকে রূপদান করিতে পারে।

এই ব্যবস্থার প্রধান দোষ হইল যে, ইহাতে দেশের জনমত আদৌ প্রতিফলিত হইতে পারে না। ইহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হয়। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া এই ব্যবস্থা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করে।

3. Why should there be a number of Political Parties in a Democracy? Why is it undesirable to have too many Political Parties? [H. S. (Hu) 1968]

গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিকদল থাকা উচিত কেন? অধিক সংখ্যক রাজনৈতিকদল থাকা বাঞ্ছনীয় নয় কেন?

উঃ—গণতন্ত্র জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিকদল জনমত সুসংবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করে। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় রাজনৈতিকদল অপরিহার্য।

২নং প্রশ্নের উত্তরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

একাদশ শ্রেণীর জন্য

ষোড়শ অধ্যায়

ভারতের শাসনতন্ত্র

(The Indian Constitution)

শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা—Definition of a Constitution

প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি শাসনতন্ত্র থাকে। শাসনতন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি কতকগুলি আইন-কানুন এবং কতকগুলি বিধি-নিষেধ ও প্রথা, যেগুলি অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্র শাসনকার্য পরিচালনা করে। রাষ্ট্রের কার্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। শাসনতন্ত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থির করে:—সরকারের কি কি ক্ষমতা থাকিবে ও কি পদ্ধতিতে সেই ক্ষমতাসমূহ শাসনকার্যে প্রয়োগ করা হইবে, কি নিয়ম অনুসারে সরকার গঠিত হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কি সম্পর্ক হইবে এবং সর্বোপরি শাসক ও শাসিতের কি কি অধিকার ও কর্তব্য থাকিবে। সুতরাং শাসনতন্ত্র হইল কতকগুলি লিখিত ও অলিখিত আইনের সমষ্টি। যেগুলি একদিকে সরকারের সংগঠন ও কার্যকলাপ, অপরদিকে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত করে।

কোন দেশের শাসনতন্ত্র লিখিত বা অলিখিত হইতে পারে। লিখিত শাসনতন্ত্রে (Written Constitution) প্রত্যেকটি বিষয় এক বা একাধিক দলিলে লিখিত থাকে, যেমন ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্র পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী একটি প্রতিনিধি-সংসদ দ্বারা রচিত হয়। মূলতঃ লিখিত হইলেও কালক্রমে প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি অলিখিত অংশ দ্বারা এই শাসনতন্ত্র বর্ধিত হইতে পারে।

অলিখিত শাসনতন্ত্র (Unwritten Constitution) কোন পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী রচিত হয় না। এই শাসনতন্ত্র প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত। তবে বর্তমানে আইনসভা প্রণীত আইনের দ্বারাও এই শাসনতন্ত্র বর্ধিত হইয়াছে।

লিখিত শাসনতন্ত্র ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট নহে। কোন

শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা অলিখিত হইতে পারে না। লিখিত শাসনতন্ত্রে অলিখিত অংশ থাকে এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ থাকে। এইজন্য শাসনতন্ত্র অনেক সময় নমনীয় ও অনমনীয়—এই দুই ভাগে ভাগ হয়। যে শাসনতন্ত্র সহজেই অর্থাৎ সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে সাধারণ আইনসভা সংশোধন করিতে পারে, তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র (Flexible Constitution) বলা হয়, যেমন বৃটিশ শাসনতন্ত্র। আর যে শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি অপেক্ষা ভিন্ন জটিল পদ্ধতির সাহায্যে সংশোধন করিতে হয়, তাহাকে অনমনীয় শাসনতন্ত্র (Rigid Constitution) বলা হয়, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র, ভারতের শাসনতন্ত্র।

অবতারণা—Introduction

ভারত আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া জগৎসভায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। শিশুরাষ্ট্র হইলেও অতি অল্পকালের মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ভারত যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা একদিকে তাহাকে যেরূপ তাহার অতীত গৌরবের সার্থক উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ তাহার ভবিষ্যৎ গৌরবপূর্ণ ভূমিকা সূচিত করে। বহুদিন পর্যন্ত ভারত পরাধীন ছিল। মুসলমান শাসকগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারত শাসন করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহারা ভারতের অধিবাসী হইয়া নিজেদের ভারতীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। মুসলমান শাসনকালে ভারতের ধনরত্ন ভারতেই থাকিত, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া তাহা বিদেশে চলিয়া যাইত না।

ভারতের অফুরন্ত ধনরত্নের লোভে আকৃষ্ট হইয়া পর্তুগীজ, স্প্যানীয়, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও সর্বশেষ ইংরাজ জাতি এদেশে মুখ্যতঃ বাণিজ্যব্যপদেশে আগমন করে। বণিকের ছদ্মবেশের অন্তরালে প্রত্যেকটি জাতির উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান শাসকগণের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এদেশে রাজ্যস্থাপন করা ও ভারতবাসীকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ-প্রদত্ত সনদের বলে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়, শেষ পর্যন্ত সেই কোম্পানীর সুদক্ষ ও সুচতুর কর্মচারী রবার্ট ক্লাইভ ছলে-বলে-কৌশলে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া ভারতে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিবর্তিত করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বৎসর পর ১৭৬৫

খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়া কার্যতঃ এদেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সিপাহী বিদ্রোহ কাল (১৮৫৭) পর্যন্ত ভারত কোম্পানীর শাসনাধীন ছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ-ব্যাপী যে বিদ্রোহ হয় তাহার ফলে এ দেশে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ভারতের শাসনভার প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ংই ইংলণ্ডেশ্বরী গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে বৃটিশ কেবিনেট সভার একজন সদস্যকে ভারত-সচিব (Secretary of State for India) নিযুক্ত করা হয়। ভারত-সচিবের হস্তেই ভারত শাসনের প্রকৃতভার ন্যস্ত থাকে। ভারতের শাসন-ব্যাপারের জন্য তিনি পার্লামেণ্ট সভার নিকট দায়ী ছিলেন। ইহার পর ১৮৬১, ১৮৯২, ১৯০৯ ও ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে চারিটি ভারতশাসন আইন পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক রচিত হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের শাসন-ব্যবস্থা কার্যতঃ এককেন্দ্রীয় ছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রের কয়েকটি বিষয়ে আংশিকভাবে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এই সময় হইতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভার অনুপ্রেরণায় জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্ররূপে দেখা যায়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন ভারতীয়গণকে আদৌ সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশঃই শক্তিশালী হইয়া উঠে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট সভা আর একটি আইন পাস করিয়া দেশীয় রাজ্যগুলিকে বৃটিশ ভারতের সহিত সংযুক্ত করিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবেও ভারতবাসী সম্মত হয় নাই এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ফলে এ প্রস্তাব আর কার্যকরী করা হয় নাই। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, এই সময়ে ভারতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কোন মতেই একমত হইতে পারে না। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের (Indian Independence Act, 1947) দ্বারা ভারতীয়গণের হস্তে বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। স্বাধীনতা আইন পাস হওয়ার ফলে ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া ভারত ও পাকিস্তান, এই দুইটি ডোমিনিয়নের সৃষ্টি হয় এবং এই দুইটি ডোমিনিয়নের গণপরিষদ (Constituent Assembly) স্বাধীনভাবে তাহাদের শাসনতন্ত্র গঠন করিবার ক্ষমতা পায়। তদনুসারে ভারতীয় গণপরিষদে ভারতের জন্য নূতন সংবিধান রচনা করিয়া ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ভারতের জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে ঐ সংবিধান গ্রহণ করে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের

২৬শে জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে নূতন সংবিধান অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র—New Constitution of India

প্রায় তিন বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া ভারতের গণপরিষদ যে শাসনতন্ত্র রচনা করেন, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর বেলা ১১টা ১০ মিনিটের সময় ভারতীয় গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ উহাতে স্বাক্ষর প্রদান করেন। ভারতের সংবিধান বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সংবিধান। ২৫১ পৃষ্ঠা-সম্বলিত এই সংবিধানে ১৮ পৃষ্ঠা সূচীপত্রসহ ৩৯৫টি সূত্র, ৮টি তপশীল এবং ২২টি অধ্যায় আছে। পৃথিবীর বহুদেশের শাসনতন্ত্রের প্রভাব ভারতের শাসনতন্ত্রে দেখা যায়। ভারতের শাসনতন্ত্র ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনআইন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, বৃটিশ, আইরিশ, ক্যানাডা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বর্মা প্রভৃতি দেশগুলির শাসনতন্ত্রের প্রভাব ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্রে দেখা যায়। ইংরেজী ভাষায় রচিত হইলেও হিন্দী ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষাসমূহে ইহার অনুবাদ করা যাইতে পারে। ভারতের শাসনতন্ত্র শুধু বৃহত্তম নহে, জটিলতার দিক দিয়াও ইহার প্রতিযোগী নাই বলিলেও চলে। নূতন সংবিধানকে 'ভারতীয় সংবিধান' (The Constitution of India) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তাবনা—Preamble to the Constitution

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের অনুরূপভাবে ভারতের শাসনতন্ত্রে একটি প্রস্তাবনা যোগ করা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি **সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** (Sovereign Democratic Republic) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা আছে।

"We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Democratic Republic and to secure to all its citizens.

Justice, social, economic and political ;

Liberty of thought, expression, belief, faith and worship ;

Equality of status and of opportunity, and to promote among them all ;

Fraternity assuring the dignity of the individual and the Unity of the Nation ;

In our Constituent Assembly this twenty-sixth day of November, 1949, do hereby Adopt, Enact and Give to Ourselves This Constitution."

প্রস্তাবনায় তিনটি উদ্দেশ্য প্রচারিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকারের ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল ভারতীয় জনগণ (We, the people of India)। যেহেতু এই ক্ষমতা জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত সেই হেতু কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা ব্যক্তি-সমষ্টি বা কোন রাজ্য বা অন্য কেহ এই ক্ষমতার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রস্তাবনা অনুসারে ভারতীয় জনগণ সরকারের নিকট হইতে কয়েকটি কর্তব্য সম্পাদনের দাবী রাখে। ভারত সরকার ভারতের সকল নাগরিকের সর্ববিষয়ে সমানাধিকার ভোগ করিতে সাহায্য করিবেন এবং এই অধিকারগুলি সুরক্ষিত করিবেন।

তৃতীয়তঃ, এই প্রস্তাবনাই শাসনতন্ত্রের ভাষ্যের সাহায্য করিবে। প্রস্তাবনায় শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে এবং শাসনতন্ত্রের কোন অংশের অভিপ্রায় সম্পর্কে যদি কখনও কোন সংশয় জাগে তাহা হইলে সুপ্রিম কোর্ট ও বিভিন্ন উচ্চ বিচারালয় প্রস্তাবনায় বর্ণিত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে পারিবেন।

সাধারণতন্ত্র-ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সদস্য হিসাবে ভারত ইংলণ্ডের রাজা ও রাণীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারত ইংলণ্ডের রাজা ও রাণীর আনুগত্য স্বীকার করে নাই। ভারত কতকগুলি সুবিধা পাইবার উদ্দেশ্যে সাধারণতন্ত্রভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সদস্য রহিয়াছে। স্বেচ্ছায় ভারত এই সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছে এবং নিজ ইচ্ছামত এই সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে পারে। সুতরাং সাধারণতন্ত্র-ভুক্ত হওয়ার ফলে ভারতরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বা মর্যাদা হানি হয় নাই।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যে গণপরিষদ শাসনতন্ত্র রচনা করে, সে গণপরিষদ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয় নাই—ইহা সত্য। কিন্তু ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে পার্লামেন্টে সভা গঠিত হয়, সে

সভা কর্তৃক আদি শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। সুতরাং ভারতে শাসনতন্ত্রের সার্বজনীন ভিত্তি অস্বীকার করা যায় না। ভারতে শাসনক্ষমতার প্রকৃত উৎস হইল 'আমরা ভারতবাসী' ('We, the people of India')।

রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারত-শাসনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। সুতরাং ভারতকে একটি প্রজাতন্ত্র (Republic) বলা হইয়াছে।

সমালোচনা (Criticism)

প্রস্তাবনায় কতকগুলি উচ্চ আদর্শের উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতের সংবিধানের উদ্দেশ্য হইল জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব আনয়ন করা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে কি না সে সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়া আরও বলা হয় যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা ও সাম্যের ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রস্তাবনায় উল্লিখিত বাণী নিরর্থক হইবে। এই সমালোচনার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, কোন নবগঠিত জাতি যদি একটি উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা হইলে সে জাতি কখনও কোন ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনের মান উন্নত করিতে পারে না। সংবিধানে উল্লিখিত উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী যে শাসনকার্য পরিচালিত হইতেছে না, এ কথা বলাও সত্য নহে। অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া সকলের জন্য সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তন, সম্পদ কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি ধার্য এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারূপ গঠনমূলক কার্য, বিশেষ করিয়া তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাহায্যে সংবিধানে উল্লিখিত উচ্চ আদর্শ-গুলিকে কার্যকরী করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। আশা করা যায়, জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিলে সংবিধানে বর্ণিত উচ্চ আদর্শগুলি কার্যকরী করা সম্ভব হইবে।

মৌলিক অধিকারসমূহ—Fundamental Rights

ভারতের শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার সাহায্যে ভারতীয় নাগরিকগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই অধিকারগুলি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেজন্য সংবিধান দ্বারা আদালতে বিচারের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকগণকে নিম্নলিখিত অধিকারগুলি দেওয়া হইয়াছে।

১। সাম্যের অধিকার—Right to Equality

জাতি-বর্ণ-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ ও জন্মস্থান-নির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই সমান অধিকার থাকিবে, এবং এই সব কারণে কোন অযোগ্যতা—সাধারণ আমোদ-প্রমোদের স্থান, জনসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত জলাশয়, হোটেল, রাস্তা প্রভৃতি ব্যবহারে কাহারও কোন বাধা থাকিবে না। সরকারী চাকুরিতে সকলকে সমানাধিকার দিতে হইবে। যে কোনও আকারে অস্পৃশ্যতা আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সামরিক ও শিক্ষাসূচক উপাধি ব্যতীত অন্য কোন উপাধি দান করা হইবে না এবং বৈদেশিক সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

২। স্বাধীনতার অধিকার—Right to Freedom

ভারতের সকল নাগরিকেরই বাক্-স্বাধীনতা, সভা-সমিতি গঠনের স্বাধীনতা, দেশের মধ্যে অবাধ ভ্রমণের ও বসবাস করার স্বাধীনতা থাকিবে। নাগরিকগণ তাহাদের ইচ্ছামত ভারতের মধ্যে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, দান ও হস্তান্তর করিতে পারিবে ও যে-কোন পেশা, বৃত্তি বা ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবে। বে-আইনীভাবে কাহাকেও আটক রাখা যাইবে না।

উপরি-উক্ত অধিকার সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন অধিকার যদি নীতি-বিরোধী হয় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলা ও জনস্বার্থ ব্যাহত করে, তাহা হইলে রাষ্ট্র এই অধিকারগুলি সম্পর্কে নাগবিকগণকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করিতে পারে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে আটক আইনের (Preventive Detention Act) প্রয়োগ নাগরিকগণের এই স্বাধীনতার অধিকার কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। পরবর্তী কালে এই আইন সংশোধিত হইলেও বিনা বিচারে যে-কোন ব্যক্তিকে অন্ততঃ তিনমাস কাল আটক রাখা যায়।

৩। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার—Right against Exploitation

দাস-ব্যবসায়, বেগার খাটান ও অনুরূপভাবে জোর করিয়া শ্রম আদায় করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১৪ বৎসরের কমবয়স্ক শিশুদের কারখানা, খনি বা অন্য কোন বিপজ্জনক কার্যে নিযুক্ত করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য জনস্বার্থের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্র সকলকেই কাজ করিতে বাধ্য করিতে পারে।

৪। ধর্মাচরণের অধিকার—Right to religion

নাগরিকগণ যে-কোন ধর্ম গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারিবে ও নিজ নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান পালন করিবার তাহাদের স্বাধীনতা থাকিবে। সরকারী অর্থে সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত কোন বিদ্যালয়ে কোন ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া চলিবে না।

অবশ্য নাগরিকগণের ধর্মাচরণ রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সাধারণ নীতিজ্ঞান-বিরোধী হইলে চলিবে না।

৫। শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার—Educational and Cultural Rights

ভারতের যে-কোন স্থানে বসবাসকারী নাগরিকগণের কোন বিশেষ ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি থাকিলে, তাহাদের উহা রক্ষা করিবার অধিকার থাকিবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের ইচ্ছামত বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

৬। সম্পত্তির অধিকার—Right to Property

আইনের অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা চলিবে না। ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া জনসাধারণের স্বার্থে কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা চলিবে না। ক্ষতিপূরণের নীতি বা পরিমাণ আইন দ্বারা স্থির করিতে হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ও রক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিবার ফলে ভূমি-সংস্কারমূলক আইন গ্রহণে সরকারের কতকগুলি বাধা উপস্থিত হয়। এই বাধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে সংবিধানের কতকগুলি ধারা সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইনের বলে জনস্বার্থের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দখল বা পরিচালনা করিবার ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

৭। শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের অধিকার—Right to Constitutional Remedies

যদি কোন কারণে নাগরিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে এই অধিকারগুলি রক্ষার দাবি করিয়া নাগরিকগণ সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত বিচার করিয়া যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবে।

কিন্তু এ সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে, জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতির উপর সংবিধান যে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তাহার বলে তিনি নাগরিকগণের অধিকার রক্ষার জন্য কোন বিচারালয়ে আবেদন করিবার অধিকার স্থগিত রাখিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরি অবস্থা যতদিন বহাল থাকে, ততদিন পর্যন্ত সরকার নাগরিকগণকে সংবিধান-প্রদত্ত অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারে।

ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, এই অধিকারগুলির কোনটিই অবাধ বা শর্তশূন্য নহে। এই অধিকারগুলি সর্বদাই যুক্তিসম্মতভাবে সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে এবং এই যুক্তিসম্মত বাধার প্রকৃতি বিচারালয় কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র ভারতীয় নাগরিকগণই এই অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ, এই অধিকারগুলি সংকুচিত করা যাইতে পারে। এমন কি কিছু-কালের জন্য স্থগিত রাখা যাইতে পারে। আপৎকালে রাষ্ট্রপতি বিশেষ ঘোষণার দ্বারা জরুরী অবস্থা থাকা কালে এই অধিকারগুলি স্থগিত রাখিতে পারেন।

চতুর্থতঃ, এই মৌলিক অধিকারগুলি ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অবাধ ক্ষমতার বাধাস্বরূপ কাজ করে। মৌলিক অধিকার-বিরোধী কোন আইন বা শাসনবিভাগীয় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করিতে পারে।

সমালোচনা—Criticism

মৌলিক অধিকারগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত অধিকারগুলি এইরূপ সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা এরূপভাবে সংকুচিত করা হইয়াছে যে, জনসাধারণ এই অধিকারগুলি ভোগ করিবার সুযোগ খুব কমই পাইবে।

অধিকারগুলিকে যে-সমস্ত বিধি-নিষেধ দ্বারা সংকুচিত করা হইয়াছে, সেগুলি আলোচনা করিলে মনে হয় যে, কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। সেই জন্য অন্যান্য দেশের মৌলিক অধিকারগুলির অনুরূপ কতকগুলি অধিকার প্রদান করিয়া সেই অধিকারগুলি যাহাতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হয়, সেইজন্য এরূপ চরম প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতের সংবিধানে আরও

কতকগুলি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সেগুলিকে মৌলিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত না করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে কতকগুলি আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই আদর্শগুলি রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি নামে সংবিধানে স্থান পাইয়াছে।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি—Directive Principles of State Policy

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের অনুকরণে ভারতের শাসনতন্ত্রেও কতকগুলি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি সংযোজিত হইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভারতকে একটি জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল গণতান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এই গণতান্ত্রিক আদর্শ বলবৎ করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ শাসনতন্ত্রে কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং শাসকবর্গ যাহাতে উক্ত নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাহার জন্যও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রের লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল যে, কোন মৌলিক অধিকার সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে ক্ষুণ্ণ হইলে বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহার প্রতিবিধান সম্ভব, কিন্তু শাসনকর্তৃপক্ষের দ্বারা যদি নির্দেশাত্মক নীতিগুলি উপেক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহার প্রতিবিধানের কোন সুযোগ নাগরিকগণকে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা বা না-করা সম্পূর্ণরূপে শাসনকর্তৃপক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আইন প্রণয়ন দ্বারা সমর্থিত না হইলে কার্যকরী করা যায় না। তৃতীয়তঃ, কোন আইন যদি মৌলিক অধিকার বিরোধী হয় তাহা হইলে বিচারালয় কর্তৃক উক্ত আইন অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে, কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতি বিরোধী বলিয়া কোন আইন অসিদ্ধ হইতে পারে না। চতুর্থতঃ, কোন নির্দেশাত্মক নীতি বলবৎ করিবার জন্য সরকারকে বাধ্য করা যায় না, যথা, চৌদ্দ বৎসরের অনধিক বালক-বালিকাদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

এস্থলে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন নির্দেশাত্মক নীতি বলবৎ করিতে গিয়া যদি কোন মৌলিক অধিকারের সহিত সংঘর্ষ বাধে তাহা হইলে নির্দেশাত্মক নীতি কার্যক্ষেত্রে আর প্রযুক্ত হইতে পারিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে বর্ণিত নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া হইল।

মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন যাহাতে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এরূপ জনকল্যাণকর একটি সমাজব্যবস্থা গঠন করিবার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকিবে। সমস্ত নাগরিকের জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, জনসাধারণের স্বার্থে সম্পদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ, সমান কার্যের জন্য স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমান পারিশ্রমিক প্রদান, শ্রমিক শ্রেণীর নিরাপত্তা রক্ষা, শিশু ও যুবকদের শোষণ ও অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা, সকল নাগরিকেরই কর্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা, বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে, অসুস্থতায় ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে সাহায্য করা প্রভৃতি শাসন-কর্তৃপক্ষের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

চৌদ্দ বৎসরের অনধিক বালক-বালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা, অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতিসাধন, মাতৃমঙ্গল, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও এই উদ্দেশ্যে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার-বর্জন, কৃষির উন্নতি, পশুপালন, বিশেষতঃ উত্তম পশুপ্রজনন, গো-হত্যা-নিবারণ, গ্রাম-পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা-সংগঠন প্রভৃতি কার্য নির্দেশাত্মক নীতিগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আরও তিনটি বিষয় সম্পর্কে নির্দেশাত্মক নীতি শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রথমটি হইল পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন, স্থান ও বস্তুসমূহ রক্ষা করা রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্পর্কেও রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতি-সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, এবং পররাষ্ট্রের সহিত ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি প্রভৃতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া বিরোধসমূহের মীমাংসা করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকিবে।

সমালোচনা—Criticism

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইল জনসাধারণের নিকট সরকারের কতকগুলি নৈতিক

প্রতিশ্রুতি। কিন্তু যে প্রতিশ্রুতি পালন করিবার আইনসম্মত কোন বাধ্যবাধকতা নাই অর্থাৎ বিচারালয় কর্তৃক যখন এই নীতিগুলি বলবৎ করা যায় না, তখন এ প্রতিশ্রুতিগুলির কোন মূল্য থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এই নির্দেশ কে কাহাকে দিতেছে। ভারতে শাসনক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল—ভারতের জনগণ। সুতরাং জনগণ তাহাদের নিজেদের উদ্দেশ্যে এই নীতিগুলি প্রচার করিতে পারে না। সুতরাং অনেক সমালোচক বলেন, শাসনতন্ত্রে এই নীতিগুলির উল্লেখ নিরর্থক হইয়াছে।

নির্দেশাত্মক নীতি সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলির পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে মাত্র। এই আদর্শগুলি শাসনকার্যে ও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বলবৎ হইলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ যে অনেক পরিমাণে সুগম হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

ভারতীয় নাগরিক—Indian Citizen

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও সমগ্র ভারতে মাত্র একদফা নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের নাগরিক শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিচিত।

শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার সময়ে বিভিন্ন প্রকার অধিবাসীর উপর নাগরিক অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতীয় পার্লামেণ্ট নাগরিক অধিকার-সম্পর্কে যে-কোনরূপ পরিবর্তন আনয়ন করিতে ও নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। ভারত বিভাগের ফলে যে আশ্রয়প্রার্থীর সমাগম হইয়াছে, তাহাদের নাগরিক অধিকার দিবার জন্য নাগরিক অধিকার অত্যন্ত সহজলভ্য করা হইয়াছে।

ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে নিম্নলিখিত তিনটি সর্তের যে-কোন একটি পূরণ করিতে হইবে :—

১। যে-কোন ব্যক্তি ভারতের অধিবাসী হইলে এবং সে এখানে জন্মগ্রহণ করিলে অথবা তাহার পিতামাতা এখানে জন্মগ্রহণ করিলে, অথবা এই দেশে অন্ততঃ পাঁচ বৎসরাধিক কাল বসবাস করিলে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

২। (ক) যদি কোন ব্যক্তির মাতাপিতা বা পিতামহ-পিতামহী অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং এইরূপ ব্যক্তি যদি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাইয়ের পূর্বে পাকিস্তান হইতে দেশত্যাগ করিয়া ভারতে বসবাস করিতে থাকে,

(খ) এরূপ ব্যক্তি যদি উল্লিখিত তারিখের পরবর্তী কালে ভারতে আসিয়া নাগরিক অধিকার অর্জন করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা রেজেস্ট্রীভুক্ত হয় এবং রেজিস্ট্রেশন দরখাস্ত করিবার পূর্বে কমপক্ষে ছয়মাস ভারতে বসবাস করে তাহা হইলে সে ভারতীয় নাগরিক হইবে।

৩। যে সমস্ত ব্যক্তি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চের পর ভারত হইতে পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরবর্তী কালে ভারতের ছাড়পত্র লইয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিবার জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, তাহারাও উপরি-উক্ত ২ (খ) সূত্রানুযায়ী আবেদন করিয়া ভারতীয় নাগরিক অধিকার লাভ করিতে পারে।

ভারতে জন্ম অথবা ভারতীয় পিতামাতার সন্তান প্রবাসী হইলেও ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে। এরূপক্ষেত্রে প্রবাসীকে তত্রত্য ভারতীয় রাষ্ট্র-প্রতিনিধির নিকট আবেদন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ভারতীয় নাগরিকত্ব বর্জন করিয়া ভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছে, সে কখনও ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ভারতীয় নাগরিক অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার খুশীমত নাগরিকত্ব অস্বীকার করিতে পারিবে না।

১৯৫৫ সালে ভারতের পার্লামেন্ট সভা নাগরিকত্ব আইন (Citizenship Act, 1955) পাস করে। এই আইন অনুসারে পাঁচটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভারতের নাগরিক হওয়া যায়: যথা, ১। জন্ম (Birth), ২। বংশ (Descent), ৩। অর্জন (Naturalisation), ৪। রেজেস্ট্রিকরণ (Registration) ও ৫। রাষ্ট্র-ভুক্তি (Incorporation of territory)। এই আইনে আরও বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় নাগরিক কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলিতে এ বিষয়ে যে সুবিধা পাইবে, ভারতও ঐ সব দেশের নাগরিকগণকে অনুরূপ সুবিধা দিবে।

ভোটদান-ব্যবস্থা—Electoral System

নূতন শাসনতন্ত্রের প্রধান কৃতিত্ব হইল, প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিকগণের উপর ভোটদান-ক্ষমতা অর্পণ করা। আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্রের জন্য একটি সাধারণ ভোটদাতার তালিকা থাকিবে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিচারে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকই এই ভোটদাতার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার দাবী করিতে পারেন। ভোটদাতার তালিকাভুক্ত হইতে হইলে প্রত্যেক নাগরিকেরই নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা চাই: (১) ভোটদাতার ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। (২) ভোটদাতার

বয়স অন্ততঃ ২১ বৎসর হওয়া চাই। (৩) কোন নির্বাচন-এলাকায় অন্ততঃ ৬ মাসকাল তাহাকে বসবাস করিতে হইবে। (৪) কোন উপযুক্ত বিচারালয় কর্তৃক সে যেন বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া ঘোষিত না হয়। (৫) নির্বাচন-সংক্রান্ত ব্যাপারে অসাধু বা বে-আইনী কার্যকলাপের সহিত যেন সংশ্লিষ্ট না থাকে।

বৃটিশ শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত ভারতে শতকরা মাত্র ১৪ জন অধিবাসী ভোটদান-ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিল। নূতন সংবিধান অনুসারে সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এই ভোটদান-ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে।

প্রত্যেক আদমসুমারী সমাপ্ত হইলে বিভিন্ন আঞ্চলিক নির্বাচন-এলাকা হইতে কতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন তাহা পুনর্নির্ধারিত হয়। সংবিধানের ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত আইনানুসারে লোকসভার সদস্য-নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক ৫ লক্ষ লোকের জন্য একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজ্যগুলির ব্যবস্থাপক সভার জন্য প্রত্যেক ৭৫ হাজার লোকের জন্য একজন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। ভারতে একাধিক ভোট-দান (Plural voting) পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

ভারতের সমগ্র ভোটদান-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে একটি ইলেকৃশন কমিশন গঠিত হইয়াছে। এই কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। পার্লামেন্টও এ সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ইলেকৃশন কমিশন একটি ইলেকৃশন ট্রাইবুনাল গঠন করিতে পারে। নির্বাচন-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইলেকৃশন কমিশনের নির্দেশ চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—The Federation of India

ভারতের নূতন সংবিধান ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠিত করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল: (১) একসঙ্গে একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কতকগুলি রাজ্য সরকারের পাশাপাশি অবস্থিতি, (২) ক্ষমতার বিভাগ ও বণ্টন, (৩) লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, (৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও (৫) রাজস্বের বণ্টন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেও উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। আদি শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 'ক', 'খ', ও 'গ', এই তিন শ্রেণীর রাজ্য এবং 'ঘ' শ্রেণীর অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছিল। তাহার পর ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার যে রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাস করেন, সেই আইন অনুসারে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মাত্র দুই শ্রেণীর অঞ্চল লইয়া গঠিত

হইয়াছে। ভাষার ভিত্তিতে বোম্বাই রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে রাজ্যসংখ্যা বর্তমানে ১৪টির স্থলে ১৫টি হইয়াছে—

(ক) ১৫টি রাজ্য ও

(খ) ১০টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল।

১৯৫৭ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে একটি নূতন কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল সৃষ্টি হইয়াছে। এই অঞ্চলটি হইল নাগা পার্বত্য তুয়েনসাঙ্ অঞ্চল। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে আসামের রাজ্যপাল এই অঞ্চলটি শাসন করেন।

(ক) **রাজ্য—States**				(খ) **কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল—Union territories**			
১।	অন্ধ্রপ্রদেশ	২।	আসাম	১।	দিল্লী	২।	হিমাচল প্রদেশ
৩।	বিহার	৪।	গুজরাট	৩।	মণিপুর	৪।	ত্রিপুরা
৫।	মহারাষ্ট্র	৬।	কেরল	৫।	আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ	৬।	লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভ দ্বীপপুঞ্জ
৭।	মধ্যপ্রদেশ	৮।	মাদ্রাজ				
৯।	মহীশূর	১০।	উড়িষ্যা				
১১।	পাঞ্জাব	১২।	রাজস্থান	৭।	নাগা পার্বত্য তুয়েনসাঙ	৮।	উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল (নেফা)
১৩।	উত্তরপ্রদেশ	১৪।	পশ্চিমবঙ্গ				
১৫।	জম্মু ও কাশ্মীর			৯।	দাদ্রা ও নগর হেভেলি	১০।	গোয়া, দমন, দিউ

১৯৬৩ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে নাগা পার্বত্য তুয়েন সাঙ্ অঞ্চল ভারতের ষোড়শ রাজ্যে উন্নীত হইয়াছে।

রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ আসাম ও উড়িষ্যা ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যগুলির আয়তন, জনসংখ্যা ও সম্পদের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে পূর্বতন বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ ও পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হইয়াছে এবং আয়তনে পূর্বতন বোম্বাই বৃহত্তম রাজ্য ও জনসংখ্যায় উত্তরপ্রদেশ বৃহত্তম রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

পুনর্গঠনের ফলে এক জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত ১৪টি রাজ্যে একই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যেই একজন নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপাল, দায়িত্বশীল মন্ত্রিমণ্ডলী, একটি আইনসভা ও একটি উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হইবে এবং এই অঞ্চলগুলির জন্য একমাত্র পার্লামেণ্ট সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

অন্য নানা বিষয়ে বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপ হইলেও ভারতের শাসন-ব্যবস্থা মূলতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্র এই উভয়ের গঠন-পদ্ধতির সমন্বয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ক্যানাডার মতই বৃটিশ ভারতের এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতি দ্বারা কতকগুলি স্বায়ত্তশাসনশীল রাজ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। আবার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দেশীয় রাজ্যকে কেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতির সাহায্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে।

ভারতের শাসনতন্ত্র লিখিত ও সাধারণভাবে এই শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় বলা যাইতে পারে। এই শাসনতন্ত্র শাসনক্ষমতাগুলিকে ভাগ করিয়া দিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য ও শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটি সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত আছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণ রাজস্বও ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র হইলেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, জরুরি অবস্থায় এই যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করা যায় এবং এই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ রাষ্ট্রপতির হস্তে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতি এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রাজ্য সরকারগুলি বাতিল করিয়া শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন।

ক্ষমতা-বণ্টন—The Distribution of Powers

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভাগ করিয়া দেওয়া হয় ও প্রত্যেকটি সরকার স্বাধীনভাবে এই ক্ষমতাগুলি পরিচালনা করে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থাকে। যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা ক্যানাডার সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বেশী সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় যুক্তরাষ্ট্রেই শাসনক্ষমতাগুলিকে দুই ভাগে ভাগ না করিয়া তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং উভয় যুক্তরাষ্ট্রেই অনুল্লিখিত ক্ষমতা (Residuary Powers) কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে। ভারতে শাসনক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ; যথা, ১। যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা

(সর্বভারতীয়) (Federal or All-India List), ২। রাজ্য তালিকা (State List) ও ৩। যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)।

যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা—ভারতে ৯৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই তালিকাগুলির প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল—দেশরক্ষা, অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারুদ নির্মাণ, কূটনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক, রেলপথ ও বন্দর-পরিচালনা, ডাক, তার ও টেলিফোন, মুদ্রাব্যবস্থা, নাগরিকত্ব, আদমসুমারী, শিল্পনিয়ন্ত্রণ, ওজন স্থির করা, তামাক, আফিং, গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর করস্থাপন, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের গঠনতন্ত্র ও এলাকা বিস্তার, জাতীয় পাঠাগার, ভারতীয় যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ, উচ্চশিক্ষার মাননির্ণয়, আন্তঃসরকার ব্যবসায়-বাণিজ্য ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারগুলির হিসাব-পরীক্ষা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকায় অনুল্লিখিত ক্ষমতাগুলি ইত্যাদি।

রাজ্য তালিকা—৬৬টি বিষয় লইয়া রাজ্য তালিকা গঠিত হইয়াছে। প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল—শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সাধারণ ও রেল পুলিশ, জেলখানা, নিম্ন-আদালতগুলির গঠন ও পরিচালনা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, ভূমিব্যবস্থা, বনসম্পদ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্প, ভূমিরাজস্ব, কৃষির উপর আয়কর ইত্যাদি।

যুগ্ম তালিকা—৪৭টি বিষয় যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। যুগ্ম তালিকার অর্থ হইল যে, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে, কিন্তু এই উভয় সরকার-প্রণীত আইনের মধ্যে যদি বিরোধ ঘটে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন বলবৎ হইবে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল—ফৌজদারী আইন, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, দেউলিয়া, সম্পত্তি হস্তান্তর, খাদ্য ভেজাল, শ্রমিক-কল্যাণ, জন্মমৃত্যুর হিসাব, সংবাদপত্র, পুস্তক ও ছাপাখানা, বাস্তুত্যাগীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও বিলিব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও সমাজ পরিকল্পনা, মূল্যনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য—Chief features of the Indian Constitution

১। ভারতের নূতন সংবিধান ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের (Federal) ভিত্তিতে

গঠিত করিয়াছে। সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

২। এই শাসনতন্ত্র বিস্তৃতভাবে লিখিত (Written)। শাসনকার্য পরিচালনা করিবার প্রধান নীতি ও নিয়মগুলি ব্যতীত অন্যান্য বহু বিষয় এই শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় (Rigid) বলা যায়, কিন্তু ইহা মার্কিণ শাসনতন্ত্রের ন্যায় চূড়ান্তভাবে অনমনীয় নহে।

৪। এই শাসনতন্ত্র ভারতে মন্ত্রিসংসদ-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা (Cabinet Government) প্রবর্তন করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী একজন শাসক-প্রধান থাকিলেও কার্যতঃ এই শাসনক্ষমতা একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা কর্তৃক পরিচালিত হয়।

৫। ভারতে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (Supremacy of the Constitution) দেখা যায়। শাসনতন্ত্রই হইল সরকারের সমস্ত ক্ষমতার উৎস।

৬। নূতন শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভারতীয়গণের এক-নাগরিকত্ব (One-citizenship) স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকত্ব ব্যতীত ভারতীয়গণের অন্য কোন প্রাদেশিক নাগরিকত্ব নাই।

৭। সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকগণের কতকগুলি মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) স্বীকৃত হইয়াছে এবং বিচারালয়ের সাহায্যে এই অধিকারগুলি রক্ষা করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। ইহা ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি (Directive Principles of State Policy) স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই নীতিগুলি আদালতের সাহায্যে বলবৎ করা যায় না।

৮। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) রূপে গঠিত হইয়াছে। জাতি-ধর্ম-নিরপেক্ষ এই রাষ্ট্রের সকল নাগরিকই সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী।

৯। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-রূপে গঠিত হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল ভারতীয় জনগণ।

১০। নূতন শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে—যথা, সর্বভারতের জন্য

একদফা নাগরিকত্ব, সকলের জন্য সমানাধিকার, একটি মাত্র সুপ্রিমকোর্ট, সর্বভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার—Union Government

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রি-সংসদ, পার্লামেন্ট সভা ও সুপ্রিম কোর্ট লইয়া গঠিত।

রাষ্ট্রপতি—The President

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা একজন রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত আছে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথবা তাঁহার অধস্তন কর্মচারীর সাহায্যে শাসনক্ষমতা পরিচালিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন—Election of the President

রাষ্ট্রপতি-পদে নিয়োগের জন্য পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতির ব্যবস্থা হইয়াছে।

(ক) ভারতীয় পার্লামেন্ট সভায় উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ ও (খ) রাজ্যসমূহের নিম্নপরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাহাতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে এই জটিল নির্বাচন-পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসনক্ষমতার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেও কার্যতঃ তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে। রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদসহ প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং জনগণ কর্তৃক রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই।

রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং তিনি পুনর্নির্বাচিত হইতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য শাসনতন্ত্র কর্তৃক নিম্ন-লিখিত যোগ্যতাগুলি স্বীকৃত হইয়াছে: (১) রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। (২) তাঁহার বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসরাধিক হইবে। (৩) পার্লামেন্টের নিম্নপরিষদের সদস্য হওয়ার তাঁহার যোগ্যতা থাকিবে। (৪) এরূপ ব্যক্তি কোনও লাভজনক কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না। (৫) তিনি পার্লামেন্ট সভা অথবা রাজ্য আইনসভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে তিনি মাসিক দশ হাজার টাকা বেতন ও বিনা ভাড়ায় আবাসগৃহ

এবং পার্লামেণ্ট দ্বারা নির্ধারিত অন্য রাহা খরচা ইত্যাদি পাইবেন। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের জন্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের যে-কোনও কক্ষ অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং অভিযোগের প্রস্তাব যদি সেই কক্ষের ⅔ সংখ্যক সদস্যের দ্বারা গৃহীত ও অন্য কক্ষের ⅔ সংখ্যক সদস্যের দ্বারা যথাযথভাবে পরীক্ষার পর গৃহীত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা চলিবে। রাষ্ট্রপতি নিজে উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদনপত্র দ্বারা পদত্যাগ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদাবৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে সাধারণ বিচারালয়ের বিচারাধীন করা হয় নাই।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা—Powers of the President

শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর আরোপিত ক্ষমতাসমূহকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—

(১) শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা—Executive Powers

রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় অধিকর্তা এবং তাঁহার নামেই সমগ্র শাসনক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাজ্যের গভর্ণরদের মনোনয়ন করা ব্যতীতও সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিদ্যালয়ের বিচারপতিগণ, ভারতের অডিটর-জেনারেল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের নিয়োগ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত জরুরী অবস্থায় এবং শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার সময় হইতে সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত পর্যন্ত অন্তবর্তী কালে বহুবিধ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি হইলেন সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর অধিকর্তা। তিনি যুদ্ধঘোষণা ও শান্তিস্থাপন করিতে পারেন।

(২) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা—Legislative Powers

রাষ্ট্রপতি আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার উভয় পরিষদ লইয়া ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভা গঠিত। রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদ অথবা একটি পরিষদকে অধিবেশনের জন্য আহ্বান করিতে পারেন, উভয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন এবং লোকসভা অর্থাৎ নিম্নপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তিনি রাজ্যসভার ১২ জন সদস্য মনোনীত করেন। প্রত্যেক অধিবেশন আরম্ভের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে পারিবেন এবং

অধিবেশনে উহা আহ্বান করিবার কারণ ব্যাখ্যা করিবেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে অথবা অন্য ব্যাপারে উভয় পরিষদের নিকট বাণী (Message) প্রেরণ করিতে পারেন।

উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত আইনের প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। অনুমোদিত আইনের প্রস্তাবে তিনি সম্মতি প্রদান করিতে পারেন অথবা সম্মতি প্রদানে বিরত থাকিতে পারেন। যে প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় না, তাহা সংশোধিত আকারে অথবা বিনা সংশোধনে যদি উভয় পরিষদ কর্তৃক পুনরায় গৃহীত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাব দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে তাঁহাকে উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতেই হইবে। পার্লামেন্টের অবকাশকালে রাষ্ট্রপতি জরুরী আইন (Ordinance) প্রণয়ন করিতে পারেন এবং এই আইনগুলি পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের মত কার্যকরী হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-প্রবর্তিত জরুরী আইনগুলি পার্লামেন্ট সভার পরবর্তী অধিবেশনে উত্থাপন করিতে হইবে এবং পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইলে পার্লামেন্টের অধিবেশনের প্রারম্ভ হইতে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যদি পার্লামেন্ট এই জরুরী আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহা হইলে জরুরী আইন আর কার্যকরী থাকিবে না।

(৩) অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা—Financial powers

প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের নিকট যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সরকারের সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয়ের এক হিসাব উত্থাপন করাইবেন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত অর্থমঞ্জুরীর কোন দাবী উত্থাপিত হইতে পারে না। নিম্নপরিষদে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে গেলেও তাঁহার অনুমোদন প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত পার্লামেন্ট সভায় আয় এবং ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কিত কোন প্রস্তাবই গৃহীত হইতে পারে না। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আদায়ীকৃত আয়কর বণ্টন করিয়া দেওয়া এবং পাটশুল্কের পরিবর্তে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য প্রদান করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

(৪) বিচারবিষয়ক ক্ষমতা—Judicial powers

সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করা ব্যতীতও

রাষ্ট্রপতির স্বল্প বিচারবিষয়ক ক্ষমতা আছে। দণ্ডিত ব্যক্তিকে দণ্ডপ্রাপ্তির সময়ে অথবা দণ্ডভোগকালে তিনি মার্জনা করিতে পারেন। শাস্তিভোগকালে কোন ব্যক্তিকে তিনি সাময়িকভাবে মুক্তির আদেশ দিতে পারেন। গুরুতর শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি লঘুতর করিবার ক্ষমতাও তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে।

(৫) জরুরী ক্ষমতা—Emergency powers

শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর কতকগুলি জরুরী ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। এই ক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) জরুরী অবস্থার ঘোষণা—Proclamation of Emergency

শাসনতন্ত্রের ৩৫২ নং সূত্রে বলা হইয়াছে যে, কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, দেশের নিরাপত্তা যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলতার জন্য বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। উপরি-উক্ত কারণগুলি কার্যতঃ উপস্থিত না হইলেও যদি প্রত্যাসন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতি মনে করেন, তাহা হইলেও তিনি জরুরী অবস্থার ঘোষণা কবিতে পাবেন। এইরূপ ঘোষণা পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত না হইলে দুই মাসের অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। উভয় পরিষদ কর্তৃক সমর্থিত হইলে এইরূপ জরুরী ঘোষণা দুই মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিতে পারে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণাব ফলে শাসন-ব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়। এই ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়। এই সময়ে পার্লামেণ্ট সভা রাজ্য তালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। লোকসভার কার্যকাল একসময়ে একবৎসর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব-বণ্টনের যে ব্যবস্থা আছে, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি তাহা পরিবর্তন করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত এ অবস্থায় বাক্-স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারগুলি হইতে নাগরিকগণকে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত হইয়াছে। অধিকন্তু এরূপ অবস্থায রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে মৌলিক অধিকারগুলিকে বিচারালয়ের সাহায্যে বলবৎ করিবার নাগরিক অধিকার স্থগিত থাকিতে পারে।

(খ) রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা-সংক্রান্ত ঘোষণা—Emergency arising out of failure of the Constitutional Machinery in the State

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন সময়ে কোন রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া অথবা অন্য প্রকারে রাষ্ট্রপতি বুঝিতে পারেন যে, সেই রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি তদ্রূপ ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতি উক্ত রাজ্যের সমুদয় শাসন-ক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সেই রাজ্যের আইন পরিষদের ক্ষমতা পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইবে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের ক্ষমতা কোন-মতে ক্ষুণ্ণ হইবে না। এইরূপ ঘোষণা সাধারণতঃ দুই মাসের জন্য বলবৎ থাকিবে এবং পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে আরও ছয়মাস কাল বলবৎ থাকিতে পারে। কিন্তু পার্লামেণ্টের অনুমোদনে ছয়মাস করিয়া ঘোষণাটির মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া তিন বৎসরেব অধিক কাল পর্যন্ত ইহাকে বলবৎ রাখা চলিবে না।

(গ) অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা—Proclamation of Financial Emergency

যদি কোন সময় রাষ্ট্রপতির ধারণা হয় যে, ভারত অথবা ভারতের কোন অংশে আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম নষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। উপরি-উক্ত দুইটি ঘোষণার অনুরূপভাবেই এই ঘোষণাটিকেও পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে উপস্থিত করিতে হইবে এবং এই ঘোষণার স্থায়িত্ব প্রথমোক্ত ঘোষণার নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হইবে। এই ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে রাজ্য সরকারের আয় ও ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাবসমূহ রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ও রাজ্য সরকারগুলির সকল শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন হ্রাস করা যাইবে।

উপ-রাষ্ট্রপতি—The Vice-President

শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী ভারত-রাষ্ট্রের একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্ট সভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটপদ্ধতিতে গোপন ভোটে নির্বাচিত হইবেন। তাঁহার কার্যকালের স্থায়িত্ব পাঁচবৎসর কাল। উপ-রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীর প্রায় রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীর যোগ্যতা থাকা চাই।

রাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটিলে অথবা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে কিংবা অপসারিত হইলে, নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির সাময়িক অবসর গ্রহণকালে অথবা অসুস্থতা-নিবন্ধন অথবা অন্য কারণে অনুপস্থিতিকালে উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কার্য করিবেন। তিনি সাধারণতঃ রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন।

মন্ত্রি-পরিষদ—Council of Ministers

ভারতে রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে, শাসনতন্ত্র অনুসারে সে সমুদয় ক্ষমতাই প্রধানমন্ত্রিসহ মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্য-পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ যে পরামর্শ বা উপদেশ দান করিবেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কোন বিচারালয়ের নিকট দায়ী করা চলিবে না। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করিবেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে পার্লামেণ্ট সভার যে-কোন পরিষদের সদস্য হইতেই হইবে। মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইবার কালে যদি কোন মন্ত্রী পার্লামেণ্টের সদস্য না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ছয়মাস কালের মধ্যে সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে; নতুবা তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রিগণের বেতন ও ভাতা পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত হয়। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী।

শাসনকার্যে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করা ও পরামর্শ দান করা হইল মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কার্য। শাসন-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা এবং বিভিন্ন দপ্তরগুলির কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থাকে চালু রাখার দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের হস্তে ন্যস্ত। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কতকগুলি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বৈদেশিক ব্যাপার ও অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যাপার-সংক্রান্ত দপ্তরের অধিকর্তা হইলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এইরূপে প্রত্যেকটি দপ্তরের জন্য এক একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী ব্যতীত ভারতে

আরও দুই শ্রেণীর মন্ত্রী আছেন, যথা, **রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী**। রাষ্ট্রমন্ত্রিগণের উপর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বসম্পন্ন দপ্তরের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু উপ-মন্ত্রিগণ কোন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সহকারী হিসাবেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বর্তমান ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ১৮ জন কেবিনেট-মন্ত্রী, ১২ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ২২ জন উপ-মন্ত্রী আছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণ কেবিনেট সদস্য নহেন।

মন্ত্রিগণ শুধু নির্দিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মাত্র নহেন তাঁহারা আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রস্তাবগুলি পার্লামেন্ট সভায় উপস্থাপিত করিয়া সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে সেগুলিকে আইনে পরিণত করেন। অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারেও মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য দেখা যায়।

প্রধানমন্ত্রী—Prime Minister

ভারতের শাসনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শদান করিবার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। সুতরাং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদ শাসনতান্ত্রিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। পার্লামেন্ট সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

নূতন শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী কার্যতঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইলেন শাসক-প্রধান। তিনি মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও পরিচালক। অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধান-মন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি শুধু মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি নহেন, মন্ত্রিপরিষদকে পরিচালিত করা তাঁহার অন্যতম দায়িত্ব। সহকর্মিগণকে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির প্রভাবে নিজের মতে আনয়ন করিতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী তাঁহার মত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারেন। তিনি মন্ত্রিগণের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়া থাকেন এবং বিভিন্ন দপ্তরগুলির কার্যের তদারক করা ছাড়াও তিনি নিজে একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের (পররাষ্ট্র) ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী আইনসভার নেতা। নেতা হিসাবে তাঁহাকে দলীয় ঐক্য ও মর্যাদা রক্ষা করিতে হয়। এজন্য তাঁহাকে জন-সাধারণের সংস্পর্শে আসিয়া জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্ব,

দলীয় নেতৃত্ব প্রভৃতি তাঁহার জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে। পার্লামেন্ট সভায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নীতি সমর্থন করেন এবং বিরোধী দলগুলির সমালোচনার উত্তর প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের সংবিধান রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, কার্যতঃ সে সমুদয় ক্ষমতাই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সুতরাং কি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিচালনা, কি রাজ্যশাসন-পরিচালনা, সর্বক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য সূচিত হয়। এক কথায় বলা চলে যে, শিশুরাষ্ট্র ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রধানমন্ত্রীর বিচারবুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

মন্ত্রিপরিষদের সহিত রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক—Relation of the Council of Ministers to the President

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু ভারতের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা মন্ত্রিপরিষদ সহ প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রিবর্গকে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শমত রাষ্ট্রপতিই নিয়োগ করিবেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি তাঁহার খুসীমত কাহাকেও নিয়োগ করিতে পারেন না। কারণ, পার্লামেন্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের যিনি নেতা তিনি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারে না।

সংবিধান অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতিকে একটি মন্ত্রিসভা রাখিতে হইবেই এবং মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রপতির খুসীমত কার্যে বহাল থাকেন। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, মন্ত্রী পরিষদ তাঁহাদের কার্যের জন্য যৌথভাবে লোক-সভার নিকট দায়ী থাকিবেন। সুতরাং সংবিধানের এই ধারা হইতে সহজে অনুমান করা যায় যে, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষেত্রে একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন করাই হইল সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে মন্ত্রী-পরিষদকে প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ বলা যায়, আর রাষ্ট্রপতি হইলেন ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান। সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্টরূপে উল্লিখিত না হইলেও শাসন পরিচালনার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতিকে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ

দল কর্তৃক নির্বাচিত ও সমর্থিত, নেতৃবর্গ দ্বারা গঠিত মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ অনুসারে চলিতে হয়।

মন্ত্রিপরিষদের সহিত প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্ক—Relation of the Prime Minister to the Council of Ministers.

আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রধান মন্ত্রীর সুপারিশ ক্রমেই অন্যান্য মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রী নিযুক্ত হন। সুতরাং কার্যতঃ প্রধান মন্ত্রীই অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করেন ও দপ্তর বণ্টন করেন। প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদেরও নেতা এবং তাঁহার নেতৃত্বেই দলের ঐক্য ও সংহতি রক্ষিত হয়। মন্ত্রীপরিষদের সভাপতি হিসাবে তিনি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন মন্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে তিনিই মধ্যস্থতা করেন। কোন মন্ত্রী যদি প্রধান মন্ত্রীর সহিত একমত না হন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে পদত্যাগ করা ছাড়া উপায় নাই। প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করিলে সমগ্র মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। সুতরাং অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধান মন্ত্রীর উপর শুধু নির্ভরশীল নহেন, তাঁহারা প্রধান মন্ত্রীর নিকট দায়ীও বটে। অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধান মন্ত্রীর সহকর্মী হইলেও প্রধান মন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা—Union Legislature

পার্লামেণ্ট—Parliament

রাষ্ট্রপতি ও দুইটি আইনপরিষদ লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেণ্ট গঠিত। উচ্চপরিষদকে রাজ্যসভা ও নিম্নপরিষদকে লোকসভা বলা হয়।

রাজ্যসভা—Council of States

রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। তন্মধ্যে ১২ জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজসেবক বা বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত করেন। রাজ্যসভার সদস্যগণ প্রত্যেক রাজ্যের নিম্নকক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব-পদ্ধতিতে পরোক্ষে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ও ১৯৫১ সালের আদম সুমারী অনুসারে লোকবৃদ্ধির ফলে রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা ২০৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৬ হইয়াছে। রাজ্যসভার এই ২৩৬ জন নির্বাচিত সদস্য নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে।

রাজ্য		রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা	কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল		রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা
১। অন্ধ্র প্রদেশ	...	১৮	১। দিল্লী	...	৩
২। আসাম	...	১৭	২। হিমাচল প্রদেশ	...	২
৩। বিহার	...	২২	৩। মণিপুর	...	১
৪। গুজরাত	...	১১	৪। ত্রিপুরা	...	১
৫। মহারাষ্ট্র	...	১৯	৫। আন্দামান	...	—
৬। কেরল	...	৯	৬। লাক্ষাদ্বীপ	...	—
৭। মধ্যপ্রদেশ	...	১৬			২৩৪
৮। মাদ্রাজ	...	১৮	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত		১২
৯। মহীশূর	...	১২	মোট সদস্য		২৪৬
১০। উড়িষ্যা	...	১০			
১১। পাঞ্জাব	...	১১			
১২। রাজস্থান	...	১০			
১৩। উত্তরপ্রদেশ	...	৩৪			
১৪। পশ্চিমবঙ্গ	...	১৬			
১৫। জম্মু ও কাশ্মীর	...	৪			

রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হইতে হইলে প্রার্থীকে অন্ততঃ ৩০ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হয়। রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ। রাষ্ট্রপতি ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না। প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এই সভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ভারতে উচ্চপরিষদের সদস্যগণ জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উচ্চপরিষদে ১২ জন সদস্য মনোনীত করিবার ব্যবস্থা আছে। উপ-রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন।

লোকসভা—House of the People

অনধিক ৫০০ সংখ্যক সদস্য লইয়া নিম্নপরিষদ গঠিত হয়। রাজ্যগুলির ভোট-দাতৃগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচন করেন। প্রত্যেক ৫ লক্ষে অনূ্যন একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ডে প্রত্যেক সত্তর হাজার লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের

ব্যবস্থা আছে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি তিন লক্ষ আঠার হাজার লোকের জন্ম একজন প্রতিনিধির ব্যবস্থা আছে।

লোকসভার প্রতিনিধির যোগ্যতা হইল যে, তাঁহাকে অন্ততঃপক্ষে, ২৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বর্তমান লোকসভার সদস্যসংখ্যা হইল ৫০৯। ইহার মধ্যে পার্লামেণ্ট সভা-নির্ধারিত পদ্ধতিতে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল হইতে অনধিক ২৩ জন সদস্য নিযুক্ত হইবে।

রাজ্য নির্বাচিত		লোকসভার সদস্য সংখ্যা	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্যসংখ্যা	
১।	অন্ধ্রপ্রদেশ ...	৪৩	১। জম্মু ও কাশ্মীর	... ৬
২।	আসাম ...	১২	২। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	... ১
৩।	বিহার ...	৫৩		
৪।	গুজরাত ...	২২	৩। লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ	... ১
৫।	মহারাষ্ট্র ...	৪৪	৪। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল	... ১
৬।	কেরল ...	১৮	৫। নাগা-তুয়েনসাং অঞ্চল	... ১
৭।	মধ্যপ্রদেশ ...	৩৬	৬। ইঙ্গ-ভারতীয়	... ২
৮।	মাদ্রাজ ...	৪১	৭। দাদ্রা ও নগর হেভেলি	... ১
৯।	মহীশূর ...	২৬	৮। গোয়া, দমন, দিউ	... ২
১০।	উড়িষ্যা ...	২০		১৫
১১।	পাঞ্জাব ...	২২		
১২।	রাজস্থান ...	২২		
১৩।	উত্তরপ্রদেশ ...	৮৬		
১৪।	পশ্চিমবঙ্গ ...	৩৬		
	কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল			
১।	দিল্লী	৫		
২।	হিমাচল প্রদেশ ...	৪	৪৯৪ (নির্বাচিত) + ১৫ (মনোনীত)	
৩।	মণিপুর ...	২	মোট ৫০৯	
৪।	ত্রিপুরা ...	২		
	মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা	৪৯২		

লোকসভার আসনসংখ্যা উপরিলিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন

করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬২ সালে সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে ভারতে তৃতীয় বার যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি লোকসভায় নিম্নলিখিত সংখ্যক আসন লাভ করিয়াছে।

কংগ্রেস দল	...	৩৫৭
সাম্যবাদী „	...	৩৩
পি. এস. পি. „	...	১২
সোসালিষ্ট „	...	৬
জনসংঘ „	...	১৩
স্বতন্ত্র „	...	২৬
ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দুমহাসভা, তপশীলভুক্ত প্রভৃতি অন্যান্য দল	...	৩৩
নির্দলীয় (Independent)		১৫
মোট নির্বাচিত সদস্য	...	৪৯৫

তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও তপশীলভুক্ত উপজাতিদের জন্য এবং য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। নিম্নপরিষদ সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইবে, তবে জরুরী অবস্থায় এই স্থিতিকাল পার্লামেণ্ট এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের পূর্বে এই সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। লোকসভা কার্যপরিচালনার জন্য একজন সভাপতি নির্বাচন করে। ইনি **স্পীকার** নামে পরিচিত। নির্বাচনের পর তাঁহাকে দলনিরপেক্ষ থাকিয়া সকল রাজনৈতিক দলকে আইনসভায় সমান অধিকার দিতে হয়। তিনি পার্লামেণ্ট সভার বিতর্ক পরিচালনা করেন এবং সভার নিয়ম-কানুন বলবৎ করেন। কোন বিষয়ে বৈধতার প্রশ্ন উঠিলে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। বৃটিশ পার্লামেণ্টে সভার স্পীকারের মতই কোন প্রস্তাব অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব কিনা এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিলে ভারতের স্পীকারও তাহার চুড়ান্ত মীমাংসা করিতে পারেন।

পার্লামেণ্টের সদস্যগণের অধিকারসমূহ—Privileges of Members of Parliament

অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভারতের পার্লামেণ্ট সভার

সদস্যগণ যাহাতে যথাযথভাবে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমতঃ, তাঁহারা বাক্‌স্বাধীনতার অধিকারী। আইনসভায় বা সভার কোন কমিটিতে কোনপ্রকার মন্তব্য বা ভোটদানের জন্য তাঁহাদের কোন আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, পার্লামেণ্ট সভা আইন প্রণয়ন করিয়া যতদিন পর্যন্ত অধিকারসমূহ বিধিবদ্ধ না করিবে ততদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডের কমন্স সভার সদস্যগণ যে সমস্ত অধিকার ভোগ করেন ভারতের পার্লামেণ্টের সদস্যগণও সেই সমুদয় অধিকার ভোগ করিবেন।

পার্লামেণ্ট সভার কার্য ও ক্ষমতা—Powers and Functions of Parliament

ভারতের পার্লামেণ্ট সভা যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত এবং যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যতীত অন্য প্রস্তাবগুলি যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। কোন প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদের সম্মতি অপরিহার্য। যদি কোন পরিষদ সম্মতিপ্রদানে বিরত থাকে এবং ছয় মাসের পরও যদি মতামত জ্ঞাপন না করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং যুক্ত অধিবেশনে অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইলে ইহা আইনে পরিণত হইবে। উভয় পরিষদ কর্তৃক কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে ঐ গৃহীত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থাপিত হইবে। রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিলে প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি যদি প্রস্তাবটিতে তাঁহার সম্মতি প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সুপারিশসহ উক্ত প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেণ্ট সভায় প্রেরণ করিতে হয়। পার্লামেণ্ট সভা পুনর্বিবেচনা করিয়া প্রস্তাবটিকে যদি পুনরায় রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করে, তাহা হইলে এই দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি আর তাঁহার সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারেন না।

অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ভিন্ন পদ্ধতিতে অনুমোদিত হয়। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উচ্চপরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে না। নিম্নপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে এই প্রস্তাবগুলি উচ্চপরিষদে প্রেরিত হয় এবং উচ্চপরিষদ যদি ১৪ দিনের মধ্যে তাহার মতামত জ্ঞাপন না করে, তাহা হইলে প্রস্তাবটি উচ্চপরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে আইনে পরিণত হইবে। এ বিষয়ে ভারতের সংবিধান বৃটেনের লর্ড

সভার অনুরূপভাবেই অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির উপর রাজ্যসভার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন প্রস্তাব অর্থ-সংক্রান্ত কি না, সে সম্পর্কে স্পীকারই চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থার ঘোষণা পার্লামেণ্ট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে অথবা রাজ্যসভা কর্তৃক অথবা এক বা একাধিক রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পার্লামেণ্ট সভা রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

ইহা ছাড়া, পার্লামেণ্ট সভার নির্বাচিত সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের জন্য পার্লামেণ্টের যে-কোন কক্ষ রাষ্ট্রপতিব বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং উভয় কক্ষের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব পাস করিয়া রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিতে পারে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। লোকসভা মন্ত্রিদের বেতন মঞ্জুর করে এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব প্রত্যাখ্যান দ্বারা অথবা মন্ত্রিসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইন না-মঞ্জুর করিয়া বা মন্ত্রিসভা-অনুসৃত নীতি প্রত্যাখ্যান করিয়া বা সরাসরি মন্ত্রিসভার উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইতে পাবে।

শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবাব ক্ষমতা পার্লামেণ্ট সভার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে সংশোধন সাধাবণ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হইতে পারে, অন্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

পার্লামেণ্ট সভার প্রত্যেক কক্ষ ⅔ সংখ্যক সদস্যের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব আনয়ন করিয়া সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চবিচারালয়ের বিচারপতিগণকে অবধারিত অসদাচবণ বা অযোগ্যতার জন্য অপসারণের ব্যবস্থা করিতে পারে।

রাজ্যসভা বিশেষ সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা রাজ্য তালিকা-ভুক্ত যে-কোন বিষয়ের উপর জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষের উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে পার্লামেণ্ট সভার উপর আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারে।

পার্লামেণ্ট হইল ভারতের জাতীয় মহাসভা। এই সভায় সমগ্র দেশের স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলির বিশদ আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পার্লামেণ্ট ইহার এই প্রায়-অবাধ ক্ষমতা পরিচালনা দ্বারা একদিকে যেমন ভারতের জনমত সজাগ

রাখে, অপর দিকে তদ্রূপ শাসন-কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রিত করে। পার্লামেন্টের এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অবর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। পার্লামেণ্ট সভার আলাপ-আলোচনা ও কার্যপদ্ধতি রাজ্য আইনসভাগুলিকেও অনুপ্রেরণা দান করিয়া থাকে।

রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে সম্পর্ক—Relation between the two Houses of Parliament

ভারতের পার্লামেণ্ট সভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত। নিম্নপরিষদ অর্থাৎ লোকসভা লোকসংখ্যার ভিত্তিতে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে। উচ্চপরিষদ লোকসংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত হইলেও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করে।

ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে উভয় পরিষদই প্রায় সমান ক্ষমতার অধিকারী। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যতীত অন্য যে-কোন আইনের প্রস্তাব যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে এবং উভয় পরিষদের সম্মতি ব্যতীত ঐ প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে পারে না। উভয় পরিষদের মধ্যে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে কোন মতভেদ হইলে, রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন এবং এই যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের ভোটে প্রস্তাবটি সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। তবে রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভার সদস্যসংখ্যা দ্বিগুণ ; সেইজন্য মতবিরোধ ঘটিলে শেষ পর্যন্ত লোকসভার জয় সুনিশ্চিত।

অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি নিম্নপরিষদেই উত্থাপিত হয়। নিম্নপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইলে প্রস্তাবটি উচ্চপরিষদে প্রেরণ করা হয়। উচ্চপরিষদের অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব সংশোধন করিবার ক্ষমতা আছে এবং উচ্চপরিষদ কর্তৃক আনীত সংশোধন প্রস্তাব যদি নিম্নপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়, একমাত্র তাহা হইলেই উক্ত প্রস্তাব বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়। নিম্নপরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উচ্চপরিষদে প্রেরিত হইবার ১৪ দিন পর পর্যন্ত যদি তাহার সুপারিশসহ অথবা বিনা সুপারিশে নিম্নপরিষদে প্রেরিত না হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাব নিম্নপরিষদের মতানুযায়ী আইনে পরিণত হইবে। ভারতের উচ্চপরিষদ মাত্র ১৪ দিন পর্যন্ত অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব স্থগিত রাখিতে পারে।

গ্রেট বৃটেনের প্রথার মত ভারতের মন্ত্রিপরিষদও লোকসভার নিকট দায়ী।

রাজ্যসভা অর্থাৎ উচ্চপরিষদ অনাস্থা-প্রস্তাব আনয়ন করিয়া মন্ত্রিপরিষদকে অপসারিত করিতে পারে না। এ-বিষয়েই নিম্নপরিষদ অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী।

বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপরিষদের বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতিতে বিচার করিবার ক্ষমতা আছে। নিম্নপরিষদ অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু বিচার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল উচ্চপরিষদ। ভারতে উচ্চপরিষদকে এইরূপ একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে যে-কোন পরিষদই অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং একটি পরিষদ কর্তৃক অভিযোগ আনীত হইলে অন্য পরিষদ ঐ আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে নিম্নপরিষদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি—Process of Law-making in Parliament

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহের অনুরূপভাবে ভারতেও একটি বিলের আইনে পরিণত হইবার পূর্বে কয়েকটি বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য দিয়া উভয় পরিষদের অনুমোদন লাভ করিতে হয়। প্রস্তাবক কর্তৃক আইনের খসড়া প্রস্তুত হইলে প্রস্তাবককে উক্ত বিল আইনসভায় উত্থাপন করিবার জন্য এক মাস পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। নির্ধারিত দিনে বিলটি উত্থাপিত হয় এবং প্রস্তাবক আইনসভায় নিম্নলিখিত তিনটির মধ্যে একটি প্রস্তাব করিতে পারেন: (১) পরিষদে সরাসরি বিলটির বিচার-বিবেচনা করা হউক; (২) বিলটিকে বিচার-বিবেচনার জন্য নির্দিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হউক; (৩) বিলটি সম্পর্কে জনমত জানিবার জন্য উহাকে গেজেটে প্রেরণ করা হউক; যদি কোন মন্ত্রী কোন বিল উত্থাপন করেন তাহা হইলে উক্ত বিল উত্থাপনের জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় না। সরকারী বিল সরাসরি গেজেটে প্রকাশ করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতিকে বিলের উত্থাপন ও প্রথম পাঠ (Introduction and First Reading) বলা হয়।

এই পর্যায়ে বিলটির নীতি-সম্পর্কে আলোচনা চলে, কিন্তু বিলটি সম্পর্কে কোন বিশদ আলোচনা চলিতে পারে না। জনমত জানিবার উদ্দেশ্যে বিলটি প্রচার করিবার সময় অতিবাহিত হইলে প্রস্তাবক পুনরায় বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করিবার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন।

বিলটি যদি সভার অনুমোদনক্রমে বিবেচনার্থ সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়, তাহা হইলে এই কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিলটি পরীক্ষা করে এবং বিলটিকে তাহাদের সুপারিশসহ আইনপরিষদে প্রেরণ করে। কমিটি যদি বিলটির কোন পরিবর্তন না

করে, তাহা হইলে কমিটি শুধু বিলটিকে ফেরৎ পাঠায়। আইনসভায় কমিটির কোন বিবরণী পেশ করিতে হয় না। এই পর্যায়কে কমিটি পর্যায় (Committee Stage) বলা হয়।

ইহার পর বিলের উত্থাপক বিলটির দ্বিতীয় পাঠের (Second Reading) প্রস্তাব করেন। এই পর্যায়ে বিলটি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা চলে। সদস্যগণ বিলটি সম্পর্কে সংশোধন প্রস্তাব আনিতে পারেন। অতঃপর বিলটির সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হয়।

বিলটি যদি সংখ্যাধিক্যের ভোটে অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে বিলের উত্থাপক বিলটির তৃতীয় পাঠের (Third Reading) প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই পর্যায়ে মৌখিক সংশোধন প্রস্তাব ব্যতীত বিল-সম্পর্কে অন্য কোনরূপ সংশোধন প্রস্তাব করা যায় না। বিলটিকে হয় সমগ্রভাবে গ্রহণ বা সমগ্রভাবে বর্জন করা চলে।

এইরূপে একটি পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইলে বিলটি অপর পরিষদে প্রেরিত হয়। শাসনতান্ত্রিক আইন অনুযায়ী উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়া আইনে পরিণত হয়।

অর্থ-সংক্রান্ত বিল—Financial Legislation

প্রতি আর্থিক বৎসরে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে অর্থমন্ত্রী পার্লামেণ্ট সভায় সরকারের বাৎসরিক আয়ব্যয়-বরাদ্দের বিবরণী (Budget) পেশ করেন। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত করধার্য করা বা অর্থমঞ্জুরী দাবী করা যায় না। অর্থমন্ত্রী লোকসভায় বাৎসরিক আয়ব্যয়-বরাদ্দের বিবরণী পেশ করিয়া এই বিবরণী সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। আনুমানিক ব্যয়-বরাদ্দকে বিবরণীতে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখাইতে হয়। কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যয়ের দাবী (রাষ্ট্রপতির জন্য খরচ, লোকসভার স্পীকার ও সহকারী স্পীকার, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ইত্যাদি) ব্যতীত অন্য সাধারণ দাবীও এই বিবরণীতে থাকে। নির্দিষ্ট ব্যয়ের দাবীসম্পর্কে পার্লামেণ্ট সভায় আলোচনা চলিতে পারে, কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে সদস্যগণ ভোট প্রদান করিতে পারেন না। অন্যান্য দাবীগুলি লোকসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। লোকসভা অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয়-বরাদ্দগুলিকে প্রত্যাখ্যান বা হ্রাস করিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করিতে পারে না বা নূতন ব্যয়ের প্রস্তাব করিতে পারে না। ব্যয়-বরাদ্দের দাবী অনুমোদিত হইলে বৃটিশ পার্লামেণ্ট-প্রচলিত প্রথানুযায়ী আর একটি বিশেষ আইন পাস করিয়া ভারতের পার্লামেণ্ট সভা শাসনকর্তৃপক্ষকে সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ তুলিবার ক্ষমতা প্রদান করে।

করধার্য বা কর সংগ্রহের জন্য আইন পাস করিতে হয়। এই প্রস্তাবগুলি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে রাজস্ব বিল (Finance Bill) আকারে আইনসভায় উত্থাপিত হয়।

শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ বিল পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করাইতে পারেন। লোকসভার অগ্রিম এবং বিশেষ ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব পাস করিবার ক্ষমতা আছে।

আইনসভার সহিত মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্ক—Relation of the Council of Ministers to the Legislature

বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার মতই ভারতের মন্ত্রিপরিষদ তাঁহাদের নীতি ও কার্যের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী। যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য হইল যে, পরিষদের সদস্যগণকে অকুণ্ঠভাবে সমগ্র পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কার্যসূচী সমর্থন করিতে হইবে। মন্ত্রিপরিষদের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগতভাবে হয়ত একজন সদস্য মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সহিত একমত না হইতে পারেন, কিন্তু পার্লামেন্টের সহিত বা জনমতের সহিত সম্পর্কে বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা কখনই সমগ্র মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে পারিবেন না। আইনসভার সহিত সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ একটি একক ও অবিভাজ্য সংস্থা হিসাবে কার্য পরিচালনা করে। আইনসভা যদি কোন একজন মন্ত্রীর কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে অথবা কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব আইনসভায় সংখ্যাধিক্যের ভোটে অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে এই একজন মন্ত্রীর পরাজয় সমগ্র মন্ত্রিপরিষদের পরাজয় বলিয়া বিবেচিত হয় ও মন্ত্রিপরিষদ একসঙ্গে পদত্যাগ করে।

ভারতে লোকসভার নিকট মন্ত্রিপরিষদের এই দায়িত্ব সংবিধান কর্তৃক বলবৎ করা হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন মন্ত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত অযোগ্যতা, অসদাচরণ বা কু-শাসনের ফলে অপ্রিয় হন, তাহা হইলে এই মন্ত্রিবিশেষের ব্যক্তিগত ত্রুটির জন্য সমগ্র মন্ত্রিসভা দায়ী হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়কেই এককভাবে পদত্যাগ করিতে হয়। সংবিধান কর্তৃক দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও গ্রেট বৃটেনের অনুরূপভাবেই ভারতেও মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য দেখা যায়। কি সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে,

কি অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের উদ্যোগেই শাসনকার্য পরিচালিত হয়। সত্য বটে, পার্লামেণ্ট সভার বে-সরকারী সদস্যগণও আইন-প্রণয়নের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের সমর্থন না থাকিলে, বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব আইনে পরিণত হওয়া একান্ত দুরূহ ব্যাপার। আয়ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে আইনসভা বিশেষ করিয়া লোকসভা মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আয়ব্যয়ের উপর লোকসভার এই নিয়ন্ত্রণক্ষমতাও নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ।

শাসন-ব্যবস্থার উপর মন্ত্রিপরিষদের এই অখণ্ড ও অবিমিশ্র আধিপত্যের মূল কারণ হইল দলীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানগণ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিয়া তাঁহাদের নির্ধারিত নীতি ও কার্যসূচী আইন-সভায় তাঁহাদের সমর্থকগণের দ্বারা অনুমোদিত করিয়া লইয়া থাকেন। দলের সমর্থকগণ অধিকাংশক্ষেত্রে বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া একরূপ অন্ধভাবেই দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের নির্দেশ পালন করেন। ভারতে মন্ত্রিপরিষদের এ-বিষয়ে একটি বিশেষ সুবিধা আছে। আইনসভার উভয় কক্ষেই সরকারী দলের আপেক্ষিক সংখ্যাধিক্য এত অধিক যে, আইনসভায় পরাজয় বরণ করা দূরের কথা—একমাত্র মৌখিক বিরোধিতা ব্যতীত মন্ত্রিপরিষদের কোন সক্রিয় বিরোধিতার সম্মুখীন হইবার আশঙ্কাও নাই। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ অনায়াসেই দলীয় সমর্থন-পুষ্ট হইয়া অবাধে তাঁহাদের কার্যসূচীকে রূপদান করিতে পারেন। দলীয় সমর্থন পাইতেও মন্ত্রিপরিষদের কোন অসুবিধা হয় না। দলীয় নিয়ম অনুযায়ী দলের কোন সমর্থক যদি দলীয় নীতি ও কার্যসূচীর বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়। দল হইতে বহিষ্কৃত হইবার ফলে তাঁহার সদস্যপদ-চ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। সেই সঙ্গে সদস্যপদের বেতন ও ভাতা হইতে তিনি বঞ্চিত হন। দলীয় নীতির বিরোধিতা করিলে প্রধানমন্ত্রী আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করিতে পারেন।

রাজ্য সরকার—Administration of State

বর্তমানে ১৫টি + নাগাভূমি রাজ্যে একই ধরণের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। পূর্বতন ক, খ ও গ শ্রেণীর রাজ্যগুলি বর্তমানে সমপর্যায়ভুক্ত

এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্কেও প্রত্যেকটি রাজ্য সমান ক্ষমতার অধিকারী। প্রত্যেক রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাসন-ব্যবস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হইলেন একজন গভর্ণর বা নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপাল। রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। মন্ত্রিপরিষদ তাহার কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী। প্রত্যেক রাজ্যে একটি আইনসভা আছে এবং নূতন আইন অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে একটি উচ্চ বিচারালয় (High Court) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শাসন কর্তৃপক্ষ—রাজ্যপাল—The Executive—The Governor

প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া রাজ্যপাল থাকেন ও তাঁহার নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন ও রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী কার্যে বহাল থাকেন। তাঁহার কার্যকাল পাঁচ বৎসর। রাজ্যপালকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে ও অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই। তিনি আইনসভার কোন পরিষদেরই সদস্য হইতে পারেন না। তিনি বিনা খরচায় আবাসগৃহ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার মাসিক বেতন ৫,০০০ টাকা। এতদ্ব্যতীত তিনি অন্যান্য ভাতা পান। নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান হিসাবে রাজ্যপাল-নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ও রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। এই নিয়োগ ব্যাপারে তাঁহার ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিশেষ স্থান নাই।

রাজ্যপালের নিয়োগ-পদ্ধতি—Mode of Appointment of the Governor

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপালের নিয়োগ-সম্পর্কে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ, বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতি হইল প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন। যে স্থলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন, সে স্থলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসনকর্তা শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি-পর্যায়ে পরিণত হন। ফলে প্রাদেশিক ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশের ভোটদাতৃগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া

থাকেন। ভারতের রাজ্যপালসমূহের নিয়োগ-ব্যপারে গণতান্ত্রিক আদর্শ যে অনুসৃত হয় নাই, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

উপরি-উক্ত সমালোচনার প্রত্যুত্তরে বলা হয় যে, ভারতের রাজ্যপালগণ নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণের ক্ষমতার ন্যায় ইঁহাদের কোন প্রকৃত ক্ষমতা নাই। ভারতের রাজ্যপালগণের শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারেই পরিচালিত হয় এবং এই ক্ষমতা পরিচালনার জন্য মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। রাজ্যপাল-গণের আইনসভার নিকট কোন প্রকার দায়িত্ব নাই। প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ও প্রয়োগ কর্তা হইলেন মন্ত্রিমণ্ডলী এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যবর্গ সাধারণতঃ আইন-সভার নির্বাচিত সদস্য। এরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণের ভোটদাতৃগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবার বিশেষ কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

রাজ্যপালের ক্ষমতা—Powers of the Governor

প্রত্যেক রাজ্যের শাসনক্ষমতা রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং তাঁহার নামেই সমগ্র শাসনক্ষমতা পরিচালিত হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের মত রাজ্যশাসন-ব্যাপারে পরামর্শ দিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীসহ একটি মন্ত্রি-পরিষদ আছে। রাজ্যপাল তাঁহার নিজ ইচ্ছামত যে সমস্ত কার্য করিবার অধিকার শাসনতন্ত্র হইতে পাইয়াছেন, সে সমস্ত ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ তাঁহাকে কোন পরামর্শ দান করিতে পারে না। একমাত্র আসামের রাজ্যপালের উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকাগুলি সম্পর্কে দুইটি বিশেষ ক্ষমতা আছে—যাহা তিনি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া নিজ ইচ্ছায় প্রয়োগ করিতে পারেন। আসাম ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যের রাজ্যপালের এরূপ নিজ ইচ্ছামত ক্ষমতাপ্রয়োগের কথা শাসনতন্ত্রের কোথায়ও উল্লেখ নাই।

শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা—Executive Powers

রাজ্যপাল রাজ্য-সংক্রান্ত শাসনবিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী এবং সেই ক্ষমতা তিনি স্বয়ং অথবা তাঁহার অধস্তন কর্মচারিবৃন্দের সাহায্যে পরিচালনা করেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করেন এবং মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তিনি উচ্চ বিচারালয়ের বিচার-পতির যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে য়্যাড্‌ভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত

করেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন। যে সমস্ত রাজ্যে তপশীলভুক্ত জাতি ও অনুন্নত শ্রেণী আছে, সে সমস্ত রাজ্যে এই সমস্ত অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণসাধনের বিশেষ ভার রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং এইজন্য রাজ্যপাল একজন পৃথক মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন। রাজ্য-তালিকাভুক্ত সমুদয় ক্ষমতাই রাজ্যপাল পরিচালনা করেন। তবে যুগ্ম-তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর তাঁহার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

আইনবিষয়ক ক্ষমতা—Legislative Powers

রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে সমস্ত রাজ্যের আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট, সেখানে উচ্চপরিষদে রাজ্যপাল কতিপয় সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ইচ্ছা করিলে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব দিবার জন্য উক্ত সম্প্রদায় হইতে কয়েকজন সদস্য বিধানসভায় মনোনীত করিতে পারেন।

রাজ্যপাল আইনসভার অধিবেশন আহ্বান কবিতে পাবেন, স্থগিত রাখিতে পারেন ও নিম্নপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন কিন্তু ইহাব কার্যকাল বৃদ্ধি করিতে পারেন না। তিনি আইনসভাব যে কোন পরিষদে বা উভয় পরিষদে বক্তৃতা করিতে পারেন এবং বাণী প্রেরণ করিতে পাবেন। কোন বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে রাজ্যপালের সম্মতি অপরিহার্য। তিনি সম্মতি দান করিতে পারেন, প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁহাব নিকট উহা প্রেরণ করিতে পারেন। অর্থ-সংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্য বিলগুলিকে তিনি পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন। রাজ্যপাল কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরিত বিল যদি আইনসভা কর্তৃক দ্বিতীয়বার গৃহীত হয়, তাহা হইলে রাজ্যপাল উক্ত বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকার করিতে পারেন না। আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকা কালে রাজ্যপাল জরুরী আইন (Ordinance) জারী করিতে পারেন, কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে বাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন, সে সকল ক্ষেত্রে জরুরী আইন জারী করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতিব অনুমোদন লাভ কবিতে হইবে। প্রত্যেকটি জরুরী আইন আইনসভায় পেশ করিতে হইবে এবং অধিবেশন আরম্ভ হইবার পর ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে তৎপূর্বেই উহা বাতিল হইবে।

রাজস্ববিষয়ক ক্ষমতা—Financial Powers

কোন অর্থবিষয়ক প্রস্তাব আইনসভায় উত্থাপন করিতে হইলে রাজ্যপালের অনুমতি প্রয়োজন। তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যয়-বরাদ্দের দাবী আইনসভায় উত্থাপিত হইতে পারে না। রাজ্যপালের উদ্যোগেই অর্থমন্ত্রী আইনসভায় বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন।

বিচারবিষয়ক ক্ষমতা—Judicial Powers

রাজ্যপাল দণ্ডদানের আদেশ সংশোধন করিতে পারেন। রাজ্য সরকারের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ব্যাপারে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রাজ্যপাল মার্জনা করিতে পারেন। দণ্ডকাল তিনি হ্রাস কবিতে পারেন এবং দণ্ডপ্রদান স্থগিত রাখিতে পারেন। একজাতীয় দণ্ডকে অন্যজাতীয় দণ্ডে পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতাও রাজ্যপালের আছে।

রাজ্যপালের ক্ষমতা পর্যালোচনা কবিলে আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে হয় এবং অনেক বিষয়ে তাঁহাকে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যপালের মত স্বৈবাচারী শাসক বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু কার্যতঃ বর্তমান রাজ্যপালগণ নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। একমাত্র আসামেব উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা সম্পর্কিত দুইটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যের বাজ্যপালই মন্ত্রিপবিষদেব সাহায্য ও পরামর্শ ব্যতীত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পাবেন না। রাজ্যপালকে একদিকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমে শাসনকার্য পবিচালনা করিতে হয়, অপরদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদসহ বাষ্ট্রপতির আদেশ ও নির্দেশ অনুসাবে চলিতে হয়। সুতরাং রাজ্যপালের পক্ষে স্বৈরাচারী হইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই।

মন্ত্রিপরিষদ—Council of Ministers

রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীসহ একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। রাজ্যপালকে পরামর্শদান-সম্পর্কে কোন বিচারালয়ে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনীত হইতে পারে না। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে (Chief Minister) নিযুক্ত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার খুশীমত কার্যে বহাল থাকেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে আইনসভার সদস্য হইতে হইবে। যদি কোন

মন্ত্রী আইনসভার সদস্য না হন, তাহা হইলে তাঁহার নিয়োগকাল হইতে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে; নতুবা তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যেক মন্ত্রী একটি বা একাধিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত থাকেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাঁহার নির্দেশক্রমেই দপ্তরের কার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের নীতি ও কার্যের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী।

কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরপ্রদেশে কেবিনেট মন্ত্রী ছাড়া কয়েকজন রাষ্ট্র-মন্ত্রী ও কয়েকজন উপ-মন্ত্রী আছেন। উড়িষ্যা, বোম্বাই, বিহার প্রভৃতিরাজ্যে কেবিনেট মন্ত্রী ছাড়া উপ-মন্ত্রী আছেন, কোন রাষ্ট্র-মন্ত্রী নাই।

রাজ্য আইনসভা—State Legislature

রাজ্য পুনর্গঠন আইনের ভিত্তিতে ভারতের ১৪টি রাজ্যে (জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত) একজন রাজ্যপাল এবং একটি অথবা দুইটি পরিষদ লইয়া রাজ্য আইনসভা গঠিত হইয়াছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও অন্ধ্র রাজ্যে দুইটি কক্ষ ও অন্যান্য রাজ্যে এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হইয়াছে। উচ্চপরিষদ, বিধান পরিষদ (Legislative Council) ও নিম্নপরিষদ, বিধান সভা (Legislative Assembly) নামে অভিহিত হয়। কোন রাজ্যে অবস্থিত উচ্চপরিষদ বিলোপ করা হইবে বা গঠিত হইবে তাহা স্থির করিতে হইলে সেই রাজ্যের নিম্নপরিষদের ⅔ ভোটাধিক্যে ও সমগ্র সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হয় এবং উক্ত প্রস্তাব পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়া চাই।

বিধান পরিষদ—Legislative Council

উচ্চকক্ষ অর্থাৎ বিধান পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যার ⅓ এর অধিক এবং ৪০ এর কম হইতে পারিবে না। পার্লামেণ্ট অন্য ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বিধান পরিষদগুলি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হইবে:

১। এক-তৃতীয়াংশ সদস্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত হইবে।

২। এক-দ্বাদশাংশ সদস্য অন্যূন তিন বৎসরের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াছেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

৩। এক-দ্বাদশাংশ কমপক্ষে তিন বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

৪। এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নিম্নপরিষদ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন।

৫। অবশিষ্ট সদস্যগণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন।

বিধান পরিষদ স্থায়ী, তবে প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বিদায় গ্রহণ করেন। সদস্যগণ ভারতীয় নাগরিক হইবেন এবং তাঁহাদের অন্ততঃ তিরিশ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই। বিধান পরিষদের কার্য পরিচালনা করিবার জন্য সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (Chairman) ও একজন সহ-সভাপতি (Deputy Chairman) নির্বাচন করেন।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদ ৫১ জন সদস্য লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে ৯ জন রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত ; ৪ জন করিয়া যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-প্রাপ্ত ভোটদাতা ও শিক্ষকগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং ১৭ জন করিয়া যথাক্রমে বিধান সভা ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত।

রাজ্যপুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে দ্বিকক্ষ-সমন্বিত রাজ্যগুলির উচ্চ-কক্ষের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট সভায় একটি বিল উত্থাপিত হইয়াছিল। এই নূতন আইন অনুসারে রাজ্যগুলির উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা নিম্নকক্ষের সদস্যসংখ্যার $\frac{1}{4}$ অংশের পরিবর্তে $\frac{1}{3}$ অংশ হইবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই বিলে অন্ধ্র রাজ্যের এবং জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য একটি উচ্চকক্ষ গঠন করিবার প্রস্তাব পাশ করা হয়।

বিধান সভা—Legislative Assembly

বিধান সভা ২১ বৎসর বয়স্ক ভোটদাতৃগণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত হয়। প্রত্যেক রাজ্যের বিধান সভার সদস্যসংখ্যা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন বিধান সভার সদস্যসংখ্যা ৬০এর কম বা ৫০০র অধিক হইতে পারে না। ২৫২ জন সদস্য লইয়া পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা গঠিত। শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পর দশ বৎসর পর্যন্ত তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও আসামের উপজাতিদের জন্য আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজ্যপাল প্রয়োজনবোধ করিলে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন। এই সভার কার্যকাল ৫ বৎসর। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে পার্লামেণ্ট এক বৎসর পর্যন্ত ইহার কার্যকাল বৃদ্ধি করিতে পারে। অপরপক্ষে ইহার কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে ইহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

বিধান সভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করেন।

১৯৫৭ সালের আইন অনুসারে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির আইনসভা নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হইবে।

বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভা

রাজ্য		বিধান পরিষদ		বিধান সভা
১। অন্ধ্র প্রদেশ	—	৯০	—	৩০০
২। আসাম	—	×	—	১০৫
৩। বিহার	—	৯৬	—	৩১৮
৪। গুজরাত	—	×	—	১৫৪
৫। মহারাষ্ট্র	—	৭৮	—	২৬৪
৬। কেরল	—	×	—	১২৬
৭। মধ্যপ্রদেশ	—	৯০	—	২৮৮
৮। মাদ্রাজ	—	৬৩	—	২০৬
৯। মহীশূর	—	৬৩	—	২০৮
১০। উড়িষ্যা	—	×	—	১৪০
১১। পাঞ্জাব	—	৫১	—	১৫৪
১২। রাজস্থান	—	×	—	১৭৬
১৩। উত্তরপ্রদেশ	—	১০৮	—	৪৩০
১৪। পশ্চিমবঙ্গ	—	৭৫	—	২৫২
১৫। জম্মু ও কাশ্মীর	—	৩৬	—	৭৫

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের স্থানীয় সভা—(Territorial Councils)

১। হিমাচল প্রদেশ—৪১
২। মণিপুর— ৩০
৩। ত্রিপুরা— ৩০

রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা ও কার্য—Powers and Functions of the State Legislatures

রাজ্যের আইনসভা রাজ্য তালিকাভুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে

আইন প্রণয়ন করিতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজ্য আইনসভাগুলির এই আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা পার্লামেণ্টের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন যদি পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনের বিরোধী হয়, তাহা হইলে রাজ্য আইন বাতিল হইবে।

কোন বিল আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। তবে উচ্চপরিষদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উচ্চপরিষদ তিনমাস পর্যন্ত নিম্নপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বিলে সম্মতিজ্ঞাপন না করিতে পারে। উক্ত বিল যদি দ্বিতীয়বার নিম্নপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহা হইলে উচ্চপরিষদ উক্ত বিলে এক মাস পর্যন্ত সম্মতি না দিতে পারে। কিন্তু একমাস অতীত হইলে উক্ত বিল নিম্নপরিষদ কর্তৃক যে আকারে গৃহীত হয়, ঠিক সেই আকারেই আইনে পরিণত হয়।

অর্থ-সংক্রান্ত বিল সম্পর্কেও নিম্নপরিষদের প্রাধান্য সূচিত হয়। অর্থ-সংক্রান্ত বিলে উচ্চপরিষদ তাহার অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারে, কিন্তু নিম্নপরিষদ তাহা গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে। উচ্চপরিষদ যদি ১৪ দিনের মধ্যে অর্থ-সংক্রান্ত বিল প্রেরণ না করে, তাহা হইলে নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইবার পর উহা আইনে পরিণত হয়। মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে নিম্নপরিষদের নিকট দায়ী।

রাজ্য আইনসভা-সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের ক্ষমতার কথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালও আইন-প্রণয়নে সম্মতি দিতে পারেন, অথবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য আইন-সভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন কিংবা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠাইতে পারেন। কিন্তু রাজ্যপাল কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরিত বিল যদি আইনসভা কর্তৃক বিনা সংশোধনে অথবা সংশোধিত আকারে গৃহীত হইয়া রাজ্যপালের নিকট দ্বিতীয়বার উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে উক্ত বিল হইতে তিনি সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারেন না।

মন্ত্রিপরিষদের সহিত (১) রাজ্যপাল ও (২) আইনসভার সম্পর্ক—

Relation of the Ministers to the (1) Governor and (2) the Legislature

ভারতের শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, শাসনকার্যে রাজ্যপালকে পরামর্শ দান ও সাহায্য করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীসহ একটি মন্ত্রি-

পরিষদ থাকিবে। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করিবেন। মন্ত্রিগণ রাজ্যপালের খুশীমত কার্যে বহাল থাকিবেন। প্রত্যেক মন্ত্রীই এক বা একাধিক শাসন-বিভাগ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহারা তাহাদের কার্যের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগে রাজ্যপাল নিজ খুসীমত কাহাকেও নিয়োগ করিতে পারেন না। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিতে হয়। আবার মন্ত্রিপরিষদ যতদিন পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন তত দিন পর্যন্ত রাজ্যপাল তাঁহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন না। সুতরাং দেখা যায় যে, মন্ত্রিপরিষদই হইল রাজ্যের প্রকৃত শাসক—আর রাজ্যপাল হইলেন রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক শাসকপ্রধান।

অপর পক্ষে আইনসভার সহিত মন্ত্রিপরিষদ অধিকতর নিকট সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যেক মন্ত্রীকেই আইনসভার সদস্য হইতে হইবে। কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদ হইল আইনসভার একটি প্রধান কার্যকরী সংস্থা। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া ইহার কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। মন্ত্রিগণ আইনের খসড়া উত্থাপন করেন, আয় ব্যয়ের হিসাব (Budget) প্রস্তুত করেন ও শাসন-নীতি নির্ধারণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেক কাজের জন্য তাঁহারা আইনসভার নিকট দায়ী। আইনসভার সদস্যগণ শাসন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করিলে মন্ত্রিগণের জবাব দিতে হয়। মন্ত্রীবর্গের কার্য যদি আইনসভার নিকট অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে আইনসভা অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে। এরূপক্ষেত্রে মন্ত্রিসভাও আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রাজ্যপালকে অনুরোধ করিতে পারে। আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিলে পরবর্তী নির্বাচনের ফলের উপর মন্ত্রি-সভার স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

জম্মু ও কাশ্মীরের অবস্থা—Status of Jammu and Kashmir

জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের একটি রাজ্য হইলেও অন্যান্য রাজ্যগুলি হইতে এই রাজ্যের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। শুধু জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে শাসক-প্রধানকে 'সদর-ই-রিয়াসত' বলা হয়। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের গণপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি 'সদর-ই-রিয়াসৎ' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পৃথক জাতীয় পতাকা থাকিবে, তবে ভারতীয় জাতীয় পতাকাও সমান সম্মান পাইবে। রাষ্ট্রপতির জরুরী ঘোষণা যদি জম্মু ও

কাশ্মীরে প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার পূর্বে উক্ত রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন হইবে। ভারতীয় নাগরিকত্বের নিয়ম-কানুন উক্ত রাজ্যে প্রযোজ্য হইলেও সেখানকার রাজ্যসরকার ঐ বিষয়ে নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিতে পারিবেন।

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা—Administration of Union Territories

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য কোনরূপ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় নাই। এই অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হইবে এবং এই অঞ্চলগুলির জন্য একমাত্র পার্লামেণ্ট সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। ১৯৫৬ সালের শেষভাগে একটি নূতন আইন পাস করিয়া হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা এই তিনটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য স্থানীয় সভা (Territorial Council) গঠন কবিবাব ব্যবস্থা কবা হইয়াছে। সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া এই সভাগুলি গঠিত হইবে। হিমাচল অঞ্চলের সভা ৪১ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং ইহার মধ্যে বারটি আসন তপশীলী শ্রেণীর জন্য সংবক্ষিত থাকিবে। মণিপুর ও ত্রিপুরার স্থানীয় সভাগুলিতে ৩০ জন সদস্য থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকাব এই সভাগুলিতে ৪ জন পর্যন্ত সদস্য মনোনীত করিতে পাবিবেন। এই সভাগুলি স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে পাবিবে। স্থানীয় সমস্যা সমাধান কবিবাব উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটি কর্পোবেশন গঠন করিবাব ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বিভিন্ন রাজ্যেব আইনসভার গঠনে ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই বাজ্যগুলি প্রতিনিধিত্বের বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা ও বাজ্য আইনসভাব অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা হইয়াছে।

আঞ্চলিক পরামর্শ সভা—Zonal Councils

বাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসাবে সমগ্র ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি অঞ্চলেব জন্য একটি আঞ্চলিক পবামর্শ-সভা গঠন করা হইয়াছে। অঞ্চলগুলি হইল :—

১। উত্তব অঞ্চল—পাঞ্জাব, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীব, দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত।

২। মধ্য অঞ্চল—উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত।

৩। পূর্ব অঞ্চল—এই অঞ্চল বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম ও কেন্দ্র-শাসিত মণিপুর ও ত্রিপুরা লইয়া গঠিত।

৪। পশ্চিম অঞ্চল—বোম্বাই ও মহীশূর হইল এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

৫। দক্ষিণ অঞ্চল—অন্ধ্র, কেরল ও মাদ্রাজ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রত্যেকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও আরও কতিপয় সদস্য লইয়া পরামর্শ-সভা গঠিত হইয়াছে। রাজ্যগুলির সাধারণ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা ও সুপারিশ করা হইল পরামর্শ সভাগুলির প্রধান কার্য।

শাসনতন্ত্র সংশোধনের পদ্ধতি—Methods of Amendment of the Constitution

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার আধিক্য থাকিলেও শাসন-ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতের শাসনতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মত অত্যধিক অনমনীয় না হইলেও ইহাকে অনমনীয় পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

১। সাধারণতঃ, শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হইলে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। প্রত্যেক সংশোধন প্রস্তাব একটি বিলের আকারে পার্লামেন্টের যে-কোন পরিষদে উত্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ উত্থাপিত সংশোধন বিল প্রত্যেক পরিষদে উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটাধিক্যে এবং সমগ্র সদস্যের সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হওয়া চাই। আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধন বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়া সংশোধিত আইনে পরিণত হয়।

২। কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে সংশোধন বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত প্রথম তপশীলভুক্ত 'ক' ও 'খ' ভাগে বর্ণিত রাজ্য আইন-সভাগুলি অর্ধেক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। এই বিষয়গুলি হইল: (১) রাষ্ট্রপতির নির্বাচনব্যবস্থা; (২) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার পরিধি; (৩) রাজ্য সরকারের ক্ষমতার পরিধি; (৪) গ-শ্রেণীর রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়; (৫) শাসনতন্ত্রের সংশোধন-ব্যবস্থা; (৬) সুপ্রিম কোর্ট-সংক্রান্ত বিষয়; (৭) উচ্চ

বিচারালয়-সংক্রান্ত বিষয়; (৮) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ও এই ক্ষমতার বণ্টন; (৯) পার্লামেন্টে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সংশোধন বিল অর্ধেক রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হয় এবং তাঁহার সম্মতি পাইলে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

৩। তৃতীয়তঃ, এমন অনেকগুলি বিষয় আছে, যে বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন সংশোধন করিতে হইলে আদৌ কোন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় না। পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে ঐ বিষয়গুলির সংশোধন করিতে পারে। নূতন রাজ্যগঠন বা বর্তমান রাজ্যগুলির পুনর্গঠন, প্রথম তপশীলভুক্ত 'গ'-শ্রেণীর রাজ্যগুলির শাসনতন্ত্র-প্রণয়ন, কোন রাজ্যে উচ্চপরিষদ গঠন করা বা বাতিল করা ইত্যাদি ব্যাপারে পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন করিতে পারে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে আংশিক-ভাবে নমনীয় বলা যাইতে পারে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে সম্পর্ক—Relation between the Centre and the States

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। উভয় সরকারের সম্পর্ক নিম্নলিখিত দুই দিক দিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

১। আইন-প্রণয়ন সম্পর্ক—Legislative Relation

সংবিধানে ব্যবস্থা আছে যে, এক বা একাধিক রাজ্য রাজ্য-তালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা স্বেচ্ছায় পার্লামেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে লিখিত আছে যে, পার্লামেণ্ট যদি মনে করে যে, কোন রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয় জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইলে ঐ বিষয়টি রাজ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ঐ বিষয়ে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্টের উচ্চপরিষদ অর্থাৎ রাজ্যসভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে প্রস্তাব পাস করিয়া পার্লামেণ্ট সভাকে কোন রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করে তাহা হইলেও পার্লামেণ্ট সভা ঐ রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে পার্লামেণ্ট যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে এবং কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলে

পার্লামেন্ট রাজ্য আইনসভার স্থান অধিকার করিতে পারে। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের উপর আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে পার্লামেন্টের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে।

উপরি-উক্ত বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সময়ে উভয় সরকারই স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীনভাবে আইন-প্রণয়ণের অধিকারী। একের অধিকারভুক্ত এলাকায় অন্যে হস্তক্ষেপ করিলে সুপ্রিম কোর্ট এই অন্যায় হস্তক্ষেপ নিরোধ করিবে।

২। শাসন-সম্পর্ক— Administrative Relation

সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজ্য সরকারগুলির আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে এবং রাজ্য সবকারগুলির শাসনক্ষমতা এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকাবের শাসনক্ষমতা ব্যাহত না হয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতার বিরোধী না হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ প্রয়োজনক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান কবিতে পারিবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকারকে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সবকার, জাতীয় স্বার্থসম্পর্কিত বা সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে যে কোন স্থলপথ, জলপথ, রেলপথ প্রভৃতি নির্মাণ ও রক্ষা সম্পর্কে বাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারে। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সম্মতিক্রমে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ের কার্যভার রাজ্য সরকারের অধীন কর্মচারিগণের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারেন। পার্লামেণ্টও আইন প্রণয়ন করিয়া উপরি-উক্ত কার্যভার রাজ্য সরকারের অধীন কর্মচারিগণের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবহমান নদীব জল অথবা নদী-উপত্যকাগুলি সম্পর্কে যদি রাজ্যগুলির মধ্যে বিবোধ ঘটে, তাহা হইলে পার্লামেণ্টকে আইন প্রণয়ন করিয়া উক্ত বিরোধের মীমাংসা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ষষ্ঠতঃ, শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর একটি আন্তঃপ্রাদেশিক-পরিষদ গঠন করিবার ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। আন্তঃপ্রাদেশিক বিরোধ অথবা কেন্দ্রীয় সরকার ও কোন রাজ্য সরকার বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে, তাহার মীমাংসা করা হইল এই পরিষদের অন্যতম কর্তব্য। পরিশেষে সংবিধানে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যদি কোন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আইনসম্মতভাবে প্রদত্ত কোন নির্দেশ উপেক্ষা করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই উপেক্ষাকে শাসনতন্ত্রে অচল অবস্থার

উদ্ভব মনে করিতে পারেন এবং সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির আয় ও ব্যয়—Heads of Revenues and Expenditures of Union and State Governments

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির রাজস্ব ভাগ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে রাজস্ব আদায় করে :

১। আমদানী-রপ্তানী শুল্ক—Customs

এই শুল্ক ভারত সরকারের আয়ের একটি প্রধান উৎস। বিদেশ হইতে আমদানী বা বিদেশে রপ্তানী-দ্রব্যের উপরে এই শুল্ক ধার্য হয়। পাট ও চাউলের উপর এই শুল্ক ধার্য আছে। ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই শুল্ক হইতে ২৩১,৬৫ লক্ষ টাকা আয়ের সম্ভাবনা আছে। পশ্চিম বাংলা, বিহার, আসাম প্রভৃতি পাট-উৎপাদক রাজ্যগুলি পাট-রপ্তানী শুল্কের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকেন।

২। আয়কর—Income Tax

(ক) ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর—বাৎসরিক তিনহাজার টাকার অধিক আয়ের উপর এই কর ধার্য হয়। আয়বৃদ্ধির সহিত এই করের হারও বৃদ্ধি পায়। আয়কর ভারতের একটি প্রত্যক্ষ কর এবং ইহাকে একমাত্র কর বলা যাইতে পারে যাহা সামর্থ্যানুসারে ধার্য হয়। এই কর হইতে সরকার বর্তমানে সবচেয়ে বেশী রাজস্ব পাইয়া থাকেন। তবে এই কর হইতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৪৫ ভাগ রাখিয়া অবশিষ্টাংশ রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হয়। নূতন সিদ্ধান্ত অনুসারে আয়করের শতকরা ৫৫ ভাগের পরিবর্তে ৬০ ভাগ রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে।

(খ) যৌথ-কোম্পানীর লাভের উপর আয়কর—এই কর যৌথ-কোম্পানীর লাভের উপর ধার্য হয় ও এই করের সবটাই কেন্দ্রীয় সরকার পায়। ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যক্তিগত আয়কর হইতে ১৭২,৫০ লক্ষ ও যৌথ-কোম্পানী হইতে ১৮৭,৫০ লক্ষ টাকা আয়কর আদায় করিবে।

৩। আবগারী শুল্ক—Excise Duty

ভারতে উৎপাদিত চিনি, দিয়াশলাই, কেরোসিন, রবার, টায়ার, বনস্পতি ঘি, তামাক ও সুপারির উপরে এই কর ধার্য করা হয়। এই উৎস হইতে ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫৫৩,৬৯ লক্ষ টাকা আয় হইবে। নূতন সিদ্ধান্ত অনুসারে তামাক, দিয়াশলাই, কফি, চা, চিনি, কাগজ, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য ও উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতি আটটি দ্রব্যের উপরে ধার্য প্রাপ্য অর্থের শতকরা ৪০ ভাগের পরিবর্তে ২৫ ভাগ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন করা হইবে।

৪। রেলপথ—Railways

ভারত সরকার রেলপথ পরিচালনা করেন এবং এই উৎস হইতে ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬ ৬'৭ লক্ষ টাকা পাইবেন বলিয়া হিসাব করিয়াছেন।

৫। ডাক ও তার—Posts & Telegraphs

১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাক ও তার বিভাগ হইতে প্রায় ৭'০৩ লক্ষ টাকা আয় হয়।

৬। মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রাঙ্কন—Currency and Coinage

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভের একটি অংশ ও মুদ্রা তৈয়ারী ও মুদ্রা প্রচলনের লাভের পরিমাণ ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭০'৫৬ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

৭। সম্পত্তি কর—Estate Duty

মৃতব্যক্তির একলক্ষ বা তদতিরিক্ত মূল্যের সম্পত্তির উপর কর ধার্য করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে আদায় করা হয়। সম্পত্তির মূল্য বেশী হইলে এই করের হারও আয়করের হারের ন্যায় বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎস হইতে ১২½ কোটি টাকা আদায় হইয়াছিল। ১৯৬০-৬১ সালে এই কর হইতে প্রায় ৩ কোটি টাকা আদায় হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৬১-৬২ সালে পূর্ব-পরিমাণ কর আদায় হইবে আশা করা যায়। ১৯৬২-৬৩ সালে এই কর হইতে ৪,০০ লক্ষ টাকা আদায় হয়।

৮। সম্পদ কর ও ব্যয় কর—Wealth tax and Expenditure tax

১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে এই দুইটি নূতন কর স্থাপন করা হইয়াছে। যাহাদের মোট দুইলক্ষ টাকার অধিক সম্পত্তি আছে তাহাদের এই সম্পদ কর দিতে হইবে। এই করও ক্রমবর্ধমান নীতি অনুযায়ী ধার্য হইবে। বাৎসরিক ৬০ হাজার

বা তদতিরিক্ত পরিমাণ আয়ের উপর ব্যয় কর ধার্য হইবে এবং ব্যয়ের পরিমাণ যতই বেশী করা হইবে, করের হারও ততই বেশী করা হইবে।

৯। সাধারণ দান কর—General Gift tax

ভারত সরকার আরেকটি নূতন কর স্থাপন করিয়াছিলেন। সাধারণ দানের উপর এই কর ধার্য হইবে। ইহা হইতে সরকারের বৎসরে ৩।৪ কোটি টাকা আয় হইবে।

ভারত সরকারের ব্যয়—Heads Of Expenditure of the India Government

১। দেশরক্ষা—Defence Expenditure

দেশরক্ষা খাতে ভারত সরকারের সবচেয়ে বেশী ব্যয় হয়। কাশ্মীর রক্ষার জন্য বর্তমানে এই ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বাবদ ৪৫১,৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য হয়। ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে দেশরক্ষার জন্য এত বেশী ব্যয় অস্বাভাবিক এবং এই কারণে জাতীয় উন্নয়নমূলক কার্যে অর্থের অভাব হয়। তবে, সুখের বিষয় বর্তমানে সামরিক বিভাগের প্রায় সবগুলি উচ্চপদে ভারতীয়গণ নিযুক্ত হওয়ার ফলে দেশের অর্থ দেশেই থাকে।

২। বে সামরিক শাসনবিভাগ—Civil Administration

এই বিভাগের ব্যয়ও বৃটিশ শাসনকাল অপেক্ষা অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, আইন, বিচার, জেল, বেতার, সমাজ-উন্নয়ন প্রভৃতি জনহিতকর বিভাগগুলি সম্প্রসারণের ফলে ১৯৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই বিভাগগুলির ব্যয়-বরাদ্দ ১৭৩·৪৬ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও আরও অতিরিক্ত ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

৩। ঋণ-পরিশোধ—Debt Services

ভারত সরকারের ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ করিতে হয়। ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বাবদ ২৪৬,০৩ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

৪। রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য দান—Central Subvention to States

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায়ই রাজ্যসরকারগুলিকে নানা বাবদে সাহায্য করিতে হয়। এইজন্য ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মোট ৫০০,২১ লক্ষ টাকা ধার্য হইয়াছে।

রাজ্য সরকারগুলির আয়—Heads of Renvenue of the State Governments

১। ভূমি-রাজস্ব—Land Revenue

রাজ্য সরকারগুলির আয়ের প্রধান উৎস হইল ভূমি-রাজস্ব। এই রাজস্ব জমিদার ও প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় করা হইত এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি যে সমস্ত রাজ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল সে সমস্ত রাজ্যে এই আয়-পরিমাণ প্রায়ই সমান থাকিত। সম্প্রতি জমিদারী প্রথার বিলোপ ও কৃষিসংস্কার আইন বলবৎ হওয়ার ফলে এই উৎস হইতে রাজ্য সরকারগুলির আয় বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৬২-৬৩ সালে ভূমি রাজস্ব হইতে ৭,০৬·৮৮ লক্ষ টাকা আদায় হয়।

২। রাজ্য আবগারী কর—State Excise Duty

ঔষধ, মদ, মাদক দ্রব্যের উপর এই কর ধার্য হয়। নৈতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই সকল দ্রব্যের উপর অধিক হারে কর ধার্য করিয়া এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করা উচিত। কিন্তু ইহাতে সরকারী আয় কমিয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই উৎস হইতে প্রায় ৭ কোটি টাকা কর আদায় কবেন। জনস্বার্থের খাতিরে এই রাজস্ব উঠিয়া যাওয়া মঙ্গলজনক।

৩। স্ট্যাম্প-শুল্ক—Stamp Duty

এই শুল্ক দুই প্রকারের। দলিলপত্র, মামলা-মোকদ্দমার জন্য কোর্ট ফি ও হুণ্ডির উপর ধার্য স্টাম্প হইতে এই রাজস্ব আদায় হয়। বিলের উপর যে স্টাম্প-শুল্ক ধার্য হয় তাহা কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করে এবং আদায়ীকৃত সমস্ত শুল্কই রাজ্য সরকারগুলিকে দেওয়া হয়। স্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রেশন খাতে ১৯৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম বাংলায় যথাক্রমে ৪,৪৪·০৪ লক্ষ ও ৮০·৯৪ লক্ষ টাকা আদায় হয়। দেশে মামলা-মোকদ্দমা কমিলে এই আয় হ্রাস পাইবে।

৪। সেচ—Irrigation

সেচব্যবস্থা হইতেও সরকারের আয় হয়। তবে এই উৎস হইতে আয় পাইতে হইলে সরকারকে প্রথমে ব্যয় করিয়া সেচখাল ও অন্যপ্রকার সেচব্যবস্থা নির্মাণ করিতে হয়। বর্তমানে নানাজাতীয় সেচব্যবস্থা নির্মাণের ফলে এই উৎস হইতে আয় বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়।

৫। বনবিভাগ—Forests

বন হইতে কাঠ ও অন্যান্য বনজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া এই আয় পাওয়া যায়। তবে এই আয়-পরিমাণ খুব কম। বনবিভাগ হইতে পশ্চিম বাংলার সমগ্র রাজস্বের একভাগ আদায় হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে বন হইতে ১,৭৩'৪১ লক্ষ টাকা আদায় হয়।

৬। কৃষি আয়কর—Agricultural Income tax

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকার ফলে ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা ছিল না। এইজন্য কৃষি আয়কর ধার্য করিয়া কৃষি হইতে সরকারের আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশে ৩,৫০০ টাকা কৃষি-আয়ের উপর ক্রমবর্ধমান হারে এই কর বসান হয় এবং ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কর হইতে প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা আদায় করেন।

৭। বিক্রয় কর—Sales tax

বিক্রীত দ্রব্যের উপর কর ধার্য করিয়া ক্রেতার নিকট হইতে এই কর আদায় করা হয়; পশ্চিমবঙ্গে টাকায় পাঁচ নয়া পয়সা হারে এই কর ধার্য হয়। দুইভাবে এই কর ধার্য হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে একটি দ্রব্য যতবার বিক্রয় হয় ততবারই কর বসানো হয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিক্রীত দ্রব্যের উপর একবার মাত্র কর বসান হয়। বিক্রয় করের হার সর্বত্র সমান নহে বলিয়া আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের বিশেষ অসুবিধা হয়।

৮। আয়করের অংশ—Share of Income tax

ব্যক্তিগত আয় হইতে যে পরিমাণ কর কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করে, তাহার শতকরা ৫৫ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই উৎস হইতে ১২,০৩'৪৫ লক্ষ টাকা পায়।

৯। কেন্দ্রীয় সরকারের আবগারী শুল্কের অংশ—Shares of the Central Excise Duty

দিয়াশলাই, তামাক, বনস্পতি প্রভৃতির উপর কেন্দ্রীয় সরকার যে শুল্ক ধার্য করে তাহার আয় হইতে শতকরা ৪০ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে লোকসংখ্যা অনুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ এই বাবদ ৭,৮৭'৬৪ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল।

১৫। বিবিধ—Miscellaneous

ইহা ছাড়া, রাজ্য সরকারগুলি নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতেও রাজস্ব পাইয়া থাকে ; যথা, (ক) প্রমোদ কর (Amusement tax), (খ) বিদ্যুৎ কর (Tax on Electricity), (গ) বৃত্তি কর (Tax on Profession and Calling), এবং (ঘ) সম্পত্তি করের অংশ (Share of Estate Duty)। পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য (ঙ) জুয়াখেলার উপর কর (Tax on Gambling) ধার্য করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসাম কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে (চ) পাট-শুল্কের একটা অংশ পায়। ইহা ছাড়া, প্রত্যেক রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রতি বৎসর নানা বাবদে অর্থসাহায্য পায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে বহু অর্থ পাইয়া থাকে।

রাজ্য সরকারের ব্যয়—Heads of Expenditure of the State Governments

১। সাধারণ শাসন—General Administration

শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশের ব্যয় অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমগ্র ব্যয়ের প্রায় ১৪ ভাগ এই বাবদ ব্যয় হয়। ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে ইহা অপব্যয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে এই ব্যয় না করিলে লোকের জীবন ও ধনের নিরাপত্তা রক্ষা করা যায় না। সরকারী কর্মচারিগণের বেতন বাবদ বহু টাকা ব্যয় হয়।

২। বিচার ও কারাবিভাগ—Justice and Jail

পুলিশ, বিচার ও কারাবিভাগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এই তিনটি বিভাগের একত্রে ব্যয় রাজ্য সরকারের সমগ্র ব্যয়-পরিমাণের দুই-তৃতীয়াংশ। ইহা হইতে দেশের বর্তমান অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। এই ব্যয় না কমিলে দেশে কোনরূপ গঠনমূলক কাজের জন্য অর্থ পাওয়া সম্ভব নয়।

৩। শিক্ষা—Education

ভারতের শতকরা ৮৫ জন লোক নিরক্ষর। সুতরাং এদেশে শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশী ব্যয় হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে এই বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য। ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার জন্য মোট ২১,৫৭'২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বর্তমানে সরকার এ

বিষয়ে অবহিত হইয়া শিক্ষাপ্রসারকল্পে অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন।

৪। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা—Public Health and Medical Relief

১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বাবদ ১১,১৫'৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এজন্য ব্যয়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা উচিত।

৫। বিবিধ—Miscellaneous

ইহা ছাড়াও রাজ্য সরকারগুলি পথঘাট নির্মাণ, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি, সমবায় সমিতির প্রসার, নূতন থানা, অফিস, আদালত প্রভৃতি গঠনের জন্য অর্থ ব্যয় করিতেছে।

বিচার-ব্যবস্থা—The Judiciary

বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—Features of the Judicial System

ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র হইলেও সমগ্র ভারতের জন্য একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় (সুপ্রিম কোর্ট) আছে। প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া উচ্চ আদালত (হাই কোর্ট) আছে। এই উভয় আদালতই দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মামলার বিচার করে। অন্যান্য নিম্ন বিচারালয়গুলি ফৌজদারী ও দেওয়ানী এই দুই ভাগে বিভক্ত। গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলি জুরীর সাহায্যে বিচার করা হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের আদালত গঠিত হয়। ইহা ছাড়া, শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রভৃতির নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত আছে। আইনের চক্ষে সব নাগরিকই সমান। নিম্নে আদালতগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

দেওয়ানী আদালত—Civil Courts

(১) গ্রামের পঞ্চায়েৎ আদালতই হইল দেওয়ানী সর্বনিম্ন আদালত। এখানে ছোট-খাট মামলার বিচার হয়। ইহার উপর হইল (২) মুনসেফের আদালত। প্রত্যেক চৌকী, মহকুমা ও জেলার সদরে মুনসেফী আদালত থাকে। মুনসেফগণ সরকার কর্তৃক যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মচারী। সাধারণতঃ ইঁহারা তিন হাজার টাকা সম্পর্কিত দেওয়ানী মামলা পরিচালনা করিতে পারেন।

ইহার উপর হইল (৩) জেলা জজের (District Judge) আদালত। ইনিই হইলেন জেলার দেওয়ানী মামলা-সংক্রান্ত সর্বোচ্চ বিচারক। জেলা জজ তাঁহার সহকারী সব্‌জজের সাহায্যে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। মুনসেফের আদালত হইতে জেলা জজের আদালতে আপীল করা যায় এবং যে সমস্ত মামলার বিষয় তিন হাজার টাকার অধিক তাহাদের সরাসরি প্রথমেই জেলা জজ বা সব্‌জজের আদালতে শুনানী হয়। জেলা জজের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যের (৪) উচ্চ আদালতে আপীল করা যায়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে দেওয়ানী মামলার জন্য ছোট আদালত (Small Causes Court) আছে। দেওয়ানী মামলার দাবীর পরিমাণ ২০ হাজার টাকার বেশী হইলে উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে (৫) সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা যায়।

ফৌজদারী আদালত—Criminal Courts

ফৌজদারী মামলার জন্য সর্বনিম্ন আদালত হইল (১) গ্রামের পঞ্চায়েৎ আদালত। পঞ্চায়েতী আদালত ছোট-খাট মামলার বিচার করে ও অল্প-পরিমাণ জরিমানা করিতে পারে। অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের জন্য প্রত্যেক মহকুমা ও জেলা-সহরে (২) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বিচারক (Magistrate) থাকেন। খুন, গৃহদাহ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের বিচার সরাসরি (৩) জেলার দায়রা জজের (Sessions Judge) আদালতে হয়। প্রত্যেক জেলায় একজন দায়রা জজ থাকেন। ইনি জেলা জজ ও দায়রা জজ উভয়রূপেই কাজ করেন। দায়রা জজও তাঁহার সহকারী দায়রা জজের (Assistant Sessions Judge) সাহায্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট হইতে আনীত গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচার করেন। সাধারণ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিবরণ শুনিয়া এই মামলাগুলি দায়রা আদালতে সোপর্দ করেন। কারণ, তাঁহাদের এই মামলাগুলি বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। দায়রা জজ অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু এই দণ্ডাদেশ উচ্চ বিচারালয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। দায়রা জজ নিম্ন আদালতগুলি হইতে আনীত আপীল-গুলিরও বিচার করেন। গুরুতর মামলার বিচারকালে দায়রা জজকে জুরীর সাহায্য লইতে হয়। জুরীগণ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী বা নির্দোষ সাব্যস্ত করেন, কিন্তু দণ্ড সম্পর্কে তাঁহাদের কোন হাত নাই। জজ ও জুরীগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে এই মামলা উচ্চ আদালতে পাঠাইতে হয় এবং বিশেষ ক্ষেত্রে

জন্য নূতন জুরী নিযুক্ত করিয়া মামলার পুনর্বিচার করিতে পারেন। দায়রা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে (৪) উচ্চ আদালতে আপীল করা যায়। উচ্চ আদালত হইতে মাত্র নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে (৫) সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা যায়।

কলিকাতা প্রভৃতি বড় শহরে ফৌজদারী মামলার জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আছে। ইহা ছাড়া, কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে নগর আদালত (City Court) সৃষ্টি হইয়াছে।

উচ্চ আদালত—High Court

প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া উচ্চ আদালত আছে। এই আদালতই হইল রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ আদালত। একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্য কয়েকজন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, রাজ্যের রাজ্যপাল ও উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া অন্য বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন। বিচারপতিগণ ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন এবং অবসর গ্রহণ করিবার পর ভারতের কোন বিচারালয়ে আইনজীবী হিসাবে কাজ করিতে পারেন না। একমাত্র অসদাচরণ ও অকর্মণ্যতা হেতু আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি কোন বিচারপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন। উচ্চ আদালতের বিচারপতি হইতে হইলে কোন নিম্ন আদালতে অন্ততঃপক্ষে ১০ বৎসর কাল জজ হিসাবে কাজ করিতে হইবে অথবা কোন উচ্চ আদালতে অন্ততঃপক্ষে ১০ বৎসর ওকালতি বা ব্যারিস্টারি করিতে হইবে।

উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতগুলি হইতে আনীত আপীল মামলাগুলি পরিচালনা করে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সির উচ্চ আদালতের আদিম ক্ষমতাও (Original Jurisdiction) আছে। প্রেসিডেন্সি এলাকাস্থিত গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার সরাসরি এখানে হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়ানী মামলার প্রথম বিচারও এই আদালতে হয়।

সুপ্রিম কোর্ট— Supreme Court

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি সর্বোচ্চ আদালত একান্ত অপরিহার্য। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতজন বিচারপতি লইয়া এই আদালত প্রথম গঠিত ছিল। ১৯৫৬ সালে একটি সংশোধনী আইন পাস করিয়া বিচার-

পাঁতির সংখ্যা ৭ হইতে ১০ করা হয়। বিচারকার্য যাহাতে দ্রুত সম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সালে দ্বিতীয় সংশোধনী আইন পাস করিয়া বিচারপতির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ছাড়া আরও ১৩ জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত।

রাষ্ট্রপতি ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইতে হইলে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর উচ্চ আদালতে বিচারপতি হিসাবে কাজ করিতে হয় অথবা দশ বৎসর উচ্চ আদালতে ওকালতি করিতে হয় অথবা প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ হইতে হয়। বিচারপতিগণ পঁয়ষট্টি বৎসব বয়স পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন এবং অবসর গ্রহণের পর ভারতের কোন আদালতে আর ওকালতি করিতে পারেন না। পার্লামেণ্ট সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি ইঁহাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন।

সুপ্রিম কোর্টের কার্য চারিভাগে ভাগ করা যায় ; যথা, আদিম বিভাগ, আপীল বিভাগ, পরামর্শ বিভাগ ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিভাগ।

প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে, অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্রের কোন বিষয়ের অর্থ লইয়া বিরোধ ঘটিলে তাঁহার বিচার করা।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতেব দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার রায়ের বিরুদ্ধে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে আপীল শুনা।

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন বিষয়ে জানিবার জন্য রাষ্ট্রপতি যদি অনুরোধ করেন, তাহা হইলে কোর্টের নিজ মতামত জ্ঞাপন কবা।

চতুর্থতঃ, নাগরিকগণের শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষা করা। যদি কোন ব্যক্তি মনে করে, যে সরকার বা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা তাহার নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা হইলে সে সুপ্রিম কোর্টে ইহার প্রতিকারের প্রার্থনা করিতে পারে। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া সুপ্রিম কোর্ট ইহার নির্দেশ দিতে পারে।

ভারতের রাজনৈতিক দল—The Indian Political Parties

ভারত যতদিন পরাধীন ছিল, ততদিন প্রকৃতপক্ষে এদেশে কোন প্রকৃত রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান হইতে পারে নাই। অশিক্ষা, পরাধীনতা ও সাম্প্রদায়িক

ভেদবুদ্ধির জন্য ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইতে পারে না, কারণ, রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধন করা। দেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে এই জাতীয়তা-বোধ জাগরিত হইতেছে। বর্তমানে ভারতে যে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কংগ্রেস সভাই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ।

জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস—The National Congress

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে য্যালান অক্টাভিয়ান হিউম নামক একজন ইংরাজ কর্মচারীর উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে মহাত্মা গান্ধী যখন কংগ্রেসে যোগদান করিয়া ইহার অবিসংবাদী নেতারূপে স্বীকৃত হইলেন, তখন হইতেই কংগ্রেসের জীবনেতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হইল। সমগ্র জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সভার মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়া উঠিল। বৃটিশ শাসনকালে কংগ্রেস ছিল একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যাহা সমগ্র জাতির মুখপাত্র হিসাবে বিশ্বের দরবারে ভারতের জাতীয় অধিকারের দাবী জানাইতে সক্ষম ছিল। কংগ্রেস সভা ভারতের সর্বসম্প্রদায়, সর্বশ্রেণী, সর্বধর্ম-মতাবলম্বী ও বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছিল। জাতি-ধর্ম-নির্বিচারে যে-ব্যক্তি বাৎসরিক চার আনা চাঁদা দিতে সমর্থ, সে-ই কংগ্রেসের সদস্য হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বৃটিশ শাসনকালে কংগ্রেস সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান। পরাধীন ও নিরস্ত্র জাতির পক্ষে বৃটিশ সরকারের মত একটি প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাশালী সরকারের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করা যে কতটা দুঃসাধ্য, কংগ্রেস তাহা ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছিল। এইজন্য মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কংগ্রেস নিরস্ত্রভাবে বিদেশী সরকারের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে। অবশ্য অনেকের মতে কংগ্রেস-অনুসৃত নীতি যে সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল তাহা নয় এবং ভারতের বহু জনপ্রিয় নেতা এই অহিংসা নীতি বর্জন করিয়া হিংসার পথে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কংগ্রেসের ঐকান্তিক চেষ্টা ও ত্যাগস্বীকার ফলপ্রসূ হইলেও স্বাধীনতালাভ-কালে কংগ্রেসর মূল আদর্শ অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে

পারে নাই এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে বিদেশী শাসকের নির্দেশ অনুসারে ভারত-বিভাগ স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে।

স্বাধীনতালাভের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেস দলই শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল অপেক্ষা কংগ্রেস দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে এত অধিক সংখ্যক সমর্থক আছে যে, এই দলের পক্ষে সরকার গঠন করিতে কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে ভারতে যে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে, লোকসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে কংগ্রেস সমগ্র আসনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখিয়া ইহা যে সর্বাগ্রিক জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিগত ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস শতকরা কিঞ্চিদধিক ৩০ ভোট পাইয়াও শতকরা ৭০টির উপর আসনলাভে সমর্থ হয়। ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি যদি তাহাদের বিভেদ ভুলিয়া সংঘবদ্ধভাবে কংগ্রেসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত, তাহা হইলে নির্বাচনে কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য বজায় রাখা কষ্টকর হইত। তবে ইহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, কংগ্রেস সভা ভারতের একমাত্র সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল এবং কংগ্রেসের এই জনপ্রিয়তার কারণ হইল, কংগ্রেসের মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহ্য এবং শ্রীজওহরলাল নেহরুর বিরাট ব্যক্তিত্ব—যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব বর্তমানে ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনেও কংগ্রেস কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান নীতি—Present Policy of the National Congress

১৯৪৮ সালে কংগ্রেসের যে নূতন গঠনতন্ত্র রচিত হয় তাহাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে: "ভারতের জনগণের কল্যাণ ও অগ্রগতির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলের জন্য সমান সুযোগ ও সমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে ভারতে একটি সহযোগিতামূলক সাধারণ-

তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা"। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভারতে একটি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গঠিত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করাই হইল কংগ্রেসের বর্তমান নীতি।

১৯৬২ সালে সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেস যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করে তাহাতে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি স্থান পায়।

কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ নীতি হইল ভারতে একটি স্বাধীন, সাম্প্রদায়িকতা-বর্জিত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করা। মদ্যপান বর্জন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, পরিবার পরিমিতায়ন ও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করিতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা। সম্ভব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা, অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য স্থির রাখা, বিলাস ও অনাবশ্যক দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করা, শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠা করা। যোগ্য ছাত্রদের শিক্ষাকল্পে সাহায্য করা, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রভৃতি হইল ইহার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। সুষম কর ব্যবস্থার সাহায্যে আয়-বৈষম্য হ্রাস করিয়া সঞ্চয় পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং সঞ্চিত অর্থকে অধিক উৎপাদনে নিয়োজিত করা কংগ্রেসের অন্যতম উদ্দেশ্য। এক কথায় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান সর্ববিধ উপায়ে উন্নত করাই হইল কংগ্রেসের মূল নীতি।

বৈদেশিক সম্পর্কে কংগ্রেস শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির উপাসক। কোন সামরিক জোটে যোগদান করা কংগ্রেসের নীতিবিরুদ্ধ এবং এজন্য কংগ্রেস কোন দেশের সহিত সামরিক চুক্তি আবদ্ধ নীতি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। নিরপেক্ষতাই হইল কংগ্রেসের পররাষ্ট্র নীতির মূল সূত্র এবং এ সম্পর্কে কংগ্রেস ইহার বিদেশী প্রভাববর্জিত স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে। কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাইতে চায় এবং যে কোন প্রকারে হউক না কেন পৃথিবীতে নিরস্ত্রীকরণ অবস্থা প্রবর্তন সমর্থন করে। ভারতের যে সমস্ত অংশগুলি চীন ও পাকিস্তান কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, ভারত সেগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট।

কংগ্রেসের সংগঠন—Organisation of the Congress

প্রাথমিক (Primary) ও সক্রিয় (Active) এই দুই জাতীয় সদস্য লইয়া বর্তমান কংগ্রেস গঠিত। ১৮ বৎসর বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি কংগ্রেসের মূল নীতিতে আস্থাবান এই লিখিত শপথ গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য হইতে পারেন। ইঁহাদের বাৎসরিক দেয় চাঁদার হার হইল ২৫ নয়া পয়সা। কেবলমাত্র সেই সকল ব্যক্তিই কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য হইতে পারেন যাঁহাদের বয়স ২১ এবং

বেশী, যাঁহারা মদ্যপান করেন না, যাঁহারা হস্তনির্মিত খাদি ব্যবহার করেন এবং যাঁহারা সকলের সমানাধিকার ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যে বিশ্বাস করেন। ইঁহাদের বাৎসরিক ১৲ টাকা চাঁদা দিতে হয় এবং ইঁহারাই গ্রাম বা মহল্লা কংগ্রেসের উপরের পর্যায়ের সংগঠনগুলির সভ্য হইতে পারেন।

গ্রাম বা মহল্লা কংগ্রেস হইল প্রাথমিক সংগঠন। ইহার উপর জেলা কংগ্রেস কমিটি ও তাহার উপরে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। সর্বোপরি হইল সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি। ইহা ছাড়া কংগ্রেসের একজন সভাপতি ও সভাপতির একটি কার্যকরী সংস্থা (Working Committee) আছে। বর্তমানে সভাপতি তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং সভাপতিই তাঁহার কার্যকরী সংস্থার সদস্যগণকে মনোনীত করেন। ইহা ছাড়া তিনি দুইজন সাধারণ সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ১৯৫৭ সালে কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয় এলাহাবাদ হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

কংগ্রেসের সরকারী ও বে-সরকারী দুইটি শাখা আছে। সরকারী কংগ্রেস শাসন-সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করে। অপর পক্ষে বে-সরকারী কংগ্রেস সরকারী কার্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রচারকার্যের সাহায্যে দলের শক্তি বৃদ্ধি এবং নির্বাচনে সাফল্য অর্জনের কার্যে নিয়োজিত থাকিবে।

প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল—Proja-Socialist Party

এই দলটি দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মিলনে গঠিত হইয়াছে। কৃষক-মজদুর প্রজা দল এবং সমাজতন্ত্রী দল ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে বিশেষভাবে পরাজিত হইয়া সম্মিলিতভাবে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল গঠন করিয়াছে। এই দলের নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ সদস্যই পূর্বে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাবের পর কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ মতবিরোধের ফলে ইঁহারা দলত্যাগ করিয়া নূতন দল গঠন করেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের এক অংশ এই দলে যোগদান করিয়া ইহার শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে এই দল লোকসভার নির্বাচনে ১২টি আসন দখল করে।

এই দলের সমর্থকগণ মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত আদর্শে বিশেষ আস্থাবান। ইঁহারা মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী এবং এই উদ্দেশ্যে ইঁহারা জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ, কুটির-শিল্পের উন্নতি ও প্রসার এবং মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ নীতি সমর্থন করেন।

ভারতের সাম্যবাদী দল—Communist Party of India

ভারতীয় সাম্যবাদী দল রুশীয় সাম্যবাদী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে এবং ইঁহারা ভারতের রুশীয় পদ্ধতিতে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা গঠন করিবার মত পোষণ করেন। বহু উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই দলের সমর্থক। এতদ্ব্যতীত কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিযুক্ত বহু শ্রমিক এই দলের অনুগামী। এই দলের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পূর্বে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। কিন্তু পরে কংগ্রেস-প্রবর্তিত অহিংস-নীতিতে আস্থাহীন হইয়া এবং রুশীয় সাম্যবাদিগণের অনুসৃত কার্যক্রমের বিরাট সাফল্যে আকৃষ্ট হইয়া সাম্যবাদী দলে যোগদান করেন। এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ভারতেও সোভিয়েত ব্যবস্থার অনুরূপ এক শ্রেণীহীন ও শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা। ইঁহাদের কার্যক্রমের তালিকা হইল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদসাধন, শিল্পগুলির জাতীয়করণ, ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন, অনুন্নত শ্রেণীর ও উদ্বাস্তুদের বিনা খরচায় পুনর্বাসন, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন, সিংহল, নেপাল, পাকিস্তান প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন।

বিগত ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে ভারতের সাম্যবাদী দল কংগ্রেসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আইনসভায় অন্যান্য দল অপেক্ষা অধিক সংখ্যক আসন দখল করিতে সমর্থ হয়। ১৯৫৭ সালের লোকসভার নির্বাচনে এই দল সমগ্র ভোট সংখ্যার ১২,০৬৮,৪৫২ ভোট পাইয়া ২৯টি আসন দখল করিতে সমর্থ হয়। মাদ্রাজ, কেরল, হায়দরাবাদ ও পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা প্রভৃতি কতকগুলি স্থানে সাম্যবাদী দলের বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। কেরলে সাম্যবাদী দল সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিল। ১৯৬২ সালের নির্বাচনেও এই দল লোকসভায় ২৯টি আসন পাইয়াছে।

সাম্যবাদী নীতিতে আস্থাবান এবং দলের সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ করিতে ইচ্ছুক এইরূপ ১৮ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি দলের সদস্য হইতে পারে। ২।৩ জন সদস্য লইয়া দলের প্রাথমিক সংগঠন 'সেল্' (Cell) গঠিত হয়। ইঁহারাই সাম্যবাদী নীতি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। ইহার উপরে গ্রাম বা জেলার সংগঠন, তাহার উপর রাজ্য সংগঠন। সর্বভারতীয় সাম্যবাদী সংস্থা হইল সাম্যবাদী দলের সর্বোচ্চ জাতীয় সংগঠন। এই সংস্থাই দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি (Central

Executive Committee) এবং দলের সাধারণ সম্পাদক (General Secretary) নির্বাচন করে।

স্বতন্ত্র দল—Swatantra Party

১৯৫৯ সালে শ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে এই দল গঠিত হয়। সাম্যবাদী দলের পরেই এই দলের স্থান। বিগত নির্বাচনে এই দল লোকসভায় ১৮টি আসন লাভ করিয়াছে।

এই দলের নীতি হইল কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক নীতির বিরোধিতা করা। এই দল ভারতীয় আদর্শে ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠনের পক্ষপাতী। ইঁহারা বিদেশী ঋণ গ্রহণের পরিবর্তে দেশীয় মূলধনের সাহায্যে শিল্পের উন্নতি চাঁন এবং কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির উপর অধিকতর গুরুত্ব দেন। পররাষ্ট্র সম্পর্কে ইঁহারা ভারতের বর্তমান নিরপেক্ষ নীতি বর্জন করিবার পক্ষপাতী।

হিন্দু মহাসভা—Hindu Mahasava

ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে হিন্দু মহাসভা অপেক্ষাকৃত পুরাতন রাজনৈতিক দল। সাধারণ সমাজব্যবস্থার সংস্কার-সাধন করা এই দলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইলেও পরবর্তী কালে এই দল ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। পরবর্তী কালে এই দল উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠে ও মুস্লিম লীগের বিপরীত দল হিসাবে হিন্দুর স্বার্থসংরক্ষণে বিশেষ যত্নবান্ হয়। ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করিয়া ভারতে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য।

বর্তমানে এই দল ইহার সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া সমাজহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছে। হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও বর্তমানে এই দলের সদস্য হইতে পারে। কিন্তু বিগত নির্বাচনের ফলে দেখা যায় যে, বর্তমানে ভারতীয় জনসাধারণের উপর এই দলের আর বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই।

এতদ্ব্যতীত ভারতে আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে **ভারতীয় জনসংঘ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দলটি পরলোকগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক গঠিত হয় এবং তাঁহার জীবদ্দশায় অতি

অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতে ইহার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। এই দলের সমর্থকগণের মধ্যে কিছু অ-হিন্দু সদস্যও ছিল। দিল্লী, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জিলায় ইহার বিশেষ প্রভাব ছিল। নেতার মৃত্যুর পর এই দলের প্রভাব বিশেষভাবে হ্রাস পায়। এই দল অনেক পরিমাণে হিন্দু মহাসভার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল এবং কার্যক্ষেত্রেও হিন্দু মহাসভার সহিত একযোগে কংগ্রেস-অনুসৃত নীতির বিরোধিতা করিত।

তপশীলী ফেডারেশন, মুস্লিম লীগ ও রামরাজ্য পরিষদ নামক আরও তিনটি ক্ষুদ্র দল বিগত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য—Features of the Indian Federation

ভারতের শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অন্তরালে এই শাসনতন্ত্রে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার একাধিক নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ, এই শাসনতন্ত্র এক-কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই শাসনতন্ত্রে স্থান পাইলেও ইহার কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য—Federal Features

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় এই যুক্তরাষ্ট্রেও কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ ও বণ্টন (Division and Distribution of Powers) হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, একটি বিশদভাবে লিখিত শাসনতন্ত্র কর্তৃক ক্ষমতা বিভক্ত হইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ন্যায় ভারতের শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত নয়, সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই শাসনতন্ত্র অনমনীয়ও বটে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মত ভারতেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিচারালয় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসা করে। চতুর্থতঃ, এই শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য-গুলি ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—Unitary Features

ভারতের শাসনতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে ইহার মূলতঃ এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রবণতা দৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ বলা যায় যে, ভারতের শাসনতন্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্র দ্বারা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন, প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র নির্ধারিত হয় নাই, পরন্তু রাজ্য সরকারগুলিও এই একই শাসনতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজ্য সরকারগুলির নিজস্ব কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সদস্য রাজ্যগুলির রাজনৈতিক সমতা (Political equality of States); ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা হয় নাই। তৃতীয়তঃ, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা-বণ্টন নীতি যেরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির শাসনভার অর্পিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রে একটি সুদীর্ঘ যুগ্ম বিষয়ের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ক্ষমতা-বণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এই উভয় ব্যবস্থা দ্বারা রাজ্য সরকারগুলির যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ স্বাধীন সত্তা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, সমগ্র ভারতের জন্য একদফা নাগরিকত্ব, একটিমাত্র আপীল আদালত ও একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য সূচিত হয়। ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে অনায়াসে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলির শাসনকার্য পরিচালিত হইতে পারে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। পরিশেষে ভারতের শাসনতান্ত্রিক আইনানুসারে ভারতের যে-কোন রাজ্যের সীমানা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টসভা কর্তৃক পরিবর্তিত হইতে পারে। উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্র মূলতঃ এক-কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার আদর্শে গঠিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র

উনিশ শত উনপঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে নূতন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয় ও উনিশ শত পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দের ছাব্বিশে জানুয়ারী হইতে নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসন-

ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে পনরটি রাজ্য ও আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও এই শাসন-ব্যবস্থায় এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই ব্যবস্থায় সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব আনয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতীয় নাগরিক ও মৌলিক অধিকার

সর্বভারতে এক-নাগরিকত্ব বলবৎ করা হইয়াছে। নাগরিক অধিকার অনেক পরিমাণে সহজলভ্য করা হইয়াছে। সংবিধান কর্তৃক ভারতীয় নাগরিকগণের প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকার-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে এই অধিকারগুলি রক্ষার জন্য নাগরিকগণ যাহাতে আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলি হইল :

১। আইনের চক্ষে সমানাধিকার, ২। স্বাধীনতার অধিকার, ৩। ধর্মসম্পর্কিত অধিকার, ৪। সম্পত্তির অধিকার, ৫। শিক্ষা ও কৃষ্টিগত অধিকার, ৬। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অন্যায় ও অবিচার-প্রতিকারের অধিকার।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি

মৌলিক অধিকার ব্যতীত ভারতের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি স্থান পাইয়াছে। এগুলি স্বাধীন আয়ারের শাসনতন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই নীতিগুলি শাসনকার্যে ও আইন-প্রণয়নে শাসনকর্তৃপক্ষের সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যাহাতে একটি জনহিতকর সমাজব্যবস্থা গঠিত হয়, তদুদ্দেশ্যেই এই নীতিগুলি শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে; নীতি হিসাবে প্রশংসনীয় হইলেও এগুলির বিশেষ কোন কার্যকারিতা আছে বলিয়া মনে হয় না, কেন-না, এই নীতিগুলি উপেক্ষিত হইলেও এগুলিকে আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা : রাষ্ট্রপতি

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং এই ক্ষমতা তিনি স্বয়ং অথবা অধস্তন কর্মচারীর দ্বারা পরিচালনা করিবেন। পার্লামেন্ট

সভার উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক এবং রাজ্যগুলির নিম্নপরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি গোপন ও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটপদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবেন। তাঁহাকে ভারতীয় নাগরিক ও অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই। তাঁহার কার্যকাল ৫ বৎসর, তবে তিনি পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিলে পার্লামেণ্টের যে-কোন কক্ষের অভিযোগক্রমে উহার ⅔ অংশ সংখ্যক সদস্যের সমর্থনে ও অন্য কক্ষের ⅔ অংশ সংখ্যক সদস্য কর্তৃক ঐ অভিযোগ গৃহীত হইলে, তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের একজন উপ-রাষ্ট্রপতিও পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত হন। তিনি সাধারণতঃ রাজ্যপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং রাষ্ট্রপতির সাময়িক অনুপস্থিতিকালে তাঁহার কার্য পরিচালনা করেন।

শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। শাসনবিষয়ক ক্ষমতা ব্যতীত আইন-প্রণয়নে ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে। তিনি কিছু বিচারবিষয়ক ক্ষমতার অধিকারী। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তিনটি কারণে বিশেষ জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিতে পারেন এবং জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে তিনি মৌলিক অধিকারগুলিকে স্থগিত রাখিতে পারেন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত করিতে পারেন।

মন্ত্রিপরিষদ

রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য পার্লামেণ্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কতিপয় সদস্য লইয়া মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ হইল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী এবং শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এই পরিষদ আইনসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকিবে। একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিষদের কার্য পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রপতির হস্তে শাসনতন্ত্র কর্তৃক যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রযুক্ত হয়; সুতরাং শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত এই ব্যাপক ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব ও পদমর্যাদা সূচিত করে। নীতিগতভাবে মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী হইলেও, কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারা গঠিত বলিয়া কি আইন-প্রণয়নে, কি অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে, কি নীতি-নির্ধারণে, সর্ববিষয়ে আইনসভার কার্য নিয়ন্ত্রণ করে।

আইনসভা : পার্লামেণ্ট

রাষ্ট্রপতিসহ রাজ্যসভা ও লোকসভা লইয়া ভারতের পার্লামেণ্ট সভা গঠিত।

অনধিক ২৫০ জন সদস্য লইয়া রাজ্যসভা গঠিত এবং অনধিক ৫০০ জন সদস্য লইয়া লোকসভা গঠিত হয়। উচ্চপরিষদের ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন এবং নিম্নকক্ষেও বিশেষ শ্রেণীর জন্য আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। নিম্নকক্ষের কার্যকাল ৫ বৎসর। উচ্চকক্ষের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রত্যেক দুই বৎসর পর অবসর গ্রহণ করেন।

আইন পাস করিতে গেলে উভয় পরিষদের সম্মতি প্রয়োজন। মতবিরোধ ঘটিলে যুক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা আছে এবং যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের ভোটে পাশ হইলে বিল আইনে পরিণত হয়। কি সাধারণ আইন-প্রণয়নে, কি অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়নে, ভারতে নিম্নপরিষদই হইল অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী।

সুপ্রিম কোর্ট—একজন প্রধান বিচারপতি ও বর্তমানে ১৩ জন বিচারপতি লইয়া ভারতের সুপ্রিম কোর্ট গঠিত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া ও প্রয়োজনক্ষেত্রে অন্যান্য প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করেন। বিচারপতিগণের নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকা চাই এবং শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত বিশেষ পদ্ধতি ব্যতীত তাঁহাদিগকে অপসারিত করা যায় না।

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখা এবং মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করা ব্যতীতও সুপ্রিম কোর্টের তিন প্রকার কার্য করিতে হয়।

১। আদিম বিচারকার্য, ২। আপীল বিচারকার্য—দেওয়ানী ও ফৌজদারী, এবং ৩। আইনবিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান।

রাজ্যসরকার: রাজ্যপাল—প্রত্যেক রাজ্যে বর্তমানে একজন রাজ্যপাল আছেন। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁহার প্রকৃত কোন ক্ষমতা নাই।

মন্ত্রিপরিষদ—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের অনুরূপভাবে প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রিসহ একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের অনুরূপভাবেই ইঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং এইজন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন।

রাজ্য আইনসভা—বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা রাজ্যপালসহ দুইটি

পরিষদ ও অন্য রাজ্যসমূহের আইনসভা রাজ্যপালসহ একটি পরিষদ লইয়া গঠিত উচ্চকক্ষের মোট সদস্যসংখ্যা নিম্নকক্ষের সদস্যসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের অধিক বা ৪০এর কম হইতে পারে না। নিম্নকক্ষের সদস্যগণের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৫০০ এবং সর্বনিম্ন সংখ্যা ৬০ জন। উচ্চকক্ষের সদস্যগণ বিভিন্ন নির্বাচনকেন্দ্রের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন ও কিছুসংখ্যক সদস্য রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। নিম্নকক্ষের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটদান পদ্ধতিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

রাজ্য আইনসভাগুলির কার্য সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভার অনুরূপ পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়।

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল—হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও লাক্ষাদ্বীপের শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন শাসকের মাধ্যমে এগুলির শাসনকার্য পরিচালিত হয়। ইহা কার্যতঃ কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন-পদ্ধতি—সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভারতের শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় আখ্যা দেওয়া হয়। পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে এই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। ১। শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে পার্লামেণ্টের যে-কোন কক্ষে সংশোধন প্রস্তাব একটি বিলের আকারে উত্থাপন করিতে হইবে। সংশোধন-প্রস্তাব বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইতে হইলে প্রত্যেক কক্ষে উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাধিক্য ভোটে ও সমগ্র সদস্যবৃন্দের সংখ্যাধিক্যে অনুমোদিত হওয়া এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করা চাই। ২। কতিপয় নির্দিষ্ট-ক্ষেত্রে যথা, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-ব্যবস্থা, সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়-সংক্রান্ত বিষয়, আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার বণ্টনপদ্ধতি প্রভৃতি পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত সংশোধন-প্রস্তাব রাজ্য আইনসভাগুলির অর্ধেক কর্তৃক গৃহীত হওয়া চাই। ৩। নূতন রাষ্ট্রগঠন বা বর্তমান রাষ্ট্রগুলির পুনর্গঠন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আবার পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ অধিবেশনে সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংশোধন করিতে পারে।

ভারতের দলীয় অবস্থা—অশিক্ষা ও পরাধীনতার জন্য ভারতে বৃটিশ শাসনকালে কোন প্রকৃত রাজনৈতিক দল গঠিত হইতে পারে নাই। একমাত্র জাতীয় কংগ্রেস সভাই ভারতের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারে। প্রধানতঃ কংগ্রেসের চেষ্টায় ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। বর্তমানে এই

রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের জন্ম গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। বৈদেশিক ব্যাপারে এই দল নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে।

ভারতের সাম্যবাদী দল বর্তমানে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। এই দল রুশীয় সাম্যবাদের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হইয়া ভারতে সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী।

এতদ্ব্যতীত প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল, হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের কোনটিরই বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই।

প্রশ্ন ও উত্তর—উনবিংশ অধ্যায়ের পর দ্রষ্টব্য।

সপ্তদশ অধ্যায়

স্থানীয় শাসন

(Local Government)

স্থানীয় শাসন কাহাকে বলে ?—What is Local Government ?

একটি দেশকে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশ শাসন করিবার জন্য পৃথক শাসন-ব্যবস্থা থাকে, তখন ইহাকে স্থানীয় শাসন বলা হয়। সমগ্র ভারত কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত। রাজ্যগুলিকে আবার কতকগুলি বিভাগে (Division) ভাগ করা হইয়াছে। আবার বিভাগগুলি কতকগুলি জেলা (District) লইয়া গঠিত। জেলাগুলি আবার কতকগুলি মহকুমা (Sub-division) লইয়া গঠিত। মহকুমায় কতকগুলি থানা (Police Station) থাকে এবং থানার অধীনে ছোট-বড় অনেক গ্রাম (Village) থাকে। রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম পর্যন্ত প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব কতকগুলি সমস্যা থাকে এবং ঐ সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রত্যেকটি অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

বিভাগ ও বিভাগীয় শাসনকর্তা—Division and Divisional Commissioner

কতকগুলি জেলা লইয়া একটি বিভাগ গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে দুইটি বিভাগ আছে ; যথা, ১। প্রেসিডেন্সি বিভাগ, ও ২। বর্ধমান বিভাগ। প্রেসিডেন্সি বিভাগ—কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম-দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং এই ৯টি জেলা লইয়া গঠিত। হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম এই ৬টি জেলা বর্ধমান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর হইতে পুরুলিয়া ও পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রত্যেক বিভাগে একজন বিভাগীয় কমিশনার থাকেন। ইনি ভারতীয়

শাসন বিভাগের (I. A. S.) অভিজ্ঞ কর্মচারী। তাঁহার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলির শাসনকার্যের তদারক করা ছাড়াও তিনি বিভাগীয় ভূমি-রাজস্ব ও নাবালকের সম্পত্তিরক্ষা বিষয়ের অধিকর্তা। তিনি জেলাশাসক ও রাজ্য-সরকারের মধ্যে যোগসূত্র।

জেলাশাসক—The District Magistrate and Collector

জেলাগুলিই হইল ভারতের শাসন-ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ এবং জেলার শাসকই হইলেন শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃত মেরুদণ্ড। প্রত্যেক জেলায় একজন জেলাশাসক থাকেন। তিনি একদিকে জেলাশাসনের সর্বময় কর্তা, অপরদিকে জেলার রাজস্ব আদায় করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে। ইহা ছাড়া, তিনি আবার ফৌজদারী মামলার বিচারও করিয়া থাকেন। উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় তাঁহাকে ডেপুটি কমিশনার বলা হয়। জেলাশাসক পূর্বে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় শাসন-বিভাগীয় কৃত্যকের (I. A. S.) কর্মচারী। কখনও কখনও প্রাদেশিক শাসন-বিভাগীয় কৃত্যকের অভিজ্ঞ কর্মচারীকে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়।

জেলাশাসকের প্রধানতঃ তিন রকমের কাজ করিতে হয়। জেলার প্রধান শাসনকর্তা হিসাবে তাঁহাকে জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয়। এইজন্য তাঁহাকে পুলিশের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। জেলাশাসনের অন্যান্য বিষয়গুলি তাঁহাকে তদারক ও পরিদর্শন করিতে হয়। কৃষি, চিকিৎসা, জেল, সেচ, বন ও জেলার শিক্ষাব্যবস্থা তাঁহাকে তদারক করিতে হয়। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ হইলে ইহার প্রতিকারের দায়িত্ব জেলাশাসকের উপর ন্যস্ত। তাঁহাকেই কৃষি ঋণদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড ও গ্রাম পঞ্চায়েৎ-গুলির কার্যের উপর দৃষ্টি রাখাও তাঁহার অন্যতম দায়িত্ব। তাঁহাকেই জেলাশাসন সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করিতে হয়। জেলার কোন অংশে কোন অশান্তি ঘটিলে তাঁহাকেই পুলিশের সাহায্যে অশান্তি দূর করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ম্যাজিস্ট্রেট হইলেন আবার কালেক্টর অর্থাৎ জেলার ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত। প্রত্যেক জেলায় যে সরকারী কোষাগার (Treasury) থাকে, তাহার ভারও জেলাশাসকের উপর ন্যস্ত থাকে। সরকারী খাসমহল ও নাবালকের সম্পত্তি পরিচালনা তাঁহাকেই

করিতে হয়। ইহা ছাড়া, জেলার অধিকর্তা হিসাবে তাঁহাকে অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানেও যোগদান করিতে হয়।

তৃতীয়তঃ, তিনি ফৌজদারী মামলার বিচার করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হইতে আনীত আপীল মামলাগুলির বিচার করিতে পারেন।

উপরে জেলাশাসকের কার্যের যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা হইতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, অসাধারণ কর্মশক্তি না থাকিলে জেলাশাসকের কার্য সুষ্ঠুভাবে করা দুঃসাধ্য। এইজন্য প্রতিযোগিতামূলক লিখিত, মৌখিক ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন যুবকগণকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। জেলাশাসককে শুধু সু-শাসক হইলে চলিবে না, তাঁহার উপর জেলার হাজার হাজার লোকের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। এজন্য তাঁহার মধ্যে জনপ্রিয় নেতার গুণ থাকা চাই। শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন হইল জেলাশাসকের প্রধান কর্তব্য। এজন্য একদিকে যেরূপ তাঁহাকে কঠোর হইতে হয়, অপর দিকে সেইরূপ কোমল-স্বভাব ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হয়। জনসাধারণের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া তাহাদের অসুবিধা দূর করিয়া সুবিধা সৃষ্টি করাই হইল জেলাশাসকের পবিত্র কর্তব্য।

ভারতে জেলাশাসকের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। জেলাশাসক একদিকে জেলার শাসক, আবার অপর দিকে বিচারক। ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি অনুযায়ী একই ব্যক্তির হস্তে শাসনক্ষমতা ও বিচার-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকা সমীচীন নহে, কারণ জেলাশাসক পুলিশের কর্তা হিসাবে যাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন আবার বিচারক হিসাবে তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন। একই ব্যক্তির হস্তে উভয়বিধ ক্ষমতা থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি সুবিচার পাইতে পারে না এবং এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। এই কারণে ম্যাজিস্ট্রেটের হাত হইতে বিচার-ক্ষমতা সরাইয়া লওয়া উচিত। নূতন শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগের পৃথকীকরণ-নীতি স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভারতের কয়েকটি রাজ্যসরকার ইতিমধ্যে কার্যক্ষেত্রে এই নীতি বলবৎ করিতেছেন।

মহকুমা শাসন—Administration of Sub-division

প্রত্যেক জেলা কতকগুলি মহকুমা লইয়া গঠিত। প্রত্যেক মহকুমায় একজন

মহকুমা-শাসক থাকেন। তিনি মহকুমার সর্ববিষয়ের শাসনকর্তা হইলেও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার কার্যের তদারক করেন।

থানা—Police Stations

পল্লী অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া একটি থানা গঠিত হয়। থানায় পুলিশের একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (Officer-in-charge—O. C.) থাকেন। তাঁহার দুই-একজন সহকারী থাকেন। ইহা ছাড়া, কয়েকজন কনেস্টবল থাকে। গ্রামে গ্রামে চৌকিদার ও দফাদার থাকে। থানার মধ্যে কোনও শান্তিভঙ্গ হইলে বা অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে চৌকিদার থানায় সংবাদ দেয়। প্রত্যেক জেলায় পুলিশের একজন পদস্থ কর্মচারী (Superintendent of Police) থাকেন। তিনি জেলার সমস্ত পুলিশের কার্য পরিদর্শন করেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন—Local Self-Government

গ্রাম, নগর প্রভৃতি প্রত্যেক স্থানীয় অঞ্চলের কতকগুলি স্থানীয় সমস্যা থাকে। যদি স্থানীয় লোকের দ্বারা এই স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান হয়, তাহা হইলে স্থানীয় লোকে সাধারণ-সম্পর্কিত কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা সহযোগিতার ভিত্তিতে তাহাদের সাধারণ-সম্পর্কিত স্বার্থগুলি রক্ষা করিবার শিক্ষা পায়। দূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা স্থানীয় লোকে স্থানীয় সমস্যাগুলির দ্রুত ও অপেক্ষাকৃত ভালভাবে সমাধান করিতে পারে। সুতরাং স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার সাহায্যেই গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকরী করা সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্যে ইংরাজ শাসনকাল হইতেই ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করা হয়। ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনের সাহায্যে ভারতে শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরে বিশেষ আইনের বলে কর্পোরেশন ও অন্যান্য শহরে মিউনিসিপালিটি গঠিত হয়। যেখানে সেনানিবাস থাকে সেখানে ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড সৃষ্টি হয়। গ্রামাঞ্চলের জন্য জেলায় জেলায় জেলা বোর্ড, মহকুমায় লোকাল বোর্ড অথবা তালুক বোর্ড এবং গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম পঞ্চায়েতের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানের গঠন, কার্য ও আয়-ব্যয়ের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

পৌর-প্রতিষ্ঠান

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান—Calcutta Corporation

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পরলোকগত দেশনেতা সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিত্বকালে সৃষ্টি হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইহার প্রথম মেয়র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইহার প্রধান কর্মসচিব ছিলেন। ১৯৫১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানের পুরাতন গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া নূতন গঠনতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। ১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালে এই নূতন আইনটির কিছু পরিবর্তন করা হয়।

গঠনতন্ত্র—নূতন আইন অনুসারে ৮৬ জন সদস্য লইয়া কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান গঠিত। সাধারণ ভোটদাতৃগণ প্রত্যক্ষভাবে ৮০ জন সদস্য নির্বাচন করে এবং এই ৮০ জন সদস্য ভোট দিয়া ৫ জন অল্‌ডারম্যান নির্বাচন করে। ইহা ছাড়া, কলিকাতা নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের (Calcutta Improvement Trust) সভাপতি পদাধিকার বলে (Ex-officio) পৌর প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য হইয়া থাকেন। কর্পোরেশনের সদস্যগণকে কাউনসিলার বলা হয়। কাউনসিলার ও অল্‌ডারম্যানগণ ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। রাজ্যসরকার ইঁহাদের কার্যকাল একবৎসর বাড়াইয়া দিতে পারেন। বাৎসরিক প্রথম অধিবেশনের সময় কাউনসিলার ও অল্‌ডারম্যানগণ সদস্যগণের মধ্য হইতে এক বৎসরের জন্য একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন। মেয়র কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার কোন বেতন না থাকিলেও তিনি যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী। তিনি নগরের প্রথম ও প্রধান নাগরিক (First citizen) বলিয়া গণ্য হন। তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে ডেপুটি মেয়র কর্পোরেশনের সভার সভাপতিত্ব করেন।

বস্তি অঞ্চলে যাঁহারা মাসিক অন্ততঃ ৪৲ টাকা ভাড়া দেন অথবা অন্য অঞ্চলে যাঁহারা ৮৲ টাকা ভাড়া দেন বা যাঁহারা ম্যাট্রিকুলেশন অথবা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এইরূপ ২১ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণ কর্পোরেশনের ভোটার হইতে পারেন।

কতকগুলি ওয়ার্ড বা পল্লী লইয়া একটি অঞ্চল গঠিত হয় এবং এই পল্লীগুলির সদস্যগণকে লইয়া আঞ্চলিক কমিটি (Borough Commtitee) গঠিত হয়।

কর্পোরেশনের বিভিন্ন কাজের জন্য ১০ জন সদস্য লইয়া একটি স্থায়ী কমিটি

(Standing Committee) গঠিত হয়, কিন্তু কোন সদস্যই একটির অধিক কমিটির সদস্য হইতে পারেন না। সর্বসমেত ৯টি বিভাগীয় কমিটি আছে, যথা—

১। শিক্ষা কমিটি
২। জনস্বাস্থ্য কমিটি
৩। গৃহ নির্মাণ কমিটি
৪। জল সরবরাহ কমিটি
৫। নগর পরিকল্পনা ও উন্নতি কমিটি
৬। অর্থ-সংক্রান্ত কমিটি
৭। জনকল্যাণ ও বাজার কমিটি
৮। ওয়ার্কস্ কমিটি
৯। হিসাব রক্ষক কমিটি

কর্পোরেশনের সভায় সমস্ত সদস্য মিলিত হইয়া কাজের নীতি ও তালিকা স্থির করেন। সভায় যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়, তাহা স্থায়ী কর্মচারিগণ কার্যে রূপদান করেন। এজন্য কর্পোরেশনে একজন মুখ্য কর্মসচিব (Chief Commissioner), একাধিক উপ-কর্মসচিব, মুখ্য এঞ্জিনিয়ার, মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকার ও আরও অসংখ্য কর্মচারী আছেন। মুখ্য কর্মসচিব হইলেন কর্পোরেশনের স্থায়ী কর্মচারিগণের প্রধান। ইনি রাজ্যসরকার কর্তৃক রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সুপারিশক্রমে নিযুক্ত হন। অন্যান্য কর্মচারিগণ কর্পোরেশন কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও মুখ্য এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি উচ্চপদের নিয়োগগুলি রাজ্যসরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ।

পৌর-প্রতিষ্ঠানের কাজ—Functions of the Corporation

কলিকাতা কর্পোরেশনের বহুবিধ কাজ করিতে হয়। কাজগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়; জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-সুবিধা এবং জন-শিক্ষা (প্রাথমিক)। এই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন শহরের রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি নির্মাণ করে। রাস্তাগুলির নামকরণ করা, পরিষ্কার করা, জল দেওয়া ও রাত্রিকালে আলো দেওয়া এবং শহরে পরিশ্রুত ও অপরিশ্রুত জল সরবরাহ করা কর্পোরেশনের কাজ। কলের জল ছাড়াও এজন্য কর্পোরেশন শহরের মধ্যে বহু নলকূপ খনন করিয়াছে। কর্পোরেশন শহরে বাড়ী-ঘরদুয়ার নির্মাণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। ইহার অনুমতি ব্যতীত কেহ গৃহাদি নির্মাণ কবিতে পারে না। জননিরাপত্তা রক্ষার জন্য কর্পোরেশন জীর্ণ বাড়ী, ঘর-দুয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। জনস্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে হাসপাতাল, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য করে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে টিকা দিবার ব্যবস্থা করে এবং শহরের ময়লা ও আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করে। কর্পোরেশন বাজার প্রতিষ্ঠা করে এবং পশুহত্যা-শালা স্থাপন করে। হিন্দুদের জন্য শ্মশান এবং

মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণের জন্য গোরস্থান স্থাপন ও সংরক্ষণও কর্পোরেশনের কাজ। কলিকাতা কর্পোরেশনের আর একটি কাজ হইল শহর এলাকার অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন অগ্নিনির্বাপক-বাহিনী (Fire Brigade) গঠন করিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের আর একটি কৃতিত্ব হইল যে, ইহা শহর এলাকায় বহু অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ইহাদের সাহায্যে বিশেষ করিয়া দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতেছে। শহরের বহু গ্রন্থাগারকে কর্পোরেশন অর্থসাহায্য করে। শহরের লোকের জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব রাখে। কর্পোরেশনের নিজস্ব একটি প্রদর্শনী আছে। দেশীয় শিল্পগুলিকে উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যেই নিছক দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়।

পৌর-প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস—Sources of Income

উপরে কর্পোরেশনের কাজের যে দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হইল তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই নানাবিধ কার্যের জন্য বহু অর্থ ব্যয় হয়। ব্যয় সংকুলান করিবার জন্য কর্পোরেশন নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে অর্থ সংগ্রহ করে :—

১। বাড়ী ও জমির মূল্যের উপর কর (Rate), ২। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উপর কর, ৩। গরু, কুকুর প্রভৃতি পশুর উপর ও শকটাদি যান-বাহনের উপর কর, ৪। রাজ্যসরকার কর্তৃক আদায়ীকৃত মোটর গাড়ীর উপর ধার্য করের একটি অংশ, ৫। কর্পোরেশনের নিজস্ব বাজার ও অন্যান্য সম্পত্তি হইতে আয়, ৬। রাজ্যসরকার কর্তৃক অর্থসাহায্য, ৭। রাজসরকারের অনুমতি লইয়া ঋণগ্রহণ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাৎসরিক আয় আড়াই কোটি টাকারও অধিক। এই বিপুল আয় জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-সুবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষামূলক কার্যে ব্যয় হয়। ইদানীং কর্পোরেশনের কার্যে নানাবিধ দুর্নীতি ও অযোগ্যতা দেখা যায়। এইজন্য কয়েক বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে বাতিল করিয়া ইহার পরিচালনা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নাগরিকগণ যতদিন পর্যন্ত তাঁহাদের পৌর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত না হইবেন ততদিন পর্যন্ত পৌর প্রতিষ্ঠানের কাজ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে পারিবে না।

সাধারণ পৌর-প্রতিষ্ঠান—Municipalities

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক জেলা, মহকুমা বা অনেক সময়ে বর্ধিষ্ণু গ্রামেও সাধারণ পৌর প্রতিষ্ঠান থাকে। কোন পৌর প্রতিষ্ঠানের

সদস্যসংখ্যা ৯এর কম বা ৩০ এর অধিক হইতে পারিবে না। শহরের করদাতাগণ প্রত্যক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতিতে এই সদস্যগণকে (Commissioners) নির্বাচিত করেন। পৌর প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল ৪ বৎসর কিন্তু সরকার ইচ্ছা করিলে ইহা একবৎসর বাড়াইতে পারেন। সদস্যগণ একজন সভাপতি (Chairman) ও এক বা একাধিক সহ-সভাপতি (Vice-Chairman) নির্বাচন করেন। কর্পোরেশনের ন্যায় সাধারণ পৌর প্রতিষ্ঠানেও একজন প্রধান কর্মসচিব, স্বাস্থ্যাধিকার ও এঞ্জিনিয়ার থাকেন। পৌর প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করিলে বিশেষ কাজের জন্য স্থায়ী কমিটিও নিযুক্ত করিতে পারে। যে সমস্ত পৌর প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয় একলক্ষ টাকার অধিক তাহারা একজন প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive Officer) নিয়োগ করিতে পারে।

সাধারণ পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্য—Functions

কর্পোরেশনের ন্যায় এই প্রতিষ্ঠানগুলিরও জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-সুবিধা ও শিক্ষাবিষয়ক কার্য সম্পাদন করিতে হয়। রাস্তাঘাট-নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, জল ও আলো সরবরাহ, ময়লা জল ও আবর্জনা দূর করা, চিকিৎসালয় ও প্রসূতি-আগার স্থাপন করা, অগ্নিনির্বাপন, সংক্রামক ব্যাধিনিরোধ, প্রাথমিক শিক্ষাদান, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা প্রভৃতি সাধারণ পৌর প্রতিষ্ঠানের কার্য।

আয়—Income

পৌর প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস হইল :

১। জল ও আলো সরবরাহ ও ময়লা নিষ্কাশনের জন্য বাড়ী ও জমির উপর ধার্য কর, ২। ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, রিক্সা, ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের উপর ধার্য কর, ৩। ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণের উপর কর, ৪। খেয়া পারাপার ও সেতু পারাপার হইবার সময় লোকজন ও যানবাহনের উপর ধার্য কর, ৫। বাজার ও অন্যান্য সম্পত্তি হইতে আয়, ৬। সরকারী অর্থসাহায্য ও ৭। সরকারের অনুমতি লইয়া ঋণগ্রহণ।

ভারতের কয়েকটি রাজ্য শহরে আনীত দ্রব্য ও শহর হইতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের উপর কর (Octroi duty) ধার্য করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কোন পৌর প্রতিষ্ঠান এই কর ধার্য করে নাই।

সেনানিবাস প্রতিষ্ঠান—Cantonment Board

যেখানে সৈন্যগণ বাস করে সেখানে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই

প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা-বিভাগের কয়েকজন সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সরকার কর্তৃক মনোনীত হন।

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান—Rural Self-Government

শহরাঞ্চলের ন্যায় পল্লী অঞ্চলেও কতকগুলি স্থানীয় সমস্যা দেখা যায়। ভারতের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। সুতরাং গ্রামগুলির স্থানীয় সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান না হইলে শুধু শহরের উন্নতি করিয়া সমগ্র দেশের উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলেও তিন শ্রেণীর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া জেলা বোর্ড, ও প্রত্যেক মহকুমায় বা তালুকে একটি করিয়া স্থানীয় বোর্ড বা তালুক বোর্ড এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রামপঞ্চায়েৎ গঠিত হইয়াছে। বাংলাদেশ ও বোম্বাই রাজ্যে লোকাল বোর্ড তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, আবার আসামে জেলা বোর্ডের স্থানে লোকাল বোর্ড কাজ করে।

জেলা বোর্ড—District Board

অন্ততঃপক্ষে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া জেলা বোর্ড গঠিত হয়। জেলা বোর্ডে কতজন সদস্য থাকিবে তাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। যেখানে স্থানীয় বোর্ড আছে সেখানে স্থানীয় বোর্ডের সদস্যগণ জেলা বোর্ডের সদস্যগণকে নির্বাচন করেন এবং স্থানীয় বোর্ড না থাকিলে ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটদাতাগণ কর্তৃক জেলা বোর্ডের সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সদস্যগণের কার্যকাল ৪ বৎসর। বোর্ডের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করেন। বোর্ডের দৈনন্দিন কার্যের জন্য একজন কর্মসচিব, এঞ্জিনিয়ার ও স্বাস্থ্যাধিকার থাকেন।

কার্য—Functions

জেলা বোর্ডও জেলার শহর ব্যতীত মফঃস্বল অঞ্চলের বহুবিধ কার্য করিয়া থাকে। জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-সুবিধা ও শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়গুলির তত্ত্বাবধান করাই হইল ইহার প্রধান কর্তব্য। যাতায়াত ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের

সুবিধার জন্য বড় বড় রাস্তাঘাট, সেতু, খেয়া-পারাপার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, হাসপাতাল, চিকিৎসালয় ও প্রসূতি-আগার স্থাপন করা, পুষ্করিণী, কূপ ও নলকূপ খনন করিয়া জল সরবরাহ করা, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ নিবারণ করা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য দান করা, পশুরোগ নিবারণ করা, হাট-বাজার ডাকবাংলো ও খোঁয়াড় স্থাপন করা প্রভৃতি হইল ইহার কার্য।

জেলা বোর্ডের আয়—Income of the District Board

উপরি-উক্ত বিভিন্ন ধরণের কাজ করিবার জন্য বোর্ড নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে অর্থ সংগ্রহ করে: ১। ভূমি-রাজস্বের সহিত আদায়ীকৃত টাকার এক পয়সা হারে অতিরিক্ত কর (সেস্—cess)। ২। হাট-বাজার, খেয়া-পারাপার ও গবাদি পশু আটক রাখিবার খোঁয়াড় হইতে আয়। ৩। রাজ্যসরকার কর্তৃক অর্থসাহায্য ও ৪। রাজ্যসরকারের অনুমতি লইয়া ঋণগ্রহণ।

স্থানীয় বোর্ড—Local Board

স্থানীয় বোর্ডগুলি কমপক্ষে ৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয় এবং বোর্ডের সদস্যসংখ্যার ⅔ অংশ নির্বাচিত হন এবং ⅓ মনোনীত হন। সদস্যসংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সদস্যগণ একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। স্থানীয় বোর্ডগুলির নিজস্ব কোন কাজও নাই বা আয়ের কোন উৎসও নাই। সাধারণতঃ জেলা বোর্ডগুলির নির্দেশমত ইহারা কাজ করে এবং জেলা বোর্ডের সব কাজই স্থানীয় বোর্ডগুলি কর্তৃক নিষ্পন্ন হয়।

ইউনিয়ন বোর্ড—Union Board

প্রত্যেক গ্রাম বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ডের সদস্য-সংখ্যা ৬-এর কম ও ৯-এর বেশী হইতে পারে না। বোর্ডের সদস্যগণ ৪ বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হন। গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাগণের মধ্যে যাঁহারা ৬ আনা-হারে চৌকিদারী ট্যাক্স দেন অথবা ৮ আনা সেস্ দেন এরূপ ২১ বৎসর বয়স্ক লোক ভোটদাতা হইতে পারেন। উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্তে গ্রাম পঞ্চায়েৎ কাজ করে। বোর্ডের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (President) নির্বাচন করেন। সভাপতি হইলেন বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা।

কার্য—Functions

ইউনিয়ন বোর্ডও গ্রামের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে নানাবিধ কাজ করিয়া থাকে। গ্রামের রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ করা, পুষ্করিণী, কূপ ও নলকূপ খনন করিয়া জল সরবরাহ করা, টিকা দেওয়া ও ছোট ছোট চিকিৎসালয় স্থাপন করা, নালা-নর্দমা পরিষ্কার রাখা ইহার কার্য। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইহা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে বা অর্থ সাহায্য করে। গবাদি পশু আটক রাখিবার খোঁয়াড় রাখে, ছোটখাট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচারকার্যও অনেক সময় এই বোর্ডগুলি করে। ইহা ছাড়া, ইহার আর এক একটি প্রধান কাজ হইল চৌকিদার ও দফাদার সাহায্যে গ্রামের শান্তি রক্ষা করা।

আয়—Income

ইহার আয়ের প্রধান উৎস হইল ইউনিয়ন রেট বা চৌকিদারী ট্যাক্স ; দ্বিতীয়তঃ, লাইসেন্স ফি, জরিমানা ও খেয়াঘাট ও খোঁয়াড় হইতে আয় আদায় হয়। তৃতীয়তঃ, সরকার ও জেলা বোর্ডের নিকট হইতেও ইহা কিছু কিছু অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে।

ইহার ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক গ্রামের শান্তিরক্ষার জন্য চৌকিদার ও দফাদারের বেতন বাবদ দিতে হয়। সরকার নিযুক্ত সার্কেল অফিসার ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য পরিদর্শন ও তদারক করেন।

গ্রাম পঞ্চায়েৎ—Village Panchayet

১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্য আইনসভা একটি আইন পাস করিয়া নূতন একধরণের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে আমূল-পরিবর্তন ঘটিবে।

একটি গ্রামে বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একটি অঞ্চলে যতজন ভোটদাতা বাস করেন, তাঁহাদের লইয়া একটি **গ্রাম-পঞ্চায়েৎ** গঠিত হইবে। গ্রামসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে ৯ হইতে ১৫ জন সদস্য নির্বাচন করিয়া একটি গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠন করিবে। সরকার ইচ্ছা করিলে গ্রাম পঞ্চায়েতের ⅓ সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন, কিন্তু এই মনোনীত সদস্যগণের ভোট দিবার ক্ষমতা থাকিবে না। গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ ইউনিয়ন বোর্ডের কাজের অনুরূপ হইবে।

গ্রামের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা ও শিক্ষামূলক কার্য পরিচালনার ভার ইহার উপর ন্যস্ত থাকিবে।

কতকগুলি গ্রাম পঞ্চায়েৎ মিলিয়া একটি **অঞ্চল পঞ্চায়েৎ** গঠিত হইবে। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েৎ হইতে একজন সদস্য নির্বাচিত হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়েতের একজন কর্মসচিব থাকিবে। ইহাদের করধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং চৌকিদার ও দফাদার সাহায্যে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ইহার এলাকায় শান্তি রক্ষা করিবে।

প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি **ন্যায় পঞ্চায়েৎ** গঠন করিতে পারিবে। এই ন্যায় পঞ্চায়েৎ ছোটখাট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করিতে পারিবে।

অন্যান্য আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান—Other Self-governing Institutions

শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীতও অন্য আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ ধরণের কাজ করিবার জন্য গঠিত হইয়াছে।

কলিকাতা নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান—Calcutta Improvement Trust

একজন সভাপতি ও ১০ জন সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। সভাপতি ও অন্য ৪ জন সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান ৪ জন সদস্য মনোনীত করে এবং অপর দুই জন বিভিন্ন বণিকসভা কর্তৃক মনোনীত হন।

বড় বড় শহরগুলিতে বিশেষ করিয়া কলিকাতার মত বড় শহরে জনসংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গৃহসমস্যা একটি প্রধান সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। শহরে অভিজাত অঞ্চল ছাড়াও যে অসংখ্য বস্তি-অঞ্চল আছে তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়। নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য হইল বস্তি-অঞ্চলগুলি পরিষ্কার করিয়া আলো ও হাওয়ার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট কাজ করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠান অনেক বস্তি বিলোপ করিয়া নূতন সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছে। প্রচুর মুক্ত বায়ু ও আলোর জন্য বড় বড় রাস্তা করিয়াছে। কলিকাতার উত্তর, পূর্ব ও বিশেষ করিয়া দক্ষিণ অঞ্চলে ইহা বহু অব্যবহার্য জমির উন্নতি সাধন করিয়া ব্যবহারযোগ্য করিয়াছে। ইহাতে শহরবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সৌন্দর্য-বোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঢাকুরিয়া লেক খনন এই প্রতিষ্ঠানের এক বিরাট কৃতিত্ব।

কলিকাতা ছাড়া বোম্বাই, কানপুর প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতার পশ্চিম উপকণ্ঠে, হাওড়া শহরের উন্নতির জন্য এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কলিকাতা বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান—Calcutta Port Trust

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর বন্দরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রসারের জন্য বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। ২৪ জন সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। কলিকাতা কর্পোরেশন ও হাওড়া মিউনিসিপালিটি একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১ জন সদস্য মনোনীত করে এবং বিভিন্ন বণিকসভা কর্তৃক ১১ জন নির্বাচিত হয়। অবশিষ্ট সদস্যগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়।

বন্দর রক্ষা ও বন্দরের উন্নতি করাই হইল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য। এই উদ্দেশ্যে জেটি, ডক্ ও পোতাশ্রয় নির্মাণ করা ও মেরামত করা ইহার কর্তব্য। যে সমস্ত জাহাজ বন্দরে আসে তাহাদের পথ নির্দেশ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। গুদামঘর ও পণ্যাগার নির্মাণ ও ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। জলপথে জাহাজ ও স্টীমারগুলি যাহাতে নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে, সেজন্য ইহার এলাকাস্থিত জলপথ পরিষ্কার রাখিতে হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎস হইল জাহাজগুলির উপর বন্দরে আগম ও নিগম শুল্ক। ইহা ছাড়া, পণ্যাগার ও গুদামঘরের ভাড়া হইতেও অর্থ সংগৃহীত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

স্থানীয় শাসন

একটি দেশ ছোট ছোট এলাকায় বিভক্ত হইয়া যখন প্রত্যেকটি এলাকার স্থানীয় শাসনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয়, তখন এই স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থাকে স্থানীয় শাসন বলা হয়।

বিভাগ ও বিভাগীয় শাসন

একটি রাজ্যকে কতকগুলি বিভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক বিভাগে একজন কমিশনার থাকেন।

জেলা-শাসক

কতকগুলি জেলা লইয়া বিভাগ গঠিত। জেলাগুলিই হইল শাসন-ব্যবস্থার প্রাথমিক উপাদান। জেলায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর থাকেন। তিনি সাধারণতঃ ভারতীয় শাসন পরিচালনা কৃত্যকের কর্মচারী। তিনি জেলার সর্বময় কর্তা। তাঁহার বিচার-ক্ষমতাও আছে।

মহকুমা-শাসক

জেলাগুলি কতকগুলি মহকুমা লইয়া গঠিত হয়। প্রত্যেক মহকুমায় একজন মহকুমা-শাসক থাকেন। মহকুমার অধীনে কতকগুলি থানা থাকে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

স্থানীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় লোকের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত শাসন-ব্যবস্থাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলা হয়।

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান

৮৬ জন সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। সদস্যগণের মধ্যে ৫ জন অল্‌ডারম্যান থাকেন। সকল সদস্য মিলিয়া একবৎসরের জন্য একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন। সদস্যগণ ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-সুবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষা হইল পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। এই কাজের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা বাড়ী ও জমির মূল্যের উপর কর, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর কর, সরকারী সাহায্য ইত্যাদি উপায়ে সংগৃহীত হয়।

সাধারণ পৌর-প্রতিষ্ঠান

অন্যান্য শহরে ৯ হইতে ৩০ যে-কোন্ সংখ্যক নির্বাচিত সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলি গঠিত হয়। সদস্যগণ একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করেন। ইহাদের আয় ও ব্যয় কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়ের অনুরূপ।

জেলা বোর্ড

গ্রামাঞ্চলে জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি থাকে। কমপক্ষে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া জেলা বোর্ড গঠিত হয়। একজন নির্বাচিত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও কয়েকজন স্থায়ী কর্মচারী থাকেন। জেলার মধ্যে পানীয় জল

সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা, রোগনিবারণ করা, রাস্তাঘাট ও হাট-বাজার প্রভৃতি তৈয়ারী করা হইল ইহার কার্য। সেস্‌ ও সরকারী সাহায্য হইল ইহার প্রধান আয়।

স্থানীয় বোর্ড

মহকুমায় বা তালুকে এই বোর্ড গঠিত হয়। কমপক্ষে ৬ জন সদস্য থাকে। ইহার নিজস্ব কোন আয়-ব্যয় নাই। জেলা বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে জেলা বোর্ডের নির্দেশমত ইহা কাজ করে।

ইউনিয়ন বোর্ড ও গ্রাম পঞ্চায়েৎ

৬ হইতে ৯ জন সংখ্যক সদস্য লইয়া প্রতি গ্রামের বা কয়েকটি গ্রামের জন্য একটি বোর্ড গঠিত হয়। গ্রামের শান্তিরক্ষা এবং স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, জল-সরবরাহ প্রভৃতি কার্যের ব্যবস্থা করে। শান্তিরক্ষার জন্য বোর্ড চৌকিদার রাখে। চৌকিদারী ট্যাক্স হইল ইহার প্রধান আয়। অনেক জায়গায় বোর্ডের পরিবর্তে গ্রাম পঞ্চায়েৎ আছে। ১৯৫৬ সালের নূতন আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে নূতন ধরণের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা গঠন করা হইয়াছে।

প্রশ্ন ও উত্তর—উনবিংশ অধ্যায়ের পর দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পৌর সমস্যা

(Civic Problems)

পৌর সমস্যা কাহাকে বলে ?—What are civic problems ?

লোকে শহরে বা গ্রামে বাস করে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পরিচালনা করিতে প্রত্যেক লোকেরই কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় এবং এই সমস্যাগুলির যদি সন্তোষজনক সমাধান না হয় তাহা হইলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশ সম্ভব হয় না; আমাদের দেশে জাতীয় জীবনের প্রধান সমস্যা ছিল পরাধীনতা। দেশ স্বাধীন হইবার পর এই সমস্যা দূর হইলেও অন্য যে সমস্ত সমস্যা গুরুতররূপে দেখা দিয়াছে তন্মধ্যে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও ব্যাধি হইল ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যাগুলির সমাধান না করিতে পারিলে জাতীয় জীবনের উন্নতি অসম্ভব।

গ্রামোন্নয়ন—Village improvement

ভারতে শতকরা প্রায় ৮৫ জন লোক গ্রামে বাস করে। সুতরাং গ্রামগুলির উন্নতি করিতে না পারিলে জাতীয় উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। গ্রামে যাহারা বাস করে তাহাদের অধিকাংশের জীবনযাত্রার মান অতি নিম্নস্তরের। খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান ও সুচিকিৎসার অভাব হইল গ্রামোন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। ইহাছাড়া শিক্ষার অভাবে নানা কু-সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দাস হওয়ার ফলে তাহাদের মানসিক উন্নতিও বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং জাতীয় উন্নতি করিতে গেলে সর্বপ্রথম গ্রামীণ জীবনের উন্নতি একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে আমাদের জাতীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন বা গ্রামোন্নয়ন কার্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

সমাজোন্নয়ন কার্য—Community Development projects

জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যে (National Extension Service) সাহায্যেই গ্রামোন্নয়নের কার্য পরিচালিত হইবে। সমাজোন্নয়ন কার্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইল

গ্রামগুলির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে ফসল-উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি জনহিতকর সকল ব্যবস্থা একই সঙ্গে আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নলিখিতভাবে গ্রামোন্নয়ন কার্য পরিচালিত হইবে :—

প্রায় ৩০০ গ্রাম লইয়া এক একটি গ্রামোন্নয়ন অঞ্চল স্থাপিত হইবে। প্রত্যেক অঞ্চলে ২ লক্ষ লোক ও মোট দেড় লক্ষ একর আবাদী জমি থাকিবে। এইরূপ একটি উন্নয়নমূলক অঞ্চলকে আবার ১০০ গ্রাম ও ৬৫০০০ লোক লইয়া গঠিত তিনটি উন্নয়নমূলক কেন্দ্রে ভাগ করা হইবে। এই উন্নয়ন-মূলক কেন্দ্রগুলিকে আবার ১৫টি হইতে ২৫টি গ্রাম লইয়া গঠিত কয়েকটি উপকেন্দ্রে ভাগ করা হইবে। এই উপকেন্দ্রগুলিকে 'মণ্ডি' নাম দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং গ্রামোন্নয়ন কার্যের প্রাথমিক স্তর হইল মণ্ডি। কয়েকটি মণ্ডি লইয়া একটি উন্নয়নকেন্দ্র গঠিত হইয়াছে এবং কয়েকটি উন্নয়নকেন্দ্র লইয়া এক একটি উন্নয়নমূলক অঞ্চল স্থাপিত হইয়াছে। আজ পর্যন্ত এইরূপ প্রায় ৬০টি উন্নয়নমূলক অঞ্চল গঠিত হইয়াছে ও অধিকাংশ অঞ্চলের কার্য সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে।

গ্রামোন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক উন্নয়ন বিভাগে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

১। **গ্রাম**—প্রত্যেক গ্রামে পানীয় জলের জন্য দুইটি পুকুর, নলকূপ বা ইন্দারা খনন করা হইবে। যাতায়াতের জন্য পথঘাট নির্মিত হইবে ও প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।

২। **মণ্ডি**—প্রত্যেক মণ্ডিতে ডাক ও তার-অফিস খোলা হইবে। একটি করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকিবে। ইহা ছাড়া চিকিৎসালয়, বাজার, ফসল রাখিবার গুদাম, কুটিরশিল্প কেন্দ্র প্রভৃতি থাকিবে।

৩। **উন্নয়নমূলক কেন্দ্র**—প্রত্যেক কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিবে। ইহা ছাড়া গবাদি পশুর জন্য হাসপাতাল ও একটি কৃষি বিদ্যালয় থাকিবে।

৪। **উন্নয়নমূলক অঞ্চল**—প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করিয়া ছোট শহর গঠিত হইবে এবং নাগরিক জীবনের সব রকম সুবিধা সেখানে পাওয়া

যাইবে। আদালত, স্কুল-কলেজ,* কলকব্জা-মেরামতি কারখানা ও অন্য যাবতীয় ব্যবস্থা থাকিবে। গ্রামীণ জীবনের সমগ্র অভাব-অভিযোগই এই উন্নয়ন এলাকাস্থিত শহরে মিটাইবার ব্যবস্থা থাকিবে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল যে, গ্রামবাসিগণ যাহাতে তাহাদের সমবেত প্রচেষ্টার সাহায্যে নিজেদের অভাব-অভিযোগ দূর করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও ব্যাধি প্রভৃতি সমস্যাগুলি দূর হইবে। যে সমস্ত জায়গায় সমাজোন্নয়নমূলক কার্য আরম্ভ হইয়াছে, সে সমস্ত স্থানের অধিবাসিগণের অবস্থায় ইতিমধ্যেই অনেক উন্নতি হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ যদি এই সমাজোন্নয়ন কার্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যথাযথভাবে কাজ করেন তাহা হইলে আমাদের হতশ্রী গ্রামগুলির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। দেশের সরকারও এজন্য মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই বাবদ মোট ৯০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে আরও অধিক পরিমাণ ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলায় প্রায় ১০টি উন্নয়নমূলক কেন্দ্র গঠিত হইয়াছে। গ্রামবাসীদের উদ্যম ও সহযোগিতার উপর এই বিরাট পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য—National Extension Service

দেশে খাদ্যবৃদ্ধি সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেন এবং এই কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাস হইতে জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য প্রবর্তিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল গ্রামগুলির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করা এবং এই উন্নতির ফলে যাহাতে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া পল্লীবাসীর আয় বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করা।

২৫১টি ব্লক লইয়া জাতীয় সম্প্রসারণ-কার্য আরম্ভ হয়। প্রত্যেক ব্লক ১০০ হইতে ১২০টি গ্রাম লইয়া গঠিত এবং প্রত্যেক ব্লকে একজন করিয়া উন্নয়ন-কর্মচারী (Development Officer) নিযুক্ত থাকেন। কৃষি ও সমবায় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ২৬ জন গ্রামসেবক তাঁহার অধীনে গ্রামের উন্নতির জন্য তত্ত্বাবধান করিবে। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ বহুসংখ্যক ব্লক স্থাপিত হইয়াছে।

ছোট ও বড় শহর—Towns and Cities

গ্রাম ছাড়া ভারতে বহুসংখ্যক ছোট ও বড় শহর আছে। বড় বড় শহরের সংখ্যা নিতান্ত কম। এই সমস্ত শহরে বর্তমানে গৃহসমস্যাই হইল প্রধান সমস্যা। ইহা ছাড়া পানীয় জলের সরবরাহের স্বল্পতা, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব ও শিক্ষার অভাবই হইল প্রধান সমস্যা। বড় বড় শহরগুলিতে বস্তি অঞ্চল থাকার জন্য বহুলোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহও শহরের আর একটি প্রধান সমস্যা।

খাদ্য—Food

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে দেশে ভীষণ খাদ্যসমস্যা দেখা দেয় এবং এখনও পর্যন্ত এই সমস্যা একেবারে দূর হয় নাই। দেশবিভাগের ফলে ও পাকিস্তান হইতে অসংখ্য উদ্বাস্তু আসায় এই সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। সরকার খাদ্যবরাদ্দ স্থির করিয়া ও বিদেশ হইতে চাউল ও গম আমদানী করিয়া খাদ্যের চাহিদা পূরণ করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার ফলে দেশে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া দেশ অনেক পরিমাণে স্বাবলম্বী হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে এখনও পর্যন্ত খাদ্যশস্যের মূল্য কমে নাই, বরঞ্চ বৃদ্ধি পাইতেছে। নৈসর্গিক কারণে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ কম হওয়া ও ক্রমাগত উদ্বাস্তু আগমনের ফলে বর্তমানে দেশে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে। দেশের অধিকাংশ লোক ভাত খায়। ভাতের পরিবর্তে গমজাত খাদ্য গ্রহণ না করিলে আপাততঃ এই খাদ্যসমস্যা দূর হইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

খাদ্য সমস্যার কারণ নির্ণয় ও এই সমস্যার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। কমিটির মতে ভারতে খাদ্যের অভাবের কারণ হইল, (১) সরকার কর্তৃক খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষা সমাজোন্নয়ন কার্যের উপর বেশী জোর দেওয়া। কাজেই খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। (২) আর একটি কারণ হইল খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি। লোকের আয়বৃদ্ধি, মজুত করিবার ইচ্ছা ও খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে। (৩) ভারতে এমন কতকগুলি অঞ্চল আছে যেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন দুঃসাধ্য। এই সমস্ত ঘাটতি অঞ্চলের লোকের বর্তমানে বর্ধিত মূল্যে খাদ্য কিনিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং ভারতে খাদ্যশস্যের অভাব অচিরাৎ দূর করা সম্ভব হইবে না।

খাদ্যের অভাব মিটাইবার জন্য কমিটি নিম্নোক্ত প্রতিকার ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছেন। খাদ্যের পরিমাণ, গুণ ও মূল্যের ভিত্তিতে কমিটি ইহার সুপারিশ রচনা করিয়াছেন।

১। দেশে যাহাতে অধিক খাদ্য উৎপাদন হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমাদানী করিতে হইবে।

৩। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যাহাতে অত্যধিক বৃদ্ধি না পায় সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণ (Rationing) প্রবর্তন করিতে হইবে।

৪। খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যমূল্য স্থির রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটি মূল্য স্থিতিকরণ বোর্ড (Price Stabilisation Board) গঠন আবশ্যক।

৫। যাহারা ভাত খায় তাহাদের অন্য খাদ্য বিশেষ করিয়া আটা, ময়দার প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে।

৬। নানা উপায়ে লোকের আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৭। জনসংখ্যা যাহাতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি অপেক্ষা বেশী হারে বৃদ্ধি না পায় সেজন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাসগৃহ—Housing

বাসগৃহের সমস্যা ভারতের সর্বত্রই উৎকটরূপে দেখা দিয়াছে। পূর্বে যে এ সমস্যা আদৌ ছিল না তাহা নয়, তবে দেশবিভাগের ফলে অসংখ্য উদ্বাস্তু আগমনের জন্য এই সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গৃহনির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণাদির দুষ্প্রাপ্যতা এই সমস্যাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে। বাসগৃহের অভাব-হেতু কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরে এমন কি মফঃস্বলের ক্ষুদ্র শহরেও বাড়ীভাড়া ৪।৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইজন্য সরকারকে বাড়ীভাড়া আইন প্রণয়ন করিয়া বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ করিতে হইয়াছে। শহরে পাকা বাড়ী নির্মাণের জন্য ইট, কাঠ, লোহা ও বিশেষ করিয়া সিমেণ্টের অভাব ও দুর্মূল্যতার জন্য নূতন বাড়ী প্রস্তুত করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার-

গুলি পরিকল্পনা কার্যের জন্য বহু লোহা ও সিমেণ্ট ক্রয় করিয়াছেন, ফলে বে-সরকারী নির্মাণক্ষেত্রে এই উপকরণগুলির তীব্র অভাব দেখা যাইতেছে। গ্রামে লোকে কাঁচা বাড়ীতে বাস করে। এজন্যও বাঁশ, খড়, গোলপাতা, হোগলা প্রভৃতি উপকরণ প্রয়োজন হয়। গোলপাতা, হোগলা ও বাঁশ যে অঞ্চলে বেশী পরিমাণে পাওয়া যাইত তাহা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে এগুলিও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও চিকিৎসা—Sanitation and Health

শুধু কোন রকমে মাথা গুঁজিবার ঠাঁই হইলেই যথেষ্ট নহে। সুস্থ শরীরে কর্মক্ষম হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আলো ও প্রচুর মুক্ত বায়ুর প্রয়োজন। শহর ও গ্রাম-গুলিতে এজন্য স্বাস্থ্যরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। শহরে যাহাতে ময়লা জল নিষ্কাশিত হয় সেজন্য জলনিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই। পথ-ঘাট, হাট-বাজার, সিনেমা, রেস্তোরাঁ প্রভৃতি সাধারণের স্থানগুলি যাহাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। দূষিত বা বাসি খাদ্য যাহাতে বিক্রয় না হয় তজ্জন্য পৌর-প্রতিষ্ঠানের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ যাহাতে বিস্তারলাভ না করে তজ্জন্য টিকা দিবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। রোগ হইলে চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসালয়, হাসপাতাল ও উপযুক্ত চিকিৎসক প্রয়োজন। গ্রামেই ইহার প্রয়োজনীয়তা বেশী দেখা যায়। স্বাস্থ্যকর ও রুচিসম্মত খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিলে তাহা স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের উপরও স্বাস্থ্য বহুপরিমাণে নির্ভর করে। শহরাঞ্চলে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ আর একটি গুরুতর সমস্যা। গ্রামের ন্যায় শহরাঞ্চলে লোকে বাড়ীতে গরু পুষিতে পারে না। শহরাঞ্চলে যে সমস্ত খাটালে গো-মহিষাদি থাকে তাহাতেও প্রয়োজনীয় পরিমাণ দুগ্ধের সরবরাহ সম্ভব নয়। অধিকন্তু বসতি অঞ্চলে খাটাল থাকিবার জন্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার হরিণঘাটায় দুগ্ধকেন্দ্র স্থাপন করিয়া কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ করিতেছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই সরবরাহ নিতান্ত নগণ্য। সমাজোন্নয়নমূলক কার্য যদি সাফল্য লাভ করে, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, দেশের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

পৌর সমস্যা

দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও ব্যাধিই হইল প্রধান পৌর সমস্যা। ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। সুতরাং গ্রামগুলির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি না হইলে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। এইজন্য সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যায় এই পরিকল্পনার সাহায্যে গ্রামের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও রোগ দূর করিয়া গ্রামবাসীর জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করা সম্ভব হইবে। এইজন্য গ্রামবাসীর সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্ন ও উত্তর—উনবিংশ অধ্যায়ের পর দ্রষ্টব্য।

উনবিংশ অধ্যায়

ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা

(Defence of India)

পাকিস্তান হওয়া সত্ত্বেও ভারত এত বড দেশ যে, ইহাকে একটি উপ-মহাদেশ বলা চলে। এই বিরাট দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা একান্ত আবশ্যক, ইহা অস্বীকার করা যায় না। দেশ স্বাধীন হইবার পর উনিশ শত পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রাষ্ট্রপতির হস্তেই প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী লইয়া গঠিত। ইহা ছাড়াও জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও জাতীয় রক্ষীবাহিনী আছে। সমগ্র প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হইলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

স্থলবাহিনী—Army

ভারতের স্থলবাহিনী তিনভাগে বিভক্ত—দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম। সমগ্র স্থল-বাহিনীর জন্য একজন প্রধান সেনাপতি (Chief of the Army Staff) আছেন। দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম ভাগের জন্য একজন করিয়া লেফ্‌টেন্যাণ্ট-জেনারেলের মর্যাদাসম্পন্ন সেনাপতি আছেন। প্রত্যেকটি ভাগ আবার কতকগুলি আঞ্চলিক সেনাবাহিনীতে বিভক্ত। প্রত্যেক আঞ্চলিক বাহিনীর জন্য মেজর জেনারেলের মর্যাদাসম্পন্ন এক একজন সেনানায়ক আছেন। অঞ্চলগুলিকে আবার কতকগুলি ছোট ছোট অঞ্চলে ভাগ করিয়া একজন হাবিলদার (Brigadier)-এর হস্তে ইহার ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে।

দিল্লীতে স্থলবাহিনীর প্রধান কর্মকেন্দ্র প্রধান সেনাপতির নির্দেশে পরিচালিত হয়। ইহার ছয়টি বিভিন্ন বিভাগ আছে। এই বিভাগগুলির মধ্যে যুদ্ধোপকরণ-সরবরাহ, রসদ-সরবরাহ, পরিবহন-ব্যবস্থা, তথ্য ও সংবাদ আদান-প্রদান প্রভৃতি হইল প্রধান। স্থলবাহিনীর জন্য একটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগও আছে। স্থলবাহিনীর জন্য দেরাদুন ও পুনার নিকটে দুইটি শিক্ষাকেন্দ্র আছে।

নৌ-বাহিনী—Navy

ভারত প্রায় তিনদিকেই সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত। এইজন্য ইহার নৌবাহিনী রাখাও বিশেষ প্রয়োজন। নৌবাহিনীর জন্য একজন প্রধান সেনাপতি (Chief of the

Naval Staff) আছেন। তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য চার জন সহকারী আছেন। বোম্বাই, কোচিন ও বিশাখাপত্তমে তিনটি নৌ-কেন্দ্র আছে। ভারতের নৌবাহিনীতে ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার, মাইন্ সুইপার প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জাহাজ আছে। ভারতের নৌবাহিনীতে বর্তমানে পাঁচশত পদস্থ কর্মচারী (Officer) ও সাড়ে পাঁচহাজার নৌসেনা আছে। নৌ-সৈনিক ও কর্মচারিগণের শিক্ষার জন্য জামনগর, কোচিন ও বিশাখাপত্তমে শিক্ষাকেন্দ্র আছে। নৌবাহিনীর সাহায্যের জন্য ইহার নিজস্ব একটি বিমানবহর আছে।

বিমানবাহিনী—Air Force

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কার্যতঃ ভারতের বিমানবাহিনী গঠিত হয়। ভারতের বিমানবাহিনীর একজন সেনাপতি (Chief of the Air Staff) অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য চার জন সহকারী আছেন। দিল্লীর নিকটে পালাম এবং বাঙ্গালোর ও কানপুরে বিমানবাহিনীর ঘাঁটি আছে। ১৯৫২ সালে পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক প্রণীত নূতন আইন অনুসারে দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করিয়া বিমানবাহিনী কেন্দ্র গঠিত হইয়াছে। ইদানীং কলিকাতায় বিমানবাহিনীর চতুর্থ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। উড়িষ্যা ও পাঞ্জাবে আরও দুইটি শাখা খোলা হইয়াছে।

সুখের বিষয় ভারতের স্থলবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়গণ দ্বারা পরিচালিত হয়। বিমানবাহিনীও প্রায় ভারতীয়গণ দ্বারা পরিচালিত হয়; বর্তমানে মাত্র সাত জন ইংরাজ কর্মচারী আছেন। ইঁহাদের অধিকাংশই হইলেন যন্ত্রবিদ্। নৌ-বাহিনীতে উচ্চপদে কতকগুলি বিদেশী নিযুক্ত আছেন। ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ব্যয় বাবদ ৪৫১·৮১ কোটি টাকা ধার্য হইয়াছে।

লোক সহায়ক সেনা—Lok Sahayak Sena

এই বাহিনীর উদ্দেশ্য হইল প্রতি পাঁচ বৎসরে পাঁচলক্ষ লোককে প্রাথমিক যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া। আঠার হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক সুস্থ ও সক্ষম ব্যক্তি লইয়া এই বাহিনী গঠিত হয়। বর্তমানে সীমান্ত অঞ্চলের জনগণকে যুদ্ধবিদ্যায় প্রাথমিক শিক্ষা দিবার উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য-গণকে একমাসব্যাপী শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাদের যুদ্ধে যোগদান করিবার কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

জাতীয় রক্ষী বাহিনী—National Cadet Corps

স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী লইয়া এই বাহিনী গঠিত হয়। ইহার তিনটি ভাগ

আছে : উচ্চতম (Senior), নিম্নতম (Junior) ও বালিকা (Girls)। উচ্চতম ও নিম্নতম বিভাগগুলি আবার স্থল, নৌ ও বিমান এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। স্থলবাহিনী আবার যান্ত্রিক, গোলন্দাজ, পদাতিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত। নৌবাহিনী সাধারণতঃ, সমুদ্রোপকূল অঞ্চলের ছাত্র লইয়া গঠিত হয়। ১৯৬৩ সালে জাতীয় রক্ষী বাহিনীর সদস্য-সংখ্যা হইল ৩,২৮,২৫০। বালিকা-বিভাগেই ৩৬,৬৩০ স্বেচ্ছাসেবিকা আছে। বিমানবাহিনীতে বর্তমানে বারটি শাখা আছে। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা ব্যতীতও তাহাদিগকে নিয়মানুবর্তিতা, নেতৃত্ব প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হওয়ার ফলে জাতীয় রক্ষী বাহিনী পুনর্গঠিত হইতেছে। কলেজের ছাত্রগণের পক্ষে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া N. C. C. Rifles গঠিত হইয়াছে।

স্থানীয় বাহিনী—Territorial Army

১৯৪৯ সালে এই বাহিনী গঠিত হয়। ১৮ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক যে-কোন সক্ষম ভারতীয় নাগরিক এই বাহিনীতে যোগদান করিতে পারে। দেশের যুবকগণকে দেশরক্ষার কার্য শিক্ষা দিবার সুযোগ দান করাই হইল এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য। এই বাহিনীর দুইটি ভাগ আছে—গ্রামীণ (Provincial) ও শহরাঞ্চল (Urban)। এই বাহিনীতে যোগদানকারী গ্রামাঞ্চলের সদস্যদের ৩০ দিন ও শহরাঞ্চল সদস্যদের ৩২ দিন শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষানবীশ থাকা অবস্থায় বা কার্যে নিযুক্ত হইলে ইহারা বেতন, ভাতা ও চিকিৎসা-ব্যয় পাইয়া থাকেন। আপৎকালে সরকার দেশরক্ষার জন্য ইহাদিগকে আহ্বান করিতে পারেন, তবে সাধারণতঃ ইহাদিগকে ভারতের বাহিরে পাঠান হয় না।

সংক্ষিপ্তসার

প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা—Defence of India

ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার জন্য স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হইলেন এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। তিনটি বিভাগের জন্য তিন জন প্রধান সেনাপতি আছেন।

ইহা ছাড়া জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী ও জাতীয় রক্ষী-বাহিনী আছে। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী লইয়া জাতীয় রক্ষী-বাহিনী গঠিত।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What is meant by the term 'Preamble' to a constitution? Briefly describe and explain the preamble of the constitution of India.

H. S. (Hu) Comp. 1961

প্রস্তাবনা বলিলে কি বুঝা যায়? ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা সংক্ষেপে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর।

উঃ—প্রস্তাবনার অর্থ হইল ভূমিকা। প্রত্যেক শাসনতন্ত্রের শুরুতেই একটি প্রস্তাবনা থাকে এবং এই প্রস্তাবনার সাহায্যে শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়।

মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের অনুরূপভাবে ভারতের শাসনতন্ত্রেও একটি প্রস্তাবনা যোগ করা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় ভারতীয় জনগণের পক্ষে কতকগুলি উচ্চ আদর্শের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই উচ্চ আদর্শগুলিকে রূপদান করা কতদূর সম্ভব তাহাতে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়াও আরও বলা হয় যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রস্তাবনায় উল্লিখিত আদর্শের বাণী নিরর্থক হইবে। কিন্তু এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বহুদিন পরে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিয়া স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং স্বাধীন ভারত যদি কর্মক্ষেত্রে একটি উচ্চ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা হইলে তাহার জাতীয় জীবনের মান কোনদিনই উন্নীত হইবে না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলিকে একেবারে নিরর্থক বলা সমীচীন নহে। অপর পক্ষে সংবিধানে উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলিকে যে কার্যে রূপদান করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে না একথাও বলা চলে না। অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া সকলের জন্য সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, জমিদারী প্রথার বিলোপ, প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তন, উত্তরাধিকার, সম্পদ, ব্যয় ও সাধারণ দান প্রভৃতির উপর কর ধার্য এবং পর পর তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাহায্যে জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার প্রচেষ্টার নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

2. "India is a Sovereign Democratic Republic." Explain what its means.

H. S. (Hu), 1960, 1962 Comp.

'ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'—এই বাক্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উঃ—ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল যে, নবগঠিত ভারতকে কি সার্বভৌম ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, ভারতের শাসনতন্ত্র কি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত? তৃতীয়তঃ, ভারতকে কি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রজাতন্ত্র বলা যাইতে পারে?

ভারত সাধারণতন্ত্রভুক্ত রাষ্ট্রগুলির [illegible] হিসাবে বৃটিশ রাজা বা রাণীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছে এবং এজন্য অনেকে ভারতকে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র বলিতে আপত্তি করেন। কিন্তু ইহার

উত্তরে বলা যায় যে, ভারত সাধারণতন্ত্রভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সদস্য হিসাবে বৃটিশ 'রাজা বা রাণীর নেতৃত্ব স্বীকার করিলেও, রাজা বা রাণীর আনুগত্য স্বীকার করে নাই। ভারত সম্পর্কে বৃটিশ রাজার আদৌ কোন ক্ষমতা নাই—এমন কি ভারতের কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে রাজা বা রাণীর নাম উচ্চারিত হয় না। ভারত সাধারণতন্ত্র গোষ্ঠীর রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করিয়া গ্রেট বৃটেন হইতে কতকগুলি সুবিধা পাইবার উদ্দেশ্যে সাধারণতন্ত্রভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সদস্য রহিয়াছে। স্বেচ্ছায় ভারত এই সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছে ও নিজ ইচ্ছামত এই সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে পারে। সুতরাং সাধারণতন্ত্রভুক্ত হওয়ার ফলে ভারত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বা মর্যাদাহানি হয় নাই। ভারত পূর্ণ সার্বভৌম-বিশিষ্ট রাষ্ট্র।

দ্বিতীয়তঃ, ১৯৪৯ সালে ভারতে যে গণপরিষদ শাসনতন্ত্র রচনা করে, সে গণপরিষদ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয় নাই ইহা সত্য। কিন্তু ১৯৫২ সালে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে পার্লামেণ্ট সভা গঠিত হয়, সে সভা কর্তৃক আদি শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। সুতরাং ভারতের শাসনতন্ত্রের সার্বজনীন ভিত্তি (Democratic basis) অস্বীকার করা যায় না। ভারতে শাসনক্ষমতার প্রকৃত উৎস হইল 'আমরা ভারতবাসী'—("We, the people of India")

তৃতীয়তঃ, রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারত শাসনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। সুতরাং ভারতকে একটি প্রজাতন্ত্র (Republic) বলা হইয়াছে।

৪। What are the Directive Principles of State policy as stated in the Indian Constitution ? What is their significance ?

H. S. (Hu) Comp. 1960, 1962

ভারতের সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশাত্মক নীতিগুলি কি? নীতিগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উঃ—মৌলিক অধিকার ব্যতীত ভারতের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার কতকগুলি মূলনীতি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এইগুলি স্বাধীন আয়ারের শাসনতন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই নীতিগুলি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, শাসন কর্তৃপক্ষ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ও শাসনব্যাপারে এই নীতিগুলি দ্বারা পরিচালিত হইবে।

শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ এই নীতিগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগে উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের আদর্শ বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক আদর্শের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এই আদর্শ হইল ভারতে একটি জনকল্যাণকর সমাজব্যবস্থা গঠন করা ও সেই উদ্দেশ্যে দেশের সমগ্র সম্পদের ন্যায্য বণ্টন-ব্যবস্থার সাহায্যে আয়-বৈষম্য দূর করিয়া সকল শ্রেণীর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করা।

দ্বিতীয়ভাগে উল্লিখিত আদর্শ হইল সমস্ত নাগরিকের উপযুক্ত ব্যবস্থা, শ্রমিক শ্রেণীর নিরাপত্তা রক্ষা, সমান কাজের জন্য সকলকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়া, সকল নাগরিকেরই কর্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

তৃতীয়ভাগে উল্লিখিত আদর্শ হইল, অনুন্নত সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতি

চাষের উন্নতি, মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠা, পশুপালন, গ্রাম-পঞ্চায়েৎ গঠন, বিনা যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সালিশীর সাহায্যে শান্তিস্থাপন, শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ ও জাতীয় গুরুত্ব-সম্পন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও বস্তু রক্ষা করা।

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতিগুলির পার্থক্য হইল যে, মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হইলে আদালত সাহায্যে প্রতিবিধান পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিগুলি ক্ষুণ্ণ হইলে ইহার কোন প্রতিবিধান নাই।

এখন প্রশ্ন হইল যে, তাহা হইলে এই নীতিগুলির কি কোন মূল্য বা তাৎপর্য নাই? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলির পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে মাত্র। এই নীতিগুলি হইল শিশুরাষ্ট্র ভারতের আদর্শ এবং একটি আদর্শ ছাড়া কোন নবগঠিত রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব নয়। এই আদর্শগুলি শাসনকার্যে এবং আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে বলবৎ হইলে দেশের যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতের সংবিধানে এই নীতিগুলি স্থান পাইয়াছে। নীতিগুলি এখনও পর্যন্ত শাসন-ক্ষেত্রের সর্বত্র প্রযুক্ত না হইলেও বলা যাইতে পারে যে, অনেক বিষয়ে শাসনকর্তৃপক্ষ এই নীতি কার্যক্ষেত্রে বলবৎ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং নীতিগুলি একেবারে নিরর্থক হয় নাই।

4. State at least four of the Fundamental Rights of an Indian citizen.
   How are these Fundamental Rights protected in the Indian Constitution?
   H. S. (Hu.), 1961.

ভারতীয় নাগরিকগণের অন্ততঃ চারিটি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ কর। এই অধিকারগুলি সংবিধান দ্বারা কিভাবে রক্ষিত হয়?

উঃ—মানুষের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য অবস্থা বলিয়া সর্বদেশে স্বীকৃত হয়। এই অধিকারগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিকার হইতে পৃথক করিয়া শাসনতন্ত্রে স্থান দেওয়া হয়। এইজন্য এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বলা হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি এই মৌলিক অধিকার পর্যায়ভুক্ত।

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রে ভারতের নাগরিকগণের এইরূপ সাতটি মৌলিক অধিকার স্থান পাইয়াছে। এই অধিকারগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি অধিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

১। সাম্যের অধিকার—Right to Equality

জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের প্রতি সমান ব্যবহার করিবে। রাষ্ট্র জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকগণের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিবে না। আইনের চক্ষে সকল নাগরিকই সমান এবং কাযের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সব নাগরিকেরই সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার সমান অধিকার থাকিবে। যে কোন আকারে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র সামরিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত উপাধি ব্যতীত অন্য কোনরূপ উপাধি প্রদান করা হইবে না।

তবে ভারত সরকার বর্তমানে 'ভারত রত্ন', 'পদ্ম বিভূষণ', 'পদ্মশ্রী' প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করিতেছেন। সমাজব্যবস্থার সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃত গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে উপাধি প্রদান প্রথা রহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। স্বাধীনতার অধিকার— Right to Freedom

ভারতের সকল নাগরিকেরই বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকিবে। ইহা ছাড়া সকল নাগরিকই নিরস্ত্রভাবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, সংঘ প্রভৃতি গঠন করিতে পারিবে। ভারতের যে-কোন অংশে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ, বসবাস, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, যে-কোন বৃত্তি গ্রহণ বা ব্যবসায় করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। সরকার যদি কোন ব্যক্তিকে আটক করে তাহা হইলে তাহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আটক করিবার কারণ জানাইতে হইবে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। বন্দী ব্যক্তি যদি মনে করে যে, তাহাকে অন্যায়ভাবে আটক করা হইয়াছে তাহা হইলে তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য হেবিয়াস কর্পাস্ রিট্ (Habeas Corpus Writ) জারি করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে। এই অবস্থায় আদালত যদি আটক ব্যক্তির নির্দোষিতা সম্পর্কে বিশ্বাসী হয়, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ দিতে পারে।

৩। ধর্মাচরণের অধিকার— Right to Freedom of Religion

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এইজন্য সকল নাগরিকেরই ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকিবে। রাষ্ট্রের শান্তি-শৃংখলা বা জনস্বার্থ ও সাধারণ নীতিজ্ঞানের বিরোধী না হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার ধর্মাচরণ করিতে পারিবে। সরকারের সহিত সম্পর্কিত কোন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে কাহাকেও যোগদান করিতে বাধ্য করা যাইবে না।

৪। সম্পত্তি রক্ষার অধিকার—Right to Property

আইনের অনুমোদন ব্যতীত বা ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া কাহারও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা চলিবে না বা জনসাধারণের স্বার্থে কোন সম্পত্তি, শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করা চলিবে না। ১৯৫১ সালে এই অধিকার সম্পর্কে কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। ১৯৫১ সালে সংশোধনী আইনের বলে জনস্বার্থের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দখল বা পরিচালনা করিবার ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত অধিকার ও শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের অধিকার বলিয়া আরও তিনটি অধিকার স্থান পাইয়াছে।

সংবিধানে উল্লিখিত অধিকারগুলি যদি কোন প্রকারে ব্যাহত হয়, তাহা হইলে যে কোন নাগরিক এই মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করিতে পারে এবং এই বিচারালয় সম্পর্কে যথোপযুক্ত নির্দেশ দিতে পারিবে।

এস্থলে একটি কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইলে সেই ঘোষণাকাল বলবৎ থাকাকালে রাষ্ট্রপতি নাগরিকগণের সুপ্রিম কোর্টে মৌলিক অধিকার

আবেদন স্থগিত রাখিবার আদেশ দিতে পারেন। সুতরাং জরুরী অবস্থার ঘোষণাকালে শাসন কর্তৃপক্ষ এই মৌলিক অধিকারগুলি হরণ করিতে পারে। এই ব্যবস্থার দ্বারা বুঝা যায় যে, ভারতের শাসনতন্ত্র এক হস্তে যে মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিকগণকে দিয়াছে, অপর হস্ত দিয়া নাগরিকগণকে সে অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করিতে পারে।

5. What are the characteristic features of Federation of India ?

H. S. (Hu.), 1961

6. State and explain the important characteristics of the Federation of India.

H. S. (Hu), Comp, 1960

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

উঃ—নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে এক যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও ১৫টি রাজ্য সরকারের অবস্থিতি এবং অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ ও বণ্টন হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, একটি লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বিভক্ত হইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ন্যায় ভারতের শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত নয়, সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই শাসনতন্ত্র অনমনীয়ও বটে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (Supreme Court) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চতুর্থতঃ, এই শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সরকারও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের শাসনব্যবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তরালে এই শাসনতন্ত্রে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার একাধিক নিদর্শন রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ভারতে একই শাসনতন্ত্র দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির গঠন, প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র স্থির হইয়াছে। রাজ্য সরকারগুলির নিজস্ব কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা পরিবর্তনের ক্ষমতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমতা—এই শাসনতন্ত্রে কার্যকরী করা হয় নাই। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা-বণ্টন নীতি এরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির শাসনভার অর্পিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ ভারতের শাসনতন্ত্রের একটি যুগ্ম বিষয়ের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ও ক্ষমতা বণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই উভয় ব্যবস্থার দ্বারা রাজ্য সরকারগুলির যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ স্বাধীন সত্তা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, সমগ্র ভারতের জন্য একদফা নাগরিকত্ব, একটি মাত্র [illegible] আদালত ও একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই শাসনতন্ত্রের এককেন্দ্রীয় ভাব সূচিত হয়। ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যসরকারগুলির শাসনকার্য পরিচালিত হইতে পারে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

7. Discuss whether India has a Unitary or Federal Government

H. S. (Hu), 1968 Comp.

ভারতের শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় তাহা আলোচনা কর।

উঃ—নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যগুলিই এই শাসনব্যবস্থায় দেখা যায়,—যথা, একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও ১৫টি রাজ্য সরকারের অবস্থিতি; কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিভাগ ও বণ্টন, লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, সুপ্রিম কোর্ট ইত্যাদি।

কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তরালে এই শাসনতন্ত্রের এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার একাধিক নিদর্শন রহিয়াছে, যথা, একই শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির গঠন, প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র স্থির করিয়াছে, অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, সমগ্র ভারতের জন্য একদফা নাগরিকত্ব, একটি মাত্র আপীল আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। এই সমস্ত কারণে অনেকে ভারতের শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় প্রবণতাযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র আখ্যা না দিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রবণতাযুক্ত এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা আখ্যা দেন।

৬নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

8. State the relation between the centre and the States of the Indian Union on legislative and executive matters.

9. Discuss the distribution of legislative powers between the centre and the States in the constitution of India

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে (১) আইন-প্রণয়ন সম্পর্ক ও (২) শাসনসম্পর্ক আলোচনা কর।

উঃ—আইন-প্রণয়ন সম্পর্কে প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির কর্মক্ষেত্র পৃথক করিয়া দেওয়া হয় এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা করে। অপর দিকে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃত্ব করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির কর্মক্ষেত্র পৃথক হইলেও সরকারী কাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য উভয় সরকারের মধ্যে যাহাতে সহযোগিতা থাকে তাহারও ব্যবস্থা করা হয়।

যদিও আইন-প্রণয়ন বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির কর্মক্ষেত্র শাসনতন্ত্র কর্তৃক পৃথক করা হইয়াছে তথাপি নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। প্রথমতঃ, যদি দুই বা ততোধিক রাজ্যের আইনসভা কেন্দ্রীয় আইনসভাকে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করে তবে কেন্দ্রীয় আইনসভা ঐ বিষয়টি রাজ্য তালিকাভুক্ত হইলেও ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভার উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে যদি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, কোন রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে জাতীয় কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন প্রণয়ন করা উচিত তাহা হইলে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভা যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন

করিতে পারে এবং কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলে পার্লামেন্ট রাজ্য আইন-সভার স্থান অধিকার করিতে পারে।

যুগ্ম বিষয়গুলির উপর উভয় সরকারই—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য—আইন প্রণয়ন করিতে পারে। কিন্তু যুগ্মতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে রাজ্য আইনসভা দ্বারা প্রণীত কোন আইনের সহিত যদি পার্লামেন্ট প্রণীত কোন আইনের বিরোধ হয়, তাহা হইলে পার্লামেন্ট প্রণীত আইনই বলবৎ হইবে।

শাসন সম্পর্ক—শাসন পরিচালনা সম্পর্কে উভয় সরকারই নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন থাকিবে। কিন্তু সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজ্য সরকারগুলির শাসনক্ষমতা এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতা ব্যাহত না হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ প্রয়োজনক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারিবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকারকে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, সামরিক অথবা জাতীয় স্বার্থ-সম্পর্কিত কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে প্রয়োজনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারিবে এবং এই নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকারগুলির কাজ করিতে হইবে। যদি কোন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন নির্দেশ উপেক্ষা করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই উপেক্ষাকে শাসনতন্ত্রে অচলাবস্থার উদ্ভব মনে করিতে পারেন এবং সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারগুলির সম্পর্ক বিচার করিয়া রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধস্তন প্রতিনিধিমাত্র বলিতে পারা না গেলেও এ কথা সত্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার নানাভাবে রাজ্য সরকারগুলির উপর তাহার কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারে।

10. Discuss the relation between the two houses of Parliament

ভারতের পার্লামেন্ট সভার উভয় কক্ষের সম্পর্ক আলোচনা কর।

উঃ—রাষ্ট্রপতি সহিত রাজ্যসভা ও লোকসভা লইয়া কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত। ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভার ক্ষমতা অনেক বেশী।

১। সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে উভয় কক্ষই সম ক্ষমতার অধিকারী। আইনের প্রস্তাব যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায় এবং একটি কক্ষ কর্তৃক পাস হইলে অপর কক্ষে উপস্থিত করা হয়। উভয় কক্ষের মধ্যে মতান্তর ঘটিলে এবং ছয় মাসের মধ্যে মীমাংসা না হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করিয়া সংখ্যাধিক্যের ভোটে প্রস্তাবটিকে পাস করাইতে পারেন। লোকসভার সদস্যসংখ্যা রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। সুতরাং যুগ্ম অধিবেশনে লোক-সভার মত সাধারণতঃ প্রাধান্য লাভ করে।

২। দ্বিতীয়তঃ, আয়-ব্যয়-সম্পর্কিত ব্যাপার একমাত্র লোকসভাই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ ব্যয়ের দাবির প্রস্তাব রাজ্যসভা কেবলমাত্র আলোচনা করিতে পারে, কিন্তু ভোট দিতে পারে না। রাজস্ব বিল লোকসভায় প্রথম পেশ করিতে হয় এবং এই সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে রাজ্যসভায় প্রেরিত হয়। রাজ্যসভা যদি কোন পরিবর্তনের প্রস্তাব করে তবে লোকসভা তাহা গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে। লোকসভা কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব রাজ্য-

সভায় প্রেরিত হইবার ১৪ দিন পর পর্যন্ত যদি রাজ্যসভার সুপারিশ সহ অথবা বিনা সুপারিশে লোকসভায় প্রেরিত না হয়, তবে উক্ত প্রস্তাব লোকসভার মতানুযায়ী আইনে পরিণত হইবে।

৩। ভারতের মন্ত্রিপরিষদও লোকসভার নিকট দায়ী। রাজ্যসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়াও মন্ত্রিপরিষদকে অপসারিত করিতে পারে না।

৪। তবে একটিমাত্র ক্ষেত্রে রাজ্যসভার বিশেষ একটি ক্ষমতা আছে। রাজ্যপরিষদ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে যে, জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদ রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

11. Describe the organisation and powers of the Union legislatures in India.

ভারতের কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভার গঠন ও ক্ষমতা আলোচনা কর।

উঃ—গঠন—ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা ও লোকসভা লইয়া গঠিত। রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ সদস্য লইয়া গঠিত হয়। রাজ্যসভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা হইল ২৩৬ জন। রাজ্যসভার ২৩৬ জন সদস্যের মধ্যে ২১৭ জন বিভিন্ন রাজ্যের নিম্নকক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক একক-হস্তান্তরযোগ্য ভোটে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে পরোক্ষে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইতে ৭ জন নির্বাচিত হন। অবশিষ্ট ১২ জন সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক বা সমাজ-সেবক বা বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ। তবে প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এই সভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অবসর গ্রহণ করিতে হয়। উপ-রাষ্ট্রপতি এই সভার সভাপতিত্ব করেন।

নিম্নপরিষদ লোকসভা অনধিক ৫০০ জন সদস্য লইয়া গঠিত। রাজ্যগুলির ভোটদাতাগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে জনসংখ্যার অনুপাতে ৪৯৪ জন সদস্য নির্বাচন করেন। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি সংখ্যা হইল ১৫, ইঙ্গ-ভারতীয় ও আসামের উপজাতীয় সদস্য সংখ্যা হইল ২+২—সর্বসমেত লোকসভার সদস্য সংখ্যা হইল ৫০৯। এই সদস্যগণের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর, আন্দামান, লাক্ষাদ্বীপ, ইঙ্গ-ভারতীয় ও আসামের উপজাতির সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। নিম্নপরিষদের কার্যকাল সাধারণতঃ ৫ বৎসর। তবে জরুরী অবস্থায় এই কার্যকাল পার্লামেণ্ট এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি ৫ বৎসরের পূর্বে এই সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। কার্য পরিচালনার জন্য লোকসভা একজন স্পীকার নির্বাচন করে।

ক্ষমতা—কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভা অন্য রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেও এই সভার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র নির্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে প্রযুক্ত হয়। মৌলিক অধিকার-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করিবার বা শাসনতন্ত্র নির্ধারিত রাজ্য সরকারগুলির আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার উপর এই সভার কোন ক্ষমতা নাই। এই সভা যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত ও যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। উভয় কক্ষের সম্মতিতে আইনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে আইন পাস হয়। উভয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত আইন রাষ্ট্রপতি প্রথমবার অনুমোদন না করিলেও দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে তাঁহাকে সম্মতি দিতেই হইবে। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবও এইরূপে পাস হয়। তবে এ বিষয়ে নিম্নপরিষদের ক্ষমতা অধিক। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণা পার্লামেণ্টের অনুমোদনসাপেক্ষ। জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে বা

রাজ্যসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পার্লামেন্ট সভ্য রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। পার্লামেন্ট সভার নির্বাচিত সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যগণ উপ-রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করেন। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের জন্য পার্লামেন্টের যে কোন সভা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং উভয় কক্ষের বিশেষ সংখ্যাধিক্যের ভোটে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়। পার্লামেন্ট উভয় কক্ষের ⅔ সংখ্যা ভোটে গৃহীত প্রস্তাব আনয়ন করিয়া সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে অবধারিত অসদাচরণ বা অযোগ্যতার জন্য অপসারণ করিতে পারে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা লোকসভার নিকট দায়ী। শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতাও পার্লামেন্টের হস্তে ন্যস্ত। সুতরাং দেখা যায় যে, ভারতের পার্লামেন্ট সভা ইহার বিস্তৃত ক্ষমতা পরিচালনার দ্বারা একদিকে যেমন ভারতের জনমত সজাগ রাখে, অপর দিকে তদ্রূপ শাসনকর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে।

12. Describe the position and powers of the President of the Indian Union.

ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

18 /Indicate the powers of the President of the Indian Union. How is he elected? H. S. (Hu.), 1960

ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আলোচনা কর। তিনি কি পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন?

উত্তরের ইঙ্গিত—নির্বাচন—রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে ৩৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। ভারতীয় পার্লামেন্ট সভার উভয় কক্ষের সদস্যগণ ও রাজ্যসমূহের নিম্ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয়।

পদমর্যাদা—রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতের সর্বপ্রধান ও সর্বসম্মানিত নাগরিক। তিনিই কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক ও তাঁহার নামেই কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসনক্ষমতার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেও কার্যতঃ তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালন[illegible] দায়িত্ব কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদ সহ প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

ক্ষমতা—শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহকে সাধারণ[illegible]বিভাগে ভাগ করা হয়, যথা,

১। শাসন পরিচালনার ক্ষমতা (Executive Powers)

২। আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা (Legislative Powers)

৩। অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers)

৪। বিচারবিষয়ক ক্ষমতা (Judicial Powers)

৫। জরুরী ক্ষমতা (Emergency Powers)

(ক) জরুরী অবস্থার ঘোষণা, (খ) রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার ঘোষণা, (গ) অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

14. State the composition and functions of the Supreme Court of India.

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের গঠন ও ক্ষমতার বিবরণ দাও।

উত্তরের ইঙ্গিত—গঠন—একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতজন বিচারপতি লইয়া এই আদালত প্রথম গঠিত হয়। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ব্যতীত আরও ১০ জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন এবং বিচারপতিগণ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন।

ক্ষমতা—১। আদিম—কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক বিষয় সম্পর্কে বিরোধের মীমাংসা করা।

২। আপীল—বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার রায়ের বিরুদ্ধে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে আপীল শোনা।

৩। পরামর্শ—রাষ্ট্রপতির অনুরোধক্রমে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতামত দেওয়া।

৪। মৌলিক অধিকার—নাগরিকগণের শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষা করা।

15. How does the Union Legislature exercise its control over the Union Executive?

কেন্দ্রীয় আইনসভা কি প্রকারে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে?

উত্তরের ইঙ্গিত—নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। দায়িত্বশীল সরকারের তাৎপর্য হইল যে, যাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁহারা আইনসভার নিকট তাঁহাদের শাসন পরিচালনা নীতি ও কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকেন। ভারতে সরকারের কার্য নিম্নলিখিত উপায়ে আইনসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

১। আইনসভার সদস্যগণ অধিবেশনের সময় বিভিন্ন বিষয়ে মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং মন্ত্রিগণের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

২। সদস্যগণ কোন মন্ত্রীর অন্যায় কাজের প্রতিবাদস্বরূপ অধিবেশনের সময় "মুলতুবী প্রস্তাব" (Adjournment motion) আনয়ন করিয়া বিষয়টির তাৎপর্য আলোচনা করিয়া ভোট লইবার দাবী করিতে পারেন।

৩। মন্ত্রিসভার [illegible] মন্ত্রীর কাজ অপছন্দ হইলে ভারতের আইনসভার নিম্নপরিষদের অর্থাৎ লোকসভার যে-কোন সদস্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পেশ করিতে পারেন। এই প্রস্তাব পাস হইলে মন্ত্রিগণের পদত্যাগ করিতে হয়।

৪। সরকার কর্তৃক উত্থাপিত আয়ব্যয়ের প্রস্তাব অনুমোদন না করিয়াও লোকসভা মন্ত্রিপরিষদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

16. Discuss the position and powers of the Governor of a state in the Indian Union.

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যপালদের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা আলোচনা কর।

উত্তরের ইঙ্গিত—পদমর্যাদা—পাঁচ বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন রাজ্যপাল প্রত্যেক রাজ্যে আছেন। তিনিই রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা এবং তাহার নামেই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালও মন্ত্রিসভার পরামর্শানুসারে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যপাল যদি কোন সময়ে মনে করেন যে, রাজ্যের শাসনব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক আইনানুসারে পরিচালনা করা সম্ভব নয়, তবে তিনি এই মর্মে রাষ্ট্রপতিকে বিবরণ পেশ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে রাজ্যপাল কর্তৃক প্রেরিত বিবরণীর ভিত্তিতে একটি ঘোষণা করিয়া রাজ্যের শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন। এরূপ ঘোষণার পর সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যপাল রাজ্যটির শাসনকার্য পরিচালনা করেন। একমাত্র আসামের রাজ্যপালের উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকাগুলি সম্পর্কে দুইটি বিশেষ ক্ষমতা আছে, যাহা তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া নিজের ইচ্ছায় প্রয়োগ করিতে পারেন।

ক্ষমতা— ১। শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা
২। আইনবিষয়ক ক্ষমতা
৩। অর্থবিষয়ক ক্ষমতা
৪। বিচারবিষয়ক ক্ষমতা

17. What are the powers and functions of the Legislature in West Bengal

পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার ক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তরের ইঙ্গিত—পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা দ্বি-কক্ষ-বিশিষ্ট। রাজ্যপাল, বিধান পরিষদ ও বিধান সভা লইয়া এই আইনসভা গঠিত। বর্তমানে বিধান পরিষদ ও বিধান সভার সদস্য সংখ্যা হইল যথাক্রমে ৭৫ ও ২৫৬।

কাজ :—

১। রাজ্য তালিকাভুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা ও পুরাতন আইন সংশোধন করা।

২। রাজ্যের বাৎসরিক আয়ব্যয় মঞ্জুর করা। যে-কোন কর ধার্যের প্রস্তাব ও সরকারী অর্থব্যয় আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষ।

৩। প্রশ্নোত্তর, সমালোচনা ও পরিশেষে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব দ্বারা আইনসভা মন্ত্রিসভার কার্য নিয়ন্ত্রণ করা।

৪। আইনসভা ইহার আলাপ-আলোচনা দ্বারা দেশে জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

18. Describe the organisation of the Judiciary in India

ভারতের বিচার-ব্যবস্থার বর্ণনা কর।

উত্তরের ইঙ্গিত—১। সুপ্রিম কোর্ট—সর্বভারতীয় সর্বোচ্চ বিচারালয়। ইহার আদিম, আপীল, পরামর্শ ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত ক্ষমতা আছে। ইহা একাধারে সর্বভারতীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা সম্পর্কে উচ্চতম আদালত ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রধান বিচারপতি ও ১৩ জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত।

২। উচ্চ আদালত—প্রত্যেক রাজ্যে এইরূপ একটি আদালত আছে। একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি লইয়া উচ্চ আদালত গঠিত হয়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের উচ্চ আদালতগুলি নিম্ন আদালত হইতে আনীত ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলার আপীল শুনে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের উচ্চ আদালতগুলির আদিম ও আপীল উভয়বিধ ক্ষমতা আছে।

উচ্চ-আদালতের নিম্নে প্রত্যেক রাজ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার জন্য দুই শ্রেণীর আদালত আছে। যথা:

দেওয়ানী	ফৌজদারী
৩। জেলাজজের আদালত	৩। সেসন্স্ জজের আদালত
সাবজজের "	সহকারী সেসন্স্ জজের আদালত
৪। মুনসেফ "	৪। ম্যাজিষ্ট্রেটের (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর) ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত
৫। ইউনিয়ন "	৫। বেঞ্চ কোর্ট

জেলা ও সেসন্স্ জজেরও আদিম ও আপীল ক্ষমতা আছে। মুনসেফের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজের আদালতে ও সাধারণ ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে সেসন্স্ জজের আদালতে আপীল করা যায়। কলিকাতা প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী শহরে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার জন্য [illegible]র আদালত (City Court), প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত ও ছোট আদালত আছে। [illegible]ক্তর ফৌজদারী মামলার বিচার জুরীর সাহায্যে পরিচালিত হয়।

19. What [illegible] the functions of municipalities in India? What are their principal sources of revenue?

ভারতের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কি কি কার্য সম্পাদন করে? তাহাদের আয়ের প্রধান প্রধান উৎসগুলি কি?

উত্তরের ইঙ্গিত—প্রত্যেক শহরে একটি করিয়া পৌর-প্রতিষ্ঠান থাকে। করদাতাদের ভোটে চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য লইয়া পৌর-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান হইলেন পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা।

কার্য—পৌর-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে বা শহরাঞ্চলে কাজ করে, তাহাদের কাজ প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা,

১। জনস্বাস্থ্য রক্ষামূলক কাজ ২। জননিরাপত্তা রক্ষামূলক কাজ
৩। জনসুবিধা সৃষ্টিমূলক কাজ ৪। জনশিক্ষা (প্রাথমিক) বিস্তারমূলক কাজ।

আয়—জমি ও বাড়ীর উপর ধার্য কর, জল, আলো ও ময়লা নিকাশন ব্যবস্থার জন্য কর, যানবাহনের উপর কর, হাট, বাজার, সেতু, পশুহত্যার উপর শুল্ক, বিভিন্ন পেশাদারী, যথা, উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতির উপর কর, রাজ্য সরকারের নিকট হইতে সময় সময় প্রাপ্ত সাহায্য, ঋণ-গ্রহণ প্রভৃতি।

●20 Describe the constitution and functions of the District Boards in India.

ভারতে জেলাবোর্ডসমূহের গঠন ও কার্যের বিবরণ লিখ।

উত্তরের ইঙ্গিত—গঠন—এক আসাম ব্যতীত ভারতের সর্বত্র প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া জেলাবোর্ড আছে। রাজ্য সরকার নির্ধারিত কম পক্ষে নয়জন চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত সদস্য লইয়া বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ডের সদস্যগণ একজন চেয়ারম্যান ও এক বা দুইজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন।

কাজ—১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কাজগুলি উদাহরণসহ লিখ, যেমন, পানীয় জল সরবরাহ করা। গ্রামাঞ্চলে এই কাজ পুকুর, কূপ বা নলকূপ খনন করিয়া করা হয়, কিন্তু বড় বড় শহরে কলের জল সরবরাহ করা হয়।

21. Explain the main features of the present constitution of India.

ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

উত্তরের ইঙ্গিত—(১) নূতন শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের অবস্থিতি, ক্ষমতার বিভাগ, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রসুলভ সকল বৈশিষ্ট্যই এই শাসন-ব্যবস্থায় আছে। তবে এই শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অধিক। ২। ভারতের শাসনতন্ত্র [illegible]রিতভাবে লিখিত ও অনমনীয়। ৩। ভারতের শাসনতন্ত্র ভারতে মন্ত্রিসংসদ-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী একজন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি থাকিলেও কার্যতঃ এই শাসনক্ষমতা একজন প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। ৪। সর্বভারতে এক নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৫। নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার ব্যতীতও এই শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি উল্লেখ আছে। ৬। নূতন শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

27. Discuss the position and functions of the Magistrate and Collector of an Indian District.

ভারতের জেলাশাসকের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা আলোচনা কর।

উত্তরের ইঙ্গিত—ভারতের প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি জেলায় বিভক্ত এবং এই জেলাগুলিই রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ। আর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হইলেন এই শাসন-ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি কমিশনার নামে পরিচিত।

বৃটিশ শাসনকালে ম্যাজিস্ট্রেট আই-সি-এস কর্মচারী ছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর তিনি আই-এ-এস-এর কর্মচারী। প্রতিযোগিতামূলক লিখিত, মৌখিক ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন যুবকগণকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট একদিকে জেলাশাসনের সর্বময় কর্তা, অপর দিকে জেলার রাজস্ব আদায় করিবার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে। ইহা ছাড়া তিনি আবার ফৌজদারী মামলার বিচার করিয়া থাকেন। পুলিশ সাহায্যে জেলার শান্তিরক্ষা করা। কৃষি, শিক্ষা, সেচ, বন, কৃষিঋণদান, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির কাজ তাঁহাকে পরিদর্শন ও প্রয়োজন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়।

জেলাশাসকের উপর হাজার-হাজার লোকের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। সুতরাং তাঁহাকে শুধু সু-শাসক হইলে চলে না। তাঁহার মধ্যে জনপ্রিয় নেতার গুণ থাকা চাই। শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনই হইলে জেলাশাসকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

জেলাশাসক একদিকে শাসনকর্তা ও অপরদিকে বিচারক। শাসন ও বিচার এই দুইটি ক্ষমতা একই হস্তে কেন্দ্রীভূত হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। এই কারণে জেলাশাসককে বিচারক্ষমতার ভারমুক্ত করা কাম্য।

28. Show how the Indian constitution secures Liberty and Equality for all Indian citizens.

ভারতের শাসনতন্ত্র কিভাবে ভারতের নাগরিকগণের স্বাধীনতা ও সাম্যের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা দেখাও।

উঃ—ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় [illegible] জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক [illegible], সাম্য ও ভ্রাতৃভাব সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—'to secure to all citizens ···liberty of thought, expression, belief, faith and worship; Equality of Status and of opportunity'······

ভারতের নাগরিকগণ যাহাতে উপরি-উক্ত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে তজ্জন্য শাসনতন্ত্রে স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্ম সম্বন্ধীয় অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি কতিপয় মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে কোনমতে ব্যাহত না হয় তাহার প্রতিকারের

[illegible] হইয়াছে। এই অধিকারগুলি কোন ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হইলে নাগরিকগণ শাসনতান্ত্রিক [illegible] সুপ্রিম কোর্ট বা অন্য কোন উচ্চ বিচারালয়ের সাহায্যে অধিকারগুলি রক্ষা করিতে পারে। [illegible] সঙ্গে বলিতে হইবে যে, এই অধিকারগুলি এত সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে নিবিবদ্ধ হইয়াছে এবং [illegible] রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থায় বিশেষ ক্ষমতার এরূপভাবে সংকুচিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে যে, নাগরিকগণ এই অধিকারগুলি যথাযথভাবে ভোগ করিবার সুযোগ খুব কমই পাইবেন।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ ও জন্মস্থান-নির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই সমান অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। সকল নাগরিকেরই সাধারণের ব্যবহার্য দোকান, কূপ, পুষ্করিণী, রাস্তা প্রভৃতি ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। যোগ্যতা অনুসারে সরকারী চাকুরিতে সকলের সমান অধিকার দিতে হইবে। যে কোন আকারে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে উপাধি প্রদান প্রথা রহিত করা হইয়াছে।

প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে [illegible] প্রথমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। সাম্যের অর্থ ইহা নহে যে সকলেই সমান বা সকলকে সমান করিতে হইবে। সাম্যের প্রকৃত অর্থ হইল সকলকেই গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে সমান সুযোগ দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকের গুণ ও যোগ্যতা অনুসরে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া জীবিকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশে উৎকট আয়-বৈষম্য থাকিলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ভারত সরকার সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।